মহাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর

শিশুভাবে শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর

(৫০ বৎসব)

বন্ধুবার্ত্তা

[চতুর্থ সংস্করণে মুদ্রণের জন্য পুনঃ পঠিত, সংশোধিত।]

গ্রন্থকার

নিত্যসেবক —

দাস মহেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ

প্রকাশক
শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
২৪বি, স্যার গুরুদাস রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৪
ফোন নং ৩৫-৩৩৬৬

চতুর্থ সংস্করণ (পরিবর্ধিত)
বঙ্গাব্দ ১৩৭০, ইং ১৯৬৩, হরিপুরুষাব্দ ১১২

মুদ্রাকর :
এন. সি. পাল
চারু প্রেস
৭৩, ধনদেবী খান্না রোড.
কলিকাতা ৭০০০৫৪

উৎসর্গ

প্রভুবন্ধুহরির

প্রসাদীকৃত এই "বন্ধুবার্ত্তা"-রূপ

সন্দেশ

জগদ্বাসী

হরিভক্তগণের

পবিত্র করকমলে

অর্পিত

হইল

নিত্যসেবক ছোট মহেন্দ্র

উপহার

শ্রীশ্রীহরিপুরুষস্তবমুক্তাবলী

শ্রুতিগলিতং শুভফলিতং ভুবনহিতং রসললিতম্ ।
ভববিদিতং হরিচরিতং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ১
কমলপদং ত্রিদিবমদং রুচিরনখং নিখিলসখম্ ।
দ্বিরদগতিং ভুবনপতিং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ২
অসৃগধরং রসিকবরং কমলকরং সুতনুধরম্ ।
অশিবহরং পুরুষবরং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৩
শুচিহসনং সিতবসনং কজনয়নং শুভদশনম্ ।
জিতনমুচিং কনকরুচিং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৪
অঘহরণং কলিদমনং ভবশরণং রিপুদলনম্ ।
সুখসদনং ভজনধনং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৫
স্বজকরণং বিধুবরণং গুণভবনং গুণিরমণম্ ।
সুজনধনং প্রভুকমনং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৬
অমৃতময়ং যমবিজয়ং চিরসদয়ং শিবহৃদয়ম্ ।
কুশলময়ং বিভুমভয়ং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৭
স্মিতবদনং রসসদনং স্মরকদনং নবমদনম্ ।
জিতকলুষং হরিপুরুষং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৮
স্তবমুক্তাবলীপাঠঃ প্রভুবন্ধুপ্রিয়ঙ্করঃ ।
শ্রবণ-স্মরণাভ্যাস-শ্চিত্ততাপতমোহরঃ ॥ ৯

'ত্বরিতগতিশ্চ (১০), নজনগৈঃ ।' (৪), নমুচি-কাম । ক=অম্বু, জল
কজ—পদ্ম ।

[শ্রীশ্রীবন্ধুস্তোত্ররত্নাবলী]

শ্রীশ্রীহরিপুরুষজগদ্বন্ধুস্তবাষ্টকম্

ত্রিভুবন-মহিত-মহানামী
জয়তি স নিখিলধরা-স্বামী।
ত্রিভুবন-গুরু-করুণাসিন্ধুং
ভজ হরি-পুরুষ-জগদ্বন্ধুম্ ॥ ১

কলয়তু জগতি স চিদ্রূপং
হরতু স কলি-কলুষং তাপম্।
চিরশুচি-শুভকর-শুদ্ধেন্দুং
ভজ হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধুম্ ॥ ২

সুখময়-সদয়-জগন্নাথং
শুভ-হরি-মখপতি-সন্নাথম্।
বিধুরুচি-গুণিগণ-চিত্তেন্দুং
ভজ হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধুম্ ॥ ৩

ভব-লয়-ভব-ভব-কর্ত্তারং
যম-ভয়হর-যম-পাতারম্।
স্মরমথ-সুরস-সুধাসিন্ধুং
ভজ হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধুম্ ॥ ৪

(১) ন ন স গ গুরু রচিতা (১১) বৃত্তা। (৪) ভব, সংসার, মঙ্গল, শিব

ভবভয়হর-ধরণীত্রাতা
কৃপয়তু স বসুমতী-ধাতা।
চিরগুরু-শিবময়-জীবেন্দুং
ভজ হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধুম্॥ ৫

রতিপতি-কুসুমধনুস্ত্রাসং
বিবসন-শিশুধন-হৃদ্‌বাসম্।
বটুজন-নয়ন-চকোরেন্দুং
ভজ হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধুম্॥ ৬

অঘহর-বিভু-নরকত্রাণং
ব্রজজন-ধন-ভুবন-প্রাণম্।
কলিমলহর-নব-গৌরেন্দুং
ভজ হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধুম্॥ ৭

রস-ঘন-তনু-রস-কূপারঃ
শুভয়তি সকল-গুণাধারঃ।
চিনু নর গুরু-করুণা-বিন্দুং
ভজ হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধুম্॥ ৮

পুরুষস্য হরের্যেন প্রপঠ্যেত স্তবাষ্টকম্।
প্রাপ্যং তেন হরে র্ধাম নিত্যানন্দ-কৃপাত্মকম্॥

শ্রীশ্রীবিভুবন্ধুবর-ভজনাষ্টকম্

হরিদাস-সেব্যং ভবভারহরং
শিবধী রমেশ-গুরু শিষ্যপরম্।
পুরুষ-প্রধান-ভবকর্ণধরং
ভজ গৌরদেহ-বিভুবন্ধুবরম্॥ ১

রঘুরামদাসশুভকন্দ হরং
বনমালি পূজ্যমতুলস্য গুরুম্।
'অমরেন্দ্র' নাম-'জয়'যুক্তকরং
ভজ গৌরদেহ-বিভুবন্ধুবরম্॥ ২

যতি-কৃষ্ণদাস-রজনীশরণং
ভুবনাক-নাশি-মহিম-স্বজনম।
হিতভক্তপাত্র-নভভদ্রকরং
ভজগৌরদেহ-বিভুবন্ধুবরম্॥ ৩

কমলা-মহেশ-বলরামধনং
শিব-শান্তিরাজ-কুতমোদলনম্।
শুভ-চন্দ্রভাল-বিধুকান্তিধরং
ভজ গৌরদেহ-বিভুবন্ধুবরম্॥ ৪

শুচি-গন্ধবাহ-রবিচন্দ্রগতিং
যম-দেবরাজ-বিধি-রুদ্রপতিম্।

১। 'প্রমিতাক্ষরা' (১২) সজসসৈঃ কথিতা (সজৌ সৌ।)

সম-লোকপাল-গুরু-শক্তিধরং
ভজ গৌরদেহ বিভুবন্ধুবরম্ ॥ ৫

অমিত-প্রভাব-তুলসীশরণং
শুচি-বর্ণিপাল-পতিতোদ্ধরণম্ ।
অবতারমুখ্য-নর দুঃখহরং
ভজ গৌরদেহ বিভুবন্ধুবরম্ ॥ ৬

ভবরক্ষণায় ধৃতমর্ত্ত্যভবং
নরদেহধারি-নর-মুখ্যনবম্ ।
ধৃতসৌম্যকায়-বিধিসৃষ্টিধরং
ভজ গৌরদেহ-বিভুবন্ধুবরম্ ॥ ৭

নত-নিত্য-বিত্ত-বশভক্তপরং
হরিনামদাতৃ-হরিরূপধরম্ ।
কুসুমেষুশাস্তৃ-কলিদর্পহরং
ভজ গৌরদেহ-বিভুবন্ধুবরম্ ॥ ৮

গৌরগদাধরৈকাত্ম-শ্রীহরিভজনাষ্টকম্
পাঠক-হর্ষদং বন্ধুপ্রেমসেবা-প্রদায়কম্ ॥

বন্ধুপ্রণতিঃ

বন্দে প্রাণজগদ্বন্ধুং নিত্যপুরুষনামিনম্ ।
মহানাম-মহারূপং হরিনামস্বরূপিণম্ ॥

মহাউদ্ধারণ

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরো জয়তি ॥

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীশ্রীবন্ধুহরির অশেষ কৃপায় ১৩৩২ সনে ক্ষুদ্রায়তন বন্ধুবার্ত্তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পর প্রয়াগস্থ বান্ধব ভট্টাচার্য্য দীনেশচন্দ্র ও অন্যান্য স্থানের কোন কোন বান্ধব লিখিত পত্রে ও সাক্ষাদ্‌ভাবে বন্ধুবার্ত্তা চাহিতে থাকেন ও কেহ কেহ উহা পুনর্মুদ্রণ করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর কয়েক বৎসর হইল গুরুবন্ধুর অহৈতুকী করুণায় পরমবন্ধু-কার্য্যসহায়ক শ্রীমান্ মহানামব্রতের উৎসাহ বাক্যে বন্ধুবার্ত্তার অভিনব বৃহৎ দ্বিতীয় সংস্করণ লিখিতে আরম্ভ করি এবং শ্রীমানের সহায়তায় গ্রন্থখানি ১৩৬১ সনে মাঘী পূর্ণিমায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

অতঃপর শ্রীমান্ মহানামব্রতই প্রভুবন্ধুর শুভ আবির্ভাবের পূর্ত্তিস্মরণে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে বন্ধুবার্ত্তার পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ও আমার লেখা বন্ধুভাগবতামৃতবিন্দুর প্রথম সংস্করণ, দুইখানি মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করেন। প্রভুবন্ধুর নিকট তাঁর কার্য্যের সহায় শ্রীমানের নির্বিঘ্ন দীর্ঘজীবন ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করি, এছাড়া শ্রীমানের মহত্ত্বের প্রতিদানের সামর্থ্য আমার নাই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি যে, ১৩২৪ বঙ্গাব্দে আমার সংগৃহীত ও লিখিত বন্ধুবার্ত্তার পাণ্ডুলিপি ও গুরুবন্ধুসম্বন্ধীয় মূল্যবান অনেকগুলি দিনলিপি, গ্রন্থরাজি, সংগৃহীত বন্ধুবাণী,

ও বন্ধুলীলাবার্ত্তা কতক অজ্ঞাতভাবে, কতক জ্ঞাতভাবে, আমার হস্তচ্যুত হয় এবং পাকসৈন্য দ্বারা বাংলাদেশ আক্রান্ত হ'লে আমার আলমারী হ'তেও লুণ্ঠিত হয়।

ইহা আমাদের জ্ঞাতব্য যে, বন্ধুচরিতামৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীরমেশবাবুর 'প্রভু জগদ্বন্ধু' প্রথমগ্রন্থ ও পরে শ্রীসুরেশবাবুর তিনটি সংস্করণ 'বন্ধুকথা' দ্বিতীয় গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থদ্বয় ও গ্রন্থকারযুগল আমার 'বন্ধুবার্ত্তা' লেখায় পরম সহায়ক। এতদ্‌ব্যতীত এ বিষয়ে মহানাম সম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীমহেন্দ্রজী লিখিত 'জগদ্‌গুরু মহা মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু' গ্রন্থও অতি মূল্যবান্। বিভিন্ন স্থানে ঐ গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে এবং বাংলা ১৩২৪ সনের পূর্ব্বে ও পরে প্রাচীন বন্ধুভক্তগণের মুখে যে সকল বন্ধুলীলাকথা শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের নিকট প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত যে সকল মূললিপি ও প্রতিলিপি পাইয়াছি, সে সকলের অনেকাংশ বন্ধুবার্ত্তায় বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

সাক্ষাদ্‌ভাবে বন্ধুহরির মধুর লীলার দ্রষ্টা দ্রষ্ট্রী, পরম পূজনীয় ও পূজ্যা, দেবী মা (দেবী দিগম্বরী), শ্রীরমেশ শর্ম্মা, নবদ্বীপ দাসজী, ঠাকুর চম্পটী, "সাধু" জয়নিতাই, শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক, গোস্বামী "বৈষ্ণব' রঘুনন্দন, বিশ্বাস শ্রীবকুলাল, মহারাজ রামদাসজী, গোস্বামী শিতিকণ্ঠ, শ্রীবাদল বিশ্বাস, মহারাজ কৃষ্ণদাসজী, শ্রীসুরেশচন্দ্র, শ্রীদেবেন্দ্র গুপ্ত, সরকার শ্রীলোকনাথ, ডাঃ সুধন্ব সরকার, ডাঃ উষারঞ্জন মজুমদার, শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ, চক্রবর্ত্তী শ্রীতারিণী, লাহিড়ী শ্রীরণজিত, লাহিড়ী শ্রীসুশীল, শ্রীদুঃখীরাম ঘোষ, 'পুলুবাবু' (শ্রীপুলিন বসু

ব্রহ্মচারী), দেবী গোলোকমণি, দেবী নিস্তারিণী, ডাঃ পূর্ণ ঘোষ, সুরমাতা, শ্রীতারক গাঙ্গুলী, শ্রীব্রজেন্দ্র নিয়োগী, শ্রীপূর্ণ দত্ত, শ্রীনকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সান্যাল শ্রীসর্ব্বসুখ, মহারাজ বালকৃষ্ণজী, ভাদুড়ী মোহিনী মোহন, শ্রীশরৎ রায়, গোস্বামী যোগেন্দ্র, শ্রীকেদার কাহা, শ্রীঅভয় শীল, মিত্র শ্রীগোপাল, সিকদার শ্রীমহীন্দ্র, শ্রীমহিম দাস, শ্রীনবদত্ত, শ্রীকোদাই সাহা, শ্রীগোপাল পোদ্দার, সাহা শ্রীবন্ধু, শ্রীক্ষুদীরাম, শ্রীবঙ্কু নাগ, শ্রীরাধাবল্লভ সাহা, শ্রীমথুর কর্মকার, শ্রীপীতাম্বর, শ্রীভীম, শ্রীরামকুমার মুদী, শ্রীরামসুন্দর মুদী, শ্রীহরিচরণ আচার্য্য, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্যামদাসজী, শ্যামানন্দজী, শ্রীহরিদাস নন্দন মনোমোহন, শ্রীকৃষ্ণ লাহিড়ী, শ্রীপূর্ণ সান্যাল, অঙ্গনের সহকারী সেবকগণ, বাকচর ফরিদপুর পাবনা কলিকাতাবাসী ভক্তগণের আরও কেহ কেহ, ইহারা সকলেই যাঁর যাঁর জ্ঞানমতে অল্পবিস্তর বন্ধুলীলা কথা ও বন্ধুবাণী আমাকে দান করিয়া বন্ধুবার্ত্তা গ্রন্থনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

এই জীবাধম লেখকের বঙ্গাব্দ ১৩২১ ১৩২২ হইতে মাঝে মাঝে কিছুদিন করিয়া ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া থাকিবার ভাগ্য ঘটে; অতঃপর ক্রমে কখন দু'এক মাস, কখন বা বৎসরকাল প্রভুবন্ধুর পাদপদ্ম আশ্রয়ে শ্রীধামে থাকিয়া আংশিক সেবাকার্য্য পাইবার ভাগ্যোদয় হয়। তাহার ফলে আমার **প্রত্যক্ষ** ও শ্রুত, **অপূর্ব-প্রকাশিত** বন্ধুলীলামৃতের সংক্ষিপ্তসার বন্ধুবার্ত্তায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদিতে এ যাবৎ **অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত** প্রভুবন্ধুর অনেক অভিনব **বাণী ও তত্ত্বোপদেশ** বন্ধুবার্ত্তার বিশিষ্টাংশ।

বন্ধু-লীলা-কণা, গুরুবন্ধু বাণী, শ্রীশ্রীহস্তাক্ষর ও বন্ধু-কথানুশীলন, এই চারিভাগ একত্র হইয়া "বন্ধুবার্ত্তা" গ্রন্থিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ভক্ত-চিত্তরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমান্ মহানামব্রত প্রমুখ বান্ধববৃন্দের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছি ও সহায়তা পাইয়াছি :

চতুর্থ সংস্করণ 'বন্ধুকথানুশীলন' কিছু পরিবর্ত্তন ও অন্যাংশে কিছুটা পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। বন্ধুলীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও আস্বাদক শ্রীরণজিত চন্দ্রের লিখিত কড়চা অবলম্বনে, শ্রীমান্ মহানামব্রত কর্ত্তৃক বন্ধুবার্ত্তার ভূমিকা স্বরূপে লিখিত 'বন্ধুলীলার দিগ্‌দর্শন, বন্ধুবার্ত্তার অপূর্ব বন্ধুতত্ত্ব প্রকাশক, অভিনব দান। ইহা বন্ধুবার্ত্তার পাঠক পাঠিকাবর্গের আস্বাদ্য একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

পরম স্নেহপ্রবণ বন্ধুনিষ্ঠ ডঃ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুবার্ত্তা (দ্বিতীয় সংস্করণ) পুনর্মুদ্রিত হইতেছে জানিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, বিশেষতঃ বন্ধু-লীলা-কণা ভাগ, পড়িয়া গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ করিবার জন্য সচেষ্ট হন।

আমার কাছে গচ্ছিত ও পরে হস্তান্তরিত প্রভুবন্ধুসম্বন্ধীয় কয়েকখানি ডাইরী বাংলাদেশ স্বাধীন হইলে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর প্রভুর অশেষ করুণায় ফিরিয়া পাইয়াছি। উহা দেখিয়া আবশ্যক স্থল সংশোধন করিয়া বন্ধুবার্ত্তার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত করা হইল।

এখন 'বন্ধুবার্ত্তা' খানি ভক্তবৃন্দের প্রীতি আনন্দ প্রদ, চিত্তরঞ্জন, নিত্যপাঠ্য ও জগৎ কল্যাণকর হইলে, আমার সামান্য জৈব চেষ্টাশ্রম সার্থক বোধে পরম সুখী হইব। জয় জগদ্বন্ধু হরি॥ ইতি—বন্ধু নবমী, ১৩৮৭

বিনয়াবনত নিবেদক
নিত্যফকীর দাস মহেন্দ্র

বন্ধুলীলার দিগ্‌দর্শন

রসঘন বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাঁহার পরম মাধুর্য্যময় লীলার প্রথম ভাগে কতিপয় বৎসর পাবনা সহরে অবস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় বুড়োশিব হারাণক্ষেপার সহিত তাঁহার মিলন ঘটে। সে এক নিরুপম মিলন। বাহ্যতঃ পরম পবিত্রতার সঙ্গে চরম অনাচারের মিলন। যে প্রভু কাহারও বাতাস গায়ে লাগান না, স্পর্শ করেন না, তিনিই শুইয়া আছেন বুড়োশিবের মলমূত্রলিপ্ত দুর্গন্ধময় শতচ্ছিন্ন অতি মলিন কাঁথার মধ্যে। সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার অবস্থায়, পরমানন্দে তাঁহার কণ্ঠটি বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া সুদীর্ঘকাল একইভাবে আছেন। মুখে মুখে ঠেকাইয়া অস্ফুট ভাষায় কত কি মধুর আলাপ চলিতেছে।

ক্ষ্যাপা বুড়োশিবের অন্তরে এমন একটি মাধুর্য্যপূর্ণ হরিপ্রেম রস ছিল, তাঁহার মুখে এমন একটি পরমামৃতময় হরিনাম সুধা ছিল, যাহার সুনিবিড় আস্বাদনানুভূতির কাছে বাহিরের অনাচার বা আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

কবিরা বলেন, ভৃঙ্গ যখন কেতকীকুসুমের মধুপান করে, তখন কণ্টকে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তবুও সে মধু আহরণ ছাড়ে না। কেতকীমধুর এমনই মাদকতা! সেইরূপ হারাণবাবা বুড়োশিবের অন্তরস্থ হরি রস আস্বাদনের এমনই ভাববিহ্বলতা যে, তদ্ভিন্ন আর সকল ভাবনা বা বিবেচনা সেখানে উপেক্ষিত।

হরিভক্তের হৃদয় কমল হইতে হরিরস মাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীহরিপুরুষের যে কী প্রবল আকর্ষণ ছিল,—বুড়োশিবের সঙ্গে মিলনে তাহার পরম রূপটি প্রকটিত। পাবনায় থাকাকালীন দেখা গিয়াছে, হরিসংকীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণগত হইলেই হরিনামের প্রভু তথায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যভাবে উধাও হইয়া ছুটিয়া গিয়াছেন, কোন বাধাই মানেন নাই। কীর্ত্তনে, নামমধ্যে একেবারেই ডুবিয়া যাইতেন। আস্বাদনের চমৎকারিতায় "রাধা" নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; কেবল রসরাজের রসের অঙ্গ মহাভাবাবেশে হেলিত দুলিত।

কিন্তু, এত ডুবিয়াও আস্বাদন যথেষ্ট হইয়াছে, এরূপ কখনও মনে করিতেন না। দেখিলে সব সময়ই বুঝা যাইত যে, একটি প্রবল তৃষ্ণা, হরিনামের জন্য একটি অনির্বচনীয় অতৃপ্তির মর্ম্মান্তিক বেদনা নিয়ত লাগিয়াই আছে। ইহাই স্বয়ং নামীর নামবিরহ। এই নামাস্বাদন ও নাম বিরহ নিরন্তরই দেখা যাইত। "তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়েকোটিগুণ।"

পাবনায় বালকদল শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও হরিকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিলে তাহাদের অভিভাবকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া প্রভুর শ্রীদেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। সে আঘাতে প্রভু হতচেতন হইয়া পড়েন। ইহাকে লীলায় মহাপ্রলয়ের অভিব্যক্তি বলা চলে। আবার এত অত্যাচারের পরও সেই পাবনায় পুনঃ পুনঃ গমন করেন, অকুতোভয়ে বিচরণ করেন। বহুজন কর্ত্তৃক বহুভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও

অত্যাচারকারীদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তাহাদের মহা অপরাধকেও গ্রহণ না করিয়া অন্তরের সহিত ক্ষমা করিয়াছেন। মহাউদ্ধারণের করুণাপ্রস্রবণের ইহা এক কল্যাণময় অভিব্যক্তি।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের লীলায় প্রধানতঃ মহাভাবের উক্ত চারিটি বিলাস দৃষ্ট হয়। হরিনাম-আস্বাদন, হরিনাম-বিরহ, মহাপ্রলয়, মহাউদ্ধারণ। এই বিলাসচতুষ্টয় আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন প্রতিভাত হইলেও ইহারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত বা অখণ্ড। ইহাদের মূলে আছে নামীর সঙ্গে নামের ক্রীড়া-বৈচিত্র্য।

শ্রীহরিপুরুষের হরিনাম-আস্বাদন। শ্রীহরি স্বয়ং যখন শ্রীহরিনাম করেন, হরিকথা বলেন, শোনেন, লিখেন, তখন যে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হয়, নিখিল বিশ্বে তাহা নিরুপম। এই নিরুপম আস্বাদনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে লাগিয়া থাকে একটি নির্ম্মমভাবের প্রাণঘাতী অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তিরই পরম বিকাশ হরিনাম-বিরহে।

এই বিরহেরই প্রকাশ রাধাশ্যাম-মিলিততনু শ্রীগৌরের, "মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি, দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু," এই বিলাপে। এই বিরহেরই অভিব্যক্তি নামঘনবিগ্রহ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের "হায়! হায়! কেউ হরিনাম করে না"—এই বুকফাটা আর্ত্তিতে।

বিরহের দশম দশায় মৃত্যু। তদপেক্ষাও তীব্রতম অবস্থায় মহাবিরহে মহামৃত্যু। এই "মহামৃত্যু মহাপ্রলয়ন"। মহা-

প্রলয়ের "মহতী বিনষ্টির" প্রতিপোষকই মহাসৃষ্টি। "যদি সৃষ্টি রাখ ভাই, হরিনাম প্রচার কর"। কোটিকণ্ঠে হরিনামই মহাউদ্ধারণ। নামবিরহ ও নামাস্বাদনের ব্যাপক অভিব্যক্তিই মহাপ্রলয়ন ও মহাউদ্ধারণ। অতএব উক্ত চারি বিলাসই অখণ্ড। এই অখণ্ডতার প্রকাশ "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু" এই পরিচয়ে। এই অখণ্ডতার পূর্ণতম বিলাস পঞ্চমবর্ষীয় শিশুভাবে, এই শিশুভাবের পূর্ণতন্ময়তায়—আত্মনিমজ্জনে।

মুণ্ডিত মস্তক, প্রশান্ত বদন, লক্ষ্যহীন ঢলঢল দৃষ্টি, মৃদু মধুর হাসি, উন্মুক্ত সুবলিত দেহ, কাঁচা সোনার বর্ণ, সুদীর্ঘ সুকোমল আরক্তিম করচরণ, ফুলের পাঁপড়ির মত সুনির্ম্মল নখরাজি, আধ আধ ভাষা, অনির্ব্বচনীয় ভাব-ভঙ্গি, কখনও ভক্তের কাঁধে দোলায়, কখনও টানা গাড়িতে, কখনও পদ্মানদীর মাঝে নৌকায় উপবিষ্ট—চতুর্দ্দিকে মধুকরের মত ভক্তকুল, তাঁহাদের কণ্ঠে মহানাম, নয়নে সে রূপমাধুর্য্যের আস্বাদন। ইহাই হরিনামের মূর্ত্ত বিগ্রহ, "পঞ্চমবর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাষে"—বাণীর প্রকট প্রতিমা॥ মিলন-বিরহ, মহাপ্রলয়ন-মহাউদ্ধারণ-সম্মিলিত মূর্ত্ত মাধুর্য্য "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী" মোহন মাদনের নিবিড়-ঘন অভিব্যক্তি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের "বার্ত্তা" আস্বাদন করুন। জয় জগদ্বন্ধু।

শ্রীঅঙ্গন, মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬১ দাস মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

আদিলীলা

মধ্যলীলা

বিষয়	(ত)	পত্রাঙ্ক

অনন্তানন্ত অন্ত্যলীলা

বিষয় (থ) পত্রাঙ্ক

উত্তরার্দ্ধ
গুরুবন্ধুবাণী

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর-শরণাগতি-পঞ্চকম্

আর্তবন্ধু-দীনবন্ধু-বিশ্ববন্ধুরূপিণং
ক্রোধ-কাম-লোভ-মোহ-দম্ভ-বৃত্তিহারিণম্।
কিঙ্করেষু সেবকেষু নামবারিবর্ষিণং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি চন্দ্রভালধারিণম্॥ ১

ক্ষোভ-তাপপাপ-হারি-চিত্তরোগনাশিনং
ভাব-রাগ-নামশক্তি-শুদ্ধ-ভক্তিদায়িনম্॥
কৃষ্ণকৃষ্ণ-রাম রাম-গৌরনামবাদিনং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি হেমকায়ধারিণম্॥ ২

চিত্তধাম-দীপ্তকারি-সত্যপূতভাস্করং
শ্যামগৌর-তত্ত্বমূর্ত্তি-বিশ্ববন্ধুসুন্দরম্।
দিব্যবিষ্ণুচিহ্নধারি-দেবলোকদুর্লভং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি সর্বজীববল্লভম্॥ ৩

পাদধৌত-বারি যস্য সর্ব্বলোকপাবনং
বিশ্বভূত-ভক্তিলব্ধ-পূজনাভিবন্দনম্।
নন্দসূনু-মিশ্রপুত্র-দীননাথনন্দনং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি চন্দ্রপুত্রশোভনম্॥ ৪

অষ্টপাশবন্ধনাশি-জীবকীটকারণং
কর্ম্মভূত-ভোগবারি-কালভীতিভঞ্জনম্।
মারগর্ব-খর্বকারি-পঞ্চবাণগঞ্জনং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি নিত্যচিত্তরঞ্জনম্॥ ৫ *

মহেন্দ্রগদিতং বন্ধোঃ শরণাগতিপঞ্চকম্।
পাঠকায় হরিং দত্তে নিত্যসেবকপালকম্॥

* 'তূণকং' (১৫), সমানিকায়াপদদ্বয়ং বিনাস্তিকম্, রজৌরগৌর

প্রভুর আঙ্গিনায় চালিতা দেবীর ছায়া-অঙ্কে বন্ধুহরিদাস নিত্য সেবক মহেন্দ্র, তুলসীমালায় বুকে ঝুলান বন্ধুমূর্ত্তি. সঙ্গে কণ্ঠীমালা, জপমালা, হরিকথা, করতাল যুগল, খোল।

জগদ্‌গুরু জগবন্ধু বৃংহিতায় প্রণম্যতে।
সেবকেন মহেন্দ্রেণ 'বন্ধুবার্ত্তা' বিঘুষ্যতে ॥

বন্ধুবার্ত্তা

প্রথম খণ্ড

বন্ধু-লীলা-কণা

আদি-লীলা

আবির্ভাব-মঙ্গল

মুর্শিদাবাদ রাজধানীর সন্নিকটে সুরধুনী গঙ্গাতীরবর্ত্তী ডাহাপাড়া ব্রাহ্মণ-চক্‌পাড়ায় ১৭৯৩ শকে, ১২৭৮ বঙ্গাব্দে, ১৬ই বৈশাখ, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, ২৮শে এপ্রিল, শুক্রবার, সিতপক্ষে, পুষ্পবস্তযোগে, পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থে, সীতানবমী তিথিতে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, শুভ মাহেন্দ্র-ক্ষণে, প্রভুবন্ধুর মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটে। পাশ্চাত্ত্য মতে মধ্যরাত্রের পর দিন গণনায় প্রভুর জন্মদিন (ইং ২৯ এপ্রিল) শনিবার বলা যায়। কিন্তু প্রাচ্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে উহা শুক্রবার বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসীতারাম ওঁকারনাথজীর আদেশে তদীয় শিষ্য জ্যোতিষ

বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কোষ্ঠী-বিচার করেন। তার ফলে উভয়ের গ্রহ সকলের পরস্পরের সম্বন্ধ, মিলন ও সাদৃশ্য ১৩৬৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে দেবযান মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হয় ঃ

(১) উভয়ের লগ্নের মধ্যে নবম-পঞ্চম সম্বন্ধ ও লগ্নাধিপদ্বয়ের মধ্যে মিত্রতা। (২) উভয়ের চন্দ্র কেন্দ্রে। (৩) একজনের দ্বিতীয়পতি বুধ, অপরের দ্বিতীয়ে বুধ। (৪) একজনের সপ্তমে রবি, অপরের লগ্নে রবি। (৫) একজনের লগ্নপতি পঞ্চমে, অন্যের পঞ্চমস্থ পঞ্চমপতি-কর্ত্তৃক লগ্ন দৃষ্ট। (৬) বন্ধুসুন্দরের ধর্মপতি বৃহস্পতি, গৌরসুন্দরের ধর্ম স্থানের উপর বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি। (৭) একজনের তৃতীয়পতি শুক্র, অপরের তৃতীয়পতি-যুক্ত শুক্র। (৮) উভয়েরই ষষ্ঠ স্থানের উপর শনির পূর্ণ দৃষ্টি। (৯) একজনের ষষ্ঠপতি সপ্তমপতিযুক্ত, অপরের ষষ্ঠ-সপ্তম-পতি একই গ্রহ। (১০) একজনের অষ্টমে বুধ, অপরের অষ্টম স্থানের উপর বুধের পূর্ণ দৃষ্টি। (১১) উভয়ের কর্মপতি ধর্মস্থানে। (১২) উভয়ের নবমপতির উপর শনির পূর্ণদৃষ্টি। (১৩) উভয়েরই একাদশপতি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে। (১৪) একজনের ব্যয়পতি বৃহস্পতি, অন্যের ব্যয়পতির উপর বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি। (১৫) উভয়ের কোষ্ঠীর দ্বাদশ স্থানে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি।

এই অপূর্ব সাদৃশ্যের জন্য প্রভু বন্ধুসুন্দর গৌরাঙ্গসুন্দরের মত দিব্য মহাভাবে বিভোর থাকেন।

চন্দননগর হইতে শতবার্ষিক পঞ্জিকা দেখিয়া বাংলা ১৩০২

সনে বন্ধুবার্ত্তায় প্রভুর জন্মবার ও জন্মের ইংরাজী সন, তারিখ

সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করি। ইতঃপূর্ব্বে ভক্তসমাজে প্রভুর জন্মদিবস, "মঙ্গলবার" এরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল।

প্রথমেই প্রভুর নামকরণ হয় "জগদ্বন্ধু", আদরের ডাক নাম হয় "জগত"। তাঁহার আর একটি নাম হইয়াছিল "মহেন্দ্র-নারায়ণ," কিন্তু উহা প্রচলিত হয় নাই।

ভক্তগণ স্মরণ করুন, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রভুর জন্মকালে ডাহাপাড়া গঙ্গায় নৈষ্ঠিক ভক্তগণ স্বভাবতঃ "গোবিন্দ", "পুণ্ডরীকাক্ষ", "হরি" শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, সুমধুর স্বরে খোল করতালে "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ" ইত্যাদি প্রভাতী কীর্ত্তন গীত হইতেছে, বৈশাখ মাসে রাঢ়দেশ মুর্শিদাবাদে তখন হরিনাম কীর্ত্তনের প্লাবন চলিতেছে, মস্‌জিদে মস্‌জিদে "আল্লাহ্‌ আকবর" ধ্বনিত হইতেছে, জগদ্বাসী ভগবন্নাম স্মরণ করিতেছেন, উচ্চারণ করিতেছেন, সুরধুনী বন্ধুর শুভাগমনে আনন্দে কল কল ধ্বনি করিতেছেন। স্থাবর জঙ্গম জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে স্বভাবতঃ মহাউদ্ধারণ বন্ধুর আবির্ভাবে সাত্ত্বিক আনন্দভাবে বিভোর।

পিতা—ফরিদপুর জেলার পদ্মাতীরবর্ত্তী গোবিন্দপুরবাসী বরেণ্য শম্ভুনাথ-চক্রবর্ত্তি-নন্দন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলতিলক পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি নৈষ্ঠিক তেজস্বী গৌরকান্তি "দীননাথ ন্যায়রত্ন" (ভট্টাচার্য্য) মহাশয়। পূর্ব্ব বাসস্থান পদ্মাতীরে কোমরপুর গ্রামে ছিল। মাতা—ফরিদপুর জেলার কাফুরা গ্রামনিবাসী ভাগ্যবান্ শ্রীশীতলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের দুহিতা মা দুর্গার মত অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যময়ী স্বর্ণকান্তি জগন্মাতা "বামাসুন্দরী দেবী।"

একবার শারদীয় পূজার প্রাক্‌কালে, একদিন পূর্ব্বে, পদ্মায় কোমরপুরের বাটী ভগ্ন হওয়ার পর চক্রবর্ত্তি-পরিবার শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ, শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা ও অন্যান্য দ্রব্য নৌকাযোগে

গোবিন্দপুরে লইয়া যান এবং স্থানীয় পরমোদার জমিদার মুক্তারাম বাবুর আনুকুল্যে তথায় নিবাস স্থাপন করেন ও নির্ব্বিঘ্নে দুর্গোৎসবও সুসম্পন্ন করেন।

চক্রবর্ত্তি-ভবনে চিরদিনই দোল-দুর্গোৎসব আদির আনন্দ হইত ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবার ব্যবস্থা ছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের খুল্লতাত পরমপণ্ডিত আরাধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুর্শিদাবাদে বঙ্গাধিকারীর সভাপণ্ডিত ও ডাহাপাড়া ব্রাহ্মণ-চক্‌পাড়ার ভূস্বামী ভট্টাচার্য্য সারদানন্দের জমিতে স্থাপিত চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারই প্রাণপ্রিয় ছাত্র ছিলেন ন্যায়রত্ন মহাশয়।

পিতৃব্যের পরলোকগমনের পর ন্যায়রত্ন মহাশয় সাদর আহ্বান পাইয়া ডাহাপাড়া গমন করেন এবং খুল্লতাতের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন।

ইতঃপূর্ব্বে গোবিন্দপুরে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রথম সন্তান নিতাইস্বরূপ "গুরুচরণ" জন্মগ্রহণ করেন ও আটমাস বয়সে নিত্যধামে গমন করেন। শ্রীদীননাথের দ্বিতীয়া সন্ততি যোগমায়া-রূপিণী "কৈলাসকামিনী"। ডাহাপাড়া যাইবার কালে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ সহ এই কন্যা, পত্নী বামাদেবী ও উর্ম্মিলা-ঝি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন। কৈলাসকামিনীর পাঁচবৎসর বয়ঃক্রমকালে ডাহাপাড়ায় প্রভুবন্ধুর আবির্ভাব ঘটে।

শৈশব ও বাল্য

শ্রীধাম ডাহাপাড়ায় বন্ধুগোপালের ছয় মাস বয়সে, স্থানীয় ভূস্বামী সারদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ও বঙ্গাধিকারী রায় ব্রজেন্দ্রনারায়ণের স্নেহানুকূল্যে শুভ "অন্নপ্রাশন" মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। আবির্ভাবাবধি বন্ধুচন্দ্র ছিলেন অসামান্য রূপ-গুণ-লাবণ্য-সম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গসুগঠন, কষিতকাঞ্চনবর্ণ, মধুর, সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্ত, সর্ব্বচিত্তরঞ্জক। তাঁহার প্রায় দেড় বৎসর বয়ঃক্রমকালে জগদম্বা বামাদেবী নিত্যধামে গমন করিলে আবিষ্টা ধনিষ্ঠাদেবীর মত পরম বাৎসল্যময়ী ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর ন'মা (ক্ষমাময়ীদেবী) বন্ধুগোপালকে কয়েকমাস মাতৃস্নেহে পালন করেন। বন্ধুর আবির্ভাবের পর হইতেই তিনি বন্ধুকে মাতৃস্নেহে সেবা করিতেন। ঊর্ম্মিলা ঝি'রও শিশুবন্ধুকে সেবা করার ভাগ্য হইয়াছিল। বালিকা ভগিনী কৈলাসকামিনীও বন্ধুকে অনেক সময় কোলে রাখিবার ভাগ্য পাইয়াছেন। সময় সময় স্থানীয় ভাগ্যবান্ নবীন মণ্ডলও বন্ধুগোপালকে কোলে বুকে ধরিয়া পরাতৃপ্তি সম্ভোগ করিয়াছেন।

অতঃপর ফরিদপুর গোবিন্দপুর হইতে বন্ধুহরির পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত চক্রবর্ত্তী ভৈরবচন্দ্র ডাহাপাড়া যাইয়া ঊর্ম্মিলা-ঝি সহ বন্ধুগোপাল ও বামানন্দিনী কৈলাসকামিনীকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসেন। রাধাগোবিন্দ বিগ্রহও সঙ্গে আসেন। সেখানে আসিয়া সাত আট মাস পরেই কৈলাসকামিনী নিত্যলোকে গমন করেন।

গোবিন্দপুরে আনন্দের মা'র সহযোগিতায় পরম বাৎসল্যময়ী জ্যেঠিমা "রাসমণি" দেবী শিশুবন্ধুকে লালনপালন করিতেন ঃ

বন্ধুর তিন বৎসর বয়সে দেবী রাসমণি নিত্যধামে গমন করিলে তদীয় কন্যা দেবীমা (দেবী দিগম্বরী) শিশুবন্ধুর সেবাভার গ্রহণ করেন।

দেবীমা'র মুখে শুনিয়াছি, বন্ধু একবার গৃহের দ্বিতলে পাটাতন হইতে নীচে পড়িয়া যাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে বাটীতে হাহাকার পড়িয়া যায়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সে যাত্রা বন্ধুগোবিন্দকে রক্ষা করেন। শৈশব হইতেই দেখা গিয়াছে, ক্রন্দমান শিশুবন্ধুকে "হরিবোল্, হরিবোল্" বলিয়া কোলে লইলেই শান্ত হইতেন। হরিনামেই তাঁহার আনন্দ দেখা যাইত, আর হরিনাম শুনিবার জন্যই শিশুবন্ধু মাঝে মাঝে কাঁদিতেন। "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু" পরিচয়, তাঁহার জন্মকাল হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে।

শৈশবে বন্ধু আধ আধ মধুরস্বরে, "জগা মাধা দু'ভাই ছিল, তারা হরিনামে তরে গেল", গাহিতে গাহিতে আপনা আপনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন ; প্রতাপ ভৌমিক প্রভৃতি সঙ্গিগণকে লইয়া খেলনা ঢোল ও করতাল বাজাইতেন ও মধুর-অস্ফুটস্বরে হরিনাম গাহিতেন। এ খেলায় তাঁহার উপদেষ্টা কেহ ছিল না, তিনি ছিলেন স্বভাব-গুরু। শিশুবন্ধু কখন কখন মুড়ি (ছুড়ুম) খাইবার আধারে নারায়ণ-শিলা বসাইয়া কাঁসর বাজাইয়া নাচিতেন। কখনও বা 'পেতাপ করতা' বলিয়া সঙ্গী প্রতাপকে

---

† প্রভুবন্ধুর জেঠতুত ভগিনী দেবী দিগম্বরীকে বাংলা ১৩৩২ সনে বন্ধু-বার্ত্তা প্রথম সংস্করণে 'দেবীমা' নামে অভিহিত করিয়াছি। বর্ত্তমান সংস্করণেও ঐরূপ করিলাম।

করতাল দিয়া নিজে বেত-বাধান ঢোল বাজাইতেন। শিশু যখন স্পষ্টস্বরে "দাদার লাঠি, দাদার ছাতি" বলিতে না পারিয়া অর্দ্ধস্ফুটভাবে "দাদা দাতি, দাদা তাতি" বলিতেন, তখন সেই লালিত্য প্রিয়জনকে আনন্দে ভাসাইত।

দেবীমা'র মুখে শুনিয়াছি, বন্ধু শৈশব হইতেই অসম সাহসী ছিলেন। তিনি কখন বা শ্মশানে শব বহনের পরিত্যক্ত খাটিয়ায় বসিয়া আছেন; বিধবা নৈষ্ঠিকা বড়দিদি (দেবীমা) মধুর শাসন বাক্য বলিয়া, কাকুতি মিনতি করিয়া ডাকিয়া আনিয়া স্নান করাইয়া ঘরে লইয়াছেন। কোনদিন বা বন্ধু ঘরের চালায় মটকার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন।

চার পাঁচ বৎসরের শিশু একদিন পদ্মায় এক বাঁধা নৌকায় উঠিয়া উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; লোকে অন্য নৌকায় উঠিয়া, সেই নৌকা ধরিয়া আনে। তিনি পদ্মাতীরে খেলিতেন, ধরিতে গেলে ভয় দেখাইবার জন্য কামড়াইবার উপক্রম করিতেন, বালি ছিটাইতেন। লোকে যে সব গর্ত্তে সাপ আছে বলিত, তিনি সেই সেই গর্ত্তে পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতেন। অসমসাহসী শিশুর এইসব চাঞ্চল্যে প্রিয়জন অনেক সময় শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত থাকিতেন,—সাপেই কামড়ায়, কি জলেই ডুবিয়া মরে, বা কিসে কি করিয়া বসে।

বালকবন্ধুকে লইয়া অনেক সময় হাস্য কৌতুক চলিত। হাঁসের ডিমকে ঘোড়ার ডিম্ব বলিয়া বুঝাইয়া দিলে, বালকবন্ধু ঘোড়ার ডিম বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। স্থানীয় অছিমদ্দির ক্ষেত হইতে বন্ধুগোপাল মাঝে মাঝে আখ আনিতেন। অছিমদ্দি বন্ধুকে

"জামাই" বলিতেন, বন্ধু তাঁহাকে "শ্বশুর" বলিতেন। বন্ধুকে লইয়া এইরূপ অনেক আনন্দ-রঙ্গ হইত। বন্ধুগোপাল সকলেরই নয়নমণি। পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে কোলে লইতেন, সাধ্যমত ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়াইয়া নিজ নিজ জীবন ধন্য করিতেন।

বালকবন্ধু দেব-দ্বিজ-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ গোপালপুরের জমিদার দাতা ঈশান বাবুর নাম শুনিয়াছিলেন। কখন রাগ করিয়া বন্ধু কিছুদূর চলিয়া গেলে, দেবীমা জিজ্ঞাসা করিতেন,—রাগ ক'রে কোথায় যেতিস্? বন্ধু উত্তর করিতেন—"যাতাম ঈছান দাছের বাড়ী।" কখন কখন "মকিম জুন্‌দারের" (শ্রীমহিম মজুমদার মহাশয়ের) বাড়ীর কথাও বালকবন্ধু উল্লেখ করতেন।

গোবিন্দপুরে বন্ধুগোপাল আসিবার কিছুদিন পরে তথাকার বাটী পদ্মাগর্ভে বিলীন হয় এবং স্তানদীয়া গ্রামের নিকট নবগোবিন্দপুরে নূতন বাটী নির্ম্মিত হয়। সেইখানেই তাঁহার শৈশব-বাল্যলীলা চলে।

গোবিন্দপুরে জেঠতুত ভ্রাতা গোপাল ও তারিণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় বন্ধুগোপালের তত্ত্বাবধায়ক সঙ্গী ছিলেন। আনন্দ ও প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় মাতা ও ভ্রাতাভগিনীদের সহিত চক্রবর্ত্তী বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রতাপ ভৌমিককে লইয়া বন্ধু অনেক হরিনামের খেলা খেলিয়াছেন। প্রতিবাসী উমানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ ও বকুলাল, বন্ধুগোপালের খেলার সঙ্গী ছিলেন। দেবীমা'র সম্পর্কিতা ভগিনী বরদা ও নিস্তারিণী দেবীর ঐ সময় ঐ বাটীতে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

সম্পর্কিতা অপর ভগিনী দেবী রাজলক্ষ্মীও সময় সময় ঐ বাটীতে আসিতেন। দেবীমা'র অনুজা, গোলোকমণি দেবীর বিবাহ হইয়াছিল, পাবনা তাঁতিবন্দ গ্রামের জমিদার প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত। উক্তা দেবীও সময় সময় গোবিন্দপুরে আসিয়া থাকিতেন ও বন্ধুসুন্দরের মাধুর্য্যময় রূপ ও খেলা দেখিয়া এবং মধুর কথা শুনিয়া জীবন ধন্য করিতেন। দেবী নিস্তারিণী বন্ধুহরির পরম স্নেহপ্রীতি পাইয়াছিলেন। নিচু দেবীর প্রতি দেবীমার আদর দেখিয়া বালক বন্ধু মধুর মুখভঙ্গী করিয়া দেবীমাকে কখনও কখনও বলিতেন—"নিচুই তোমার সব কিছু, আমি তোমার কিছুই না।"

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাসন্তী সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যপূজার দিন, বাণীনাথ বন্ধুর 'হাতে খড়ি' হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় পণ্ডিত দুর্গাচরণের সহযোগে এই মাঙ্গলিক কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। পিতা ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সময় গোবিন্দপুরেই ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানেই বন্ধুর বিদ্যারম্ভ-দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার কিছুদিন পর ডাহাপাড়া চতুষ্পাঠীর কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে তাঁহাকে ডাহাপাড়া যাইতে হয়।

১২৮৫ সনে, বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ডাহাপাড়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয় নিত্যধামে গমন করেন। তিনদিন পরে গোবিন্দপুরে ঐ সংবাদ পৌঁছে। বালক বন্ধুগোপাল ইহার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই আপন মনে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ নিদারুণ সংবাদ জানিবার পর সকলে বালকের ত্রিকালদর্শী জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে হারাইয়া শোকে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের

পর বালক কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করেন ও যথাকালে সুদীর্ঘ সময় আসনস্থ থাকিয়া সুস্পষ্ট-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বৈদিক শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন করেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় বন্ধু

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিত্যধাম গমনের পর গোবিন্দপুরের দ্বিতীয় বাড়ীখানিও পদ্মা নদী গ্রাস করিতে উদ্যতা হন। তখন ভৈরবচন্দ্র সপরিবারে জ্ঞানদীয়া গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া অবস্থান করেন। গোবিন্দপুরের বাটী পদ্মাসাৎ হইয়া যাইবার পর, ফরিদপুর সহরতলীর পশ্চিম উপকণ্ঠে ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামে ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সহিত আরও বহু পরিবাব ব্রাহ্মণকান্দা ও বদরপুর গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ১২৮৫ সনে ফাল্গুন মাসে চক্রবর্তি-পরিবার ব্রাহ্মণকান্দায় আসেন। ১২৮৬ সনে, আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিত্যলোক প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণকান্দা বাটীতেও পূর্ব্ববৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার ব্যবস্থা ছিল। দোল-দুর্গোৎসবাদিও যথারীতি হইত।

দেবী নিস্তারিণী সময় সময় ব্রাহ্মণকান্দা আসিতেন। বন্ধুসুন্দর স্নানকালে কখন কখন নিচুদেবীকে করতাল বাজাইতে

বলিতেন ও বলিতেন যে, উহাতে অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। উক্ত দেবীর মুখে শুনিয়াছি, বন্ধু প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে নিজ পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি গৌরাঙ্গ"। "বিশ্বাস হয় না," এই কথা নিচুদেবী বলিলে, গৌরবন্ধু বলিয়াছিলেন, "পরে জান্‌তে পারবি।"

নিচুদেবীর বিবাহ হয় আলোকদিয়া ভট্টাচার্য্য-বাড়ী। তথায় বালকবন্ধু একবার লিখেন—"নিচু, আমার (কুকুর) ওচ্‌মান তোর ধলীর তা কেড়ে খায়। তোর ধলী ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে।"

ব্রাহ্মণকান্দায় গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি নামে কয়েকটি গাভী ছিল এবং পেনা ও সোণা নামে ভৃত্য ও কেচুর পিসী নামে পরিচারিকা ছিল।

দেবীমা'র কন্যা ক্ষীরোদাদেবীও এখানে বন্ধুর স্নেহপাত্রী ছিলেন।

জন্মরহস্য কথা

বন্ধুগোপালের জন্ম-সম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী শুনা যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে উহা পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও মূলে উহাতে তাঁহার নিত্যসত্যবস্তুত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর ন'মা ক্ষমাময়ী দেবীর সাক্ষ্যে জানা

যায়, জ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্বসুন্দর নবজাত শিশুর অঙ্গে রক্তক্লেদাদির চিহ্নমাত্র ছিল নাঃ ন'মা শিশুর জন্মকথা শুনিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক রূপলক্ষণাদি দেখিয়া নবজাত শিশুর মার্জ্জন সংস্কারাদি না করিয়াই ভাবানন্দে শিশুবন্ধুকে কোলে লইয়া সমীপস্থ শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

প্রভুবন্ধুহরির আবির্ভাবের পূর্ব্বে একদিন অভিন্না যশোমতী শচীমাতাস্বরূপা শুদ্ধসত্ত্বময়ী মাতা বামাদেবী স্বপ্ন দেখেন, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, "সংসারটা অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হল। আমি শীঘ্রই হরিনাম প্রচার করবার জন্য তোর কাছে আসব।" ন'মা আদি মাতা বামাদেবীর প্রিয়জন, এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শিশুবন্ধুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই জানিতেন। তাঁর এই স্বপ্ন যে কার্য্যতঃ সত্য তা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

প্রভুবন্ধু প্রসঙ্গক্রমে নানাস্থানে নিজকে মায়ার অতীত বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবীমা'র কন্যা ক্ষীরোদাদেবী, বন্ধুভক্তবর গ্র্যাজুয়েট চম্পটী অতুলচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। তিনি মায়িক সম্পর্কে প্রভুর ভাগিনেয়ী, এইকথা চম্পটী মহাশয় একদিন কলিকাতা হররায়ের বাটীতে ক্ষীরোদা দেবীর আসিবার পর প্রভুকে শুনাইয়া বলিলে, প্রভু বলিয়াছিলেন,—"তুই এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বলিস্? আমি অযোনিসম্ভব। আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ?" ঠিক্ ঐ সময়ে টিক্‌টিকির শব্দ হয়।

[একদা] ইং সন ১৮৯১ সাল, ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদে, বেলতলায়, ভট্টাচার্য্যদের বাগানে ; বেলা ১১টায়, প্রভু হাততালি দিয়া চম্পটী মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন,—

"অতুল! আয়, আজ তোকে আমার জন্মরহস্য বলি। জন্মস্থান, মুর্শিদাভাদ্‌রাঝ্‌ ডাহাপাড়া, প্যালেসের ওপার। রাজধানী ভিন্ন অবতারের জন্ম হয় না। বঙ্গাধিকারী বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী। রীতিমত গড়প্রাসাদ, পরিখা পরিবেষ্টিত। দীননাথ ন্যায়রত্ন বঙ্গাধিকারীর দ্বারপণ্ডিত। ন্যায়রত্ন ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, ভট্টাচার্য্যদের প্রদত্ত জমিতে বাস করিতেন। ন্যায়রত্নের একটি চতুষ্পাঠী ছিল; সে টিপি এখনও বর্তমান। ন্যায়রত্ন ও তাঁহার ব্রাহ্মণী অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বঙ্গাধিকারীর বাটি যান; † ফিরে এসে দেখেন, ঘরের ভিতর অপূর্ব্ব সদ্যোজাত শিশু বর্ত্তমান, জ্যোতির্ম্ময় গৃহ, আলোকে উদ্ভাসিত। ন্যায়রত্ন ও ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত! অবশ্য ব্রাহ্মণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল। লোকে জানিল যে, ন্যায়রত্নের ব্রাহ্মণী পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। কিন্তু উভয়ে এ' গুহ্যকথা কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই।

দেড়বৎসর পরে ব্রাহ্মণী স্বর্গলাভ করেন; ভট্টাচার্য্য-বাটীর ন'মা প্রতিপালন করেন। ন্যায়রত্ন জন্মলগ্ন-ঠিকুজি করে রাখেন। ঐ সময়ে মহারাণী স্বর্ণময়ীর ওখানে একজন সন্ন্যাসী জ্যোতিষী আসেন। গঙ্গাধর কবিরাজের সহিত ন্যায়রত্নের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল; কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, ন্যায়রত্ন, তোমার যে ছেলে হয়েছে, একবার এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দিয়ে গণনা ক'রে দেখ না। গঙ্গাধরের অনুরোধে ন্যায়রত্ন ঠিকুজিখানি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দিলেন। সন্ন্যাসী ঠিকুজি পাইয়া বললেন—"আমি

---

† সীতানবমী তিথি-মধ্যেই বঙ্গাধিকারীর গৃহে শ্রীশ্রীনারায়ণ পূজা ও কুলদেবতার অর্চ্চনার পর অন্নপ্রাশন উৎসব হয়।

দে'খে রাখ,ব ; তুমি অমুক দিন এস।" সেই দিন ন্যায়রত্ন গেলে, সন্ন্যাসী বলিলেন, "ন্যায়রত্ন! আমি ভাল করে দেখি নাই, তুমি আর একদিন-এস।" দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, আমি বেশ ক'রে দেখেছি ; কিন্তু আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হয়েছে। আমি আর একবার ভাল ক'রে দেখ্‌ব ; তুমি অমুক দিন এস।"

তৃতীয় দিন ন্যায়রত্নকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে কি বেঁচে আছে ?" ন্যায়রত্ন বলিলেন, "আপনি এমন কথা কেন বললেন ? ছেলের কি কোন গ্রহ-ফাঁড়া আছে ?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "না, সেকথা নয়। তুমি যখন এ'লে, তখন ছেলে কি করছিল ?" ন্যায়রত্ন বলিলেন, "খোকা উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছিল।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "ন্যায়রত্ন! তুমি এক কাজ কর, তোমার ছেলেকে নিয়ে এস ; আমি তাকে দেখ্‌ব।"

ন্যায়রত্ন চলে গেলেন ; গঙ্গা পার হয়ে পুনরায় খোকাকে কোলে করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন, সন্ন্যাসী খোকাকে বুকের উপর রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগলেন ; ন্যায়রত্ন ভীত হইলেন ; বলিলেন—"আপনি খোকার অকল্যাণ কেন করছেন ?" সন্ন্যাসী সে কথার উত্তর না দিয়া মাথার উপর খোকার পা দু'খানি রাখিলেন ও বলিলেন,—"ন্যায়রত্ন! আমি এতদিনে বুঝলাম যে, নেপাল হ'তে সহসা বাঙ্গলায় কেন আসলাম। এইরূপ ভাগ্য প্রতি অবতারে একজনের ভাগ্যে ঘটে থাকে। আজ আমার সেই ভাগ্য উপস্থিত। তোমাকে আর আমি কি বলব ?

যে পাঁচটি গ্রহের সঞ্চার ও সংযোগে অবতারের জন্ম হয়, যেমন শ্রীরামচন্দ্র-লক্ষ্মণ, সেই পাঁচটি গ্রহই ইহার জন্মলগ্নে তুঙ্গস্থ। ইনি দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হবেন। ইহা হইতে জীব কৃতার্থ হবে।"

ইহার পর সেই জ্যোতিষী সন্ন্যাসীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদ সহরে দেখে নাই।"*

ডাহাপাড়া কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়রত্ন-ভবনে বন্ধুগোপালকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"এ ছেলে রাজা হবে।" পরে বলেন, "ভোগের রাজা না, যোগের (ধর্মের) রাজা।" মৌনী হওয়ার পূর্ব্বে বন্ধুহরি কোনও কোনও বিশিষ্ট ভক্তকে লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন "চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সঙ্গে বর্ত্তমান সাড়ে তিন মণ দেহের ওজন মিশায়ে অশোক পুষ্পের কুঁড়ির অগ্রভাগের আভা ল'য়ে আমি এসেছি। চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় জন্মেছি, তাই চন্দ্রপুত্র।"

"জগদ্বন্ধু মনুষ্য নয়, পুরুষ হরি।" "গর্ভ-বাস হয় নাই, তাই অযোনিসম্ভব।"

বন্ধুহরি যুগে যুগেই এ জগতে মাতাপিতা সম্বন্ধ পাতাইয়া মায়া প্রকাশ করেন। ভাগবতে উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ দিব্য

---

* বাংলা ১৩৩২ সনে একদিন এই জন্মরহস্যের প্রত্যেক বাক্য শ্রীল চম্পটী মহাশয় আন্দুল-নিবাসী পরমবন্ধুভক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ (এম্, বি) মহাশয়কে নিজে লিখাইয়া, সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ দিন তখনই আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া উহা সংগ্রহ করি এবং ১৩৩২ সনেই বন্ধু-বার্ত্তায় প্রথম প্রকাশ করি।

চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে মাতাপিতা দেবকী-বসুদেবের কাছে প্রকাশিত হইয়া কিছুক্ষণ পরেই প্রাকৃত শিশুরূপে মায়া প্রকাশ করেন। প্রভু বলিয়াছেন—"মায়িক সৃষ্টিতে কৃষ্ণ কেবল নামরূপে আছেন এবং নাম-সংকীর্ত্তনেই কৃষ্ণের উৎপত্তি।"

"প্রাকৃত মনুষ্য নহে, নিমাই পণ্ডিত।" "অযোনিসম্ভব।" "জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি হ'তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব।" "কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু, জীবের হিতের জন্য বিশেষ চিহ্ন নিয়ে মানুষের মধ্যেও মানুষ হয়ে আসেন। লক্ষণে চিনে নিতে হয়।"

গোপাল মিত্র মহাশয়কে প্রভু লিখেন—

"শ্রীমান্ গোপাল মিত্র।

তুমি, বাকচরের ভূপাল, আমার, পরিচয় লয়ে দ্বন্দ্ব করিও না।··· আমি দীনু ন্যায়রত্নের পুত্র নহি। ময়ূরভট্টের সন্তান, তাই ভট্টাচার্য্য। গাভীর অশ্রু, বৃষের আর্ত্তনাদে, সাড়ে তিন মণ চন্দ্রের সুধা ও অশোক পুষ্পের কুড়ির আভা ল'য়ে আমার আগমন, এই আমার পরিচয়।

"জগদ্বন্ধু। বদরপুর।"

"আমাতে মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করো। আমি রজঃ বীর্যে জন্মি নাই।····পুংও ব্রহ্ম। আমার পরিচয়, একমাত্র আমি জানি।···· বৃন্দাবন।"

এই সব কথা গোপাল মিত্র মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। পরে বন্ধুকথা-লেখক সুরেশবাবুর নিকট রক্ষিত প্রভুর মূল লিপির প্রতিলিপিতেও দেখিয়াছি।

ঘোষ দুঃখীরামকে প্রভু লিখেন—

"দীনু গোপাল ঠাকুরেরা আমার কেউ নয়। আমি তাদের পোষ্য মাত্র।" "গ্রহে পাঁচ তুঙ্গ। ক্ষণে জন্ম, যোনি-সংস্রব নাই। চন্দ্রের সুধায়, কারণ-দেহ। আমি, কৃষ্ণ বিষ্ণু সব নিত্য জেন।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে প্রভু লিখেন—

"আমাকে মনুষ্য বুদ্ধ্যে ত্যাগ করলে, শক্তি কৃপা করবেন না। আমি ক্ষণে জন্মেছি, ময়ুরভট্টের সন্তান, দীননাথের পোষ্য। আমি স্বপ্রকাশ। অন্ত্র সংস্রব নাই। বিষ্ণু ও শক্তি আমার আশ্রিত। এই মাত্র আমার পরিচয় দিয়ে নিরস্ত হ'লাম। ইতি, জগদ্বন্ধু ভট্ট। কাকচরিত।"

ডাহাপাড়ায় শিশুবন্ধুর দেড়বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাতা বামা-দেবীর নিত্যলোক প্রাপ্তির পর সারদানন্দ-অনুজ ময়ূরভট্ট-বংশীয় সাধক ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণানন্দের সহধর্ম্মিণী ন'মা নামে প্রসিদ্ধা, ক্ষমাময়ী দেবী, কয়েক মাস পরম বাৎসল্যে বন্ধুগোপালকে লালন পালন করেন। বন্ধুর আবির্ভাবের পর হইতেই তিনি মাতৃস্নেহে শিশুবন্ধুর সেবা করিতেন এইজন্য প্রভুবন্ধু নিজেকে সময়ে "ময়ূরভট্টের সন্তান, ভট্ট ভট্টাচার্য্য", বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রভুর বিবিধ বাণীতে বুঝা যায়, মায়িক জীবের সহিত তিনি সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। কেবল ভক্তি-বাৎসল্য-সম্পর্কে ভক্তি-রাজ্যেই মাতা, পিতা, জেঠা, কাকা, ভাই ইত্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। আবার ইহাও শুনিয়াছি, বন্ধুগোপাল তাঁহার সাত বৎসর বয়সে আসনস্থ হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্রাদ্ধকালে বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত মন্ত্র পড়িয়া শ্রাদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। বাৎসল্যময় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পিতার মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের সেবায় তৎপর যে সকল ভক্তকে তিনি, ‘তোমরা আমার নিত্য সত্য অভিভাবক” বলিয়া আদর করিয়াছেন, বাক্য পালনে বিমুখ হইলে তাঁদিগকেই আবার ভৎ´সনা করিয়া বলিয়াছেন,—“তোরা দুনিয়ার মহাপাপী, ভেসে যাচ্ছিলি, আমি ধরেছি বলে আছিস্।” আমরা শুধু এইটুকু বুঝি, বাল্যলীলায় পালক পিতা—ন্যায়রত্ন মহাশয়, পালিকা মাতা দেবী বামাসুন্দরী। ঐ ঐ ভাবাপন্ন ভক্তগণও প্রভুর মাতাপিতা। তাঁহার “ইচ্ছাকৃতি দ্বারা অবতার।”

বন্ধুর জন্মরহস্য অচিন্ত্য। ‘অচিন্ত্যং তর্কাসহম্’। বন্ধুহরির কৃপা ব্যতীত তাঁহার দিব্য জন্মকর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান মানবীয় বিচারের অতীত। তথাপি তাঁহারই স্মরণে এ-সম্পর্কে, ‘বন্ধু-কথানুশীলনে’ আরও কিছু আলোচনা করিয়াছি। পাঠকবর্গ উহা পড়িয়া স্বভাবমত ভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা, ৪।৬
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৪।৯
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১

দিব্য নরদেহধারী সেই বন্ধুহরির যুগল পদকমল মস্তকে ধারণ করি। জয় জগদ্বন্ধু হরি ॥

—*—

ষষ্ঠদশা। প্রকাশের প্রাগ্দশা।
যম, নিয়ম।

ব্রাহ্মণকান্দায় ঈশ্বর মাষ্টার মহাশয়ের পাঠশালায় বন্ধু কিছুকাল পড়িয়াছিলেন। বাল্যে কুষ্টিয়া আলমপুরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পর্কযুক্ত লাহিড়ী-ভবনে থাকিয়াও তিনি তথাকার এক স্কুলে কিছুদিন পড়েন। ইহার পর ফরিদপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়িয়া বন্ধুহরি জেলাস্কুলে ভর্ত্তি হন; ব্রাহ্মণকান্দা হইতে স্কুলে যাইতেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি মাটির দিকে চাহিয়া নতদৃষ্টিতে চলিতেন। তিনি সুবিনয়ী, স্বতন্ত্র, নৈষ্ঠিক ও স্বল্পভাষী ছিলেন। তাঁহার বাক্যগুলি চিরদিনই সুমধুর ও বীণাবিনিন্দন ছিল। অল্প বয়স হইতেই তিনি তুলসী, দেবমন্দির, সদ্‌ব্রাহ্মণ, সাধু ও ধার্ম্মিকগণকে প্রণাম করিতেন। তিনি লোকশিক্ষাগুরু, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" ইহাতে তাঁহার কেহ উপদেষ্টা ছিল না।

তের বৎসর বয়সে প্রভুর উপনয়ন হয়। তখন হইতে তাঁহাতে উষায় স্নান, ত্রিস্নান, আহ্নিক, সংযম-নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, কঠোরতাদির বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। দেবীমা'র মুখে শুনিয়াছি, একদিন বন্ধুসুন্দর গোপালপুর ঈশানবাবুর ওখানে বেড়াইতে যান। এক টুকরা ঝালরের কাঁচ পড়া-অবস্থায় পাইয়া ব্রাহ্মণকান্দা লইয়া আসেন। যেই মাত্র তাঁহার মনে পড়িল, উহা বলিয়া আনা হয়

নাই, অমনি তিনি মালিককে উহা বলিবার জন্য আবার প্রায় তিন-চার মাইল দূরে গোপালপুর চলিয়া যান। লোকে বালকবন্ধুর মধ্যেই অস্তেয়-ধর্ম্ম মূর্ত্ত দেখিয়াছিল। নিত্যকুমার বন্ধু মাদক-দ্রব্যাদি ও ভোগবিলাস চিরকালই বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি গাত্র ও নাসিকা আবৃত করিয়া পথ চলিতেন, পাছে ভোগী বিলাসীর স্পর্শ বা গন্ধ পূতদেহে সংলগ্ন হয়। বন্ধুর অঙ্গকান্তি ছিল স্বর্ণের মত উজ্জ্বল। যে দেখিত, সে মুগ্ধ হইত; বারংবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাহার লালসা বাড়িত। সহপাঠিগণ রূপে মুগ্ধ হইয়া সময় সময় তাঁহাকে "রাঙামূলা" বলিত।

তাঁহার লম্বা কাছা ছিল, উহা প্রায় মাটি ছুঁইয়া থাকিত। ক্লাসে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র ভাবে বসিতেন। অতি সাধারণ জামা চাদর ব্যবহার করিতেন। পরিধেয় বস্ত্রখানির কোন্ অংশ কটির নিম্নে, কোন্ অংশ কটির ঊর্দ্ধে থাকিবে, তাহা ঠিক রাখিবার জন্য তিনি বস্ত্রের কোণে একটি 'গিট্' রাখিতেন। কখনও এক দিকেরটা আর-একদিক্ করিতেন না। জল-কাচা বস্ত্র পরিতেন। ধোপ দেওয়া বা সোডায় সাবানে ধোয়া কাপড় পরিতেন না। মুখ মুছিবার ও চরণ মুছিবার গামছা পৃথক্ ছিল। একেবারে শুদ্ধ পবিত্রতার আধার।

প্রভুবন্ধু মাঝে মাঝে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর সেবা করিতেন। যে দিন তিনি নিজে পূজা করিতেন, সে দিন শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল দেখা যাইত। কোনও দিন বা শ্রীরাধার বেশ শ্রীগোবিন্দকে পরাইয়া আর গোবিন্দের বেশ শ্রীরাধাকে পরাইয়া আনন্দকৌতুক করিতেন। আপনভাবে কত দিব্য কথা বলিতেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় বন্ধুকিশোর নিজ হাতে পঞ্চবটী স্থাপন করিয়াছেন ও নারিকেল আদি বৃক্ষের চারা লাগাইয়াছেন। ব্রাহ্মণকান্দা ভবন ও বৃক্ষাদি বন্ধুর নানা লীলা-স্মৃতি-বিজড়িত।

কোন কোন দিন রাত্রিকালে বন্ধুসুন্দর আসনস্থ হইয়া বাটীর জলাশয়ে পদ্মের মত ভাসিয়া বেড়াইতেন। বাটীর আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন ঘটনায় তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভাইদের বিবাহের সময় দেবী গোলোকমণি স্বামী সহ আসিয়া কয়েকদিন ব্রাহ্মণকান্দা অবস্থান করেন। তখন একদিন ঐ ভক্তদম্পতি চকিতের জন্য বালক-বন্ধুকে রাধামদনমোহন মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া "কি দেখিলাম" বলিয়া বিচার-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বন্ধুহরির পঠদ্দশায় জলধর ঘোষ ও দুঃখিরাম ঘোষ মহাশয় তাঁহার কৃপা পাইয়া ধন্য হন। ভক্তের প্রাণের আকুলতায় বন্ধু ভক্তদত্ত দধি-সর-ঘৃতাদি উপহার গ্রহণ করিতেন। ভক্ত যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ "ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে", ইহা তিনি পরবর্ত্তী কালে লৌকিক নিম্নবর্ণজাত ভক্তপ্রদত্ত অন্নগ্রহণ করিয়া জগৎকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

দুঃখিরাম শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, প্রভুবন্ধু তাঁহাকে একসময় জগদম্বা ও অন্য সময় ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া, ভগবৎ-তত্ত্বের অভিন্নতা ও তাঁহারই একাধারে যার যার ইষ্টের বিদ্যমানতা প্রাণের অন্তস্তলে অনুভব করাইয়া দিয়াছেন।

প্রভুবন্ধু সাধুদের যোগ-বিভূতিকে ইন্দ্রজাল বলিয়াছেন।

তথাপি নিজ প্রিয়জন অন্যত্র যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভক্তিপথভ্রষ্ট না হন, এই জন্য কখনও কখনও আপনাতে কিঞ্চিৎ বিভূতি দেখাইয়াছেন। ভক্ত দুঃখিরামের সম্মুখে প্রভুবন্ধু একদিন আসনস্থ অবস্থায় শূন্যপথে কিছু দূরে উঠিয়াছিলেন। তিনি যে ঐ ভাবে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারেন, ইহাও জানাইয়াছিলেন।

পরম শিশুর মত ভাষার ভঙ্গী করিয়া একদিন বন্ধুসুন্দর দুঃখিরামকে লিখিয়াছিলেন—

"দুখীরাম ঘছ, মছথ, সধু, মহারাজ ; ঘৃত পক্কাইয়া দিবা, দধি মথ্খনএ দিবা নিত্য পমর সের করিয়া। শক্তি সিদ্ধি করেছ, আমি শক্তিরও শক্তি। আমার ভজনায় গব্য ঘৃতের বল পাইবা।

ঘোষ মহাশয়কে আত্মপরিচয় জানাইয়া বন্ধু লিখিয়াছিলেন, —"আমি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, সব। নিত্য জে'ন॥"

বন্ধুসুন্দরের অপ্রাকৃত অনিন্দ্যসুন্দর গৌর কান্তি, মনমাতান অঙ্গগন্ধ, প্রাণাকর্ষী কণ্ঠস্বর, অপার্থিব নয়নের চাহনিই তাঁহাকে "স্বতন্ত্র পুরুষ" বলিয়া জগতের নরনারীর কাছে পরিচয় করাইয়া দিত।

বন্ধুহরি পাঠ্যাবস্থায় আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁহার দিব্যভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। তখন তাঁহাকে স্কুলে, গৃহে, দেবমন্দিরে, বৃক্ষতলে, মাঠে, বিভিন্নস্থানে যাঁহারা লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারা দেখিতেন,—বন্ধু কখনও গভীর চিন্তামগ্ন, কখনও অন্যমনস্ক ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে একদিকে তাকাইয়া আছেন।

কখনও বা দৃষ্টি হইত উদাস, কর্ণ হইত উৎকর্ণ, নির্জ্জনে কি

যেন শুনিতেন কান পাতিয়া। মস্তক সঞ্চালন করিয়া ধীরে ধীরে কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া কি যেন বলিতেন। লোকের গতিবিধি বুঝিলে নীরবে সতর্ক হইতেন। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টির আড়াল দিয়া কোন্ দিব্যদেহ তাঁহার নিকট আসিত, কথা বলিত, তাহা কে বুঝিবে?

বন্ধু কখনও বা মাঠে ঘাটে বিহ্বল অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। প্রিয়জনেরা কেহ দেখিলে, কাঁধে করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া যাইত। কোন কোন দিন স্কুলের ক্লাস হইতেও আনমনাভাবে শিক্ষকদের অনুমতি না লইয়াই চলিয়া যাইতেন। শিক্ষকমহাশয়গণ তাঁহার এই স্বতন্ত্র উদাসীন ভাব জানিতেন বলিয়া কিছু বলিতেন না।

মাঝে মাঝে উদাসীন ভাবের উদয় হইলেও, স্কুলে যাইবার নিয়মটি বন্ধুসুন্দর বরাবর বজায় রাখিতেন। শুনিয়াছি, ভূগোলে তিনি সব পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান রাখিতেন। ক্লাসে পাঠ্য হাণ্টারের হিষ্ট্রি (ইতিহাস) বই বন্ধুর ছিল না। তিনি উহা আগাগোড়া নিজে হাতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। নিজে "বিদ্যার শ্রম", আচরণ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, "বিদ্যার শ্রম করিও।"

তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পরীক্ষার দিন, বন্ধু তাঁহার স্বভাবগত ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে অন্যমনস্ক ছিলেন। হেড্মাষ্টার ভুবন সেন তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন। তৎকালীন বন্ধুর সহপাঠী রমেশচন্দ্র বলেন যে, ঐদিন দ্বিতীয় শিক্ষক দ্বারিকবাবু গার্ড ছিলেন। তিনি হেড্মাষ্টারকে জানাইয়াছিলেন যে, জগদ্বন্ধু কোনও অন্যায় কার্য্য করে নাই। কিন্তু, ঐরূপ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকাটাই প্রধান শিক্ষক তখন নিয়ম-বিরুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন।

দৈবক্রমে সর্ব্বজনপ্রিয় সত্যাশ্রয়ী ছাত্রকে ঐরূপভাবে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিয়া সেন মহাশয়ের পরে অনুতাপ হয়। কিছুক্ষণ পরেই তিনি প্রিয় জগতের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহাকে পাইবেন কোথায়? বন্ধুসুন্দর ফরিদপুর হইতে বহু পথ হাঁটিবার পর ট্রেণ যোগে কলিকাতায় ১, মদন মিত্র লেনে, চম্পটী মহাশয়ের বাটীতে যান।

এদিকে বন্ধুকে না পাইয়া আত্মীয়স্বজন মহাব্যাকুল ও চিন্তিত হইয়া পড়েন। পরে কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইয়া সকলে নিশ্চিন্ত হন। কলিকাতা হইতে প্রভু আবার ফরিদপুরে আসিলে, জেলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টার প্রভৃতি শিক্ষকগণ বন্ধুকে তাঁহাদের স্কুলে পড়াইবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু বন্ধু প্রবল আপত্তি জানান।

তারিণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব আচরণের জন্য বহু অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরকালে শিক্ষকগণ বন্ধুসুন্দরকে মহাপুরুষ জ্ঞানে পরম শ্রদ্ধা করিতেন। বন্ধুর শিক্ষক, দক্ষিণা নাগ মহাশয়কে আঙ্গিনায় আসিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে চালিতাতলায় ও মন্দিরে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে দেখিয়াছি।

নিজজন বন্ধুকে ফরিদপুরে জেলাস্কুলে পড়াইতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার অনিচ্ছাহেতু সম্ভব হয় নাই। অতঃপর রঁাচিতে তারিণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট থাকিয়া বন্ধু তথাকার স্কুলে ইং ১৮৮৮, ২৬শে সেপ্‌টেম্বর, বার্ষিক পরীক্ষার অল্প আগে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ও বার্ষিক পরীক্ষার পর উত্তমরূপে পাশ করিয়া দ্বিতীয়

শ্রেণীতে উঠেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, রাঁচি স্কুলে ক্লাশে জগতের সর্ব্বোচ্চস্থান ছিল।

বন্ধুর অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্য-গুণে অল্পদিনেই স্থানীয় সকলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এখানে রায় বাহাদুর রাখালবাবুর একটি দুর্দ্দান্ত তেজস্বী পাগলা ঘোড়া ছিল। সুগৌরতনু বন্ধুসুন্দর নিজে চালাইয়া সেই ঘোড়াকে অতি অনুগত ও শান্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এ কাহিনীও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দেখা ও তাঁহার মুখে আমাদের শোনা।

বন্ধুসুন্দর স্বভাবতঃ নির্জ্জনে শান্তভাবে থাকিতেন। অতি সুকোমল তাঁর অঙ্গ, কোনও দিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান অভ্যাস ছিল না। রাখালবাবুর ঐ পাগলা ঘোড়াকে বশীভূত করিতে বড় বড় ওস্তাদরাও পারে নাই। পিঠে মানুষ উঠিলেই ঐ ঘোড়া তাহাকে ফেলিয়া দেয়। কথাটি শুনিয়া প্রভুবন্ধু নির্ভীকভাবে ঐ ঘোড়াতে লাফাইয়া উঠেন ও রাতুর রাজার বাড়ী পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দেন। ঘোড়াকে ফিরাইয়া আনিবার পর দেখা গেল, সে ঘোড়া একেবারে শান্ত ও নিরীহ হইয়া গিয়াছে।

রাঁচিতে আসিয়া বন্ধুর স্নানাহার অনেকটা অনিয়মিত হয়। উদাস ভাব বৃদ্ধি পায়। তারিণীবাবুর বাসার পাচক ও ভৃত্য ব্যতীত অপর কোন আত্মীয়স্বজন ছিলেন না। পাচক ও ভৃত্যের চুরি করার অভ্যাস ছিল। অপরাধ প্রকাশ-ভয়ে একদিন তাহারা প্রভুবন্ধুর খাদ্যদ্রব্যের সহিত আর্সেনিক বিষ মিশাইয়া দেয়। উহা ভক্ষণ করিয়া বন্ধু অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সংবাদ

পাইয়া তারিণীবাবু অফিস হইতে আসিয়া, অনুসন্ধানে প্রকৃত ব্যাপার জানিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দ্বারা বন্ধুকে সুস্থ করেন। বন্ধুর দয়ায় পাচক-ভৃত্যও ক্ষমা প্রাপ্ত হয়।

রাঁচির বাসা অরক্ষিত বলিয়া তারিণীবাবু জগদ্বন্ধুকে ওখানে রাখা নিরাপদ মনে করিলেন না। ফরিদপুর পাঠাইয়া দিলেন। ওখান হইতে বন্ধুকে দেবীমা'র অনুজা গোলোকমণি দেবীর নিকট পাবনায় পাঠাইয়া তথাকার জেলাস্কুলে ইং ১৮৮৯, ৫ই নভেম্বর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করান হয়। দেবী গোলোকমণির স্বামী জমিদার ও উকিল প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়, বন্ধুসুন্দরের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ বাড়ীর মেয়ে পুণ্টু, তাঁহার স্বামী আশুতোষ, তলাপাত্রের কন্যা হেমাঙ্গিনী, তাঁহার স্বামী হরিদাস কর, প্রতিবাসী অন্যান্য বালকগণ—সকলেই বন্ধুর প্রিয়জন ছিলেন। বাটীর শ্রীশ, জগদীশ, রণজিত প্রমুখ প্রিয়জন বন্ধুগতপ্রাণ ছিলেন।

ইং ১৮৯০ সনে পাবনায় প্রবেশিকা ক্লাশ পর্য্যন্ত জগদ্বন্ধু পাঠ করেন। এখানেই তাঁহার সাত্ত্বিক ভাবাদির বিশেষ প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

বাল্যকাল হইতেই তুলসী ও দেববিগ্রহে প্রণাম, নির্জ্জনে অবস্থানাদি, উদাসীনভাব, যাত্রাগানে প্রহ্লাদ-ধ্রুব আদি ভক্ত-চরিতাভিনয়-দর্শনে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা, ব্রহ্মচর্য্য-নিয়ম-নিষ্ঠা পালন, হরিনামে তন্ময়তা ইত্যাদি তাঁহার লোকাতীত ভাব প্রিয়গণের চিত্তাকর্ষী হইয়াছিল। পাবনায় ঐ সকল ভাবের বিশেষ প্রকাশ হয়। এইখানে তাঁহার বহু অনুবর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও হরিনাম গ্রহণ করেন।

সর্ব্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যধাম বন্ধুচন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। যম—ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ। নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান। এই যম-নিয়ম বন্ধুর অনুবর্ত্তী ভক্তগণ তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি ত স্বয়ং সত্যনিত্যবস্তু, বাহিরে তাঁহার আচরণ-ব্যবহার ছিল, কেবল লোকশিক্ষার্থ।

সাত্ত্বিকভাব-দশা

অহিংসা-অক্রোধ-ক্ষমা

পাবনায় হরিনাম কীর্ত্তনে জগদ্বন্ধুর ভাব-দশা, সমাধি, আবেশ, মূর্চ্ছা অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইতে থাকে। কখনও কখনও তিনি দিবারাত্র অচৈতন্য দশায় পড়িয়া থাকিতেন। পুনরায় হরিনাম করিয়াই তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করান হইত। একবার এক দুষ্টলোক বন্ধুকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া একখানি জ্বলন্ত টীকা বন্ধুর শ্রীঅঙ্গের উপর ধরিয়া রাখে। জ্বলন্ত অঙ্গারে পুড়িয়া ঐ অঙ্গে ভীষণ ফোস্কা পড়িয়া যায়। কিন্তু বাহ্যজ্ঞানহীন বন্ধুর উহাতে কোন ভাববৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। প্রভুকে পরীক্ষাকারী ব্যক্তি পরে অনুতপ্ত হয়।

দূর হইতে কীর্ত্তন শুনিলে বন্ধু মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিতেন। ভাবাধিক্যে কখনও নর্দ্দমায়, কখনও প্রাচীরগাত্রে

সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়া যাইতেন। স্নেহময়ী দিদি গোলোকমণি বন্ধুকে আঘাতাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কক্ষমধ্যে আটকাইয়া রাখিলে, তিনি কীর্ত্তনের তালে তালে নাচিতে নাচিতে গৃহমধ্যেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যাইতেন। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় প্রিয়জনবৃন্দ তাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অথবা স্কন্ধে করিয়া হরিনাম কীর্তন করিতেন ও ধন্য হইতেন। পাবনায় কেলিকদম্ববৃক্ষতলা, জয়কালীমাতার মন্দির বন্ধুর প্রিয় বিহার-স্থান ছিল।

প্রভুবন্ধুহরি সত্যমধুর কল্যাণময় সঞ্জীবনী-উপদেশ বাক্যে, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষায় ও হরিনামদানে বহুসংখ্যক অসংযত, অজিতেন্দ্রিয় ও পতিত জীবনের পরিবর্তন সাধন করেন ও আচণ্ডালকে অভয়-পদে আশ্রয় দান করেন। কিন্তু আলোর পার্শ্বেই অন্ধকার, তাই পাবনায় অজ্ঞানান্ধ বিরুদ্ধবাদী লোক হিংসায় মাতিল।

একদল লোক বন্ধুর ঐ অলৌকিক শক্তিদর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া এবং ছেলেরা তাঁহার শিক্ষায় সংসারত্যাগী সাধু হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। একদিন শেষরাত্রে প্রাতঃস্নানকালে প্রভুবন্ধুকে দুষ্টগণ জলে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বন্ধুসুন্দর বহুকষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

একদিন দেবী গোলোকমণি জগদ্বন্ধুর উপর দুষ্টগণের অত্যাচারের কথা মনে করিয়া শিবপূজাকালে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া ক্ষমার দেবতা বন্ধুহরি বলিয়াছিলেন, "দিদি, টাটের উপর শিব বসা'য়ে চোখের জল ফেলবেন না; ওতে ওদের

অকল্যাণ হ'বে।" জীবননাশে উদ্যত শত্রুর জন্যও কল্যাণ-কামনা একমাত্র "অক্রোধ পরমানন্দ" ক্ষমার দেবতা বন্ধু ছাড়া আর কোথায় সম্ভব হয় ?

পাবনায় অত্যাচারী ব্যক্তিগণ আর একদিন শেষরাত্রে বন্ধুসুন্দরকে একক আক্রমণ করিয়া অমানুষিকভাবে প্রহার করে। তিনি নীরবে সকল আঘাত সহ্য করিয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া যান। পীড়নকারীরা তখন বন্ধুকে মৃতজ্ঞানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যান। প্রিয়গণ খুঁজিয়া শ্রীদেহ বহন করিয়া আনেন। বন্ধুর প্রতি পাশব হিংসাচরণের ব্যাপারে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন।

কয়েকদিন সেবাযত্নের পর বন্ধুহরি সুস্থতা লাভ করেন। অতি ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রিয়পরিজন আঘাতকারীদের নাম জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রেমময় বন্ধু কোনক্রমেই তাহাদের নাম প্রকাশ করেন নাই। হাসিমুখে আরও হাসিয়া বলেন, "আমি দণ্ডদাতা নহি। উদ্ধারণ বটী। আমার উপর আরও কত অত্যাচার হ'বে। কিন্তু কেউ মেরে ফেলতে পারবে না।"

তাড়াসের রাজর্ষি বনমালী রায় সময়ান্তরে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যাহারা আঘাত করিয়াছে, তাহাদের নাম জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে, প্রভু লিখিয়া দিলেন,—

"পাপরূপ হিমাচল শিরোদেশে ছিল।
লাহিড়ী পবনবেগে উড়াইয়া দিল॥"

অপরাধীর অপরাধ জানিয়া তাহা গ্রহণ না-করাই ক্ষমাপদ-

বাচ্য। অপরাধীকে অপরাধীই না ভাবিয়া উপকারিরূপে গ্রহণ করা ক্ষমা অপেক্ষাও মহত্তর মহাউদ্ধারণ ধর্ম্ম, যাহার ভাষা অভিধানে নাই, দৃষ্টান্ত জগতে নাই।

পাবনায় বন্ধু অনেক সময় ভাবাবিষ্ট থাকিতেন। "রাধা" এই নামটি কর্ণগত হইলেই মহাভাব-দশা হইত। বর্ণনায় শুনিয়াছি, গৌরহরি "রা" বলিয়া "ধা" বলিতে ঢলিয়া পড়িতেন। বন্ধুহরি রাধানাম উচ্চারণই করিতে পারিতেন না। প্রিয়ভক্ত রাধিকাকে 'শারিকা,' রাধাকুণ্ডকে "অমুককুণ্ড" বলিতেন। রাধাস্থলে "অমুক" "শ্রীমতী" বা "বৃষভানুনন্দিনী" বলিতেন। কি মহাভাবের খেলা, কে বুঝিবে!

এক সময় কয়েকজন সঙ্গী তীব্রবেগা ইচ্ছামতী নদীতে নৌকাযোগে বন্ধুকে লইয়া "রাধা রাধা" বলিয়া ধ্বনি দেন। ঐ ধ্বনি শুনিয়া বন্ধু আবিষ্টভাবে নদীতে পড়িয়া স্রোতের বেগে তলাইয়া যান। কৌতুক করিয়া "রাধা" বলিবার এই নিদারুণ পরিণতিতে সঙ্গীরা কাঁদিয়া আকুল হইবার পর স্রোতোবেগে তীরে উৎক্ষিপ্ত-দেহ বন্ধুচাঁদের দর্শন লাভ করিয়া সুস্থির হন।

ঠাকুর তারিণীবাবুর মুখে শুনিয়াছি, পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক বন্ধুর উপর পূর্ব্বোক্ত আঘাতের সংবাদ পাইয়া তিনি জগদ্বন্ধুকে পুনরায় পাবনা হইতে রাঁচি লইয়া যান। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন, বন্ধু সেখানে টেষ্ট পরীক্ষায় কোন কোন বিষয়ে প্রথম হইয়া ভালভাবে পাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা আর দেন নাই। বন্ধুসুন্দর পুনরায় কিছুকাল রাঁচিতে থাকিলেও, তাঁহার ব্যবহারিক ছাত্রজীবন প্রকৃতপক্ষে পাবনাতেই শেষ হয়।

বন্ধুহরি তৎকালে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠে তন্ময় থাকিতেন। তিনি আপন ইচ্ছায় কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া আবার পাবনাতে উপস্থিত হন।

তিনি অত্যাচারীদের নিকট দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্ভয়ে একাকী সিংহবিক্রমে বিচরণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ অটল অধ্যবসায়ের সহিত অবিচলিতভাবে অনুবর্ত্তিগণকে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ ও হরিনাম দান করিয়াছেন। উত্তরকালে অত্যাচারিগণ নানারূপ কঠিন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অনুতাপ-বারি বর্ষণ করেন। তাঁহারা অনেকে প্রভুবন্ধুর প্রতি আকৃষ্টও হন এবং পরবর্ত্তিজীবন পবিত্র ভাবে যাপন করেন।

অহিংসা-নীতি লঙ্ঘন করিলে প্রভুবন্ধু নিজ প্রিয় সেবককেও কৃপাদণ্ড করিয়াছেন। অঙ্গনে প্রভুর মৌনাবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী সেবাইত, গোপীকৃষ্ণ দাস ঘটনাক্রমে একদিন এক প্রাচীন ভক্তকে আঘাত করায় বন্ধুহরি ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"মানুষ কেমন ক'রে' মানুষকে মারে? কেন মানুষ হিংসা ছাড়ে না!" অতঃপর তিনি সেবককে বলেন, "তোমার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে। তুমি গৃহে যাও।"

প্রভুর কঠোর আদেশে সেবক অনুতপ্ত হইয়া অঙ্গন ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইতে বাধ্য হন। প্রভুর কৃপাশক্তি সঞ্চারণে আমাদের পূজ্য ঐ বিষ্ণুপ্রিয় ভক্তের অবশিষ্ট জীবন অহিংসা, বিনয় ক্ষমা ও কারুণ্যাদি সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রভু সংযম-সহিষ্ণুতা-ক্ষমা-দয়া-অহিংসা-সত্য ও প্রেমের মূর্ত্তিমান আলেখ্য। নিজে আদর্শ হইয়া উপদেশ দিয়াছেন— "জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস। জীবদেহে আঘাত করলে নিত্যানন্দে আঘাত করা হয়।" "মাইর খাইও, মারিও না।" অহিংসায় সিংহবিক্রমে চল। "হরিনামের দল বাঁধ।" "মহাপাপ হরি হিংসা।"

"মনঃ প্রাণে, জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।
ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্মদান, উদ্ধার বিধান॥
(উদ্ধারণ ধর রে) (সবে হরিনাম দান)
(এই কল্যাণ বিধান)"

—হরিকথা

পাবনায় বন্ধু ও ভক্তগণ

বন্ধুহরির অলোকসামান্য মধুর তেজঃপুঞ্জ রূপলাবণ্য ও অশ্রুকম্পপুলক-মূর্চ্ছা-ভাব-আবেশ এবং অন্যান্য দিব্য লক্ষণাদি দেখিয়া ক্রমে বহু গণ্যমান্যজন তাঁহার অনুরাগী ও শরণাপন্ন হন। শিবভক্ত শ্রীশ লাহিড়ী ভার্য্যাসহ বন্ধুকে শিবজ্ঞানে সেবা করিতেন। রাঁচি হইতে পাবনায় দ্বিতীয় বার বন্ধুসুন্দরের ফিরিয়া আসার পর স্বর্ণ-তার দ্বারা গ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা তিন লহরী করিয়া বন্ধুহরির কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া তাঁহারা (লাহিড়ি দম্পতি) কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্য সময়ে প্রভু কণ্ঠে ও অন্যান্য অঙ্গে প্রচুর তুলসী মালা ধারণ করিয়াছেন।

লাহিড়ী-ভবনে বন্ধুর অবস্থানকালে দেবী গোলোকমণি একদিন ঘটনাক্রমে বন্ধুহরির বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। বন্ধুসুন্দরই পরে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থা করেন।

শান্তিপুরের আনন্দ মৈত্র, পাবনা তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি বৈষ্ণব বনমালী রায়, তৎগুরুপুত্র অদ্বৈতবংশীয় রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি বহুভক্তজন বন্ধুকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ-গৌরাঙ্গ জানিয়া তাঁহার অনুগত হন। রাজর্ষির আগ্রহে গোস্বামীজী বন্ধুসুন্দরকে হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া পাবনা হইতে তাড়াসের রাজবাটীতে লইয়া একবার জামাই বিনোদজীর মন্দির সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে তাঁহার অবস্থিতির ব্যবস্থা করেন। তাড়াসে প্রভুবন্ধুর অনেকবার গতায়াত ঘটিয়াছে।

ভোগের পর জামাইবিনোদকে তামাক দিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন রায় বনমালী বিগ্রহ-সেবার সার্থকতা বুঝিতেন না। পূর্ব্বপুরুষের ঠাকুর বলিয়া যেটুকু বা শ্রদ্ধা ছিল তাহাও তামাক-সেবার পারিপাট্য দেখিয়া মলিন হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বন্ধুহরি ইহা অন্তরে বুঝিয়াই একদিন ভোগান্তে রাজর্ষি বনমালীকে ডাকিয়া তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ দান করিয়া বলিলেন—"ঐ শুনুন, বিনোদিয়ার তামাক সেবাবিলাস।' রাজর্ষি শুনিলেন, জাগ্রতদেব গড়গড়া টানিতেছেন। গড়গড় শব্দে কর্ণ ও তামাকের সুগন্ধে নাসিকা পরম তৃপ্ত হইল। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত লীলা গোচর হয় না। প্রভুর কৃপায় রাজর্ষির ইন্দ্রিয়গণ তখন অপ্রাকৃত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পরই তিনি "রাজর্ষি" বলিয়া পরিচিত হন।

বাকচরবাসী ভক্তদের মুখে শুনিয়াছি, প্রভু একবার তাঁহাদিগকেও জামাই বিনোদজীর দর্শনে লইয়া গিয়া তামাক সেবা আস্বাদন করাইয়াছিলেন। রায় বনমালীর বংশীয় এক গোপীস্বভাবা দিব্যাকুমারী কন্যার সহিত মন্দিরেই বিগ্রহ বিনোদ-দেবের অপ্রাকৃত বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য ইষ্ট বিগ্রহ জামাই বিনোদ নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত ও পূজিত হন।

পাবনার বৈদ্যনাথ চাকী, দীনবন্ধুদাস বাবাজী, তৎপত্নী বিন্দুমাতা, হরিরায়, নৃত্যগোপাল কবিরাজ, রণজিত লাহিড়ী, সুশীল লাহিড়ী, কার্ত্তিক ভৌমিক, হরিদাস কর প্রমুখ বহুজন প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। জগদ্‌গুরু বন্ধু নিজেকে "চিরগুরু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রাদিও কাহাকেও কাহাকেও লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু লৌকিকভাবে কাহাকেও দীক্ষামন্ত্র দিতেন না, বা শিষ্য করিতেন না। শুনিয়াছি, কোন ভক্ত বিশেষভাবে আবদার করিলে, প্রভু তাহাকে একদিন লিখিত মন্ত্র স্পষ্টভাবে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

বুড়োশিব ও প্রভুবন্ধু

পাবনার নিত্যসিদ্ধ হারাণক্ষেপা, "বুড়োশিব" প্রভুবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। ভক্তগণ বলেন যে, গৌরলীলার অদ্বৈতাচার্য্যই প্রচ্ছন্নভাবে বুড়োশিব হইয়া আছেন। সর্পসঙ্কুল ভগ্ন অট্টালিকায় তিনি বাস করিতেন। কখন কখন বৈদ্যনাথ চাকী

ভবনের সন্নিকটে বাস করিতেন। একবার দুর্গোৎসবের ছয়মাস আগে তিনি একটি বাঙ্গি (ফল) দুর্গাপূজায় ভোগ দিবার জন্য চাকী গৃহিণীকে দিয়াছিলেন। ঐ ফল ছয়মাস অবিকৃত অবস্থায় ছিল এবং ছ'মাস পরে পূজার সময় ভোগে লাগিয়াছিল। সাধারণতঃ ঐ ফল পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকিলেই পচিয়া যায়। বুড়োশিবের কাছে কাছেই তাঁহার পরম স্নেহভাজন 'ধুনী' নামে এক ক্ষেপী-মাতাকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত।

চম্পটী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, প্রভুবন্ধু ও বুড়োশিব স্থান-কাল (Time & Space) এর বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না ; ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রভুবন্ধু একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়াছেন এবং বাহির হইতে তালারুদ্ধ পাকাঘর হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। একসময় হুগলীর জনৈক নাজীর ঘটনাক্রমে জামিন হইয়া প্রভুকে পাকা গোয়াল ঘরে তাঁহার বাক্যানুসারে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে দেখেন গৃহ যথাযথ তালারুদ্ধ অথচ গৃহ হইতে প্রভু কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। মথুরায় এক শেঠজি প্রভুকে তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট জামাই মনে করিয়া তালা দিয়া কক্ষে আটক রাখেন। পরদিন তালা খুলিয়া দেখেন, গৃহ শূন্য।

বৃন্দাবনে গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা দেখিয়া প্রভুবন্ধু ভাব সমাধিস্থ হইলে, রাজর্ষি বনমালী বন্ধুহরিকে শিবিকাযোগে আনাইয়া নিজ ঠাকুরবাড়ীর অট্টালিকা কক্ষে সাবধানে রক্ষা করেন। দ্বার বাহির হইতে বন্ধ ছিল, প্রহরীর ব্যবস্থাও ছিল। বন্ধুহরি কিন্তু ভিতর হইতে অক্লেশে অন্তর্হিত হন। এই জাতীয় ঘটনা বুড়োশিব

সম্বন্ধেও ঘটিয়াছে। শিবের আশে পাশে থাকিয়া চম্পটী ঠাকুর উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যে-প্রভু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের গাত্রগন্ধেও কষ্টবোধ করিয়া তাহাদিগকে কুড়িহাত দূরে থাকিতে বলিতেন, সেই প্রভুই স্বচ্ছন্দে ও স্বেচ্ছায় অতিবৃদ্ধ শিবের ময়লা কাঁথায় ও শয্যায় একত্র শয়ন উপবেশন করিতেন। "ওরে, জগা মানুষ নয় রে, সাক্ষাত্। তোরা তা'কে যত্ন করিস রে, যত্ন করিস। জগা গৌর, জগা রাজা, আমরা প্রজা" ইত্যাকার নানা উক্তি পাগলা শিবের মুখে শোনা যাইত। হরিনাম কীর্ত্তনে বুড়োশিবের উদ্দণ্ড নৃত্য অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু ছিল। তাঁহার নৃত্যকালে চারিদিকের ভূমি কম্পিত হইত।

গোস্বামী রঘুনন্দন, ঠাকুর চম্পটী, জয়নিতাই, শ্রীনবদ্বীপ শ্রীরামদাস আদি ভাগবতগণ বুড়োশিবের কৃপাপাত্র ছিলেন। বড় ছোট, সম্ভ্রান্ত-সাধারণ, সকলেই বাক্‌সিদ্ধ হারাণ বাবা বুড়োশিবকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শিব সময় সময় প্রভুর জন্য ফরিদপুর-বাকচর যাইতেন। শুনা যায়, একই দিনে তিনি পাবনায় ও বাকচরের নিকট সুলতানপুরে দুই স্থানে দেহত্যাগ করিয়াছেন ও দুই স্থানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। অথচ তিনি এখনও দেহে বিদ্যমান, ইহা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন।

প্রভুবন্ধুর কৃপায় পাবনা সহর ভক্তিপ্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হয়। প্রভু পাবনা হইতে শ্রীবৃন্দাবন, কলিকাতা, নবদ্বীপ ও ফরিদপুর, ডাহাপাড়া, ব্রাহ্মণকান্দা যাতায়াত করিতেন। তিনি অগণিতবার পাবনা গমনাগমন করিয়াছেন। দেবীমাও কখন

কখন জগতের জন্য পাবনা আসিয়াছেন। পাবনা ভক্তলোকের স্থান বলিয়া বন্ধু রহস্য করিয়া বলিতেন, এমন স্থান আর "পাব—না", "পাবনা দুর্লভ-জিলা।"

পরম বন্ধুপ্রিয় রণজিত লাহিড়ি প্রমুখ ভাগ্যবান্ ভক্তগণ কীর্ত্তনে অবিষ্ট হরিনামময় প্রভুবন্ধুহরির অনাবৃত শ্রীঅঙ্গে "হরি", এই নামাক্ষর স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছেন। ভক্তগণ প্রভুর নিজ হস্তলিখিত পরিচয়ে 'হরি' এবং "আমি হরি নাম মহানাম নাম মাত্র" "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু" ইত্যাদি বন্ধুবাণী প্রভুতে মূর্ত্ত দেখিয়াছেন।

পদ্মাসনবদ্ধ বন্ধুর আলোকচিত্র

বন্ধুর বাল্যসঙ্গী বকু বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট নিজে শুনিয়াছি, তিনি যখন ইং ১৮৯১ সালে কলিকাতায়, কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন তিনি সঙ্গে থাকিয়া কলিকাতার বেঙ্গল ফটোগ্রাফার দ্বারা বন্ধুর আলোকচিত্র তোলার ব্যবস্থা করেন। রাঁচির স্কুল হইতে আসিয়া ইং ১৮৮৯, ৫ই নভেম্বর পাবনা জিলা স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশে বন্ধু ভর্ত্তি হন। রাঁচিতে বন্ধুর পাঠকালে বকুবাবু স্কুলের ছাত্র, কলিকাতায় ঐ সময় তিনি কদাপি ছিলেন না। তাঁহার প্রথম ও মধ্য-স্কুল-জীবন ফরিদপুরে, শেষ স্কুল-জীবন বিহার অঞ্চলের ডুমকায়, কলিকাতায় নহে। বকুবাবু কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডুমকা বিদ্যালয় হইতেই ইং ১৮৮৯ সনে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। ইং ১৯৬০ সনে কলিকাতা ৮, ভীম ঘোষ লেনস্থিত প্রফেসর স্থধীর কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে জানিয়া ও বকুবাবুর পুত্র হীরেনবাবুর কাছে শুনিয়া এই সত্য তথ্যে অভ্রান্ত হইয়াছি। স্থরেশবাবু বন্ধুকথা তৃতীয় সংস্করণে ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেন, '(ইং ১৮৯১ সন) জগদ্বন্ধু তাঁহার ফটোগ্রাফ উঠাইবার অনুমতি প্রদান করেন।' ইং [১৮৭১] সনে প্রভুর আবির্ভাব। স্থতরাং ইং ১৮৯১তে প্রভুর বয়স উনিশ-কুড়ি বৎসরের মধ্যে ছিল, ইহা সরল সত্যকথা। পাবনায় ইং ১৮৯০ সনে প্রথম শ্রেণীতে প্রভু পাঠ ত্যাগ করেন। আবার রাঁচি যাইয়া দ্বিতীয়বার পাবনায় প্রভু আসিলে অনুরক্ত ভক্ত শ্রীশ লাহিড়ী মহাশয় ভার্যাসহ স্বর্ণতার গ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা বন্ধুকে ভক্তি-উপহার দেন। পদ্মাসনবদ্ধ বন্ধুর ফটোচিত্রের কণ্ঠে ঐ মালা দেখা যায়। তারিণী ঠাকুরের কাছে জানা যায়, রাঁচিতে স্কুলে ছাত্রবন্ধুর কণ্ঠে ঐ রুদ্রাক্ষ মালা কোনদিনই ছিল না। এখানে পদ্মাসনবদ্ধ বন্ধুরূপ, কীর্ত্তন ছন্দে কিঞ্চিৎ বর্ণনা, স্মরণ ও বন্দনা করিলাম,—

নিত্যকিশোর বন্ধুরূপ

অতুল সেই বন্ধুরূপ সর্ব্বদেব বন্দে।
বর্ণিব এথায় কিছু কীর্ত্তনের ছন্দে॥
জয় প্রভু জগদ্বন্ধু বিশ্ব বিমোহন।
পদ্মাসনে সমাসীন নয়ন রঞ্জন॥

পাণিপদতল, রক্তশতদল, শুভ্রবাস পরিধান।
শ্বেত উপবীত, উরসে শোভিত, যেন শেষ ভগবান্ ॥
চারুসুবিমল, প্রেমে ঢলঢল, অক্ষি কপোল বয়ান।
কন্দর্প গঞ্জন, স্বর্ণ সংহনন, জগদ্বন্ধু বিশ্বপ্রাণ ॥
কনক বরণ, শ্রীবন্ধুমোহন বিস্তৃত শোভন ভাল।
শ্রীমুখ কমল, অতি নিরমল, কক্ষ উরস বিশাল ॥
নব গোরা রায়, বন্ধু মহাকায়, বৃষস্কন্ধ সিংহগ্রীব।
স্কন্ধে গাত্রচ্ছদ, দর্শন শুভদ, রূপে গঞ্জে দেব-শিব ॥
বংশী পরিহাস, মধুর সুভাষ, বিশ্বকল্যাণকারণ।
মুকুতা-নিন্দন, সুন্দর দশন, নাসা গরুড়-লাঞ্ছন ॥
চারু বিম্বাধর, গ্রীবা মনোহর, আজানুমৃণাল কর।
ললিত শ্রবণ, সর্ব্বসুলক্ষণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশধর ॥
চারিহস্ত দীর্ঘ তনু ভুরু জিনে কামধনু,
আয়ত লোচন মরি তায়।
দীর্ঘ সূক্ষ্ম কৃষ্ণ কেশ পূর্ণ চিহ্ন পূর্ণ বেশ,
রম্যমালা বক্ষে শোভা পায় ॥
গাত্রচ্ছদ ভেদি রূপ তমঃ বিনাশয়।
পুণ্য পূত অঙ্গ গন্ধে চিত্ত কাড়ি লয় ॥
বন্ধু-রূপ-নাম-প্রেমে বিশ্বে জয় জয়।
তাপদগ্ধ মোহমুগ্ধ নিত্য দূরে রয় ॥

———

আত্মপ্রকাশের সূচনা ও ভক্তানন্দদান

বন্ধুসুন্দরের প্রিয়গণ পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার অন্তর্য্যামিত্ব, ত্রিকালদর্শিত্ব ও বিবিধ বিষয়ে অনন্যসাধারণ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন। কৈশোরে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু একদিন চম্পটী মহাশয়ের নিকট তৎসম্পর্কিত একটি বহু পূর্ব্বের গুপ্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি পরম বিস্মিত হইয়া পড়েন। একদিন কিশোরবন্ধুর মুখে, "Money is the most sensitive part of human skin."—এই সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত ইংরাজী কথা শুনিয়া তিনটি বিষয়ে অনার্স গ্রাজুয়েট্ ও হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার চম্পটী মহাশয় অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

বাস্তবিক সাধারণ মানব অর্থের যত দাস, এরূপ আর কাহারও নহে। টাকা যেন জীবনাধিক দ্রব্য। মানুষ মুখে ভক্তি প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ ভক্তিভাজন পাত্র দায়ে পড়িয়া টাকা চাহিলে তখন তাহার ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রভুবন্ধু বিদ্যার্জ্জনে সকল বালক-যুবককেই উৎসাহ দিতেন এবং চাকরী বাকরী অপেক্ষা চাষবাসকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিতেন। ঐরূপ অল্প বয়সেই একদিন চম্পটী ঠাকুরকে প্রভু বলিয়াছিলেন—"লোকে চাক্‌রী বাক্‌রী ছেড়ে চাষবাস করুক। দেশে প্রচুর শস্য হ'ক। সুখে স্বচ্ছন্দে খা'ক, আর হরিনাম করুক। ইহারই নাম স্বাধীনতা।" স্বাধীনতা শব্দটী বলিবার সময় তিনি শয়ন-অবস্থা হইতে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়াছিলেন।

মৌনের পূর্ব্বে প্রভু বন্ধু যে সকল ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, সে সকল প্রায় কার্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি ট্রামগাড়ী প্রচলনের পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "কলিকাতায় ইলেকট্রিসিটি গড়িয়ে যাবে", "ভারত স্বাধীন হবে', 'দিল্লি রাজধানী হবে', 'ফোর্টউইলিয়ম করায়ত্ত', 'স্কুল-কলেজ কোতোয়ালী। জেল, ক্ষেম, ক্ষমা।"

গ্রেটওয়ার, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, বন্ধুহরির ভবিষ্যদ্‌বাণীতে ভাবী মহাযুদ্ধের কথা, খণ্ডপ্রলয়, বর্ণবিদ্বেষ, প্লেনে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও দুর্ভিক্ষের কথা আছে। প্রভু বন্ধুর বাণী ঃ

"প্রলয়মেঘ, প্রলয় ঝটিকা পশ্চিমাকাশে, দশদিকে। হিংসানল পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। মারামারি, কাটাকাটি রক্তপাতে ধরা ভেসে যাবে। নীলাকাশ ধূম্রাকার হবে।....না খেয়ে মরতে বসবে, তখন নাম নিবে, তখন হরিপুরুষ চিনবে। সংকর্ষণ রক্ষা করবে।" এবার প্রলয়াঘাতে নাকের জল চোখের জলে এক না হ'লে হা অন্ন হা অন্ন না করলে ত কেউ হরিনাম করবে না!" মানুষকে হরিনাম বিমুখ দেখিয়া প্রভু ভাবী দুর্দিনের কথা বলেন।

রসিকশেখর বন্ধু বিবিধ সাজসজ্জা করিয়া অনেক সময়ে প্রিয়জনদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাতিবন্দ গ্রামে লাহিড়ীদের বিরাট বাড়ীতে একবার দুর্গাপুজার সময় মহাষ্টমীর দিনে বিবিধ অলঙ্কার ও উত্তম শাড়ী পরিধান করিয়া বন্ধুসুন্দর শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তখন কেহই তাঁহাকে জগদ্বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারে নাই। সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী জ্ঞানে সকলে ভক্তি-প্রণতি নিবেদন করিয়াছিলেন।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্বভাবতঃ জ্যোতির্ম্ময়। ঐ জন্য প্রকাশ্যে

লোকসংঘট্টে সাধারণতঃ চলাফেরা করিতেন না। উষাকালে নির্জ্জনে স্নানাদি সমাপন করিতেন। ভাগ্যবান্ কেহ কেহ কোন কোন দিন জলে নিমজ্জিত বন্ধুর হেমকান্তি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় দিব্যজ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতে দেখিয়াছেন।

প্রভুবন্ধু সময় সময় নানা রঙ্গলীলা করিয়া প্রিয়গণকে হাস্যরসে ডুবাইতেন। বিবাহান্তে তাঁহার জেঠতুত ভ্রাতৃবধূদ্বয় ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে যেদিন আসেন, সেদিন দেবীমা দাদাদের বউদের প্রণাম করিতে বলিলে জগদ্বন্ধু একখানি বাঁশের চটা লইয়া তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া অভিনব অভিবাদন জানান। বধূদ্বয় স্বতন্ত্র পুরুষের স্বাতন্ত্র্যে পরম আহ্লাদিত হইয়া হাসিতে থাকেন। বড় বধূকে বন্ধু "অধিকারী ভায়া" ও ছোট বধূকে "বাগচি ভায়া" বলিয়া ডাকিতেন।

একবার কলিকাতা গ্রাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে 'বিল্ব-মঙ্গল' অভিনয় চলিবার সময় তরুণবয়স্ক বন্ধুসুন্দর চম্পটী মহাশয়কে লইয়া প্রথম শ্রেণীর সংরক্ষিত আসন স্থলে উপস্থিত হন। অকস্মাৎ তাঁহার অর্দ্ধাবৃত মুখমণ্ডল হইতে গাত্রচ্ছদ সরিয়া যাওয়ায়, ঐস্থান দিব্য জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকবৃন্দ আত্মবিস্মৃত, বিস্ময় বিমুগ্ধ ও নির্ব্বাক্ হইয়া বন্ধুসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ ও সত্ত্বময়ী দীপ্তির দিকে তাকাইয়া থাকেন। রঙ্গমঞ্চের এই বিপর্য্যয়-ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রভুবন্ধু শ্রীবদনমণ্ডল আবৃত করেন ও মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ স্থান হইতে অন্তর্হিত হন। তখন দর্শকগণের অনেকে, তিনি 'কোথায় গেলেন' বলিতে বলিতে বাহির হইয়া পড়েন। ঐ অবস্থায় অভিনয়

করিবার ও দেখিবার স্পৃহা ও মনোবৃত্তি, উভয়তঃ না থাকায় সেদিন ঐ পর্য্যন্ত হইয়াই অভিনয় বন্ধ থাকে।

দেবীমা'র মুখে শুনিয়াছি, জগদ্বন্ধু একবার ব্রাহ্মণকান্দায় পেটে ধামা বাঁধিয়া তদুপরি ঝুলান আলখেল্লা পরিয়া ডিপুটি সাজিয়াছিলেন। রঙ্গলালের মধুর রঙ্গে বাটীতে উপস্থিত প্রিয় ভক্তগণ আনন্দে হাসিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

বিভিন্ন দেশের লোকের ভাষা ও বুলি অনুকরণ করিয়া প্রভু মধুর ভঙ্গীসহ যখন কথা বলিতেন, তখন ভক্তগণের মধ্যে আনন্দ-হাস্যরোল উঠিত। আনন্দে হাসিতে হাসিতে তাঁহারা হরিবোল হরিবোল বলিতেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় দেবীমা একদিন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তুলসী-তলা দিয়া যাওয়া কালে জগদ্বন্ধুর চরণে তুলসীর ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া এড়াইবার জন্য বন্ধু সরিয়া সরিয়া যাইতেছেন, তুলসী-ছায়াও সরিয়া সরিয়া তাঁহারই চরণে লুটাইতেছে। অপর একদিন অপরাহ্নে দেবীমা দেখিয়াছিলেন, জগদ্বন্ধুর শ্রীমস্তক হইতে একটি জ্যোতিঃশিখা বাহির হইয়া সূর্য্যরশ্মির সহিত মিশিয়া কেমন একটি নীল সবুজ আলো রেখা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপ ছোট বড় অলৌকিক ঘটনা প্রায়শঃ ঘটিত। বাহুল্যভয়ে আর অধিক লিখিলাম না। জয় জগদ্বন্ধু হরি ॥

শ্রীশ্রীবন্ধুমাধুর্য্যস্মরণ-বন্দনাষ্টকম্

সনৃত্যং চলন্তং সুমন্দং হসন্তং
হিতপ্রেষ্ঠসন্তং সুবাণীং বদন্তম্ ।
সুগৌরাঙ্গরূপং মহারাস-ভূপং
কুধী-ন্যস্তকোপং ভজে বন্ধুগোপম্ ॥

হৃতজ্যাকভারং মহানামকারং
সুধীকণ্ঠহারং সুলাবণ্যসারম্ ।
সুরাজ্ঞেয়শেষং ভজে রম্যবেশং
স্বভূ-কৃষ্ণকেশং মখেশং মহেশম্ ॥ ২

নন্দকহ্লাদনং শ্রীশচীতোষণং
দীননাথাঞ্জনং ভক্তসঞ্জীবনম্ ।
চন্দনৈশ্চর্চিতং দৈবতৈরর্চিতং
স্তৌমি তং গোহিতং রাধিকাবাঞ্ছিতম্ ॥ ৩

নামভিস্তোষিতং সাত্ত্বিকৈর্ভূষিতং
মাধুরীমণ্ডিতং গ্রন্থনে পণ্ডিতম্ ।
কীর্ত্তনৈস্তর্ষিতং নর্ত্তনৈর্হর্ষিতং
নৌমি ভূপাবনং তং মহোদ্ধারণম্ ॥ ৪

ণ ১, ২, 'ভুজঙ্গপ্রয়াতং' চতুর্ভির্যকারৈঃ (১২) ৩, ৪, ৫, স্রগ্বিণী রাঃ (১২) '৬, ৭, ৮, জসৌ জসযুতৌ জলোদ্ধতগতিঃ (১২)

সেবিনাং প্রেমদো যোগিনাং ক্ষেমদো
বাসনাবারকো মারভী-হারকঃ।
কর্ম্মিণাং তারকো বর্ণিনাং চারকঃ
পাতু নঃ পালকো বন্ধুগৌরাঙ্গকঃ॥ ৫

মৃদঙ্গকুশলং স্বগীতি-সবলং
স্বভাব-সরলং কুমার-বিমলম্।
মনোজশমনং গজেন্দ্রগমনং
প্রপন্নশরণং ভজে সুনয়নম্॥ ৬

অযোনিজননং স্বজাত-করণং
কৃতান্তদমনং কুভাব-লবনম্।
সরোজচরণং ভবাব্ধিতরণং
বিপত্তিহরণং ভজে সুবদনম্॥ ৭

সুকান্তসদয়ং প্রশান্তহৃদয়ং
রসামৃতময়ং শরণ্যমভয়ম্।
সুগৌরবরণং মনোজ্ঞকমনং
মহেন্দ্ররমণং ভজে প্রভুধনম্॥ ৮

শ্রীরূপাদি-গুরুভ্যো মে গ্রন্থন-জ্ঞান-শিক্ষণম্।
স্মরণাদ্ব্যপহারেণ গুরু-নিষ্কৃতদক্ষিণম্॥
সেবক-গীত-মাধুর্য্য-মণ্ডিতং বন্দনাষ্টকম্।
সভক্তিগান-পাঠাভ্যাং বন্ধুতোষণ-কারকম্॥

ইতি আদিলীলা

মধ্যলীলা

দিব্য আকর্ষণ। ব্রহ্মচর্য্য-হরিনামদান।

বিদ্যালয়ে পাঠত্যাগের পর শ্রীশ্রীপ্রভু পাবনা, ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, ডাহাপাড়া, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেন। তিনি ব্রাহ্মণকান্দা আসিয়া ক্রমে নানা সংকীর্তন সম্প্রদায় গঠন করেন ও ছাত্র যুবকগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দান করিতে থাকেন।

বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী বকু বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্বাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, প্রভুর শিক্ষায় ও কৃপায় তিনি গ্রাজুয়েট্, মুন্সেফ্, সবজজ্ ও জজ্ হইয়াছিলেন। প্রভুর উপদেশ মত ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনকে উন্নত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তাঁহার জীবনের সমৃদ্ধি, শ্রেয়, কল্যাণ সমস্তই জগদ্বন্ধুর দান। বালকোচিত সারল্য বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে ও উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে!

বাল্যসহপাঠী রমেশচন্দ্র ৪।১ ছকুখানসামা লেনে বকুলালের মেসে যাইয়া সহাধ্যায়ী বন্ধুকে নূতন ভাবে দর্শন করেন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন। তাহাতে তাঁহার জীবনধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বন্ধুর ললাটদেশ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল, তদ্দর্শনে রমেশচন্দ্রের অন্তর বাহির উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিয়াছিল। ললাটস্থ ঐ জ্যোতিকে প্রভু "চন্দ্রভাল" বলিয়াছেন। শুনিয়াছি, ঐ জ্যোতি অনেক ভাগ্যবান্ দর্শন করিয়াছেন। বন্ধুকথা গ্রন্থের লেখক সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মণকান্দায়, হরিদাস মোহান্ত ফরিদপুর চাঁদমারিতে, গৌরকিশোর সাহা মহাশয় শ্রীঅঙ্গনে ঐরূপ জ্যোতি দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হরিসভার শিতিকণ্ঠ মহাশয় একদিন সন্ধ্যায় শ্মশানে জ্যোতিশিখা দেখিয়া অগ্রসর হইয়া প্রভুর দর্শন পান। বাকচরের ভক্ত ক্ষুদীরাম আদি কেহ কেহ রাজাপুরের শ্মশানে, কেহ কেহ রাত্রিকালে নির্জ্জন মাঠে বন্ধুর ঐ দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করেন। রামদাস বাবাজী বৃন্দাবনে যমুনার ঘাটে ও বাকচরে কাবেরী নদীতে ঐ জ্যোতি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রভু এক সময় কতিপয় ভক্তকে বলিয়াছিলেন,—

"জানিস্, আমি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সঙ্গে বর্ত্তমান সাড়ে তিন মণ ওজন নিয়ে, অশোক পুষ্পের কুঁড়ির অগ্রভাগের আভা নিয়ে জন্মেছি। কপালে যে রাজটীকা, উহা রাকা শশী, চন্দ্রভাল, নীল স্বভাব-জ্যোতি। চন্দ্রের জ্যোৎস্না নিয়ে জন্ম, তাই চন্দ্রপুত্র। মুন্‌লাইটের দেহ, সময়ে বাড়ে ও কমে।"

রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, পাঠ্যজীবনে তিনি প্রসিদ্ধ "বাবু" ছিলেন। প্রভুর কৃপায় তাঁহার ভোগবিলাস-বর্জ্জিত চিরকুমার জীবন হয়। ঐ দিন মেসে প্রভুবন্ধু তাঁহাকে কতিপয় ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম উপদেশ করেন। রমেশচন্দ্র উহা লিখিয়া লন ও জীবন ভরিয়া পালন করেন। প্রথম দিনই নিজ মেসে ফিরিয়া আসিয়া সকল বিলাসিতার দ্রব্যাদি বিলাইয়া দিয়া কম্বল কুশাসন সার করেন।

প্রভুবন্ধু কখনও কখনও ব্রাহ্মণকান্দায় বাঁশবনের ফাঁকা স্থানে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রমেশচন্দ্রের প্রতি জ্ঞানবৈরাগ্যের উপদেশ দান করেন। গৃহের অভিভাবকগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রমেশচন্দ্র গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, প্রভু নিষেধ করেন। পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে প্রভু—বলেন —"নিজমাতার অনুমতি লইয়া যাইতে পার।"

একবার প্রভু শ্রীধামবৃন্দাবন যাইবার পর রমেশচন্দ্র বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা লইয়া প্রভুর নিকট চলিয়া যান। তাঁহার দাদা জ্যোতিষ বাবু কয়েকদিন পর অনুজের অনুসন্ধানে সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। প্রত্যাবর্ত্তনে একান্ত অনিচ্ছুক রমেশচন্দ্রকে অনেক বুঝাইয়া প্রভু আদেশ করেন—"বাংলায় ফিরিয়া যাও, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, করাও। বিবাহ করিও না, মাষ্টারী কর। ইহাই আমার কাজ।"

প্রভুর কাজ হইবে মনে করিয়া রমেশচন্দ্র তখন রাজী হইলেন। প্রভু আশ্বাস দিলেন, "আমি তোমাকে সততই রক্ষা করিব, চিন্তা নাই।"

পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ Band of Hope (ব্যাণ্ড অব হোপ্) ইত্যাদি লইয়া উৎসাহী হইয়াছিলেন। প্রভুর করুণালাভের পর তিনি পাঠ্য উপদেশের সহিত ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দিতেন ও অবসরকালে তাহাদের লইয়া কীর্ত্তন করিতেন। ইহাতে ছাত্রগণের অভিভাবকগণ রমেশচন্দ্রের ঘোর বিরোধী হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন। তিনি তেজস্বী অথচ ধীর বিনয়ী ছিলেন।

রমেশচন্দ্র প্রথমে ফরিদপুর ঈশান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শেষে ঢাকার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ঢাকায় প্যারীমোহন সেন, সুধন্ব সরকার, রাধাবল্লভ বসাক, উপেন্দ্র সেন, পূর্ণ ঘোষ, লোকনাথ প্রমুখ ভক্তগণ রমেশবাবুর আনুগত্যে প্রভু-বন্ধুর কৃপা প্রাপ্ত হন। রমেশচন্দ্র "ব্রহ্মচর্য্য" নামক গ্রন্থ লিখিয়া বাংলায়, হিন্দীতে ও ইংরাজীতে প্রচার করেন। শতশত বালক ও যুবক তাঁহার প্রচারের ফলে সত্যপথের দিকে অগ্রসর হয়। রমেশচন্দ্র নিজেকে "বিদ্যার্থি-সেবক" বলিয়া লিখিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে ছাত্রদের এমন সুহৃদ্ আর কেহ ছিলেন না। ঐ সময় ভারতের স্বাধীনতা-কামী দেশপ্রেমী যুবকদল বিপ্লবী নামে খ্যাত ছিল। রমেশচন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্য-গ্রন্থ তাহাদের পথের বর্ত্তিকা-স্বরূপ ছিল। শত শত বিপ্লবী যুবক তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিত ও চিঠিপত্রাদি দ্বারা উপদেশ-প্রার্থী হইত। এই হেতু দুই তিনবার রমেশচন্দ্রের গৃহে পুলিশ হানা দিয়া প্রভু-লিখিত চিঠিপত্রাদি লইয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। ঐ সঙ্গে প্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত অনেক মূল্যবান্ উপদেশ ও পত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রভুর কৃপায় রমেশচন্দ্র মহাসাধক হইয়াছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি জাতির ও ছাত্রদের কল্যাণ-চিন্তা করিয়াছেন। তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। শেষবার পুলিশের অনুসন্ধানকালে তাঁর গৃহে উপদেশপ্রার্থী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পত্র পাওয়া গিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র নিজেও সময় সময় রমেশচন্দ্রের নিকট আসিতেন।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের দশ বৎসর পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র

বস্ত্রযজ্ঞ-সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিয়া দেশবাসীকে চরকার প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, গান্ধী মহারাজও ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে কতিপয় পত্র লিখিয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, দেহান্তকালে দুইদিন নাড়ীর স্পন্দন ও বক্ষের স্পন্দন-রহিত অবস্থায় তিনি অবিরাম বন্ধুকথা ও বন্ধুনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ সময় প্রভু দিব্যরূপে ভক্তকে দেখা দেন। দেহরক্ষার পর ভক্তের ঐ দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল। অপ্রাকৃত বন্ধুর ভজনে ভক্তদেহও অপ্রাকৃত হইয়াছিল। বন্ধু রমেশচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। আমার বন্ধুভজনে অন্যতম আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র এই জীবাধম লেখককে অগাধ স্নেহ করিতেন, আমার অসুস্থ অবস্থায় বহুদিন নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া মাতৃবৎ সেবা করিয়াছেন। স্নেহবশতঃ তিনি প্রভুর প্রসাদী করতাল ও নামাবলী আমাকে দান করিয়াছিলেন, কত বন্ধুলীলা-কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

অতি প্রিয় রমেশকে বন্ধুহরি বিভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন—

"তুমি প্রতিদিন দুইখানি করিয়া পত্র আমাকে লিখিও। ঐ পত্রে তোমার সমগ্র প্রশ্ন থাকিবে।"

"ধরে বেঁধে হরিভক্তি।" "এই ভার তোমার মস্তকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকলাম।" "এই মেলা হইতে তিন জোড়া খোল ও ছয় জোড়া করতাল নিজ বাসায় নিজ ঘরে নিজের করিয়া রাখিবে।" "ফকিরের রচনা ভিন্ন অন্য গান করিও না। নিত্য চিরদিন।" "শব্দে-সংকর্ষণ শক্তি।" "আমার কথা বদল কোরো না।" "রমা,

তুমি বন্ধুর সত্য প্রতিনিধি।" "ভাই রাজা লোক, তোমার পোষা শুক পাখী, সত্য জেন। তুমি আমার অভিভাবক, অন্য নয়।" ধন্য ভক্ত! ধন্য ভক্তের প্রাণারাম প্রভু!!

ব্রাহ্মণকান্দার পূর্ব্বপ্রান্তবাসী হরিমোহন দাস ঘোর হরিনাম-বিরোধী ছিলেন। একদিন মধ্যরাত্রে ব্রাহ্মণকান্দা ভবনে লীলারঙ্গময় বন্ধুকিশোর ভক্ত নবদ্বীপ দ্বারা তথায় অবস্থিত অন্যান্য ভক্তকে ডাকিয়া আনেন এবং মৃতের অভিনয়ে এক খাটিয়ায় শয়ন করেন। অতঃপর ভক্তগণ প্রভুর ইঙ্গিত মত প্রভুকে কাঁধে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ও মাঝে মাঝে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে হরিমোহন দাসের বাটীর উঠানে যাইয়া খাটিয়া সহ প্রভুকে নামাইয়া রাখেন। প্রভুর পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারে হরবোলা নারায়ণ দাস বৈরাগী "বাবা রে বাবা! বাবা আমার কোথায় গেলি রে!" বলিয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে থাকেন। কে মারা গেল, এই সন্ধানে বহু লোক-সঙ্ঘট্ট হইল। ক্রমে হরিমোহন দাসও সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুর পূর্বশিক্ষামত তাঁহার রচিত,—

"ভুলে মর্ম্ম একি কর্ম্ম, ও মন তরবি রে কোন্ বলে।
ত্যজি সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান কর্ম্ম কুসঙ্গেতে মজে র'লে।"

এই কীর্ত্তনটি আরম্ভ হইল। হরিমোহনের অন্তর হইতে তখন প্রভুর কৃপায় হরিনাম-বিদ্বেষ দূর হইয়া হরিনামে রুচি জন্মিয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনের শেষ পঙ্‌ক্তি,—

"মায়া মোহ ভুলে, বাহু তুলে, নাচ সদা হরি বলে"—

যখন গাওয়া হইতেছিল, তখন হরিমোহন হরিনামে মত্ত হইয়া

পড়িয়াছেন, বাড়ীতে তখন মহানন্দে ঘন ঘন উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনি হইতেছিল। এইরূপ রঙ্গলীলার মধ্যে মহাউদ্ধারণ কার্য্য করিয়া ভক্তকীর্ত্তনদলসহ প্রভু ব্রাহ্মণকান্দা-ভবনে ফিরিয়া আসেন।

কীর্ত্তনের পর তামাক খাইবার ইচ্ছা করিয়া একদিন বাকচরের এক গৃহী ভক্ত প্রভুর সম্মুখে 'তামাক সাজ' বলিতে না পারিয়া পূর্ব্ব অভ্যাসমত তামাক সাজিবার সংকেত করিয়া অন্য একজন ভক্তকে "পাগরী বাঁধ" বলিলে, রসিকশেখর বন্ধু মন্দির হইতে বলিয়া উঠেন, "কাপড় নাই।"*

অতঃপর তামাক সাজিতে যাইয়া ভক্ত দেখেন, তামাক নাই। তখন ভক্ত বুঝিলেন, সর্ব্বদর্শী প্রভু দূরে থাকিয়াও সব দেখিতে পান। তামাক নাই অর্থ বুঝাইতে তিনি রহস্য করিয়া পাগড়ী বাঁধার "কাপড় নাই" বলিয়াছেন। ভক্তপ্রাণানন্দ বন্ধু হরিনামের মধ্যেই এইরূপ নানারসময় বাক্যে ও লীলারঙ্গে ভক্ত-সুখ বৃদ্ধি করিয়া সকলকে হরিনামের প্রেমসিন্ধুতে ভাসাইতেন। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

* 'পাগরী বাঁধ' প্রসঙ্গটি ভক্তবর শিক্ষক প্রবোধ চন্দ্র পাল মজুমদার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

"সংকীর্ত্তন উদ্ধারণ"

'ভক্ত্যপহৃতমশ্নামি'

শেষ মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে স্থিতিকালে প্রভুবন্ধু সাধারণতঃ রমেশবাবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। একবার ঢাকা হইতে ফরিদপুর-গমনেচ্ছু প্রভু নারায়ণগঞ্জগামী ট্রেনের এক প্রথম শ্রেণীর কক্ষে বসিয়াছিলেন, তখন উষাকাল, ভক্তগণ তৃতীয় শ্রেণীর এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া প্রাণের আবেগে প্রভাতি কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন। ট্রেন কিছুদূর যাইবার পর হঠাৎ নিশ্চল গতিহীন হইয়া পড়িল। সন্ধানে জানা গেল, ইঞ্জিনের কলকব্জা কিছুই বিকল হয় নাই। রমেশবাবু প্রভুকে এই কথা জানাইলে, প্রভু তখন কীর্তন বন্ধ রাখিতে বলেন। ট্রেন বন্ধ হইবার কারণ বন্ধু জানাইয়া দেন যে, "ইঞ্জিন হইতে উৎপন্ন গ্যাসের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আত্মাসমূহ হরিনাম-কীর্তনে উদ্ধার হইয়া যাওয়াতে, গ্যাসে (বাষ্পে) কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তাই গাড়ী চলিতেছে না।" অতঃপর প্রভু বলেন—

"গ্যাস জড় পদার্থ নহে, আত্মার সমষ্টি।"

প্রভুর আদেশ মত কীর্ত্তন বন্ধ করা হইলে, ট্রেন স্বাভাবিক ভাবে চলিতে থাকে।

ট্রেনে ত আরও কত সময় কীর্ত্তন হয়, ট্রেনের গতি ত তা'তে রুদ্ধ হয় না। সেদিন সাক্ষাৎ বন্ধুহরির উপস্থিতি ও ইচ্ছাতেই

হরিনাম স্বতঃস্ফূর্ত্ত হন, হরিনামে শক্তি প্রকাশ পাওয়ায় ঐ ঘটনা ঘটে এবং প্রভু ঐ অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা বলেন।

সেদিন রমেশবাবু নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে যাইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসেন। ঢাকায় মেসে বাসকারী বন্ধুপ্রিয় পূর্ণ ঘোষ উক্তদিবস প্রভুর ফরিদপুরে রওনা হইয়া যাইবার বার্ত্তা পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারেন নাই। তাই তিনি পূর্ব্ব অভ্যাস মত কিছু সেবার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া অপরাহ্ণে প্রভুদর্শনে আসেন ও রমেশবাবুর হাতে ঐ সেবার দ্রব্য দেন। প্রিয়ভক্তকে না জানাইয়া প্রভু চলিয়া গিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া ভক্ত পূর্ণ প্রাণে ব্যথা পাইবেন ভাবিয়া রমেশবাবু নীরবে ঐ সেবার দ্রব্য লইয়া প্রভুর স্থিতি মন্দিরে রাখিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। অতঃপর বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে ট্রেনের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিছুক্ষণ পর প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া রমেশবাবু দেখেন, প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগদ্রব্য গৃহীত হইয়াছে; কিছুই অবশিষ্ট নাই। প্রকোষ্ঠ ভক্তগণের পরিচিত, প্রভুর মনোহর দিব্য অঙ্গগন্ধে। বন্ধুহরির বিরহে ক্লিষ্ট পূর্ণবাবুকে মন্দিরে আহ্বান করিয়া রমেশবাবু তাঁহাকে এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখাইলেন। তখন ভক্তদ্বয় ভক্তের আকুলতায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বগ ভক্তব্যথাহর নিত্যবন্ধু প্রভুর সান্নিধ্য সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া পরম বিস্ময়ে ও প্রেমানন্দরসে আপ্লুত হইয়া বহুক্ষণ সর্ব্বান্তর্য্যামি-বন্ধুগুণকথনে মগ্ন রহিলেন ও আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

বাংলা ১৩০৬ সালে একদিন ভক্তবর পূর্ণ দত্ত মহাশয়, "শূন্য থেকো না, সদা স্মরণ বই," "সদা কৃষ্ণ স্মৃতি," প্রভুর এই আদেশ

স্মরণ করিয়া ইষ্টনাম করাঙ্গুলিতে জপ করিতে করিতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গনে যাইতেছিলেন। তিনি জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য গাছ হইতে কয়েকটি পাকা তিত জাম তুলিয়া পকেটে রাখিয়াছিলেন। জপের পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা পূর্ণ হইতেই গণনানুসারে ভক্ত এক একটি জাম অন্য পকেটে রাখিতেছিলেন। সংকল্পিত জপসংখ্যা পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅঙ্গনে পৌছিয়া তিনি প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রভু বন্ধু মন্দির হইতে মধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠেন,

"ঐ গুলা আমায় দাও।"

বন্ধুসুন্দরের মধুর কণ্ঠ ধ্বনিতে চমকিত ও পুলকিত হইয়া ভাগ্যবান্ ভক্ত যখন ভাবিতেছিলেন, প্রভু কি চাহিতেছেন অমনি প্রভু বলিলেন "ঐ যে পকেটে!"

মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। হরিনাম-জপকরা সমস্ত জাম যখন এক পকেট হইতে অন্য পকেটে রাখা হইয়াছে, তখনই সর্ব্বদ্রষ্টা হরিনামের প্রভু ঐ জাম চাহিয়াছেন।

অতঃপর প্রভু দরজা খুলিয়া একটু ফাঁক করিলে, ভক্ত পূর্ণ দত্ত পকেট হইতে ঐ তিত জামগুলি ঐ স্থানে রাখিলেন। কাঙ্গালের ঠাকুর বন্ধু উহা হইতে একটি জাম লইয়া আস্বাদন করিয়া মধুর ভঙ্গীতে বলেন, "বড় মিষ্টি ত! সুন্দর।" হরিনাম-মাখা জাম প্রভুর কাছে বস্তুতঃ বড় মিষ্টি।

দীননাথ বন্ধুহরির এই অযাচিত করুণার কথা, ভক্তবর পূর্ণবাবু একাধিক দিন প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে, অশ্রুসিক্তনয়নে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

বাকচরবাসী ভক্তগণ ও মহাউদ্ধারণ প্রভু

"বাকচর গ্রাম, পুণ্যধাম"

প্রভু ব্রাহ্মণকান্দা হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বাকচর গ্রামে বহুবার গমনাগমন করিয়াছেন। তথায় তিনি প্রথমে কালীবাড়ী মন্দিরে উঠেন। সেদিন ভক্ত নিবারণ সাধু সঙ্গে আসিয়াছিলেন। পরে গোপালমিত্র ও নবদত্ত আলয়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে প্রভু কখনও কখনও থাকিয়াছেন। মহিমদাসজীর বাটীতে প্রভুর প্রথম অঙ্গন স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় অনেকদিন বাস করিয়াছেন। বাংলা ১২৯৬ সনে অগ্রহায়ণ মাসে একদিন প্রভু প্রথমে বাকচর আসেন, এইরূপ শুনা যায়।

বাকচরের বহু ভক্তগৃহে প্রভু গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কীর্ত্তনানন্দে ভাসাইয়াছেন। বাকচরে গোপালমিত্র, মহিমদাস, মদন সাহা, নেচু সাহা, মহীন্দ্র শিকদার, যাদব দত্ত, নব দত্ত, সতীশ, তারক, পূর্ণবিশ্বাস, ক্ষুদীরাম, কেদার, রসিক, কুঞ্জ, বিহারী, প্রহ্লাদ গোপাল, বঙ্কু, কোদাই, শশধর, মতি আদি সমগ্র গ্রামবাসী প্রভুর ভক্ত। ভক্তমাতা, ভক্তপত্নী ও সন্তানগণ সকলেই প্রভুর প্রিয়। তিনি বাকচরে প্রায় প্রতি ভক্তগৃহেই পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রভু-প্রদত্ত অর্থের আনুকূল্যে অনেক ভক্তের পারিবারিক অভাবও মোচন হইয়াছে।

প্রভুর কৃপায় ভক্তগণের মধ্যে মৃদঙ্গবাদন ও সংকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিত হয়। "এস এস নবদ্বীপ রায়" "ভজ

নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ” “কে রে কাঙ্গালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়” “প্রদোষ অম্বর”“ঐ শ্যাম রায়’ ”“ঐ গোরা রায়” “ভাই দিন যায়” ‘জাগ জাগ নগরবাসী’ প্রভৃতি প্রভু-রচিত মধুর কীর্ত্তন-সমূহ ভক্তগণ আনন্দে পুনঃ পুনঃ গাহিতেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দে, চৈত্রমাসে বারুণীস্নানের দিন মহিমদাসজীর অঙ্গনে ভক্তগণ প্রেমানন্দে “কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবন রে” ও পরে “জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে” গাহিতে ছিলেন। ভক্তবর মদন সাহা মহাশয় “আহা কি মধুবর্ষণ হচ্ছে” বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। যখন “রাখ বন্ধুদাসে পদ পাশে কৃপাসঞ্চারে” গাওয়া হইতেছিল, তখন ‘রাঙ্গা চরণ দেখছি” বলিতে বলিতে ভক্তবর মদন বন্ধুহরির সম্মুখেই দেহরক্ষা করেন। সকলে হায় হায় করিল। প্রভু বন্ধুহরি বলিলেন—

“ব্রজের বস্তু, ব্রজে গেল।”

বাকচরে প্রভুর আদেশে বিভিন্ন সময়ে অশ্বত্থ বৃক্ষাদি ঘিরিয়া তুমুল কীর্ত্তন হইত। তাহাতে উদ্ধারপ্রয়াসী কত প্রেতাত্মার উদ্ধার সাধন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণকান্দার তেঁতুলগাছ ঘিরিয়া ঐরূপ কীর্ত্তন হইয়াছে। তাহাতে শাখা আন্দোলন, বৃক্ষ হইতে জল বর্ষণাদি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ কীর্ত্তনে প্রভুর পরম কৃপাপাত্র সারিকা রামদাস বাবাজী উপস্থিত ছিলেন। ঐ কীর্তনের কথা তিনি প্রায়শঃ বলিতেন ও তেঁতুল বৃক্ষটি কেমন আছেন, খোঁজ লইতেন। ঐ বৃক্ষের তেঁতুল অতি মিষ্টাস্বাদযুক্ত ছিল। প্রভুর আদেশে রামদাসজী ব্রাহ্মণকান্দায় পঞ্চবটী বৃক্ষ রোপণ করেন।

১৩০৬ সনে এক নির্মেঘ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ফরিদপুরের কতিপয় বালকভক্ত প্রভুর নির্দ্দেশ মত রাজবাড়ীগামী পথের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে অবস্থিত এক বাবলা গাছ ঘিরিয়া তন্ময়ভাবে করতালি দিয়া কতকক্ষণ হরিনাম কীর্তন করেন। তাহাতে বারিবর্ষণ ও প্রবলবেগে শাখা-আন্দোলন হইতে থাকে। অতঃপর ডালভাঙ্গার মত মড়্ মড়্ শব্দে ভীত হইয়া বালকগণ কিছুদূরে সমাসীন প্রভুর নিকট ছুটিয়া আসেন। প্রভু তাঁহাদিগকে বলেন,—"গান বন্ধ না করলে একটি মহাত্মার দর্শন পেতি।···তোদের মুখে নাম শুনে মুক্ত হলেন।···"

একদিন ভক্ত নেচু সাহার বাকচর গৃহ-প্রাঙ্গণে মহাকীর্তনানন্দ হইতেছিল। প্রভু মহাভাবাবেশে তাঁহার অবস্থিতি-গৃহের বেড়ার উপর পড়িয়া যান, বেড়া পড়িয়া যাওয়ায় প্রভু সবেগে কীর্তন মধ্যে ছিটকাইয়া পড়েন ও পদ্মাসন বদ্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ কীর্তন মধ্যে লুটাইতে থাকেন। গৃহপার্শ্বস্থ একটি বৃক্ষ ঐ সময় কিছুটা আনত হইয়া শাখা দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া প্রণতি জানাইয়াছিল ও তাহার একটি বড় শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কীর্তনস্থলের ধূলি সুগন্ধময় হইয়াছিল।

বাকচরে ১৩০৪ সালে কয়েকমাস অনাবৃষ্টির দরুণ শস্যের ক্ষতি হয়। ভক্তগণের আকুলতায় বন্ধুহরি একদিন তাঁহার স্বরচিত "গদাধর কাদম্বিনী অদ্বৈত অম্বরে" সংকীর্তনটি ভক্তগণকে খোল-করতালে আবিষ্টচিত্তে একাগ্রভাবে গাহিতে বলেন। কিছুক্ষণ ঐ সংকীর্তন চলিবার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। চারিদিক্ জলময় হইয়া পড়ে। সেইদিন ভক্তগণ

আঙ্গিনায় সমবেত হইয়া মহানন্দে মহোৎসবও করেন।

বাকচরে হিমি, ললিতা, সদি, কাদি, বিনোদী প্রভৃতি ছোট ছোট মেয়েরা স্বভাব-সরলভাবে আসিয়া "পিরভু লুট দেন" বলিয়া লুট চাহিত। প্রভু মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি ছড়াইয়া দিতেন।

একদিন "হিমি, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে" বলিয়া প্রভু বহিরঙ্গনে আসিলে, ভক্তগণ মহানন্দে "হরিবোল হরিবোল" বলিতে থাকেন এবং নিজেরাই পুরোহিত প্রভৃতি সাজিয়া বিবাহ-পর্ব্বের অভিনয় করেন। কিছুক্ষণ খেলিয়া অরূপ রূপের দর্শন দিয়া সকলকে আনন্দে ভাসাইয়া প্রভু একক মন্দিরে প্রবেশ করেন। এ খেলা বাকচর আঙ্গিনায় হয়।

ভক্তগণের আগ্রহে ও প্রভুর ইচ্ছায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কাবেরী তীরে প্রভুর বাসের জন্য ১৩০০ বঙ্গাব্দে বাকচর শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভু স্বয়ং এখানে পঞ্চবটী স্থাপন করেন। ভক্তগণ তখন 'জয় রাধে জয় রাধে' ধ্বনি দিতে থাকেন।

ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল প্রায় সর্ব্বদাই অঙ্গনে পড়িয়া থাকিত। তাহাদের মন প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। ললিতা নাম্নী একটি ছোট্ট মেয়েকে প্রভু প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, "ললিতে, সেই গানটা গা'ত!" অমনি সঙ্গিনীগণ সহ ললিতা মধুর কণ্ঠে গাহিত,—

"মেঘের কোলে চাঁদের আলো দেখে নয়ন ভুলে র'ল।
তোরা আয়লো সখি, দেখে আসি প্রাণকৃষ্ণ কোথা র'ল॥"

গানটিতে বন্ধু বড় সুখ পাইতেন। পরবর্ত্তী কালে হিমি, ললিতা আদি দিদিদের দর্শন করার ভাগ্য পেয়েছি।

বাকচরে মিত্র মহাশয় একবার প্রভুর সেবার জন্য বাড়ীতে কয়েকখানি আমসত্ত্ব প্রস্তুত করান। মিত্রপত্নী উহা হইতে ছয়খানি আমসত্ত্ব লুকাইয়া রাখেন। মিত্র মহাশয় উহা জানিতেন না। তিনি অবশিষ্টগুলি প্রভুকে দিলে, প্রভু বলেন, "অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী, অর্দ্ধেক গুরুগুষ্টি। নারে না, সবই মা ষষ্ঠী। জেঠা ভাল, জেঠী বড় কষা।" জেঠা ঐ কথার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু হাসিয়া বলেন, "এখনও ছয়খানা আমসত্ত্ব ঘরে আছে।" মিত্রজী বাসায় যাইয়া অনুসন্ধানে জানিলেন, সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভুর কথা সত্য। জেঠা তখন পরীক্ষার জন্য কৌতুক করিয়া চারিখানি লুকাইয়া রাখিয়া, আর দু'খানাকে ছয়খানা বানাইয়া প্রভুর নিকট লইয়া গেলে প্রভু হাসিতে হাসিতে ভক্তের চতুরতা প্রকাশ করিয়া দেন।

একবার বাকচরে ভীষণ কলেরা মহামারী দেখা দেয়। সেবার মহিমদাসজীর অঙ্গনে প্রভুবন্ধুর অবস্থান কালে, ভক্ত তারক ও পূর্ণের কলেরা হয়। বন্ধুহরি মহিমসহ গভীর রাত্রে স্নানে যাইবার কালে এক অপূর্ব্ব সংহারিণী শক্তি নগ্নমূর্ত্তিতে কালীমন্দিরে থাকিয়া অট্টহাস্য করিতেছিলেন। প্রভু মহিমের দ্বারা প্রশ্ন করাইলে, সেই মূর্ত্তি বলেন, আমি ন্যাংটা। তিনি সাতদিন না খাইয়া আছেন, জানাইলে, প্রভুর আদেশ মত মহিমদাস বড় কলার পাতায় তাঁহাকে জলদেওয়া ভাত, ডাল, খই ইত্যাদি একঘট জলসহ খাইতে দেন। ন্যাংটা নিজমাথার উপর "শান্তি শান্তি" বলিয়া ঘট ঘুরাইতে থাকিলে খাদ্যসকল অদৃশ্য হইয়া যায়।

মহিমদাসজীর মুখে শুনিয়াছি, তারক ও পূর্ণের বংশে ব্রহ্মশাপ ছিল। তাঁহার কথায় বুঝা যায়, সাতদিন পূর্ব্বে তারক ও পূর্ণের আয়ু শেষ হইয়াছিল ; প্রভুর কৃপায় তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন মাত্র। প্রভু তারকের জন্য ভক্তগণের কাছে পরমায়ু চাহিলেন। ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত চম্পটী ঠাকুর তাঁহার আয়ু হইতে পাঁচ বৎসর আয়ু তারককে দান করেন। ফলে তারক বাঁচেন। পূর্ণ দেহরক্ষা করেন। প্রভু পূর্ণের দেহে ভক্তদ্বারা হরেকৃষ্ণ নাম লিখাইয়া দেন ও তাঁহার মস্তক পাদপদ্ম দ্বারা স্পর্শ করেন।

তারক সুস্থ হইলে প্রভু তাঁহার মাতাকে তারকসহ নবদ্বীপ যাইয়া বাস করিতে বলেন এবং মায়িক সংসারে থাকিলে পাঁচ বৎসর পরই তারকের মৃত্যু হইবে বলিয়া দেন। তারকের মাতা প্রভুর সতর্ক-বাণী উপেক্ষা করেন। ফলে ঠিক পাঁচ বৎসর পর তারক দেহত্যাগ করিয়া নিত্যলোকে গমন করেন।

নড়াইল ষ্টেটের প্রতাপশালী নায়েব শ্রীচারু ঘোষ একদিন বৈষ্ণবোচিত বেশ ধরিয়া প্রভুর জন্য নানাবিধ সেবার দ্রব্য ভৃত্য দ্বারা বহন করাইয়া বাকচর অঙ্গনে উপস্থিত হন ও প্রভুর দর্শন প্রার্থনা করেন। প্রভুবন্ধু ভক্ত-মাধ্যমে ঐ সকল দ্রব্য সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে বলায় ও নায়েববাবুকে প্রভু দর্শন না দেওয়ায়, নায়েববাবুর বাহ্যভক্তি ভীষণ ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। তিনি প্রভুর ভক্তদের জানাইয়া দেন যে, বাকচরের আঙ্গিনা উঠাইয়া দিয়া প্রভুকে ভিটাছাড়া করিবেন। সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভু আঙ্গিনার জন্য ব্যস্ত না হইয়া অদূর ভবিষ্যতে নায়েববাবুর শোচনীয় মৃত্যুর কথা জানাইয়া উদ্বেগ প্রকাশ

করেন। ইহার কিছুদিন পরেই তেলিহাটি পরগণায় শত্রুগণ কর্ত্তৃক অতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হইয়া উক্ত নায়েববাবুর শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

একবার চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কীর্তনের দলসহ প্রভুকে কোলা উদয়পুর নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লন। প্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐখানে বিষমিশ্রিত পায়স দেওয়া হইয়াছিল। জানা সত্ত্বেও প্রভুবন্ধু তাহা হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করেন। সেদিন মহোৎসবের সমস্ত রান্না নষ্ট হইয়া যায়। মহিমদাসজী প্রভুকে প্রদত্ত পায়সের উপর রাশি রাশি মৃত পিপীলিকা দেখেন। ভক্তসহ প্রভু অলক্ষ্যে পথে বাহির হন। তিনি "জ্বলে গেল" বলিতেছিলেন। অতঃপর পথিপার্শ্বে এক জলাশয়ে স্নান ও ভক্ত আনীত ডাব জল পান করিয়া তিনি শান্ত হন।

প্রভুর করুণায় তৎকালীন গৃহস্থ ভক্তগণও অনেকে প্রভুর নির্দ্দেশিত কঠোর নিয়মনিষ্ঠা পালন করিতেন। গৃহস্থ বন্ধুভক্ত কৃষ্ণকুমার (নেচু) সাহা প্রায় একচল্লিশ বৎসরকাল নিত্য ঊষাস্নান, টহলকীর্তন ও হবিষ্যান্ন-গ্রহণাদি দ্বারা সাত্ত্বিক জীবন পালন করেন। পুত্রগণসহ বাটীতে কীর্তন করাও গৃহীদের প্রতি প্রভুর উপদেশ ছিল। বাকচরে প্রত্যেক গৃহীকে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট, গাভী ও নৌকা রাখিতে প্রভু উপদেশ দিতেন।

নবদত্ত মহাশয় সেতার বাজাইতেন। একদিন প্রভু কীর্তনে লুট ছড়াইবার সময় ঐ সেতারও লুট দেন। তাহাতে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ ঘটনার পর প্রভু তাঁহাকে মৃদঙ্গ দান করেন। খোল করতালই সংকীর্তনে একমাত্র উপযুক্ত যন্ত্র, আর সব

রাজসিক বাদ্য বলিয়া প্রভু ঐ সব রাজরাজড়ার বাদ্য বাজাইতে প্রিয় নবকে নিষেধ করিয়া দেন।

পরাণপুরে জন্মেজয় নামক একজন পরম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ভক্ত ছিলেন। তাঁহার শরীর হইতে পবিত্র সুগন্ধ বাহির হইত। ইনি বৎসরে প্রথমে প্রস্তুত কোনদ্রব্য বা বনজাত ফলমূল শস্য প্রভুকে না দিয়া নিজে খাইতেন না। একদিন শ্রাবণ মাসে ভক্ত জন্মেজয় আউস ধান হইতে আতপ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ ঘৃত, ইক্ষুপাটালি ও আনাজি কলা মস্তকে লইয়া জলকাদা ভাঙ্গিয়া প্রভুর বাকচর অঙ্গনে আসেন।

সেই সময় প্রভুর সেবাকার্য্য করিতেন প্রতাপ ভৌমিক মহাশয়; ঐদিন পর পর দুইবার প্রভুর ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। প্রভু কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করেন নাই। তারপর ভক্ত জন্মেজয় কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্যাদি পাক করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৎসল প্রভু উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভুর কাছে ভোগ দিবার পর জন্মেজয় যুক্তকরে আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। কোনও নূতন দ্রব্য প্রভুকে অগ্রভাগ না দিয়া, না খাওয়ার নিয়ম, অনেক ভক্তেরই ছিল। ফরিদপুরে বালক ভক্ত বিধানী, প্রভু কোন দ্রব্য না খাইলে তাহা কিছুতেই খাইতেন না।

শুদ্ধ নিরামিষ আহার ও অন্যান্য কঠোর নিয়মপালনে অসমর্থ ভক্তগণকে কেবল হরিনাম ব্রতপালনে, প্রভু উপদেশ দিতেন। আর কিছু পার আর না পার, হরিনাম ছাড়িও না; ইহাই ছিল বন্ধুর মুখ্য আদেশ।

মিত্র গোপালকে লক্ষ্য করিয়া বন্ধুকিশোর প্রসঙ্গক্রমে একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমি তোদের যে সব নিয়ম বলেছি ও সব তোরা করতে পারবি না। যা করিস্, আমি ঘৃণা করব না। শূয়োর খেলেও আমি কোলে তুলে নেবো। কিন্তু হরিনাম ভুলিস্ না। হরিনাম করিস্, হরিনাম করিস্।"

চন্দ্রগুহ নামক একজন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি একদিন পথে প্রভাতি টহল কীর্ত্তনকারী ভক্ত কেদারকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিয়া খড়ম দ্বারা প্রহার করে। ইহাতে কেদারের রক্তপাত হয়। এই ঘটনা শুনিয়া প্রভু অপরাধী চন্দ্রের ভাবী দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ভক্ত কেদারকে ঐ আঘাত সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন,—"কেদারের পাপ খণ্ডন হয়ে গেল"। ইহার পর চন্দ্রগুহ শত্রু হস্তে নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনকালে তিনি সংসারে শোচনীয়ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ভক্তাপরাধের দণ্ড ভোগ করেন।

বাকচর হইতে প্রভু আলোকদিয়া, ফরিদপুর, ব্রাহ্মণকান্দা যাইতেন। কখনও কখনও নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। বাকচরে বড়দল, মধ্যদল ও ছোটদল কীর্ত্তনীয়া ছিল। এই সব কীর্ত্তনদল নানাস্থানে প্রভুর সঙ্গে যাইতেন। শুনিয়াছি, একবার বাকচরে চব্বিশ প্রহর কীর্ত্তনে প্রভু চৌদ্দটি দল আনাইয়াছিলেন এবং তাহাতে বহুসংখ্যক করতাল ও মৃদঙ্গ আনাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন।

একদিন বাকচর আঙ্গিনায় বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া শিবু সা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কীর্ত্তনকালে হঠাৎ তিনি শ্রীরাধার

ভক্তকিরণ আখর দেওয়ায় কীর্ত্তনে রসভঙ্গ হয়। মন্দিরে থাকিয়া প্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হন ও মনোবেদনায় ছট্‌ফট্ করেন। সেই দিন রাত্রে কীর্ত্তনান্তে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়। তখন "পাপ ধুয়ে গেল" বলিয়া প্রভু প্রশান্ত ভাব ধারণ করেন।

বাকচরে প্রতাপ ভৌমিক, বৃন্দাবন দাস, রামদাস, দুঃখিরাম ঘোষ, মোহিনী ভাদুড়ী, বাদল বিশ্বাস, নবদ্বীপ দাস প্রমুখ ভক্তগণ সময় সময় আসিতেন, থাকিতেন ও সেবার কার্য্যাদি করিতেন। গুরুবন্ধু তাঁহাদিগকে হরিনাম-নিষ্ঠা ও কঠোরতা শিক্ষা দিতেন। প্রভু অপূর্ব্ব সুরতাল-লয়যুক্ত অপ্রাকৃত সংকীর্তন রচনা করিয়া ভক্তগণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গাওয়াইতেন। কোনও কোনও সময় তিনি মধুর শিষ ধ্বনি করিয়া সুর শিক্ষা দিতেন ও নিজে উত্তম খোল বাজাইয়া কীর্ত্তনে আনন্দোল্লাস বর্ধন করিতেন।

দীর্ঘবাহু চারিহস্ত-পুরুষ প্রভুবন্ধুর তামার তার-যুক্ত অতি বৃহৎ "সীতানাথ" নামক খোল ছিলেন। প্রভু সহজেই তাহা বাজাইতেন। শুনিয়াছি, যে খোলে ভাল শব্দ হইত না, সেই খোলই প্রভু বাজাইলে তাহা হইতে মধুর হইতে মধুরতম গুরু-গম্ভীর ধ্বনি উঠিত। কি অলৌকিক মাধুর্যই ফুটিয়া উঠিত বন্ধুর মৃদঙ্গ বাদনে। বহু মৃদঙ্গবাদক থাকিলেও, চৌদ্দ মাদল আদি বড় বড় নগর কীর্ত্তনে প্রভু সর্ব্বাগ্রে নিজের কাঁধে সীতানাথ মৃদঙ্গ রাখিতেন। পথ দেখার জন্য একটি চোখ ব্যতীত প্রায় সর্ব্বাঙ্গ প্রভুর বস্ত্রাবৃত থাকিত; কখনো কখনো বস্ত্রাবরণ খুলিয়া যাইত।

ভক্ত ক্ষুদিরামের মুখে শুনিয়াছি, প্রত্যুষে টহল কীর্ত্তন কালে, তিনি তাঁহার পশ্চাতে করতালনের তালে তালে মধুর মৃদঙ্গধ্বনি

শুনিতেন, মনে হইত ঠিক প্রভুর শ্রীহস্তের মৃদঙ্গ-বাদন; কিন্তু পশ্চাতে তাকাইলে কিছুই দেখিতেন না। সময়ে ভক্ত প্রভুকে এই কথা নিবেদন করিলে, প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলেন, 'হরিনামের সহিত হরি থাকেন।'

লীলাময় বন্ধুহরি একদিন বাকচরে গরদের পরিধেয় ও উত্তরীয় দ্বারা রাজবেশ ধারণ করিয়া ভক্তগণকে ঘরে ঘরে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রভু ছত্রধারী বৃন্দাবন দাস ও অন্যান্য ভক্ত পাত্রমিত্র লইয়া হরিনাম-ধ্বনি সহ বাকচর গ্রামে বাহির হইয়াছিলেন। প্রভু সেইদিন রাজনাথ দাস মহাশয়ের বাগান হইতে স্বহস্তে কয়েকটি শশা ছিঁড়িয়া লইলে কয়েকজন ভক্ত আনন্দকৌতুকে বলেন,—"প্রভু, না বলে পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয়।" প্রভু তদুত্তরে হাসিয়া বলেন—"যা কিছু সব আমার, আমার জিনিষ আমি নেব, তাতে আবার দোষ কি?" ভক্তের প্রাণপ্রিয় বন্ধু এইভাবে ভক্তগণকে আপন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসাইতেন।

বাকচরে মহিমদাসজীর অঙ্গনে প্রভু একদিন উপস্থিত ভক্তগণকে হঠাৎ দড়ি দিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে সকলে বিশেষ কৌতুক অনুভব করেন। প্রভুর আদর্শে ভক্তগণ ঐ বন্ধনগ্রস্ত অবস্থায় বহুক্ষণ পরমপাবন তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ নাম করিতে থাকেন। অতঃপর লীলাময় বন্ধু তাঁহাদের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"আজ হতে তোদের ভববন্ধন মোচন হ'ল।"

বাকচরে কাবেরী নদীতে শ্রীনবদ্বীপ দাস একদিন প্রভুর বাসন মাজিতেছিলেন, এমন সময় ভূমিকম্পে নদীর জল ও বৃক্ষাদির

আলোড়ন হয় ; কিন্তু ভক্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রভুর অবস্থান মন্দির অনড়, নিষ্কম্প অবস্থায় রহিয়াছে।

১৩০২ সনে ভাদ্রমাসে প্রভু প্রায়ই রাত্রিকালে কোদাই সা, বিহারী কাহার, গোপাল সাহা প্রমুখ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া নৌকাকীর্ত্তনে বাহির হইতেন। নিজে খোল বাজাইতেন। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে স্নানাদি শেষ করিয়া প্রভু মন্দিরে ফিরিতেন। কোন কোন দিন আসন্ন বৃষ্টিতে ভক্তগণ শঙ্কিত হইলে প্রভু কৌতুক করিয়া বলিতেন, "ইন্দ্র রাজকার্যে থাকেন। তিনি শুনবেন না। শচীমাতার দোহাই দেও, বৃষ্টি আসবে না। নৌকা একপাশে রাখ।" ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া দেখিতেন যে, প্রভুর কৃপায় নদীর অপরপারে বৃষ্টি হইতেছে, অথচ যে দিকে নৌকায় কীর্ত্তন হইতেছে, সে দিকে বৃষ্টি নাই।

ভক্ত ক্ষুদিরামের কাছে শুনিয়াছি, একদিন অমাবস্যার রাত্রে তিনি নৌকায় প্রভুকে লইয়া রাজাপুরের শ্মশানঘাটে গিয়াছিলেন। তথায় শয়ান বন্ধুর অঙ্গজ্যোতিতে শ্মশান আলোকিত হইয়াছিল। বৈঠাখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া ক্ষুদিরাম প্রভুকে জানাইয়াছিলেন যে, আর নৌকা চালান যাইবে না। তখন প্রভু ক্ষুদিরামকে ভাঙ্গা বৈঠা ধরিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে বলেন। ভক্ত প্রভুর নির্দ্দেশমত কার্য্য করার কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া দেখেন, বাকচরের ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। ভবকর্ণধার বন্ধু থাকিতে পার হইবার ভাবনা কি ?

বন্ধুহরি প্রায় সর্ব্বদা বস্ত্রাবৃত অবস্থায় থাকিতেন ও তাঁহার দিকে তাকাইতে ভক্তগণকে নিষেধ করিতেন। রামদাসজীর মুখে

শুনিয়াছি, একবার শেষরাত্রে প্রভুর স্নানকালে তাঁহার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি হঠাৎ প্রভুর দিকে তাকাইয়াছিলেন। প্রভুর অঙ্গজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার চক্ষুতে পড়িতেই তিনি "বাপ রে" বলিয়া চক্ষু আবৃত করেন ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন। নিষেধ অমান্য করিয়া প্রভুকে দর্শন করায় প্রভু প্রিয়-ভক্তকে প্রকৃতিস্থ করিয়া মৃদুমধুর ভৎসনা করেন।

কোনো কোনো ভক্ত বলেন, রামদাসজী যমুনা ঘাটে ও কাবেরীঘাটে, দুইস্থানেই দুইদিন প্রভুর ঐ দিব্যজ্যোতিঃ দর্শন করেন।

প্রভুর বদরপুরে অবস্থানকালে একদিন রামদাসজী ভাবে বিভোর হইয়া প্রভু-রচিত "ঐ শ্যামরায়" কীর্ত্তনটি গাহিতেছিলেন। ঐ সময় বন্ধুহরি তথায় উপস্থিত বাকচরের ভক্ত ক্ষুদিরামকে চকিতের মত "শ্যাম" মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন।

বাকচরে প্রভুবন্ধু একদিন "জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান রে," এই প্রভাতি কীর্ত্তনটি রচনা করিয়া সেবক নবদ্বীপকে দেন। প্রভুর আদেশে তিনি গ্রাম ঘুরিয়া টহল দিয়া শ্রীঅঙ্গনে আসেন এবং প্রভুর ইঙ্গিতে উহা পুনঃ পুনঃ গাহিতে থাকেন। ক্রমে গ্রামবাসী ভক্তগণ যোগ দিয়া খোল করতালে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মহানন্দে ঐ প্রভাতি কীর্ত্তন করেন। কণ্ঠে, বক্ষে, বাহুতে ও মস্তকে তুলসী মালায় ভূষিত বন্ধুসুন্দর তখন মন্দির-বারান্দায় বীরাসনে আসনস্থ হইয়া বসিয়া ভক্তগণকে দুর্লভ দর্শন দান করিয়া আনন্দসাগরে ভাসাইতে থাকেন। প্রভুর আলোকচিত্রে দৃষ্ট রুদ্রাক্ষ মালা প্রভুর কণ্ঠে তখন ছিল না। শুনিয়াছি প্রভু ডাহাপাড়ায়

মস্তক মুণ্ডনের দিন ঐ রুদ্রাক্ষ মালা ন'মাকে দান করেন। হরিনামে মহাস্মুখী প্রভু চিরদিনই ভক্তগণকে নানা দ্রব্য বিতরণ করেন। সেদিন শ্রীনবদ্বীপ একজোড়া ক্ষীরদ বস্ত্র ও জপমালা উপহার পাইয়াছিলেন। জয় মহাউদ্ধারণ অনন্তানন্ত বন্ধুলীলা।

দেখা দিলে দেখা যায়

প্রভু মৌনী হইবার পূর্ব্বে প্রভু-প্রদত্ত লুট পাইবার আশায় গোয়ালচামট অঙ্গনে সময় সময় অনেক বালক ভক্ত আসিতেন; ধামবাসী কৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, প্রভু বেড়ার উপরের ফাঁক দিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, ফল, বস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য ফেলিয়া দিতেন, তখন লাহিড়ি-প্রমুখ বালকগণ যে যাহা পাইতেন, হাত পাতিয়া লইতেন। মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনেকে আসিতেন; তাঁহারা প্রভুর নিকট অর্থাদি চাহিলে, প্রভু সময় সময় বেড়ার ফাঁক দিয়া সিকি, দুয়ানি, আধুলি, টাকা ইত্যাদি ফেলিয়া দিতেন, সকলে আনন্দে কুড়াইয়া লইতেন, হরিনাম করিতেন। তবে প্রভুর দর্শন সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটিত না।

ধামবাসী প্রাচীন পূর্ণ সান্যাল মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি একদিন তাঁহারা দশবার জন বালক আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলে, প্রভুবন্ধু কৌতুক করিয়া অবস্থান মন্দির হইতে বলিয়া উঠেন, "আমাকে খুঁজে বের কর।"

প্রভুর আহ্বানে সাহস পাইয়া বালকগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া প্রভুকে খুঁজিতে থাকেন। সমবেত অনুসন্ধানেও ক্ষুদ্র কুটীরের কোনও স্থানে প্রভুকে পাওয়া গেল না। অতঃপর পরম বিস্মিত বালকগণ শ্রান্তক্লান্ত হইয়া যেই মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, অমনি প্রভু মন্দির হইতে বলিয়া উঠেন, "ওরে, আমি ত এই ঘরেই আছি।" অতঃপর চাদরে আবৃত অবস্থায় প্রভু তাঁহাদিগংক দর্শন দানে পরম পুলকিত করিয়াছিলেন। প্রভু সাধারণতঃ সেলাই করা দেড়পাট্টা বড় চাদর গায় দিতেন, আবার অন্যপ্রকার গাত্রাবরণও ব্যবহার করিতেন।

বন্ধুসুন্দর কৃপা করিয়া এইভাবে ধরা দিলে, তাঁকে ধরা যায়, দেখা দিলে দেখা যায়।

পাবনায় প্রভু একসময় জয়নিতাইদেবকে জানান যে, তাঁহার নিকট আসিতে জয়নিতাইর অবারিত দ্বার। ইহার পর একদিন জয়নিতাই প্রভুকে দরজা খুলিয়া দর্শন দান করিতে বলিলে, প্রভু বলেন, "কাঠের দুয়ার কি দুয়ার?" বস্তুতঃ প্রভু কৃপা করিয়া দর্শন দিলে, কোন পার্থিব বস্তুই তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

পাবনায় আর একদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রভু ভক্ত হরি রায়কে উপদেশ দিতেছিলেন। সেদিন জয়নিতাই প্রভুর কক্ষে প্রবেশ করিতে না পারায়, ক্রোধ ও অভিমানবশতঃ চলিয়া যান, আর প্রভুর কাছে আসিবেন না, স্থির করেন। কিন্তু পরদিবসেই প্রভুর অদৃশ্য আকর্ষণে ব্যাকুলভাবে প্রভুর কাছে উপস্থিত হইয়া

তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বন্ধুহরি অভয় আশ্বাস দান করিয়া বলেন, "গতকল্য আপনার যে ক্রোধ ও অভিমান ঘটিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ রাজসিক ও আংশিক তামসিক। তাহাতে হৃদয় ও মস্তিষ্ক অতিশয় জ্বালা-যন্ত্রণাময় হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীব্রজগোপীদের যে মান-অভিমান, তাহা সাত্ত্বিক। তাহাতে হৃদয় ও মস্তিষ্ক শীতল, পরম শান্তিময় ও পরমানন্দময় হইয়া থাকে।"

প্রভুর প্রথম দর্শন দিনে জয়নিতাই, 'আগে প্রভুর শ্রীচরণ না দেখিয়া কেন শ্রীমুখ দেখিলাম; মনে মনে এইরূপ ভাবিতে থাকিলে, বন্ধুসুন্দর হাসিতে হাসিতে নিজের অভিন্ন গৌরস্বরূপ জানাইয়া, ভক্তের চিত্তের সংশয়জাল ছিন্ন করিয়া বলেন, "যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবেন, তখন তার পা দেখবেন, মুখ দেখবেন না। কারণ মুখে মায়া আছে, পায়ে মায়া নাই।"

একটু পরেই প্রভু আবার বলেন, "তাই ব'লে শ্রীশচীনন্দনের মুখ দেখবেন না, এমন কথা বলছি না। সে মুখে মায়ার গন্ধ নাই।"

তখন নিতাইনিষ্ঠ জয়নিতাই পদ্মাবতীনন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু মহানন্দে বলেন, "সেই দুই শ্রীমুখ এক, কিছুমাত্র ভেদ নাই।"

এই সঙ্গে হরিরায়ের প্রতি, "নিত্য যে ব্রজসম্বন্ধীয় বস্তু, তাহাতেই স্নেহ, মমতা, আসক্তি, আশা ও ভরসা করিতে হয়", এই বন্ধুবাণী আমাদের স্মরণীয়।

প্রভুবন্ধু এক সময় জয়নিতাইকে কলিকাতা হইতে ফরিদপুর

যাইয়া হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করেন। নূতনস্থানে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে হরিনাম প্রচারে জয়নিতাই একক অসুবিধায় পড়িবেন মনে করিয়া চম্পটী মহাশয় তাঁহার সহিত যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, প্রভু বলিয়াছিলেন,—

"যদি দয়াল নিতাইচাঁদের কৃপা হয়, তবে যে সে একজনের দ্বারা সকল কার্য সম্পন্ন হ'তে পারে।"

"আমি পিপীলিকা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে পারি।"

সে যাত্রা জয়নিতাই একক ফরিদপুর যাইয়া স্থানীয় ভক্তগণসহ হরিনামে সহর মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, হরিনামে অপূর্ব শক্তি প্রকাশ হইয়ছিল।

প্রভুর কৃপায় জয়নিতাই সপরিকর মহাপ্রভুর দর্শন পাইতেন। প্রভুবন্ধু ও বুড়োশিবের আশীর্বাদে জয়নিতাই গীতা, ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠে, সভায় পরম উল্লাস পাইতেন, শ্রোতৃবর্গও পরম শ্রদ্ধাভরে পাঠ শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেন। জয়নিতাইদেব কীর্ত্তন ও পাঠকালে বন্ধুহরির সাক্ষাৎ সান্নিধ্য অনুভব করিতেন।

জয়নিতাই নৈহাটিতে রাজর্ষি বনমালী রায়ের ভবনে শ্রীরাধাবিনোদজীর পার্শ্বে সর্বপ্রথম প্রভুবন্ধুর কৃপাদর্শন প্রাপ্ত হন। প্রভুর পাঠ-ত্যাগের পর এক মাঘ মাসের এক মঙ্গলময় দিবসে তাঁহার এই পরম ভাগ্যোদয় হয়। বন্ধুহরির চিরকৃপাভাজন জয়নিতাই ইহার পূর্ব্ব হইতেই দয়াল নিতাইচাঁদের প্রেমে বিভোর হইয়া 'জয় নিতাই' নামে আবিষ্ট থাকিতেন। তিনি ব্রজ-বিদেহী সন্তদাস মহারাজের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং এম্. এ. পর্যন্ত

পাঠ করেন। তিনি সংসারী অবস্থায় কয়েক বৎসর শিলং হাইস্কুলে হেড্‌মাষ্টারী করেন, অতঃপর প্রভুবন্ধুর অশেষ কৃপাকর্ষণে ত্যাগী হইয়া ভক্তিশাস্ত্র ও নিতাই বন্ধুহরিনাম প্রচারণে ব্রতী হন।

কলিকাতা রামবাগানে প্রভুর স্থিতিকালে এক সময় শ্রীহরিদাস মোহন্ত প্রভুর আদেশমত গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুর সেবার জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্রে ছাঁকিয়া কলসী ভরিয়া গঙ্গাজল আনিতেন। এইরূপ সেবাকালে একদিন ফরিদপুরস্থ পরিবারবর্গের নিকট যাইবার জন্য শ্রীহরিদাসের মানসে ইচ্ছা হইলে, অন্তর্যামী প্রভু ভক্তের আনা গঙ্গাজলে, পোকা আছে, রহস্য করিয়া বলেন এবং সেইদিনই পাথেয় ও বস্ত্রাদি দ্রব্য কিনিবার খরচ দিয়া ভক্তবরকে ফরিদপুর পাঠাইয়া দেন। গৃহে আসিয়া হরিদাস পরদিন উষায় পদ্মায় স্নানের পর কলসীতে জল ভরিয়া, আত্মদোষে প্রভু-সেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন মনে করিয়া বন্ধু-স্মরণে কাঁদিতে থাকেন। প্রভু তখন কলিকাতায়। এমতাবস্থায় বিরহার্ত্ত ভক্ত অকস্মাৎ মধুর 'হরিদাস! হরিদাস' আহ্বান শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখেন প্রভুবন্ধু স্বয়ং পদ্মাতীরে উপস্থিত, হস্তপদ্মাঞ্জলি মেলিয়া তিনি ভক্তের নিকট পানীয় জল চাহিতেছেন। বন্ধুর সেবার্থ আকুল ভক্ত বন্ধুর পদ্মকরপুটে জল ঢালিয়া দিলে, তিনি তাহা তৃষ্ণার্ত্তের ন্যায় পান করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইলেন। ভক্ত প্রত্যক্ষ করিলেন, ভক্তের প্রভু ভক্তের জন্য সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দেখা দিয়া থাকেন। প্রাণের একান্ত আগ্রহেই তাঁকে দেখা যায়। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

বিভিন্ন ভক্তকে কৃপা। কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন। জাত্যভিমান দূরীকরণ। অস্পৃশ্যতা নিবারণ।

সংকীর্ত্তন দল-সমূহ গঠনের পর প্রভু 'ব্রাহ্মণকান্দা' ও বাকচর হইতে বহুবার সাত সম্প্রদায় সহ বিরাট চৌদ্দমাদল নগরকীর্ত্তন বাহির করিতেন। কোন্ দল কি গাহিবে, কাহার পর কে চলিবে, কে নাচিবে, কে কে আগে গাহিবে ইত্যাদি সমস্ত সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা তিনি নিজেই করিয়া দিতেন।

ব্রাহ্মণকান্দা ও বাকচরধাম হইতে প্রভুবন্ধু অনেকবার সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দমাদল নগর কীর্ত্তন স্বয়ং পরিচালনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একবার প্রভুলিখিত নিম্নোক্ত সাতটি সংকীর্ত্তন, সাত সম্প্রদায়ে, নগর কীর্ত্তনে মহানন্দে আট ঘণ্টাকাল (সকাল ৮টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত) গান করেন। প্রভুর শক্তি সঞ্চারিত ঐ সংকীর্ত্তন সাতটির প্রারম্ভ নিম্নলিখিত রূপ ঃ

(১) ভজ রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল।
যদি এড়াবিরে মায়া জাল॥

(২) আয় পারে আয় (পাঠান্তরে 'ভাই দিন যায়')
দয়াল নিতাই ডাকে সকলে হরিবলে আয় রে॥

(৩) আহা ঐ নিতাই চাঁদ নাচিছে।
নয়নে বারি ধারা ঝরিছে॥

(৪) জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে।

(৫) নিতাই নিতাই নিতাই বলে ডাকরে পামর মন॥

(৬) আহা ঐ মৃদঙ্গ বাজিছে।
কি রঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ নাচিছে॥
(৭) সুরধুনী তীরে ঐ বাজল রে মাদল।
নিত্যানন্দ নাচে, আর বলে হরিবল॥

বিশেষ বিশেষ নগরকীর্ত্তনে রামবাগানের ডোমভক্তগণ, নবদ্বীপের শিতিকণ্ঠ মহাশয় আদি ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভুর আহ্বানে আসিতেন। প্রভুর আদেশে রামদাসজী বুনা ও ডোম ভক্তগণকে প্রভুর রচিত কীর্ত্তন শিক্ষা দিতেন। ডোমভক্তগণ মোহন্ত ভক্তদের নিকট মৃদঙ্গবাদন ও করতালন শিখিতেন। প্রভু নিজেও সময় সময় মৃদঙ্গ বাজাইয়া ও শিস্ধ্বনি দিয়া কীর্ত্তনে শিক্ষা দিতেন।

সর্ব্বজনে প্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব হইত। সাক্ষাৎ বন্ধুহরির সম্মুখে বহু অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হইত। কীর্ত্তনে অনেকের উত্তম সাত্ত্বিক ভাবদশাদি হইত, বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত দুলিত ও নত হইত। পায়ের নীচে ইট্পাটকেলও যেন নাচিত।

বাকচরে নিতাই, কার্ত্তিক, শশধর, মতি, কোধা, বিহারী, হরিচরণ আদি সহ ছোটদল ও মিত্র গোপাল, নব দত্ত, দাস মহিম, মদন সাহা, নেচু সাহা, চন্দ্র, মহীন্দ্র, রামচরণ, যজ্ঞেশ্বর, প্রহ্লাদ আদিকে লইয়া—বড়দল পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছিল। বাৎসরিক চৌদ্দমাদল ছাড়া নিত্য টহল কীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তন, নিশা কীর্ত্তন অবশ্যই হইত। প্রভুবন্ধু কোন কোন দিন কীর্ত্তনের সঙ্গে বাহির হইতেন। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত অবস্থায় চলিতেন, কেবলমাত্র পথ দেখিবার জন্য একটিমাত্র চক্ষু খোলা থাকিত। বন্ধুসুন্দর যে দিন কীর্ত্তনে বাহির হইতেন, সে দিন সে সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িত। প্রভুকে দর্শনের জন্য গ্রাম সহর ভাঙ্গিয়া সর্ব্বশ্রেণীর নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে ছুটিয়া আসিতেন। পথের দুই পার্শ্ব লোকে লোকারণ্য হইত। প্রভুকে সকলে কত ভালবাসে, তাহা তাহাদের আকুল দৃষ্টি হইতে বোঝা যাইত। যে ছুটিয়া আসিত, সে আর ফিরিয়া ঘরে যাইতে চাহিত না। যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাইয়া থাকিত। কেহ কেহ সঙ্গে সঙ্গেই চলিত।

ইতঃপূর্ব্বেই বন্ধুচন্দ্র ফরিদপুরের বুনা ভক্তগণের উদ্ধার সাধন ও আশ্রয় বিধান করেন। খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ ইঁহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রভুর জন্য তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হয়। প্রভুর অপূর্ব্ব কৃপাশক্তিতে ইঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল কদাচারাদি দোষ শোধিত হয়। কৌলপন্থী রজনী বাগদী (পাশা) ছিলেন ঐ দলের নেতা। তাঁহার অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। প্রভুবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব পরিবর্তন সাধন করিয়া "হরিদাস মহান্ত" নামে অভিহিত করেন।

পতিতপাবন বন্ধুহরি হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি বুনা নও, কাশ্যপগোত্র।' পরে সব বন্ধুভক্তকেই প্রভু 'অচ্যুত গোত্র' বলেন। হরিদাসের হাতের দুই আঙ্গুলে ও পায়ের দুই আঙ্গুলে গলিতকুষ্ঠ ছিল, উহাতে নেকড়া জড়াইয়া রাখিতেন, বড় কষ্ট পাইতেন। প্রভুবন্ধু বহু ভক্ত সমক্ষে তাঁহাকে এক জোড়া ক্যানভ্যাসের কোমল বুটজুতা দান করেন এবং উহা পরিধান করিয়াই হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। 'উহাতে

তোমার দোষ হইবে না' প্রভুর এই অভয় বাণী পাইয়া দৈন্ত-ভূষণ হরিদাস পাছুকা পরিহিত অবস্থায় কীর্ত্তন করিতেন। প্রভুর কৃপায় কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। করুণাসাগর প্রভু তাঁহাকে বলেন, "আমার সান্নিধ্যে আসায় তোমার দেহ চিন্ময় হইয়াছে। তুমি মায়ামুক্ত হইয়াছ।"

হরিদাস মহান্তের কীর্ত্তনের দল "মোহান্ত সম্প্রদায়" নামে বিখ্যাত হয়। মৃদঙ্গ বাদন ও হরিনাম কীর্ত্তনে এই সম্প্রদায় অদ্ভুত শক্তি অর্জ্জন করেন। বড় ছোট, দুই দলে সত্তর আশি-জন বিশিষ্ট কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। মাধব, উমেশ, পূর্ণ, রাম, মহিম, হরি, নিবারণ, মতি, জানকী, দলু, গৌরদাস, শ্রীমন্ত প্রভৃতি ছিলেন বড়দলে। রাজকুমার, মনোমোহন, সতীশ (সত্য), দামোদর, বাসুদেব প্রভৃতি ছিলেন ছোটদলে ; সকলেই প্রভুর কৃপায় উত্তম অধিকারী হইয়াছিলেন।

হরিদাস মহান্তকে প্রভু শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারা গঠন করিয়া অতি অপূর্ব্ব নবজীবন দান করিয়াছিলেন। হরিদাসের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও হবিষ্যান্ন গ্রহণাদি কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা দেখিয়া ব্রাহ্মণ-জাতীয় ভক্তগণও তৎপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তপক্ক নিবেদিত ভগবৎ-প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া দেহের পাপ নষ্ট করিতে ব্রাহ্মণজাতীয় ভক্তকে প্রভুবন্ধু উপদেশ দিতেন। ঐ উপদেশ যথাযথ পালিতও হইত। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের বহু পূর্বেই প্রভু বুনা ডোমদের উচ্চবর্ণ সমাদরে সম্মানিত করেন।

প্রভুর কৃপায় মোহান্ত সম্প্রদায়ের কণ্ঠে প্রভুর রচিত নাম

ও পদ-কীর্ত্তনের আদর দেশের সর্ব্বত্রই হইয়াছিল। প্রভু কর্তৃক, এই হীন জাতিকে হরিনাম-দানে উদ্ধার কার্য্যের কথা, তৎকালে সকলের মুখে শুনা যাইত। সমগ্র বুনা জাতির এই অভাবনীয় পরিবর্তন-বার্ত্তা তৎকালীন আবগারী ও অন্যান্য সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছিল। বন্ধুলীলায় বন্ধুর অমোঘ কৃপাশক্তিতে হীন পতিতের নয়নে প্রেমাশ্রুধারা দেখিয়া ব্রাহ্মণেও নিজেকে ধিক্কার করিত। হরিনামে প্রভু বুনা ডোমদের সংস্কৃত করে ব্রাহ্মণেরও পূজ্য করেন।

তৎকালে ঢাকায় ও ফরিদপুরে রমেশ বাবুর নেতৃত্বে ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম প্রচারণে ছাত্রদল গঠিত হইয়াছিল। হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুর বার্ত্তাও তখন প্রচারিত হইত। জনসমাজে প্রচারিত 'ঢাকা হরিনামের ক্যাপিটাল' এই বন্ধুবাণী সম্পর্কে কেহ কেহ মনে করেন, তৎকালে রাজধানী ঢাকায় বহু ভক্তের গতায়াত ও বহু স্থানে প্রায় প্রত্যহ কীর্ত্তন ভাগবতাদি পাঠ হইত, এই জন্য প্রভু ঐ কথা বলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন ঢাকা হরিনামের একটি প্রধান কেন্দ্র হইবে, সেইজন্যই এই ভবিষ্যৎ উক্তি।

প্রভু হরিনামে মান-অভিমান, জাতি-বর্ণ-বিদ্বেষ, হিংসাদি নষ্ট করাইয়া, অস্পৃশ্যতা নিবারণ করাইয়া আম্লেচ্ছ-চণ্ডাল-বিপ্র, সকলের একত্র সম্মিলনের মহান্ আদর্শ স্থাপন করেন।

একবার নবদ্বীপ হরিসভায় বাকচরের ভক্তগণ যখন প্রসাদ পাইতেছিলেন, তখন মোহান্ত ভক্তগণের কেহ কেহ পানীয় জল আনার জন্য ঐ স্থান দিয়া গমন করায়, বাকচরের ভক্তগণ

"জাতি গেল" বলিয়া আহার বন্ধ করিয়া উঠিয়া যান। ইহাতে দুই দলে বাদানুবাদ ও সাময়িক মনোমালিন্য হয়।

এই ঘটনা শুনিয়া প্রভুবন্ধু মর্ম্মাহত হন। পরদিন যথাযথ বিচারকের বেশ পরিয়া তিনি বিচারাসনে বসিয়া বিচার করেন। "ভক্তের মধ্যে জাতিবুদ্ধি করায়, অপরাধ হইয়াছে," এই রায় দিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপ স্বয়ং দুই দিন উপবাস করেন। ইহাতে ভক্তগণ অনুতপ্ত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে আর কখনও প্রসাদ-প্রাপ্তিকালে জাতিবুদ্ধি করেন নাই। হরিভক্ত এক জাতি। অবশ্য, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সামাজিক বিচারে প্রভু কিছু বলিতেন না। প্রসাদ ব্যতীত অন্যত্র অন্নগ্রহণে জাতি বিচার ছিল।

পাবনায় চম্পটী মহাশয় বুড়োশিবের আদেশে একদিন ভক্ত-বন্ধু মণ্ডলের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষ্যাপা শিব, চম্পটী মহাশয়কে বাজারে লইয়া গিয়া "বামুনের ছাওয়াল, চাঁড়ালের বাড়ী ভাত খায়" এই কথা প্রচার করিয়া তাঁহার জাত্যভিমান দূর করেন।

"পাবনার" ভক্তগণ ও বুড়োশিব, চম্পটী মহাশয়, জয়-নিতাই, ভারতী মহাশয়-প্রমুখ বন্ধুপ্রিয়গণ পাবনায় হরিনামের প্লাবন আনেন।

প্রভুবন্ধুর অশেষ কৃপাভাজন প্রভুর শিক্ষায় কঠোর ব্রহ্মচারী ও ত্যাগী, অতি আদরের 'শারিকা', বন্ধুদাস 'রামদাস'-কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রদেশে, জেলায় জেলায় হরিনাম প্রচারণ-বার্ত্তা এ' দেশে সর্বজনবিদিত।

কলিকাতা "রামবাগানের" ডোমজাতীয় ভক্তদিগকেও বন্ধু-হরি স্বীয় দিব্যশক্তিতে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত করিয়া উত্তম খোল-বাদক ও কীর্তনের অধিকারী করেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ঐ ভক্ত-দিগকে দেখিলে ব্রজজন বলিয়া মনে হয়। বন্ধু কাপড়ের থলিতে সিকি, তুয়ানি, আধুলি, টাকা ভরিয়া রামবাগানে হরিসংকীর্ত্তনে লুট দেওয়াইতেন। ঐ সব কার্য্যের ভার অনেক সময় চম্পটী মহাশয়ের উপর থাকিত। চম্পটী মহাশয় বারবনিতাদের পল্লী দিয়াও উচ্চ "হরি-হরিবোল" ধ্বনি দিয়া বেড়াইতেন ও প্রভুর আদেশে কলিকাতা সহরে প্রত্যহ টহল কীর্ত্তন করিতেন।

রামবাগানে দয়াল তিনকড়ি, মৃদঙ্গবিৎ হিত হরিদাস, হীরু, মহেন্দ্র, মহীন্দ্র, ভূষণ, যজ্ঞেশ্বর, নটবর, পীতাম্বর বাবাজী, দীনু, রজনী, সদয় রাণা, ভূতনাথ, অহীন্দ্র, ভীম, নারায়ণ, গোপী, শশী, কালাচাঁদ আদি ভক্তগণ প্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন ছিলেন। রামবাগানের বালক বালিকা ও মাতৃগণ সকলেই ভক্তিধনের অধিকারী হন। কলিকাতায় প্লেগ মহামারী নিবারণে যে বিরাট নগরকীর্ত্তনের আয়োজন হয়, তাহাতে শ্রীশ্রীপ্রভুর অলৌকিক মহাউদ্ধারণ শক্তির বিকাশ হয় এবং রামবাগানের সংকীর্ত্তন দলই সকলের অগ্রগণ্য ও পূজ্য হইয়াছিল। প্রভুর অসীম প্রেম-করুণা এরূপভাবে জগতে ছড়াইয়া পড়ে। জগাই মাধাই ছিলেন ধনী ব্রাহ্মণসন্তান, নবদ্বীপের কোতয়াল, (এস. পি.), উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ; তবে কদাচার, হরিনামবিমুখ। তাই তাঁদের উদ্ধার করিয়া নিতাই-গৌরাঙ্গসুন্দর হইলেন পতিতপাবন। আর এবার সমাজে পতিত, ঘৃণাপ্রাপ্ত, দরিদ্র, অনাদৃত, কদাচারী বুনা ও

ডোমদের হরিনাম দিয়া, জল-চল করিয়া অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি দান করিয়া, উদ্ধার করিয়া অভিন্ন নিতাই গৌর স্বরূপ বন্ধুসুন্দর, হইলেন মহাপতিতপাবন মহাউদ্ধারণ।

প্রভুর মৌনের পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্রমোহন সিংহ, রমেশবাবু ও সুরেশবাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দা যাইয়া প্রভুবন্ধুর অবস্থান মন্দিরের সামনে প্রাঙ্গণে মাটিতে বসিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে ভূমিলগ্ন মস্তকে প্রণাম করেন। দরজার ফাঁক দিয়া প্রভুর লেখা দুখানি কাগজ জেলা শাসক পান। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল:

"যতীন বাবুজী" জেলার রাজা কর্ত্তা, সাধু মস্ত, অকৈতব।.... অন্যায়ের ন্যায় বিচার করুন। হরিনামের পথ আবিষ্কার করুন। ...আমি ক্ষণে জন্মেছি। কারো আত্মজ নহি। অযোনিসম্ভব। ভট্ট সন্তান, ভট্টাচার্য। জ্যোতিষী গণনায় স্থির সিদ্ধান্ত। প্রলয়-দমন মহাউদ্ধারণ কার্য। ইতি।..."

প্রভুর "পদাতিক সৈন্য"

বাংলা ১৩০৩/৪ সন হইতে ফরিদপুরে ছাত্র বালকগণের অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়। পরস্পর অচ্ছেদ্য, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যে আবদ্ধ সুরেশ, দেবেন, সুরেন, অক্ষয়, বিধু, লোকনাথ, নকুলেশ্বর,

উপেন, অমৃত প্রমুখ বালকগণ প্রভুবন্ধুর পরম অনুগত হইয়া উঠেন। প্রভুবন্ধু ইহাদিগকে "পদাতিক সৈন্য" বলিতেন। উত্তরকালে ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এম্. এ, বি. এল্, পাশ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন।

প্রভুর পরম কৃপায় ও অতুলনীয় শিক্ষায় তাঁহারা বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন, বিদ্যোন্নতি, হরিনামনিষ্ঠা, নিত্য কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল অসংযত জীবনকে শান্তিময় ও আনন্দময় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের পরমবান্ধব ও পরিচালক রমেশচন্দ্র অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রভুর শরণ লইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা, বাকচর, পাবনা, নবদ্বীপ, কলিকাতা, আলামবাজার, হুগলী ইত্যাদি স্থানে মাঝে মাঝে প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবাকার্য্য করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ প্রভুর সঙ্গলাভে পরম ভাগ্যবান্ এই ভক্তদের দৈন্য ও আর্ত্তি আমাদের শিক্ষণীয়। ইং ২৯।১০।১৯২০ তারিখে ত্যাগী বন্ধুসেবক বেশধারী আমাকে দেখিয়া বন্ধুর পরম প্রিয় শ্রীদেবেন্দ্র গুপ্ত (নেপোলিয়ন) ভাবাবেগে বলিতে থাকেন, "তোরা যদি আপন হস্, তোদের মত ক'রে নে। তোদের দেখা না পাওয়াই ভাল। কি যে আকর্ষণ বুঝি না ...।" তিনি স্নেহবশতঃ আমাকে মাষ্টার মহেন্দ্র বলিতেন।

প্রভুবন্ধু সময় সময় প্রিয় বালক ভক্তগণকে কঠিন কাজের চাপ দিতেন ও নানা দ্রব্যাদি আনিতে বলিতেন। তাঁহার আদেশমত সমস্ত দ্রব্য দেওয়ার সামর্থ্য থাকিত না বলিয়া বালকগণ চিন্তিত হইলে, বন্ধু সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন,—

"আমি পূর্ণ, পূর্ণ মাত্রায় কাজের চাপ দেবো। তোরা যা পারিস্ তা করিস্। না পারিস্ আমায় বলিস্।" "তোমাদের মঙ্গলের জন্য বলে থাকি।" "আমি যা চাই, তা একালে দিও আমি যা চাই, তা দ্বিকালে দিও, আমি যা চাই তা ত্রিকালে দিও। না দিতে পারলেও দুঃখ করো না।"

আঙ্গিনায় শ্রীগোপীকৃষ্ণের সেবাধিকারকালে কয়েকদিন বালক ভক্তগণ-প্রদত্ত গব্যঘৃত মিশ্রিত সিদ্ধপক্ক আতপান্নের মালসাভোগ দ্বারা বন্ধুর মধুর স্মরণীয় সেবা হইয়াছিল। ১৩০৮ সনে প্রভুর মহাভাবোন্মাদ দশাতেও এই ব্রহ্মচারী ভক্তগণ সপ্তাহকাল প্রভু বন্ধু-সুন্দরের সেবাভাগ্য পাইয়া মানবজন্ম সার্থক করেন।

সর্বদ্রষ্টা ভক্তত্রাতা প্রভু

কতিপয় বালক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া হরিনাম-প্রিয় প্রভু লিখেন "শ্রীশ্রীবাবুগণ! তোমরা কীর্ত্তন ভিন্ন কোনও ব্রত বা নিয়ম করিও না। চিরদিনই টহল ও নগর কীর্ত্তন, সর্বদাই করিও।"

প্রভুবন্ধু তাঁহার অনুগতদের কল্যাণার্থ সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। "তোরা আমায় স্মরণ করিস্ আর না-ই করিস, আমি তোদিগকে স্মরণ করে নিত্য চিরকাল রক্ষা করব।" "চিরগুরু রইলাম" "ভয় কি, আমি আছি" ইত্যাদি বন্ধুবাক্যে ভক্তবাৎসল্য সুপরিস্ফুট।

রমেশবাবুকে তাঁহার অভিভাবকগণ সংসারে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে প্রভু তাঁহাদিগকে লিখিয়াছিলেন—"আপনারা রমেশের জন্য আট যোজন দেখিলে, আমাকে সেখানে কোটি যোজন দেখিতে হয়। কারণ, রমেশ তাহার গুরু ও যুগলকিশোর ভিন্ন আর কিছুই জানে না। আপনাদের উপর রমেশের যে সব মায়া,, মমতা ও ভালবাসা ছিল, সে সবই এখন তাহার গুরুর উপর পড়িয়াছে, ইহা জানিবেন।.. রমেশ ব্রজের ভক্ত।···যুগল-কিশোর যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের চিত্তে কোন বাসনা কামনা থাকে না। কোনপ্রকার ক্ষোভ গ্লানিও থাকে না। এমন কি তাঁহারা মুক্তি পর্য্যন্ত ইচ্ছা করেন না। কিন্তু মুক্তি তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত থাকেন। ধর্ম্ম ও সংকর্ষণ সর্ব্বদাই ইঁহাদের সঙ্গে থাকেন। রমেশ সংসারী হইবে না, সংসারী হইলে সে অধিক দিন বাঁচিবে না।"

এই প্রকার পত্র দিয়া ও শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রভু রমেশ-বাবুকে রক্ষা ও চিরত্যাগী করিয়াছিলেন। রমেশবাবু এফ্., এ, পাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি মাষ্টার ও প্রফেসর হইবেন বলিয়া প্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। উত্তরকালে প্রভুর বাক্যানুসারে রমেশবাবু আলবার্ট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। প্রভুর শিক্ষায় তিনি অনর্গল সহজ সরল ভাবে শুদ্ধ ইংরেজী কথা বলিতে পারিতেন।

রমেশবাবুর দাদা জ্যোতিষবাবু পনর টাকা বেতনে সামান্য চাকুরী করিতেন। প্রভুবন্ধু তাঁহাকে "হাকিম হইবেন" বলিয়া-ছিলেন। বলাবাহুল্য জ্যোতিষবাবু উত্তরকালে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

হইয়া প্রভু যে অবিতথবাক্ ও বাক্‌সিদ্ধপুরুষ এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ভক্তগণ পীড়িত হইলে প্রভুবন্ধু মহাব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। বাকচরে গোপাল মিত্র মহাশয় একবার নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলে, প্রভু নিজে খবর দিয়া ফরিদপুর হইতে শ্রীধর ডাক্তারকে আনাইয়াছিলেন। অবশ্য, ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই রোগী ভাল হইতে থাকেন এবং প্রভুর ব্যবস্থায় নীরোগ হন।

একবার ভক্ত মোহিনী ভাদুড়ী পুনঃ পুনঃ ভেদ-বমন করিয়া মুমূর্ষুপ্রায় হইলে প্রভু তাঁহাকে প্রাতঃস্নান করিতে বলেন, সবরীকলা ও তেঁতুলগোলা পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া রোগমুক্ত করেন।

একবার বালকভক্ত নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বন্ধুপ্রিয় ছোটবাবু) মৃত্যুশয্যায় আছেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে বাঁচাইবার আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন হঠাৎ বন্ধুসুন্দর ঢাকা হইতে ফরিদপুরে আসেন। "বন্ধু এসেছেন" এই কথা মুমূর্ষু রোগীর কর্ণে প্রবেশ করিতেই তাঁহার জীবনী-শক্তি ফিরিয়া আসে। অতঃপর প্রভুর ব্যবস্থামত শুশ্রূষা করায় রোগী সহজেই নবজীবন লাভ করেন।

একটি বালকভক্তকে প্রভু "সোয়া তিন হাত" বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত ভক্ত তাঁহার জীবনে সংঘটিত একটি গুপ্ত পাপ-ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া সময় সময় অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া থাকিতেন। অন্তর্যামী প্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একখণ্ড কাগজে একদিন লিখিয়া দেন,—

"তামসী নিশার সেই দুঃখস্মৃতি সুষুপ্তির ধাঁধা মাত্র ॥ মিথ্যা ॥ ইষ্টবাক্য মিথ্যা নয় ॥"

ইহাতেও শান্ত না হইয়া ঐ বালক অপর একদিন অনুতাপে অধীর হইয়া আত্মহত্যার জন্য সচেষ্ট হন। সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভু অনেক দূর হইতেই তাহা জানিতে পারেন। প্রেমময় বন্ধু প্রভু অস্থির হইয়া স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া অপর একটি বালকদ্বারা তাঁহার নিকট উহা পাঠাইয়া দেন। সঙ্গীরা মিলিয়া উক্ত বালককে প্রভুর নিকটে লইয়া আসেন। প্রভু পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে ঘৃণা করেন না। তিনি দূরে থাকিয়াও ভক্তের জন্য কত ব্যাকুল, ইহা অনুভব করিয়া ভক্ত বালকটি কাঁদিয়া আকুল হন। তাঁহার জীবনও তদবধি নূতন ছন্দে গড়িয়া উঠে।

পদাতিক সৈন্যমধ্যে ফরিদপুর দুলালী গ্রামের দেবেন গুপ্ত ছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীমহেন্দ্রগুপ্ত (এম্ এ) র পিতা, ইনি উত্তর জীবনে সৎ সাহিত্যিক, লেখক ও উকিল হইয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে "নেপোলিয়ন" বলিতেন। নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে একদিন রাত্রে পথে তাঁহাকে গোক্ষুর সাপে দংশন করে। তিনি তখন "বন্ধু বন্ধু" বলিয়া ক্ষত স্থানে ধূলি ঘর্ষণ করেন। আর কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ঐ ঘটনার পূর্ব্বেই সর্বদর্শী প্রভু একখানি পত্রযোগে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—

"সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
প্রভুপদে যদি মতি রয়।"

সর্পদংশনের দিনই প্রিয়ভক্ত প্রভুর এই পত্র পান।

সুরেশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার আদি কয়েকটি বালকভক্ত একদিন

দিবাভাগে বন্ধুকে দর্শন করিবার জন্য মাঠ পার হইয়া বাকচর যাইতেছিলেন। মাঠে এক বালককে একটি সর্প দংশন করে। বালকগণ "বন্ধু বন্ধু" বলিয়া বালকের ক্ষতস্থানে ধূলি ঘর্ষণ করেন এবং নিশ্চিন্ত মনে বাকচর শ্রীঅঙ্গনে পৌছেন। তাঁহারা নিকটে পৌছামাত্র সর্ব্বদ্রষ্টা বন্ধু দরজা ঈষৎ খুলিয়া হাসিমুখে আশ্বাস দিয়া বহেন—

'সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
প্রভুপদে যদি মতি রয়।'

এখানে 'বিভু' স্থলে 'প্রভু' উক্ত হইয়াছে।

বন্ধুতে ভক্তদের অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। গুরুবন্ধুর বহু অনুরাগী ভক্ত তাঁহার নিত্যসত্য অটল ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে উত্তর জীবনে মাষ্টার, অধ্যাপক, ষ্টেশনমাষ্টার, ইনস্‌পেক্টর, উকীল, মোক্তার, মুন্সেফ, ডাক্তার, ডেপুটি, সবজজ, জজ, চিকিৎসক, ত্যাগী চিরকুমার, দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্নরূপে থাকিয়া কালযাপন করিয়াছেন। প্রভু যাহাকে যাহা বলিয়াছেন তাঁহার জীবনে তেমনটিই ঘটিয়াছে।

আবার প্রভুর অমোঘ ভবিষ্যদ্‌ বাক্যানুসারে কাহারও কাহারও অকালমৃত্যু ও পতন ঘটিয়াছে। "হরিবলে অবহেলে নিয়তি এড়াইরে—" এই কথা প্রভু লিখিয়াছেন এবং অনেককে হরিনামাশ্রয়ে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাকচরে ভক্ত কোদাই সাহাজী ১৩০১ সনে একদিন প্রভুর আদেশে প্রভু রচিত 'এস প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর' কীর্ত্তনটি প্রেমস্বরে প্রাণ ভরিয়া গাহিয়া ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন।

গোয়ালচামট গ্রামের গুরুচরণ দে মহাশয়ের পুত্র কেশবের জন্ম গণ্ডযোগে হইয়াছিল। কেশবের আঠার মাস বয়সে দে মহাশয়ের মৃত্যুযোগ ছিল। প্রভুর বাক্যমত হরিনামকীর্ত্তন দ্বারা দে মহাশয় সে-যাত্রা রক্ষা পান। প্রভু আরও জানাইয়াছিলেন যে, কেশবের ছয়বৎসর বয়ঃক্রমকালে কঠিন মৃত্যুযোগ আছে। তবে, হরিনাম নিষ্ঠায় থাকিলে রক্ষা পাবে।

কেশবের বয়স যখন ছয়বৎসর, তখন সে চিকিৎসার অসাধ্য অবস্থায় আসে। সংবাদটি প্রভুর কাছে পৌঁছে। প্রভু অবিলম্বে রোগীর কাছে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে বলেন। প্রভুর আদেশ পালিত হইলে কেশব রক্ষা পায়।

দেবী গোলোকমণির এক কন্যার সহিত এক স্বাস্থ্যবান্ সুন্দর যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। প্রভুবন্ধু একদিন দূর হইতে ঐ যুবককে দেখিয়া দিদি গোলোকমণিকে জানাইয়া দেন যে, উহার দেহে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় ও কয়েকদিনের মধ্যে যুবকের মৃত্যু ঘটে। দিদিকে বন্ধু অনেকদিন পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাত্র ছয়মাস বৈধব্য ভোগ হইবে। প্রায় ত্রিশবৎসর পর ঐ কথা সফল হয়। কাশীতে শ্রীপ্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর দেবী আর ছয়মাস মাত্র জীবিতা ছিলেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্বন্ধে প্রভুবন্ধু অনেকদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, মহানবমীর দিন মৃত্যুযোগ আছে। ফলত তাহাই ঘটিয়াছিল। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বাটীতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় ছাগবলি হইত; সেইবার বন্ধু উহা

নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়াও বাটীর কর্ত্তৃপক্ষ প্রচলিত 'বলি' বন্ধ করিতে সাহস পান নাই। ফলে ঐ বৎসর মহানবমীর বলির অব্যবহিত পরেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেহরক্ষা করেন এবং ঐ নবমীতেই প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়।

প্রিয়ভক্ত বিধানী নামক বালককে প্রভুবন্ধু একদিন সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি গৃহী হইও না, গৃহস্থ সংস্রবে তোমার মৃত্যু। সত্য জেন। যোষিৎ-মায়া-মনসিজ ত্যাগ কর। হরিনাম নিষ্ঠা কর। তোমার কাকচরিত, বন্ধু॥ ইতি।"

অপর একটি ভক্তকে কিছু পরেই বলেন "বিধার (বিধানীর) আর মাত্র তিনমাস আয়ু। একমাস পূর্ব্বে মরার লক্ষণ দেখতে পাবি। তোদের কাছে ঘেষতে চাইবে না। হরিনাম করবে না, আমার কাছেও আসবে না। তখনি বুঝবি মরবে"। প্রভুর বাক্যমত যথা সময় বিধুরঞ্জনের মৃত্যু ঘটে।

বাদলবিশ্বাসজীর মুখে শুনিয়াছি, বিধানীর মৃত্যুর কয়েকমাস পর, শ্রীঅঙ্গনে একটি শূকর প্রভুর চরণে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয় ও অশ্রুপাত করে। প্রভু জানাইয়াছিলেন, তাঁহার কৃপায় বিধানীর হরিণরূপধারী ভরত রাজার ন্যায় পূর্ব্বজন্মস্মৃতি ছিল। তাই শূকররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও অনুতাপ জানাইয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিল। অল্পদিনের মধ্যে ভোগবাসনা খণ্ডন হইয়া গেলে শীঘ্রই আবার মুক্ত ভক্তদেহে আসিবে।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বহুমূত্ররোগী ভক্ত কিশোরী চক্রবর্ত্তীকে প্রভু বন্ধু ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেন। প্রভু নিজে ভক্তের রোগ গ্রহণ

করিয়া আশ্চর্যজনকভাবে ভক্তকে রোগমুক্ত করেন। ডাহাপাড়া বন্ধুধামে আম্রবৃক্ষে বন্ধুসুন্দরের ঝুলনলীলায় ভক্ত কিশোরী প্রভুর সেবকরূপে প্রভুর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

প্রভুবন্ধু যাহাকে সংসারী হইতে হইবে বুঝিতেন, তাহাকে সংসারে পাঠাইতেন। ভবিষ্যতে কে সুরাপায়ী হইবে, কে অসৎসঙ্গে মিশিবে, তাহাও বলিয়া দিতেন। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিত। অনুবর্ত্তীদের অতীত-জীবনের বহু গুপ্ত কথা তিনি যথাযথ বলিয়া দিতেন। বন্ধু বলিতেন,—

"আমি দর্পণ-সদৃশ। আমার কাছে এলেই সকলের স্বরূপ প্রকাশ পায়। কারো কিছু গোপন থাকে না।"

কেহ মনে মনে পাপচিন্তা করিলেও, অন্তর্যামী বন্ধু-হরি তাহা যথাযথ বলিয়া দিতেন। কেহ গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য খাইলে, বা অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করিলে প্রভুর কাছে আসামাত্র তাহা প্রকাশ করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। তৎকালে প্রভুর ভয়ে ভক্তগণের পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যাইত। তাঁহারা দৈবাৎ কোন অন্যায় করিয়া ফেলিলে, বন্ধুকে বলিয়া পাপমুক্ত হইতেন।

ফরিদপুর একবার এক বালকভক্ত নিজের পাপকার্যের জন্য আত্মানুশোচনায় আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিল। বন্ধুসুন্দর তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাহার হাতে জল ও খাবার খাইয়া, "আর এমন ক'রো না, আমার শপথ" এই কথা শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন। এই বাক্যের অমোঘশক্তিতেই বালক রক্ষা পায়।

দৈবক্রমে পাপাচারী অনুবর্ত্তী ভক্তদিগকে স্বীয় অভয়পদে আশ্রয় দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন, "আজ থেকে তোরা মুক্ত ; 'বেদ

বিধি' পাপ-পুণ্যের অতীত হলি। আমি সব নিলাম। আমার মুখে তোদের পাপ প্রচার হওয়ায়, সবই পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল ; পাপ তোদিগকে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না। তোদের ভবিতব্য রইল আমার হাতে, যা কিছু সবই।"

এক সময় জটিয়া বাবা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য বালকৃষ্ণদেব নবদ্বীপে গভীর রাত্রে বড়ালঘাটে গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় নবদ্বীপ দাসজী শ্রীবাস আঙ্গিনার ঘাটে শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি প্রভুর আদেশমত বড়ালঘাটে যাইয়া প্রভুর দোহাই দিয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়া বালকৃষ্ণদেবকে রক্ষা করেন ও প্রভুর নিকট লইয়া আসেন। বালকৃষ্ণ একান্ত প্রভুভক্ত ছিলেন, তাঁহার মুখে মধুর মধুর বন্ধুকথা শুনিয়াছি ও তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি লীলাম্বুধি নামক নিজরচিত গ্রন্থে "ধন্য প্রভু জগদ্বন্ধু জগদুদ্ধারণ, মহাউদ্ধারণ প্রভু শ্রীহরিপুরুষ" ইত্যাদি মধুর মধুর বন্ধুগীত লিখিয়াছেন।

কোনও সময় এক বালকভক্ত পথিপার্শ্বে সুসজ্জিতা এক সুন্দরী বারবনিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। নারীমূর্ত্তির দিকে তাকান প্রভুর নিষেধ ছিল। ঐ কথা মনে হইতেই বালক অনুতপ্ত চিত্তে যেইমাত্র শ্রীঅঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি সর্ব্বজ্ঞ প্রভু মন্দির হইতে বলিলেন—

"বাবুজী, ও বাবুজী, অমন ফেল্ ফেল্ করে তাকিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে নেই। মোহ সব ভুলায়ে দেয়। পাপ—যোষিৎসঙ্গ মহাপাপ। আর কদাচ অমন ক'রো না। খুঁটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা

কর। দৃষ্টিপূত পথ, মনঃপূত বৈরাগ্য, মনে রাখিও।” বালক খুঁটি ছুঁইয়া ও প্রভুর আদেশে মটর পরিমিত গোময় ভক্ষণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রভু বজ্র অপেক্ষাও কঠোর ও নিরপেক্ষ ছিলেন,—আবার সময়ে কুসুম অপেক্ষাও কোমল ও ভক্তবৎসল ছিলেন। অনেক গুরুতর অপরাধেও প্রহ্লাদ সাহা প্রভৃতি গৃহী ভক্তকে ক্ষমা করিয়াছেন। আবার সামান্য অপরাধে গোপীকৃষ্ণ, ছোট জয়-নিতাই আদি ত্যাগীভক্তকে কঠোরতর শাসনও করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল,—“যোষিৎ ও বালকাদি পরিহার করিও।” “প্রকৃতি দর্শন ও স্পর্শনই পতন।” ব্রহ্মচারীর পক্ষে, বালকাদি দ্বারা পা টিপাইয়া লওয়া প্রভুর নিষেধ ছিল।

ছোট জয়নিতাই ত্যাগিবেশ লইয়া প্রভুর মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বে কিছুকাল নৈষ্ঠিকভাবে অঙ্গনে প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। সেই ত্যাগী অবস্থায় তিনি ১৩০৬ সনের মাঘমাসে রাত্রিকালে একটি রমণীকে বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ ঘটনা কেহই জানিত না। তিনি প্রত্যূষে প্রাতঃস্নান ও টহলাদি শেষ করিয়া আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রভু গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন,—

“তুমি গৃহে যাও, এ জীবনে অঙ্গনে এ'স না। বেশ ত্যাগ কর। যোষিৎ সংস্পর্শে তোমার দেহ কলুষিত হয়েছে।” পরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

“গৃহে যাও, বিবাহ কর, কলুষ দেহ ত্যাগ কর, মানস বৈরাগ্য কর। বন্ধু কাকচরিত।”

ছোট জয়নিতাই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও প্রভু টলিলেন না! বালক ভক্তগণ একদিন ছোট জয়নিতাইর প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য কাতরভাবে বন্ধুপদে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু তাহাতেও কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আদর্শ শিক্ষা দানের জন্য ছোট হরিদাসের ন্যায় ছোট জয়নিতাইকে বর্জ্জন করেন। বন্ধুর প্রিয় ভক্ত মনঃক্ষোভে আহার নিদ্রার অনিয়মে একমাসের মধ্যেই "হা বন্ধু! হা বন্ধু!" বলিয়া বন্ধুবর্জ্জিত দেহ বিসর্জ্জন দিয়া দিব্যদেহে বন্ধুসেবার অধিকারী হন।

কোন সময় শ্রীশ্রীপ্রভুর বৃন্দাবনে অবস্থানকালে গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় কতিপয় সমস্যায় পড়িয়া বন্ধুকে স্মরণ করেন। পত্রে বা মুখে তিনি কিছু না জানাইলেও, ঠিক প্রয়োজন সময় প্রভু পত্রযোগে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দেন।

প্রভু পত্রে আরও জানান, "অন্য মনে ছিনু। অকস্মাৎ অমঙ্গলের সূত্র ও ছায়া দেখতে পাই। বলিদান তথা জীবহিংসা মহাপাপ, মহা অশুভ জানবেন। হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট। তান্ত্রিকাচার। মহাকৈতব বৃত্তিমাত্র।"

পরে বন্ধুহরি যখন ব্রাহ্মণকান্দা ফিরেন, তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, কি ভাবে জগদ্বন্ধু তাঁহার জরুরী প্রয়োজনের কথা জানিলেন। তদুত্তরে প্রভু বলেন, "একান্তভাবে লিখব লিখব ভেবেছিলেন কিনা, তাই লেখা হ'য়ে গেছে। আমি ফকির মানুষ, তাই বুঝতে পেরেছি।" "কীর্ত্তনকারীদিগকে অবিচারে স্থান দিবেন। শ্রীনিতাই কৃপা করবেন।'

ফরিদপুর খাসকান্দিতে ভক্ত পূর্ণদত্তের নিকট একদিন একটি লোক আসিয়া সংবাদ দেয় যে, ময়মনসিংহ গৌরীপুরের বাসায় পূর্ণবাবুর পিতা কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী। সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া সেদিন পূর্ণবাবু বাহক দ্বারা নিজ মাতাকে ডুলি যোগে লইয়া বার্তাবহ সহ গৃহ হইতে রওনা হন ও রাত্রি প্রায় দশ-এগারটায় বদরপুরে শ্রীদেবেন সেনের বাসার কাছে পৌছেন। সেখানে পথের ধারে মাঠে চাদরে আবৃত অঙ্গ, শয়ান এক দীর্ঘকায় পুরুষকে দেখিয়া তিনি পথিপার্শ্বে মাতার ডুলি নামাইতে বলেন। সেই পুরুষোত্তমের অনাবৃত শ্রীমুখ হইতে দিব্যজ্যোতি বাহির হইতেছিল ; লোক দেখিয়া তিনি শ্রীবদনমণ্ডল আবৃত করিয়া মধুর কণ্ঠে 'কে রে' বলিয়া প্রশ্ন করিলেন। কিছুদূরে প্রভুর এক সেবক ভক্ত ছিলেন।

কণ্ঠস্বরে ও লক্ষণে প্রভুবন্ধুকে চিনিতে পারিয়া পূর্ণবাবু দূর হইতে প্রণামানন্তর নিজ পিতার কঠিন পীড়ার কথা প্রভুর নিকট কাতরভাবে নিবেদন করেন ও পিতার জীবন প্রার্থনা করেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রভু গম্ভীরভাবে বলেন "যাও ভয় নাই।"

পূর্ণবাবুর মাতা পুত্রের মাধ্যমে প্রভুর নিকট তাঁহাকে প্রণাম করিবার অনুমতি চাহিলে, স্পর্শ না করিয়া দূর হইতে প্রণাম করিতে প্রভু অনুমতি দেন।

ময়মনসিংহে পৌছিয়া পূর্ণবাবু অনুসন্ধানে জানিলেন যে তাঁহার পিতা ইহার মধ্যে একদিন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে দৈবকৃপায় পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতা সুস্থ হওয়ার পর পূর্ণবাবু ফরিদপুরে আসিয়া আঙ্গিনায় প্রভুর এক সেবক ভক্তের নিকট শুনিলেন যে.

বদরপুরে পূর্ণবাবুকে আশ্বাস দিবার পর প্রভু একসময় তাঁহার সেবককে বলেন, "পূর্ণর বাবার আর আয়ু ছিল না। কিন্তু কি করি? পূর্ণ ছাড়ে না। তাই তিন অঞ্জলি জল দিয়ে তার বাবাকে বাঁচালেম।"

পূর্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, যে দিন প্রভু তিন অঞ্জলি জল দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিনই তাঁহার পিতা 'যায়-যায়-অবস্থা'হইতে জীবন ফিরিয়া পান।

ভক্তপ্রাণধন বন্ধুহরি ভক্তের ব্যাকুলতায় ভক্তের সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া এইরূপ কত দুঃখ-ক্লেশভারই না সহ্য করিয়া থাকেন!

দত্ত মহাশয় প্রভুর সেবায় কিছু দিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনের অভিলাষ ছিল, প্রভু স্বয়ং কিছু আদেশ করেন। ১৩০৬ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন প্রভু কৃপাপূর্বক শ্রীপূর্ণ দত্তকে নিম্নরূপ এক ফর্দ লিখিয়া দেন,—

"১। কাপড় লাল পেড়ে ৪৮´ ইঞ্চি তিনখানি॥

২। সর্ব্বোল সন্দেশ চারি সের॥

৩। বালাপোষ দুইখানি।"

প্রভুবন্ধু শ্রীহস্তে দত্ত মহাশয়কে খাতায় কৃষ্ণ-ভজন ও মন্ত্রাদি লিখিয়া দেন। ঐ মূল-লিপি দেখিয়া এখানে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"শ্রীমতি!"

...

"চৈতন্যদাস শিষ্য।"

"শ্রীঅদ্বৈত পরিবার।+১। বটপত্রতিলক।
২। মঞ্জরী—প্রেমমঞ্জরী। ৩। সখী—বিশাখা।
৪। যূথ—কুন্দলতার। ৫। সেবা—মাল্যসেবা।"
"১। সিদ্ধ—স্বরূপ নাম—চৈতন্যদাস।
২। কৃতি—প্রচার। ৩। লক্ষ্য—জগদ্বন্ধু।
৪। ভাব—উদ্ধারণ। ৫। দশা – হরিনামী" (১)

প্রাচীন বন্ধুসেবকের মুখে শুনিয়াছি, প্রভুর সেবার্থ টাকা চাহিবার পর, কোন দাতা অশ্রদ্ধার সহিত টাকা দিলে, ঐ টাকা প্রভুর সেবায় লাগিত না। অন্যান্য ভক্তপ্রদত্ত টাকার সহিত ঐ টাকা মিশাইয়া রাখিলেও সর্বদ্রষ্টা প্রভু অঙ্গুলি নির্দেশে ঐ নির্দিষ্ট টাকাটি সেবককে দেখাইয়া সেই শ্রদ্ধাহীন দাতার নাম উল্লেখ করিয়া তাহার নিকট উহা ফেরত দিতে আদেশ করিতেন। আদেশও যথাযথ পালিত হইত।

অপূর্ব্ব দান ও হরিলুট

ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর অঙ্গন, ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন, রামবাগান প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে প্রভুবন্ধু সময় সময় অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব দান ও বিতরণ করিয়াছেন। সকলকে হরিনাম করিতে বলিতেন,—যখন কীর্ত্তনে আনন্দোল্লাস বৃদ্ধি পাইত, তখন তিনি লুট দিতে আরম্ভ করিতেন। ক্রমে ঘরের সমস্ত দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত লুট দিয়া আনন্দে করতালির ধ্বনি করিতেন।

হরির হাতে হরির লুট পাইতে ভক্ত অভক্ত সকলেই

৭

আসিতেন। আম, লিচু, বেদানা, খেজুর, আরও কত ফল, পাত্রভরা সন্দেশ, রসগোল্লা, বাতাসা, মিঠাই, ঘড়ি, আংটি ধর্ম্মগ্রন্থ, খেলনা, ছাতা, হারমোনিয়ম, কাগজ, পয়সা, টাকা, নোট, অসংখ্য নামাবলী, তুলসীমালা, সেমিজ, শাড়ী, নানাবিধ বস্ত্র, কম্বল, বালাপোষ, শাল, আলোয়ান, ছোটবড় নানা পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি অগণিত দ্রব্য বিলাইয়া দিতেন। এত দ্রব্য কোথা হইতে আসিত, কেহ জানিত না। ব্রাহ্মণ-কান্দাভবন হইতে প্রভু একবার বহুশত শিকারপুরের খোল বিতরণ করিয়াছিলেন।

একবার ভক্ত অভয় শীল প্রভুর আদেশ মত প্রভু-প্রদত্ত টাকা দিয়া একখানি সুন্দর কম্বল ও আরও কিছু আবশ্যক দ্রব্য কিনিয়া আনেন। প্রভু তখন ঐ কম্বলখানি শ্রীঅভয়কে গায় দিতে বলেন। আদেশ পালিত হইলে প্রভু বলেন, "বেশ মানিয়েছে, তোর বউকে দেখায়ে আন।" এইভাবে ভক্তকে নানাদ্রব্য দান করিয়া, ভক্তের সেবাসুখে বন্ধুহরির চিরদিনই পরম উল্লাস।

প্রভু কখনও কখনও আধমণ একমণ করতাল ও দুই-তিন কুড়ি খোল কিনাইয়া আনিয়া ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। আশা, সোঁটা, বিউগেল, হ্যারিকেন, রাখালী পোষাক ইত্যাদি দ্রব্যও গ্রামবাসী কীর্ত্তনদলকে দিয়া দিতেন।

একদিন রামবাগানে কীর্ত্তনান্তে প্রভু বলিলেন, "তোরা যা চাস্, তাই দিব।" কেহ চাহিল টাটকা রসগোল্লা, তাকে একহাঁড়ী রসগোল্লা দিলেন, কেহ চাহিল, ট্যাকশাল হইতে তৈয়ারী নূতন টাকা, তাকে তাই দিলেন। পীতাম্বর বাবাজী চাহিলেন,

"ব্রজের পাথেয়," প্রভু তাঁহাকে একজোড়া করতাল দিলেন। এরূপ অভূতপূর্ব্ব দান প্রভুতেই সম্ভব। বিতরণের পর দেখা যাইত, প্রভু নিজে একটুক্রা ছেড়া ন্যাকড়া পরিয়া কিংবা সম্পূর্ণ দিগম্বর হইয়া আছেন।

ফরিদপুর মোহান্তপাড়ায় একদিন তুমুলকীর্ত্তনে প্রভু বাতাসা-বৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহা উঠানের চল্লিশহাত পরিমিত স্থানে আধহাত পুরু হইয়াছিল।

প্রভুর রন্ধনের অপূর্ব্ব আস্বাদ ছিল। বাদল বিশ্বাস মহাশয় এক সময় মুগ ডাইল খাইতে পারিতেন না. খাইলেই বমি হইত। অন্তর্য্যামী প্রভু একদিন স্বয়ং মুগডাল রান্না করিয়া গ্রহণ করিবার পর, বিশ্বাস মহাশয়কে প্রসাদ পাইতে বলেন। বিশ্বাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, প্রভুর প্রসাদী মুগডাল খাইয়া সেইদিন হইতে তাঁহার বমির দোষ ভাল হইল, ঐরূপ সুস্বাদু ডাইল, তিনি আর কখনও আহার করেন নাই। সুরেশবাবু প্রভুর প্রদত্ত দধির মধ্যস্থিত রসগোল্লা গ্রহণ করিয়া এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আস্বাদ পাইয়াছিলেন। চম্পটী মহাশয় প্রভৃতি বহু ভাগ্যবান্ ভক্ত প্রভুর অপ্রাকৃত প্রসাদ আস্বাদনের অধিকারী ছিলেন। ভক্তকে প্রভু নিজ হাতে অমূল্য প্রসাদ বিতরণ ও পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া চির আপন করিয়া লইয়াছেন। ভক্তসুখদাতা-বন্ধু কখন কখন নিজ হাতে আম, কদলী, নারিকেল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ও চিঁড়া, দধি, মিঠাই আদি দ্রব্য পরিবেশন করিয়া ভাগ্যবান্ ভক্ত-গণকে খাইতে দিতেন।

অতুলনীয় ত্যাগ, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা

প্রভু জীবনে বহু অনশন উপবাস করিয়াছেন। অনেক সময় চট্ কি ছোণ খড়ের উপর ও পানের বরজে পাটখড়ি-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। দিবাভাগে তিনি অন্তের দৃষ্টির অলক্ষ্যে থাকিতেন। বিশেষ বিশেষ কারণে নিজের ইচ্ছা ছাড়া কখনও জলটুকু পর্য্যন্ত কাহারো সম্মুখে গ্রহণ করিতেন না। দেখা গিয়াছে, প্রভুর জন্য প্রস্তুত কোন খাদ্যদ্রব্যে কোন ভক্তের দৃষ্টি পড়িলে বা অন্তরে লোভ হইলে, ঐ খাদ্যদ্রব্য অন্তর্য্যামী প্রভুর কাছে লওয়ামাত্র তিনি সেই ভক্তের নাম করিয়া তাহাকে উহা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। সেইজন্য ভক্তগণ অতি সাবধানে ঢাকিয়া প্রভুর ভোগের দ্রব্য লইতেন। ঢাকায় রামশাহজীর বাগানে একদিন প্রভুর সেবার জন্য কয়েকখানি পরোটা ও আলুর তরকারী ভক্ত সুধন্ব সরকারের মাধ্যমে দেওয়া হইয়ছিল। ভক্ত সুধন্ব প্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ পাইবেন বলিয়া মনে মনে লুব্ধ হইয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু ভোগের সমস্তটাই উক্ত ভক্তকে ভোজনার্থ দিবার জন্য আদেশ করেন। প্রিয় ভক্ত তখন অতিশয় অনুতপ্ত ও চিরজীবনের জন্য প্রভুর সেবা-সম্পর্কে সাবধান হন।

একবার প্রভুর জন্য আনীত কয়েকটি আম দেখিয়া একজন ভক্ত লুব্ধভাবে ঐ আমের প্রশংসা করেন। রমেশবাবু প্রভুর কাছে উহা দেওয়া মাত্র, তিনি সেই ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে ঐগুলি ভোজনার্থ দিবার জন্য আদেশ করেন।

ফরিদপুরে একজন ভক্ত একবার প্রভুর জন্য একটি সুপক্ক কাঁঠাল লইয়া যাইতেছিলেন। পথে এক বৈরাগী কাঁঠালটির

দাম জিজ্ঞাসা করেন। উহা প্রভুর জন্য লওয়া হইতেছে শুনিয়া তিনি লজ্জায় নিজ জিহ্বা দংশন করেন। কাঁঠালটি সেবকের কাছে পৌছান হইলে, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভু এক কাগজে উক্ত বৈরাগীর নাম লিখিয়া তাহাকে উহা দিবার জন্য আদেশ করেন। আদেশ পালিত হয়।

লোক-সংস্পর্শ হইতে প্রভু সতত সতর্ক থাকিতেন। বিশেষতঃ নারীজাতিকে তিনি "প্রকৃতি", "যোষিৎ" ব্যতীত অন্য নামে অভিহিত করিতেন না, তাঁহাদিগকে কখনও নিকটে আসিতে দিতেন না, বা তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। লোকচলাচলের পথে না চলিয়া অনেক সময় তিনি মেঠো পথে অতি দ্রুতগতিতে, নিঃশব্দে চলিতেন, ভক্তগণের পক্ষে তাঁহাকে দৌড়াইয়া ধরাও কঠিন হইত। গৌরকিশোর সাহা মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, একবার মেঠো পথে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি আসিতেছিলেন। দূরে লোক আসিতেছে দেখিয়াই প্রভু কেমন যেন বর্ত্তুলাকার কূর্মাকৃতি হইয়া নিকটবর্ত্তী খাদে বলের মতন গড়াইয়া পড়েন। দেহের ঐরূপ অভূতপূর্ব্ব আকৃতি কি প্রকারে হইল, তাহা ভাবিয়া ভক্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলা অভিনয় দেখিয়া প্রভু অতি অসাধারণ দীর্ঘকায় অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়েন, দেহে নানা ভাববিকার প্রকাশিত হয়; রাজর্ষি বনমালী অতি সন্তর্পণে শিবিকাযোগে প্রভুকে প্রাসাদে আনিয়া হরিনাম সহ শুশ্রূষা করেন। পরে তালাবদ্ধ প্রাসাদ কক্ষ হইতে প্রভু স্বেচ্ছায় অদৃশ্য হন।

একক ভ্রমণে কখন কখন বিপদ্‌ভঞ্জন প্রভুকেও লীলাবশতঃ

বিপদ্ স্বীকার করিতে হইত। মথুরার এক শেঠজি প্রভুকে তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট জামাতাজ্ঞানে ডাকিয়া আনিয়া এক প্রকোষ্ঠে আটক রাখিয়া তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রভু নিজেকে "প্রভু জগদ্বন্ধু" বলিয়া পরিচয় দিয়া সত্যতা প্রমাণের জন্য রাজর্ষি বনমালী রায়কে সংবাদ দিতে বলেন। সংবাদ পাইয়া পরদিন রাজর্ষি আসিয়া দেখেন, কক্ষ তালাবদ্ধভাবেই আছে, কিন্তু প্রভু নাই, ঘরখানি তাঁহার অপূর্ব্ব অঙ্গগন্ধে আমোদিত। পরমার্থে শেঠজি পরম ভাগ্যবান্, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রভু লোকের ব্যবহৃত ঘরে থাকিতেন না বলিয়া বিদেশে ভ্রমণকালে দারুণ শীতে পাঞ্জাব প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে রেল-ষ্টেশনের নিকট অনাবৃত মাঠে রাত্রি কাটাইয়াছেন।

দীর্ঘকাল প্রভু স্বপাক অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন; আবার অন্নাদি ত্যাগ করিয়া মাত্র ফলাদি গ্রহণ করিয়াছেন, কখন কখন মাত্র সিদ্ধ তরকারী লইয়াছেন ও বহুদিন উপবাসও করিয়াছেন। তিনি আসনস্থ হইয়া কত রাত্রি সহজে কাটাইয়াছেন। লোক-সংস্পর্শ এড়াইতে কখন কখন স্বহস্তে স্বমস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন।

'*যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*'

পাবনায় জয়নিতাই কোনও সময় তাঁহার 'ব-কলম' গ্রহণ করিবার জন্য প্রভুবন্ধুর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। বন্ধুহরির নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইবার কালে জয়নিতাই মাঝে মাঝে উহা স্মরণ করাইয়া প্রভুকে বলিতেন, "সে কথা মনে

আছে ত ?" ভক্তকে চির আশ্বস্ত করিয়া সহাস্য অভয় বরদ আস্যে বন্ধুচন্দ্র প্রাণারাম মধুর কণ্ঠে উত্তর দিতেন, "সেই ব-এর কথা !"

একবার বাকচরের মিত্র গোপালকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর প্রভুবন্ধু স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। খালিলপুরের হরিমিত্র গৃহের পার্শ্বে পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কে যায় ?" মিত্র মহাশয় উত্তর দেন, "আমি গোপাল মিত্র।" পুনরায়, "সঙ্গে কে আছে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে সুচতুর মিত্র মহাশয় গুপ্তধন বন্ধুকে গোপন করার উদ্দেশ্যে বলেন, "একজন মুটে আছে।"

রহস্য করিয়া ভক্ত এইরূপ উক্তি করিলেও বন্ধুহরি আনন্দ প্রকাশ করিয়া নির্জ্জন পথে ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "আমি সত্যই তোমাদের সকলের মুটে—ভবের মুটে।"

কলিকাতায় বন্ধুভক্তা শান্তিরক্ষিতের নিকট ভক্তের নিমিত্ত প্রভুর যোগক্ষেম বহনের এক অপূর্ব্ব ঘটনার বর্ণনা নিম্নোক্তরূপ শুনিয়াছি।

ঐ ভক্তার মাতা প্রভুবন্ধুর শ্রীমূর্ত্তির পাদপদ্ম নিত্য তুলসী চন্দনে অর্চ্চনা করিতেন। একদিন ঘটনাক্রমে তুলসী সংগ্রহ না হওয়ায় ও বন্ধুচরণে তুলসী-চন্দন দিতে না পারায়, ভক্তা অতি আকুল ভাবে প্রভুর স্মরণে অশ্রুপাত করিতে ও তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন। এমন সময় গবাক্ষ পথে তাকাইয়া দেখেন, দূরে শূন্যে বিন্দু বিন্দু কতকগুলি বস্তু শ্রেণীবদ্ধভাবে ভাসিয়া আসিতেছে। ক্রমে তাঁহার পূজার আসনের কাছে ঐগুলি আসিয়া পড়িলে দেখা গেল, একরাশি টাট্‌কা আবশ্যক তুলসীপত্র।

প্রভু অভূতপূর্ব্বভাবে ভক্তকে তুলসীপত্র যোগান দিলেন। আনন্দাশ্রুপাত ও প্রভুর জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভক্তা বন্ধুহরির পূজা সম্পন্ন করিলেন।

প্রভুবাক্যে দৃঢ় নিষ্ঠা ও ব্যাধিমুক্তি

প্রভুর মৌনের পূর্ব্বে গোয়ারী কৃষ্ণনগরনিবাসী সর্ব্বসুখ সান্যাল নিত্য ব্যায়ামশীল দৃঢ়-বলিষ্ঠদেহ স্বাস্থ্যবান্ যুবা ছিলেন। তখন একদিন তাঁহার গৃহের পার্শ্ব দিয়া নবদ্বীপধামে গমনকালে সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভুবন্ধু সুস্থ দেহে ব্যায়ামনিরত সর্ব্বসুখজীকে দূর হইতে দেখিয়া অনুগামী ভক্ত জগচ্চন্দ্র লাহিড়ীকে বলেন, "ওর দেহে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে; অচিরে ব্যাধিগ্রস্ত হবে।" ভক্তমুখে প্রভুর ভবিষ্যদুক্তি শুনিয়া বলিষ্ঠ যুবক সর্ব্বসুখ হাসেন। কিন্তু ইহার কয়েকদিন পরেই তিনি কঠিনরূপে রোগাক্রান্ত হন। চিকিৎসকের উপদেশে তিনি তখন কক্ষমধ্যে মোজা পায়ে ও উত্তম গরম বস্ত্রাচ্ছাদনে থাকিতেন, তৎকালে সর্ব্বপ্রকার শীতল দ্রব্যের সংস্পর্শ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভক্ত জগচ্চন্দ্র ব্যস্ত হইয়া অপর একদিন প্রভুবন্ধুর নিকট এই কথা নিবেদন করেন। বন্ধুহরি তখন ভক্তের মাধ্যমে সর্ব্বসুখজীকে খড়িয়া গঙ্গায় উষাস্নান করিতে আদেশ করেন। ইহার পর প্রভুবাক্যে বিশ্বাসী সর্ব্বসুখ চিকিৎসক ও আত্মীয়স্বজনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পীড়িত দেহেই গঙ্গায় উষাস্নান করিয়া সুস্থবোধ করেন এবং কয়েকদিন উষাস্নানের পর সম্পূর্ণ নিরাময় হন। ঘটনাটি নিজে সর্ব্বসুখজীর মুখে শুনিয়াছি।

অলৌকিক শক্তি ও লীলামাধুর্য্য

প্রভুবন্ধু কখনও কখনও এমন সব অলৌকিক কার্য্য করিতেন, যাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বন্ধুপ্রিয় ভক্ত নবদ্বীপদাদার মুখে শুনিয়াছি, একবার প্রভু দিল্লীর উচ্চপ্রাচীর বেষ্টিত ভিক্টোরিয়া গার্ডেনের মধ্যস্থ পুষ্করিণীতে যাইয়া স্নান করিয়া আসেন। ঐ বাগানের দ্বার তৎকালে সকল সময় বহু অস্ত্রশস্ত্রধারী প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত থাকিত। বন্ধু সকলের অলক্ষ্যেই যাতায়াত করিলেন।

সমস্তরাত্রি তিনি কখনও একক, কখনও বা ভক্তগণকে লইয়া শ্মশানে, মাঠে, বা নদীতীরে অবস্থান করিয়াছেন; কোন কোনদিন সারারাত্রি ভক্তগণকে উপদেশ দিয়াছেন ও তত্ত্বকথা বলিয়াছেন। প্রভু নিজেকে চিরজাগ্রত বলিতেন, দেবগণেরও মহানিশাক্ষণে মোহনিদ্রা ঘটে, কিন্তু প্রভুর কৃপা-শক্তিতে কোন কোন ভক্ত জিতনিদ্র হইয়া তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অমৃতমধুর বাণী শুনিয়া মহাসুখে রাত্রি কাটাইয়াছেন। কোন কোন রাত্রিতে প্রভু আসনস্থ হইয়া শ্রীঅঙ্গন-কুণ্ডে বা নদীতে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন।

রোগপ্রতিকার ও যোগবিভূতিকে প্রভু অতি তুচ্ছ, বুজরুকি, ফাঁকি, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি বলিয়াছেন। তথাপি ভক্তের লালসায় ও প্রভুর সাময়িক ইচ্ছায় ভক্তগণ সময় সময় প্রভুর অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ফরিদপুর, বাকচর ও রামবাগানের ভক্তগণ সময় সময় কওর অথবা কাঠের বাক্সে প্রভুকে উঠাইয়া কাঁধে করিয়া আনন্দে

পরিভ্রমণ করিতেন। বন্ধু কখনও কখনও ভক্ত দ্বারা "হরিবোল" প্রচারার্থ ও পথের জনতা দূরীকরণার্থ শবের অভিনয়ে গমনাগমন করিতেন। ভক্তস্কন্ধে কখনও কখনও তাঁহার ওজন তুলার মত হালকা বোধ হইত; আবার কখনও বা তিনি এত ভারী হইতেন যে, ভক্তগণ তাঁহাকে নামাইয়া রাখিতে বাধ্য হইতেন। কথাচ্ছলে প্রভু নিজের অঙ্গ দেখাইয়া বলিতেন—"এ দেহকে ইচ্ছামত হালকাও করা যায়, ভারীও করা যায়, ছোটও করা যায়, বড়ও করা যায়, ধলাও করা যায়, কালও করা যায়।"

রামবাগানের ভক্তগণ কোন কোন দিন শেষরাত্রে প্রভুকে ডুলি-পাল্কীতে বসাইয়া গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতেন। একদিন পথে পুলিস উহাতে "কে আছে" বলিয়া দেখিতে চাহিলে, দেখা গেল প্রভু তন্মধ্যে নাই। পুলিস চলিয়া গেলে দেখা গেল, প্রভু যথাস্থানেই আছেন।

সুরেশবাবু প্রমুখ কয়েকজন বাবুশিষ্যভক্ত একবার প্রভুর পায়ের জন্য বার নম্বর ও চৌদ্দ নম্বরের দুইজোড়া রবারের পাদুকা আনিয়াছিলেন, যে জোড়া পায়ে লাগে, সে জোড়া রাখিয়া যাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। প্রভুর চরণে পর পর দুইজোড়াই পরিয়া দেখাইলেন, দুইজোড়াই ঠিক ঠিক পায়ে লাগিয়াছে, একটুও ছোট বা বড় হয় নাই। ভক্ত অবাক্ হইয়া দুইজোড়াই প্রভুর জন্য রাখিয়া গেলেন। ঢাকায় ভক্তবর পূর্ণঘোষও এইরূপ ভাবে দুইজোড়া পাদুকা আনিয়াছিলেন। ছোট বড়, দুই জোড়াই প্রভুর চরণে ঠিক লাগিয়া যায়। বন্ধুসুন্দর বলেন, 'দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি আমারই হাতে।' 'মুনলাইটের

দেহ, সময়ে বাড়ে ও কমে।' 'জুতার সুকৃতি আছে, তাই আমার কাছেই রইল।'

ঢাকাতে বালক কালিন্দীর একটি নূতন ছোট কোট প্রভু তাঁহার বিরাট দেহে পরিয়াছিলেন, কোটটি তাঁহার শরীরে ঠিক ঠিক লাগিয়া অতি সুন্দর মানাইয়াছিল। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, শ্রীরমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিয়াছিলেন—"ওরে আমার মুনলাইটের (চাঁদের জ্যোৎস্নার) দেহ, ছোট বড় সবই লাগে। তোর জামার ভাগ্য ছিল, তাই আমার দেহে এলো।" অতঃপর প্রভু বালক কালিন্দীকে প্রসাদী জামা ফেরত দেন।

মৌনাবস্থার পূর্ব্বে এক সময় বন্ধুহরি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কালীনাথের প্রাণের ব্যাকুলতায় তাহাকে দিগম্বর মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন। প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ণুলক্ষণ সুপ্রকট দেখিয়া কালীনাথ চিরবন্ধুদাস হইয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীমথুরানাথ পদরত্ন ছিলেন এক সংস্কৃত টোলের পণ্ডিত। টোলের নিকট ছদ্মবেশী নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নেহালক্ষেপা মধ্য রাত্রের পর "আমার ঠাকুর নিল কে রে" বলিয়া এবং প্রভাত হইলেই "আবার দিয়া গেছে রে" বলিয়া চীৎকার করিতেন। পদরত্ন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, ক্ষেপার ঝোলাস্থিত রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ গভীর রাত্রে শচীনন্দন গৌররূপে এক বিগ্রহ হন, আবার প্রভাতে রাধাকৃষ্ণরূপে দুই তনু হন। ভক্তের বিগ্রহ জাগ্রত, সাক্ষাৎ উহা দেখিয়া প্রেমশক্তি-মুগ্ধ মথুরানাথ ক্ষেপার অনুগত শিষ্য হইলেন।

পদরত্নের পিতা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বৈরাগীদের হরিনাম-

কীর্ত্তনে বিরূপ ছিলেন ; তাঁহাদের হীন নীচ মনে করিতেন। একদিন রাত্রে পথে সপরিকর মহাপ্রভু স্বর্ণোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কীর্ত্তন-সহ তাঁহাকে দিব্যদর্শন দান করিয়া আত্মসাৎ করেন। পরে গৌরসুন্দর একক তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া বিহারী কুম্ভকার দ্বারা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ঐখানে স্থাপন করিতে আদেশ করেন।

এদিকে বিহারীর নিকটও সেই বালকরূপী গৌর প্রভাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেহের মাপ রাখিতে বলেন এবং এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া, সেই আকারে ও ভাবে এক বিগ্রহ প্রস্তুত করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হন। এই ঘটনার পর বিহারী ও বিত্তারত্ন দৃঢ়ভাবে বুঝিলেন যে, ঐ বালকই গৌরাঙ্গসুন্দর। তখন টোলটি হরিসভায় পরিণত হইল এবং গৌরাঙ্গসুন্দরের ঐরূপ বিগ্রহ নির্মিত হইয়া 'নবদ্বীপ হরিসভায়' প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রতিষ্ঠার দিন কীর্ত্তন মহোৎসব হয়। কৃপাপ্রাপ্ত বিহারী সেইদিন হরিসভার নিকট এক বৃক্ষে হেলান দিয়া গৌরধ্যানে শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন। সে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। নেহালক্ষেপা এর মধ্যে শিষ্য মথুরানাথকে তাঁহার সেই যুগল বিগ্রহ দিয়া যান এবং 'নবগৌর' হরিসভায় আসিবেন এই অগ্রবার্ত্তাও দেন।

ইহার পর সত্য সত্যই নবগৌর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর একদিন বিদ্যুদ্-গতিতে গৌরসুন্দরের মন্দিরে স্বয়ং প্রবেশ করেন। মথুরানাথের পুত্র শিতিকণ্ঠ প্রথমে প্রভুর দর্শন পান। পুত্রের নিকট বার্ত্তা পাইয়া পিতা 'নবগৌরাঙ্গ'কে চিনিলেন। হরিসভায় ক্রমে বন্ধুসুন্দরের অনেক মধুর লীলাখেলা চলিতে থাকে।

পরবর্ত্তী কালে গৌরসুন্দরের পাশে বন্ধুসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার নিত্য সেবা পূজা চলিতে থাকে। তথায় নিত্য পাঠ-কীর্ত্তনাদি হয়। "বন্ধু বলে কালে কালে কত কিবা হবে হায়!" শ্রীধাম নবদ্বীপে মহানামমঠে টোটা গোপীনাথও গৌরাঙ্গ-সুন্দরসহ মধ্যস্থলে বন্ধুসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে কুসুম-সরোবরে প্রভুবন্ধু একবার প্রিয়ভক্ত শ্যামদাসজীকে দিব্য দিগম্বর মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ভক্ত শ্যামদাসজী শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুকে একবার বালক মূর্ত্তিতে, অন্যবার বিরাটকায় মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন। সুরমাতা বৃন্দাবনে একদিন দেখিয়াছিলেন, প্রভুর বিরাট বপু প্রকাণ্ড দরজা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে।

কুসুমসরোবরের তীরে শ্যামদাসজী একদিন লক্ষ্য করেন, প্রভু ধীরে ধীরে চলিতেছেন, আর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগলের উপর শূন্য হইতে চন্দনমাখান কচি কচি পত্র-সহ তুলসীমঞ্জরীর গুচ্ছ পড়িতেছে,— অপূর্ব্ব সুগন্ধে ঐ স্থান আমোদিত। কিছুক্ষণ পর পর ঐরূপ কয়েক গুচ্ছ পড়িয়াছিল। ভক্তবর ঐ অমূল্য প্রসাদ সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের অদৃশ্য কত দিব্যশক্তি প্রভুর পূজা করিয়াছেন। শ্যামদাসজীর মুখে এসব বার্ত্তা শুনিয়াছি। পাবনায় প্রভুর স্থিতিকালে কলেজের ছাত্র অতুল মীরবহর একদিন প্রভুকে প্রশ্ন করেন, ভগবান্ আছেন, তার প্রমাণ কি? প্রভু উপস্থিত সকলকেই চক্ষু নিমীলিত করিয়া যার যার ইষ্ট চিন্তা করিতে বলেন। সকলে ঐরূপ করিলে, তথায়

দিব্যগন্ধ বহিতে থাকে ; চক্ষু মেলিয়া সকলে দেখেন প্রভু অদৃশ্য, কিন্তু সুগন্ধ বহিতেছে। কয়েকদিন পর মীরবহর এলাহাবাদ হইতে তাঁহার এক বান্ধবের পত্রে জানিতে পারেন, যুগপৎ একই দিনে একই কালে প্রভু পাবনা ও এলাহাবাদ উপস্থিত ছিলেন। নরবপু ধারণ করিলেও প্রভু যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই আছেন, ভক্তগণ তাহা অভ্রান্তরূপে অনুভব করিলেন।

ফরিদপুরে মৌনাবস্থায় প্রভু গৃহে আবদ্ধ থাকা কালে, কাশী ও অন্যান্য স্থানের কোন কোন ভক্ত, তাঁহাদের অবস্থিতি স্থানেই প্রভুর দিব্যদর্শন পাইয়াছেন। প্রভু গৃহের ভিতর আছেন, সে অবস্থায় একজন শিবভক্ত দেখেন, প্রভুর গৃহে বেড়া নাই, দিব্যমূর্ত্তিতে প্রভু বসিয়া আছেন, ক্ষণকালপরেই তিনি তাঁহার হরগৌরীমূর্ত্তি দর্শন করিতে না করিতে দেখেন, তথায় কেহই নাই, গৃহখানি পূর্ব্ববৎ চারিদিকে বেড়া দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। শ্রীঅঙ্গন নীরব।

অঙ্গনে ধলাশ্যাম দাস একদিন শেষরাত্রে মন্দিরের বাহিরে এক দীর্ঘকায় মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ মূর্ত্তি যে হঠাৎ কোথায় বিলীন হন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। বাদল বিশ্বাস মহাশয় উহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রভুর নিকট লোকের দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে নানা দিব্য অলৌকিক শক্তি গতায়াত করিয়া থাকেন। প্রভু তখন মহামৌনী।

রাধাকুণ্ডে কুন্দন ব্রজবাসী প্রভুর প্রিয় ছিলেন। ঐ অঞ্চলে লোকে প্রভুকে "ঘুঙ্‌টেওয়ালে" "মৌনীবাবা" বলিতেন। ব্রজবাসীর অন্তরে সাধ ছিল, প্রভুর প্রসাদী দ্রব্য কিছু পান। অন্তর্য্যামী

প্রভু একদিন বাংলাদেশে যাওয়া কালে তাঁহাকে তাঁহার প্রসাদী মটকা বস্ত্র দিয়া যান। ব্রজবাসী ঐ বস্ত্র স্পর্শ করিতেই তাঁহার দেহ অপূর্ব্ব অনুভূতিতে আলোড়িত হইয়া উঠে, বস্ত্রে যেন কি এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি মাখান ছিল। এ বার্ত্তা ঐ ব্রজবাসীর মুখে শুনিয়াছি।

মহামৌনী প্রভু। শ্রীঅঙ্গন নীরব। ভক্ত কালোশ্যাম ও ভক্ত শ্রীরামগোবিন্দ কিছু অনুভবের আশায় গভীর রাত্রে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। কাণে মন্দিরমধ্য হইতে নৃত্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন কয়েকজন অপূর্ব্বতালে নৃত্য করিতেছেন। অথচ মন্দিরে আছেন প্রভু একক। এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দুইজনেই অঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। কালোশ্যামের দেহ গড়াইতে গড়াইতে পশ্চিম দিকের তারের বেড়া পর্য্যন্ত সেই অদৃশ্য শক্তি চালাইয়া লইয়া গেল। সেখানে তাঁহার দেহ এক চটে জড়াইয়া পড়িয়া রহিল। দুইজনেরই বহুক্ষণ আর উঠিবার শক্তি ছিল না। উঠিবার শক্তি হইতেই তাঁহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

বাকচরের প্রাচীন বন্ধুভক্তগণের মুখে শুনিয়াছি, একবার এক অভিচারক বাউল কোনও কারণে প্রভুর প্রতি অতিক্রুদ্ধ ও জাতবিদ্বেষ হইয়া এবং স্বীয় অভিচারক বাণ প্রয়োগ বিদ্যাসিদ্ধি বিষয়ে গন্ধান্ধ হইয়া বাকচর মন্দিরে স্থিত প্রভুবন্ধুর বিনাশ কামনায় বহিরঙ্গণ হইতে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বাণ প্রয়োগ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত বাউলের মুখ হইতে ফেনোদ্গম ও ক্রমে শোণিত

ক্ষরণ হইতে থাকে এবং তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্যগণ গুরুর এবম্বিধ শোচ্যদশা দেখিয়া তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া তাহাদের গুরুর গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হয়। বাউলের গুরুদেব শিষ্যকে বন্ধু কথা ও হিত উপদেশ দিয়া বলেন যে, জগতের বন্ধু জগদ্বন্ধু, জগতের প্রভু জগৎপ্রভু। তাঁর প্রতি ঐরূপ বাণ প্রয়োগে অপরাধ ঘটেছে। সেই অপরাধ খণ্ডনের জন্য প্রভু বন্ধুকে স্মরণ করে তাঁর চরণে শরণ নিলে পরিণামে কুশল হবে। গুরুর উপদেশ শিষ্যের চৈতন্যোদয় হয় ও সুমতি ঘটে। চরমে উক্ত বাউল প্রভুর স্মরণে প্রভুর শরণাগত হন এবং শ্রীহরির শরণাগতের লভ্যা উত্তমা গতি প্রাপ্ত হন।

বৃন্দাবনধামে বন্ধুভক্ত বালক নবদ্বীপ ব্রজবাসী সময় সময় বন্ধুসুন্দরের স্নেহপ্রদত্ত প্রসাদী দ্রব্যাদি পাইয়াছেন। উত্তরকালে প্রভুর কৃপায় ইনি একজন অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক ও কীর্ত্তনশিক্ষাচার্য্য বলিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য বহুস্থানে সমাদৃত হন।

একবার রাধাকুণ্ডে স্থিতিকালে, প্রভু একদিন রাজর্ষিকে জানান যে, পরদিন দ্বিপ্রহরে মহাদেবের মন্দির পার্শ্বস্থিত তেঁতুলবৃক্ষরূপধারী এক মহাপুরুষ দেহ রাখিবেন, অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রভুর আদেশে তেঁতুল-বৃক্ষসহ বনখণ্ডী মহাদেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মহাউদ্ধারণ "হরেকৃষ্ণ" তারকব্রহ্ম নামে আনন্দে সংকীর্ত্তন হইতে থাকে। দ্বিপ্রহরে বিনা ঝড়বৃষ্টিতে উক্ত বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ মন্দিরের ক্ষতি না করিয়া বিপরীত দিকে ঢলিয়া পড়িলেন।

পরিক্রমণে ভক্তদের অসুবিধা না হয়, এইজন্য বৃক্ষরাজ একটি শাখার সাহায্যে কিছু উঁচু হইয়া শায়িত হইয়াছিলেন। ভক্তগণ আনন্দে চব্বিশ প্রহর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৩০১ সনে একদিন বৃন্দাবনে যমুনাতীরস্থ এক শ্মশানে প্রভুর সহিত শিতিকণ্ঠ মহাশয় আছেন, এমন সময় সর্পাঘাতে মৃত এক বালককে লইয়া তাহার মতাপিতা আত্মীয়স্বজন কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু উহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মধুরস্বরে মৃত বালকটিকে "রে লালা! রে লালা!!" বলিয়া ডাকিতেই বালকটি সজীব হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—

"কস্য পিতা কস্য মাতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিদেবনা॥"

শ্লোকটি বলিয়াই বালক আবার পূর্ব্ববৎ মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে, এবং "উহার ব্রজপ্রাপ্তি হইয়াছে", প্রভুর এই সান্ত্বনায়, ঐ শোকার্ত্ত পরিবারের শোক প্রশমিত হইল।

রাধাকুণ্ডতীরে ডাক্তার শ্রীপ্রমথচন্দ্র প্রমুখ কতিপয় ভক্ত একদিন দূর হইতে লক্ষ্য করেন যে, বন্ধুসুন্দর শূন্যদেশে আদর করিয়া হাত নাড়িতেছেন। পরে জিজ্ঞাসার উত্তরে বন্ধু বলেন,— "ধবলী এসেছিল, আদর চাইতে। আনন্দে আমার গা চাট্‌ছিল।" অতঃপর প্রভু ধবলীর চোনায় সিক্ত স্থান দেখাইলেন, তখনও সেখানে ধোঁয়া উঠিতেছিল। ভক্তগণ গোমূত্র সিক্ত সেই অতুল অমূল্যরজঃ গায়ে মাখিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

ফরিদপুরে একদিন গভীর রাত্রে নিশাভ্রমণে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তবর শ্রীবাদল বিশ্বাস ও কেদার কাহা যাইতেছিলেন।

অকস্মাৎ প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "জগৎ মাতালে জগৎ, জগদ্বন্ধু নাম দিয়ে রে"। প্রভুর আদেশে ভক্তদ্বয় আনন্দে তালে তালে ঐ পদ গাহিতে লাগিলেন, আর বন্ধুসুন্দর আগে আগে হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া নিজ মহানাম আস্বাদনে চলিতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ চিত্র দেখাইলেন, জগৎ জগদ্বন্ধু নামে মাতিবে।

একবার বৃন্দাবনযাত্রী প্রভু হাওড়া ষ্টেশনে বিশ্রাম কক্ষের দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়া চম্পটী মহাশয়কে টিকিট কিনিয়া আনিতে বলেন। গাড়ী ছাড়িতে ঘণ্টাখানেক দেরী। কোথা হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিবেন, এই কথা চম্পটী মহাশয় প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলেন,—"ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দিবে।" চম্পটী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে চলিতে চলিতে বিডন স্কোয়ারের নিকট এক খাবারের দোকানে শিখা-কণ্ঠীমালাধারী এক অপরিচিত বৈষ্ণবকে দেখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার প্রভু বলিয়াছেন—ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দিবে। দোকানী জিজ্ঞাসা করিলেন—কত টাকা দিতে হইবে? চম্পটী মহাশয় বলিলেন—পঞ্চাশ টাকা সাড়ে নয় আনা। কীর্ত্তনীয়া দোকানী মুকুন্দ ঘোষ তাঁহার বাক্সের সমস্ত টাকা পয়সা গণিয়া আশ্চর্যজনকভাবে দেখিলেন ঠিক পঞ্চাশ টাকা সাড়ে নয় আনা আছে, উহা তিনি ঠাকুর চম্পটীকে তখনই দেন। পরে তিনি পরম বন্ধুভক্ত রূপে পরিগণিত হন।

ঢাকা বরুণ্ডি গ্রামে শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার নিয়োগী সপরিবারে বন্ধুভক্ত। তাঁহার মুখে অনেক অমিয় বন্ধুবার্ত্তা শুনিয়াছি। প্রভুবন্ধু একদিন গভীর রজনীতে শ্রীব্রজেন্দ্রকে তাঁহার অনুগমন

করিতে বলেন। এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভু ভক্তকে বলেন, "আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত, একপাও নড়বি না।" অতঃপর প্রভু অদৃশ্য হইলে, এক ভীষণাকার ক্রূর সর্প শ্রীব্রজেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকে। বন্ধুবাক্যে দৃঢ়নিষ্ঠ ভক্ত বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া একই স্থানে অবিচলিত ভাবে থাকিয়া বন্ধুস্মরণে হরিনাম করিতে থাকেন। ভক্তের অতুলনীয় ভক্তিনিষ্ঠা প্রভাবে খল ব্যাল অল্পকাল মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যান্তর ধ্বান্ত-বিনাশী হেমজ্যোতিঃ বন্ধুশশী তথায় উদিত হইয়া সহাস্যে প্রিয়-ভক্তকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, "ভয় পাস্ নাই ত ?" শমনভয়বারী বন্ধুহরির একান্ত শরণাগত কৃপাভাজন ভক্ত যে নিত্য চিরদিনই লব্ধবিজয়, চিরনির্ভয়, মৃত্যুঞ্জয়, এই সত্য তথ্য ভক্তজীবনধন বন্ধু এইরূপ ভক্তমনোহর লীলা করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

গোয়ালচামটনিবাসী ভক্তবর গৌরকিশোর সাহা মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, প্রভু এক অমাবস্যা তিথিতে সাহা মহাশয়কে কিছু সেবার দ্রব্য, দিবসে না আনিয়া রাত্রিতে আনিবার জন্য আদেশ করেন। অমাবস্যা রাত্রিতে একা শ্রীঅঙ্গনে আসিতে গৌরকিশোর ভীত হইলে, প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "আসিস্, তোর ভয় নাই। আঙ্গিনায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখবি।" গৌরকিশোর সেবার দ্রব্য সহ সেই রাত্রে আঙ্গিনায় আসিয়া দেখেন, প্রভুবন্ধু মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার দিব্য অঙ্গদ্যুতিতে আঙ্গিনা ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত আলোকে আলোকিত। পথে আসিবার কালে

সাহা মহাশয় কুণ্ডের তীরে শ্বাপদের জলপানের মত শব্দ শুনিয়াছিলেন ; বন্ধুহরির চিন্তায় মগ্ন থাকায়, তখন ওদিকে বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। পরে প্রভু জানাইলেন, একটি বাঘ ওখানে জলপান করিতেছিল। তখন ভক্তের প্রাণে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, বন্ধুহরির শরণাগতজনের পথ সর্ব্বদাই বিপদ্‌মুক্ত, তাহার চিত্ত বাঘ বা যমভয়ে বিচলিত হয় না।

ভক্তের মনে প্রভুকে অন্নভোগ দিবার সাধ ছিল, কিন্তু মনে আতঙ্ক, সাহাজাতি কি করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণকুমারকে অন্ন দিবেন ? অন্তর্য্যামী বন্ধু নিজেই ভক্তের অন্ন চাহিয়া উহা পাইয়া "মহা অন্ন এনেছিস" বলিয়া ভক্তের গৌরব আদর বাড়াইয়াছেন।

একবার আঙ্গিনায় প্রভু হরিদাস মোহান্তকে জানাইলেন যে, তাঁহার দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে, অমুক পরিমাণ শুক্‌না মরিচের গুঁড়া, অমুক পরিমাণ সরিষার তৈলে জ্বাল দিয়া তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে, নাসিকায় ও নাভিতে ঢালিলে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে, তাঁহার জ্বালা দূর হইবে। ঐরূপ সাংঘাতিক কার্য্য করিতে হরিদাস প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই, কিন্তু প্রভু কাতরভাবে বালকের মত আবদার করিতে থাকায়, অবশেষে হরিদাস প্রভুবাক্য পালন করেন। তৎপুত্র মনোমোহন মোহান্ত বলিয়াছেন যে, ঐ বিষাক্ত তৈল সবটুকুই প্রভুর দেহে শুষিয়া মিশিয়া গিয়াছিল।

সময় সময় প্রভু দুই দিবস, তিন দিবস, এমন কি দ্বাদশ দিবস অনশনে থাকিয়াছেন। আবার এককালেই আটাশটি ত্রিশটি ডাবজল পান করিয়া, কয়েক ডজন লিমোনেড জিঞ্জারেড্ রোজেড্

ইত্যাদির জল উদরস্থ করিয়া, দেড়সের দুইসের পরিমাণ গরম কটুঘৃত পান করিয়া প্রচুর পরিমাণে নিম্বাদি তিক্ত সেবন করিয়া আহার ব্যাপারেও অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন।

প্রত্যক্ষ বন্ধুলীলাদর্শী জয়নিতাই ও নবদ্বীপদাসজীর মুখে শুনিয়াছি, গাভীগণ প্রভুকে দেখিলে উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গা চাটিত। আনন্দে হাম্বা হাম্বা রব করিত। এমনও দেখা গিয়াছে, বাছুর ফেলিয়া গাভী বন্ধুর কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতেছে। বন্ধু যখন মধুর কণ্ঠে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিতেন, তখন ধেনুগণ পাগলের মত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত। কেহ কেহ দড়ি ছিঁড়িয়া প্রভুর কাছে ছুটিয়া আসিত।

শ্রীরমেশচন্দ্রের কাছে শুনিয়াছি, বনের পশুও প্রভুকে চিনিত ও মানিত। একদিন রমেশচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে যাইতে যাইতে দেখেন, একটি শৃগাল একদিকে যাইতেছে। প্রভু শৃগালটিকে ডাকিয়া দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যদিকে যাইতে নির্দ্দেশ করিলেন। শৃগালটি প্রভুর দিকে তাকাইয়া অমনি প্রভু প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিল। প্রভু তখন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বনের পশুও আমার কথা শুনে। কিন্তু দু'ঠেঙে মানুষ বড় চালাক, আমার কথা শুনে না, হিত বল্‌লে অহিত করে, ডাইনে যেতে বল্‌লে, বাঁয়ে যায়।"

এ সংসারে মাতাপিতা যদি দেখেন, তাঁদের সন্তান অসৎসঙ্গে আমোদ স্ফূর্ত্তি করিতেছে তখন তাতে বিশেষ আপত্তি করেন না, বা তেমন বাধা দেন না, কিন্তু তাঁহাদের সন্তান যদি কোনও সাধুসঙ্গে সাধু হইয়া যায়, তবে সেই সাধুর প্রতি ঘোরতর ক্রুদ্ধ

হইয়া পড়েন। প্রভুর প্রতিও, পাবনা ও ফরিদপুরে কতিপয় অভিভাবক ও অভিভাবিকা ঐরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিদারুণ উৎপীড়ন করিয়াছে ও গুলি করিয়া বা বিষ-আদি প্রয়োগে তাঁহার প্রাণসংহারেরও চেষ্টা করিয়াছে।

গোয়ালচামটে ভক্ত নিতাই কবিরাজের বাগানে প্রভুর স্থিতিকালে একদিন কোনও ভক্ত তাঁহার মাতৃদত্ত দধি উপহার লইয়া প্রভুর কাছে উপস্থিত হন। উহাতে বিষ আছে, একথা প্রভু জানাইলে, পরীক্ষার্থ একটি কুকুরকে উহা খাইতে দেওয়া হয়। উহা খাওয়া মাত্র কুকুরটি অচৈতন্য হইয়া পড়ে। সামনে জীবহত্যা না ঘটে, এই জন্য প্রভু কুকরের মাথা থাবড়াইয়া উহাকে সুস্থ করেন। তখন প্রভুর ক্ষমা, অন্তর্য্যামিত্ব ও জীবে দয়া দেখিয়া ভক্তগণ অভিভূত হইয়া পড়েন।

তৎকালে ফরিদপুরস্থ তুলাগ্রামের মাঠের একস্থানে ত্রিকোণাকারে তিনটি বটগাছ ছিল। লোকে ঐ স্থান দিয়া যাইতে দিবাভাগেও ভয় পাইত। একদিন গভীর রাত্রে প্রভু ঐস্থানে য,ইয়া আসনস্থ হইয়া বসেন, সঙ্গে ভক্ত কেদার শীল (আদরের 'কাহা') প্রভুর বস্ত্র লইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, কিছুক্ষণ পর তথায় তিনি "ডুগ্‌ডুগু তা, ডুগুডুগু তা" এইরূপ বাদ্যধ্বনি শুনিতে পান, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পান নাই। তিনি ভয়ে প্রভুর পরিহিত কাপড়ের খুঁট ধরিয়াছিলেন। প্রভু মাঝে মাঝে "যা যা" বলিতেছিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, রাজকন্যার ন্যায় অতি সুন্দরী, সুসজ্জিতা কয়েকটি নারীমূর্ত্তি পূজার্ঘ্য ও আরতির দ্রব্যাদি

লইয়া প্রভুসহ বৃক্ষ তিনটিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়া অদৃশ্য হইল। ইহার পর শেষরাত্রে প্রভু স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে বিনা ঝড় বৃষ্টিতে ঐ তিনটী বটগাছ উন্মূলিত হইয়া পড়িয়া যায়। শ্রীঅঙ্গনে আগত তুলাগ্রামের এক মুসলমান অধিবাসীর মুখে শুনিয়াছি, ঐরূপে গাছ উপড়াইয়া পড়িবার ব্যাপার তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অন্তর্যামিত্ব-আদি অলৌকিক শক্তি জানিবার জন্য সময় সময় পরীক্ষা করিতেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে কোলাঘাটে যাইয়া কোলাঘাট-নিবাসী ভক্তবর তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রমাণ পাইয়াও কয়েকবার প্রভুকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে "উদ্ধারণ" খাতায় লিখিয়া দিয়াছিলেন ;—

"তুমি পরীক্ষা করিও না। কারণ পরীক্ষায় মৃত্যু ঘটায়। পরীক্ষায় আত্মা পচিয়া যায়। আত্মা পচাই শবত্ব।"

"আমি হরিনাম মহানাম নাম মাত্র!"

"তারক জানিতে চান প্রভুর বার নাম, অনন্তানন্ত"। এই কথা লিখিয়া "হরি, মহাউদ্ধারণ, পুরুষ, জগদ্বন্ধু" ইত্যাদি দ্বাদশ নাম নিজ হস্তে প্রভু লিখিয়া দেন। গুরুবন্ধু বাণীতে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

নানা তত্ত্বোপদেশ প্রসঙ্গে প্রভু ভক্ত তারককে বলেন, "আমি পৃথিবীর কেন্দ্র, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে নেই।"

এক সময়ে তারক গাঙ্গুলী মহাশয় পত্নীবিয়োগে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তধন প্রভু একদিন মধুর

ভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিলেন, "তারক বউ রে, মা রে বলে কাঁদে।" অতি সামান্য কথাই প্রভুর শ্রীমুখে উচ্চারিত হইয়া মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করিয়াছিল। ঐ মুহূর্ত্ত হইতেই গাঙ্গুলী মহাশয়ের পত্নী-বিয়োগজনিত শোক তাপ প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল।

প্রভুর গতিস্থিতি ও স্বাতন্ত্র্য

বিদ্যালয়ের পাঠত্যাগের পর বন্ধুসুন্দর এক সময় কয়েকমাস নিরুদ্দিষ্টভাবে থাকিয়া বিদেশে বিভিন্ন দূরবর্ত্তী স্থানে ইউরোপ খণ্ডেও পর্য্যটন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। নানাদেশ পর্য্যটনে প্রভু কখন কখন একক যাইতেন, সময় সময় তাঁহার আদেশ মত ভক্তগণের কেহ কেহ সঙ্গে থাকিতেন। ট্রেনে বা ষ্টিমারে প্রায়ই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন। গদী থাকিলে গদী উল্টাইয়া কম্বল পাতিয়া বসিতেন। সম্ভব হইলে, সঙ্গে তুলসী-টব ও গঙ্গাজলের পাত্র রাখার ব্যবস্থা হইত।

নূতন স্থানে যাইয়া তিনি অন্যের অব্যবহৃত নবনির্মিত গৃহে অথবা হোয়াইট্ ওয়াশ (চূনকাম) করা গৃহে, তদভাবে গোশালায় অবস্থান করিতেন। নূতন মৃৎপাত্রে মলাদি ত্যাগ করিতেন, ভক্ত সেবক উহা পরিষ্কার করিতেন। অন্যের ব্যবহৃত পায়খানায় প্রভু যাইতেন না। তিনি কলের জল ব্যবহার করিতেন না, গঙ্গা বা কোন পুষ্করিণী হইতে আনীত জল ব্যবহার করিতেন। প্রভুর

শৌচকার্য্যের জন্য কলসীভরা জল, ঝুড়িভরা মৃত্তিকা-গোময়াদির ব্যবস্থা রাখিতে হইত। তাঁহার অবস্থান-মন্দির, তাঁহার নির্দ্দেশ মত বাহির হইতে তালা দ্বারা বন্ধ রাখা হইত। তিনি নিজের ক্ষৌরকার্য্য নিজেই করিতেন, কখন বা ভক্ত দ্বারাও করাইতেন। ভক্ত অভয়শীল বলিয়াছেন, উভয় হস্ত ধুইয়া, নাসারন্ধ্রে তুলসীপত্র দিয়া প্রভুর ক্ষৌরকার্য্য করিতে হইত, যাহাতে সেবকের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রভুর গায় না লাগে সেজন্য যথেষ্ট সাবধান থাকিতে হইত। প্রভুর ক্ষুর পৃথক্ থাকিত।

একসময় প্রভু স্বপাক গ্রহণ করিতেন। একসময় উপর্য্যুপরি কিছুদিন তিনি ডাল তরকারী একত্র সিদ্ধ করিয়া লইয়া উহাই গ্রহণ করিতেন, অন্নাদি লইতেন না। কখন কখন বা তিনি অগ্নিপক্ক কোন খাদ্যই লইতেন না। প্রায় সমস্ত কাজেই নিকটে গোময় ও তুলসীর টব রাখা প্রভুবন্ধু পছন্দ করিতেন। নগর-সংকীর্ত্তনে দুইটি তুলসী টব সঙ্গে লইতে বলিতেন। ভক্ত প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, সংকীর্ত্তনে প্রভুর মোহ-মূর্চ্ছা-দশা ঘটিলে, তাঁহার পূর্ব্ব উপদেশ-অনুযায়ী তাঁহার কর্ণমূলে তুলসীপত্র দিয়া হরেকৃষ্ণ নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা হইত, তাহাতে ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যদশা ফিরিত।

প্রভু যখন বৃন্দাবনাদি দূর দেশে থাকিতেন, তখন বাংলাদেশের অনেক ভক্ত প্রভুর শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোগ নিবেদন করিতেন। ভক্ত-প্রদত্ত দ্রব্য চিত্রে থাকিয়াও প্রভু যে গ্রহণ করেন, তাহা তিনি কে কবে, কি নিবেদন করিয়াছিল, জানাইয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া ভক্তগণকে আনন্দিত করিতেন। কোন্ কোন্ দিন ভক্তগণ মন-

প্রাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রভু তাহা বিদেশ হইতে আসিয়া বলিতেন, অমুক পাখীরূপে আসিয়া অমুক চালে বসিয়া তিনি কীর্ত্তন শুনিয়াছেন। যে ভক্তটি পাখীটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিতেন।

প্রভুবন্ধু বহুবার কলিকাতায় (রামবাগান হরিসভা, চাষা-ধোপাপাড়া, ছকু খানসামার লেন, আলমবাজার, শেঠের বাগান, কুমারটুলী, গৌরলাহা ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে) অনেকবার পাবনায় (প্রসন্ন লাহিড়ীর বাড়ী, বৈদ্যনাথ চাকীর বাড়ী, দীনবন্ধু বাবাজীর বাড়ী ও কালাচাঁদপাড়া), তাড়াসে (রাজর্ষির মন্দিরে বহুবার) বহুবার শ্রীবৃন্দাবনে (জ্ঞানগুধরী অযোধ্যাকুঞ্জ, লছমীরাণীর কুঞ্জ, কেশীঘাট ছত্রিশগড় রাজার বাড়ী, কুসুম সরোবর, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে) অনেকবার শ্রীনবদ্বীপে (হরিসভা, রাইমাতার বাড়ী, জগদিদির বাড়ী প্রভৃতি স্থানে) অনেকবার ঢাকায় (রামশাহর বাগান, নবাবপুর, মৌলভীবাজার প্রভৃতি স্থানে) যান। কুড়ি হইতে চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রভু বার চার জন্মস্থান ডাহাপাড়া গমন করেন। পূর্ব্বেই ডাহাপাড়ায় নিজ জন্মরহস্য চম্পটী মহাশয়কে বলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর একবার ডাহাপাড়া গঙ্গাতীরে নরসুন্দর চন্দ্র দ্বারা নিজ মস্তক মুণ্ডন করান, সাবিত্রী চতুর্দশীর পূর্ব্বদিবসে। শুনা যায়, প্রভু সেবার নিজের গলার রুদ্রাক্ষ মালা ন'মাকে উপহার দেন। আর একবার প্রভু-বন্ধুসুন্দর বহরমপুর হইতে চম্পটী ঠাকুর ও হরিচরণ, জগদীশ আদি প্রায় সত্তর জন ভক্ত সহ আসিয়া নিজ জন্মভিটায় ন'মা রোপিত দাড়িম্ববৃক্ষ সংকীর্ত্তনসহ চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, প্রভুর আদেশে

সেখানে মুদ্রাপূর্ণ একটি ঘটী প্রোথিত করিয়া তুলসীমঞ্চে তুলসীচারা লাগান হয় এবং সমবেত ভক্তগণ ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া মহানন্দে তুমুল কীর্ত্তন করেন। আর একবার প্রভু ভক্ত কিশোরী চক্রবর্ত্তী সহ ডাহাপাড়া জন্মভূমিতে আসিয়া এক আম্রবৃক্ষে ঝুলনের ব্যবস্থা করিয়া ঝুলন খেলা খেলেন।

এতদ্ব্যতীত চন্দননগর, ময়মনসিংহ, নগরবাড়ী, কালিকাবাড়ী, আলোকদিয়া, টেপাখোলা প্রভৃতি স্থানে প্রভু গমন করিয়াছেন। দিল্লী, রাওলপিণ্ডি, রাজপুতানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি দূর দূর স্থানেও তিনি অনেক বেড়াইয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া শেষভাগে তিনি ফরিদপুর সহরের উপকণ্ঠে গোয়ালচামট গ্রামে ১৩০৬ সনে স্থাপিত শ্রীঅঙ্গনধামেই থাকিতেন। এইস্থানে একাদিক্রমে, একই কুটিরে ষোল বৎসর আট মাস কাল মহা-মৌনাবস্থায় অবস্থান করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা, ঢাকা, বাকচর, ব্রাহ্মণকান্দা ও বদরপুরেও সময় সময় থাকিয়াছেন।

ভক্ত রামকুমার ও রামসুন্দর মুদী ভ্রাতৃদ্বয় প্রদত্ত জমিতে প্রভুর গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গন, ১৩০৬ সনে, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ দিন ভোর হইতে কীর্ত্তন তুমুল রোলে চলিতে থাকে। অপরাহ্নে প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারে সাতদলে চৌদ্দমাদল নগরকীর্ত্তন বাহির হয় ও হরিনামের মহারোলে সহর-গগন মুখরিত হইয়া উঠে।

প্রভু নিজ অঙ্গন সম্পর্কে স্তুতি কথা লিখিয়াছেন ঃ

"আঙ্গিনা—ধর্ম। আঙ্গিনা—পবিত্র। আঙ্গিনা—শুচি। আঙ্গিনা—নিষ্ঠা।" "ব্রাহ্মণকান্দা বাড়ী, আঙ্গিনা। শ্রীগৌরাঙ্গ

ধাম, শ্রীনিতাই ক্ষেত্র। নিষ্ঠায় রক্ষা। অন্যথা শ্মশান। শেয়াল শ্বাপদের বাস।" "বাকচর অঙ্গন—শ্রীনিতাই অঙ্গন, শ্রীনিতাই ধাম।" "আঙ্গিনার বাতাসে পাপ তাপ পুড়ে ছাই হবে। আমার ও আমার আঙ্গিনার হাওয়ায় বাঁচিও।"

প্রভুর শ্রীঅঙ্গন ও আবির্ভাব ভূমি ডাহাপাড়া বন্ধুধাম, একাধারে অক্ষয় নিত্য বৃন্দাবন ও নবদ্বীপধাম। পরতত্ত্ব কৃষ্ণ-গৌরবন্ধুর আবির্ভাব ও স্থিতিলীলাস্থল, নিত্য হরিধাম। তৎতৎ-স্থানে 'সদা সন্নিহিতো হরিঃ।'

মৌনের পূর্বে প্রভু বন্ধুহরি দেবীমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "দিদি, একবার ডাহাপাড়া যেও।" এইকথা শুনে দেবীমা তাঁর প্রিয় জগতকে বলেন,—ওখানে যেয়ে কি হবে? ওখানে কি আছে?

তদুত্তরে বন্ধুসুন্দর বলেন, "ওখানেই তোমার সব কিছু।" এই সব কিছুই জীবের পরমধন, দেবীমার প্রিয়তম বন্ধুহরি স্বয়ম্, নিত্যবস্তু।

যিনি 'রসো বৈ সঃ', সেই আদি হরিপুরুষের আবির্ভাব স্থল নিত্য চিন্ময়ভূমি ডাহাপাড়া জগদ্বন্ধুধাম। শ্রীহরির ধরাধামে প্রকাশ যেমন তাঁর স্বেচ্ছাধীন, তাঁর ধামের প্রকাশও তাঁর ইচ্ছাধীন।

প্রভুবন্ধুর আবির্ভাবের প্রায় চব্বিশ বৎসর পর প্রভুবন্ধু একদিন তাঁর প্রিয় হরিবোল শ্রীচম্পটী সহ বৃহৎ এক কীর্তনের দল বহরমপুর হইতে নিয়া ডাহাপাড়ায় নিজ জন্মভিটায় উপস্থিত হন। তাঁর জন্মভিটায় ন'মা রোপিত দাড়িম্ব বৃক্ষ তিনি চারিবার প্রদক্ষিণ

করেন এবং সেস্থানে মুদ্রাপূর্ণ, যেন অদেয় রাধাপ্রেমধনভরা, একটি ঘটী প্রোথিত করেন। প্রভুর নির্দেশে ঐস্থানে একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপন করা হয়। ভক্তগণ মহানন্দে খোলকরতালে কীর্তন করিতে করিতে কীর্তনেশ্বর প্রভুবন্ধুকেও প্রদক্ষিণ করেন, আবার বহুবার জন্মভিটাও প্রদক্ষিণ করেন। হরিকীর্তনে মুদ্রাদি বহুদ্রব্য হরিলুট দেওয়া হয়।

আহা! 'হা কীটপতন' প্রভু বন্ধুহরি কীটজীবের কৃষ্ণবিমুখতা-রূপ পতন, আত্মঘাত-নিবারণকল্পে এবং জীবত্রাণ ও পাবনের জন্য নিত্য বৃন্দাবন হইতে এই ক্লেশময় ধরায় নিজের পতন, অবতরণ, আগমন সঙ্ঘটন করিয়াছেন! এই বন্ধুধামে তাঁর চিন্ময় জন্মভিটা তাঁর মহাউদ্ধারণ লীলার মূল উৎস! জয় জগদ্বন্ধু হরি॥

"রজে দোষ নাই"

একবার প্রভুবন্ধু শ্রীধাম বৃন্দাবনে আছেন। একদিন দোকানে টাটকা পকৌড়ি ভাজা হইতেছে দেখিয়া তৎকালে ব্রজবাসিনী সুরমাতা উহা প্রভুর সেবায় দিবার ইচ্ছা করেন। ঐ সময় দোকানী হস্তাঙ্গুলি সাহায্যে নাক ঝাড়িয়া ঐ হাত না ধুইয়াই কাজ করিতে থাকায় সুরমাতা ঐ দ্রব্য আর ক্রয় করিলেন না। ইচ্ছামত সেবার দ্রব্য আনিতে না পারায় উক্ত মাতা কিছু ক্ষুণ্ণমনে প্রভুর অবস্থান মন্দিরের বাহিরের দিকে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইলে, সর্ব্বান্তর্য্যামী বন্ধু তাঁহার ভক্তের অন্তরের ব্যথা বুঝিয়া ভিতর হইতে বলিয়া উঠেন, "রজে দোষ নাই।"

সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভুর মুখে ব্রজরজের মাহাত্ম্য শুনিয়া ও উহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সুরমাতার মন হইতে অনাচার দর্শনজনিত ক্ষুণ্ণতা ও ব্রজবাসীর প্রতি বিরূপতা দূর হইয়া চিত্তপ্রসাদ জন্মিল। অতঃপর ভক্তিময়ী মাতা প্রভুর সেবায় ঐ দ্রব্য দিবার সুব্যবস্থা করেন।

বন্ধুর লীলাবৈচিত্র্য

প্রভু সময় সময় বিচিত্র বেশ পরিতেন। এক সময় প্রভু কলিকাতা গৌরলাহা ষ্ট্রীটে ছিলেন। তথায় পর পর কয়েক দিন সন্ধ্যায় তাঁহার অবস্থান মন্দিরের ছাদে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। ইহাতে নিকটবর্ত্তী লোকেরা মনে করে, চম্পটী ও নবদ্বীপ দাস কোনও বড় ঘরের সুন্দরী বউ বা মেয়ে বাহির করিয়া আনিয়াছে। উহারা লম্পট।

প্রভু বাহিরে আসিয়া কথা বলিতেন না। লোকেও সত্য পরিচয় বুঝিত না। ফলে ভক্তগণের ভাগ্যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইত। ভক্তের লাঞ্ছনায় প্রভু আনন্দে হাসিতেন। ভক্তগণ পরমানন্দ পাইতেন। এমন রঙ্গলাল প্রভুকে সেবা করা বড় সহজ ছিল না।

এক সময় চম্পটী মহাশয় আলমবাজার কালীকৃষ্ণঠাকুর মহাশয়ের বাগানবাড়ী এক-কোঠা-বিশিষ্ট এক ঘরে প্রভুর থাকার ব্যবস্থা করেন। কালীকৃষ্ণঠাকুর প্রভুর সেবার্থ এক হাজার টাকা ভক্তহস্তে অর্পণ করেন। প্রভু তাহা নিজে লন নাই। প্রভুর আদেশে চম্পটী মহাশয় তাহা দ্বারা খোল করতাল কিনিয়া বিভিন্ন

সংকীর্ত্তন দলে বিতরণ করেন। ঐখানে রমেশচন্দ্র প্রভুর সেবাকার্য্য করিতেন। প্রভুর পত্র পাইয়া বৃন্দাবন হইতে রামদাসজী আসেন ও তিনি ঐস্থানে প্রত্যহ প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন।

প্রভু প্রত্যহ উষায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন। ঐ অবস্থায় প্রভুকে দেখিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এক কর্ম্মচারী মনে করে যে, চম্পটী এক সুন্দরী রমণী বাহির করিয়া আনিয়া বাগানে রাখিয়াছে। তাহার মনিবের কাছে সে ঐরূপ অভিযোগ করে। তদুপরি একদিন কোন ঘটনায় প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত চম্পটী মহাশয় উক্ত জমিদারের ইষ্টের প্রতি কোন মর্য্যাদা-হানিকর আচরণ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ রাজা-বাহাদুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পারিষদসহ বাগানবাড়ীতে প্রভুর উদ্দেশ্যে অভিযান করেন।

দ্বাররুদ্ধগৃহে প্রভু চৌকির উপর মশারির মধ্যে বিশ্রাম করিতেছেন, সেবক রমেশচন্দ্র মেঝেতে কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের তর্জ্জন-গর্জ্জনে রমেশচন্দ্র ঘরের দরজা খুলিয়া দেন। ঠাকুর মহাশয় রমেশচন্দ্রকেই প্রভু জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অপমান করিতে উদ্যত হওয়ামাত্র প্রভু মশারির মধ্য হইতে মাধুর্য্যমণ্ডিতস্বরে বলিয়া উঠেন,—"কে রে, কালীকৃষ্ণ ?"

প্রভুর কণ্ঠের এমনই মোহিনী শক্তি যে, ঐ ডাকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকালীকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া পড়েন, এবং অভিভূত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। মশারির মধ্যে থাকিয়া প্রভুবন্ধু শ্রীহস্তাঙ্গুলি বাহির করিয়া দেখান। তদ্দর্শনে

কালীকৃষ্ণ "কি সুন্দর! কি সুন্দর!! ইষ্টের দর্শন পেয়েছি, ইষ্টের দর্শন পেয়েছি" বলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়েন। তাঁহার ক্রোধ-ক্ষোভ দূর হইয়া পরম প্রশান্তি লাভ হয়। এই ঘটনার বর্ণনা কিছুটা অন্য রকমও শোনা যায়। একই ঘটনা বিভিন্ন ভক্তের মুখ হইতে এক আধটু বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হওয়ায়, এই ভেদ ঘটে। তবে সকলেরই বর্ণনার উদ্দেশ্য এক, কল্যাণ বিধান, উদ্ধারণ কার্য্য।

ঐ ঘটনার পর বিষয়ী সংস্রবে থাকিতে প্রভু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া পরদিনই রামবাগানে চলিয়া আসেন। রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, ঐ বাগানে জমিদার-প্রেরিত রাজোচিত ভোগদ্রব্যাদি প্রভু কিছুই স্পর্শ করিতেন না। ভক্তগণ সেখানে পৃথক্‌ভাবে প্রভুর সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভক্তগণকে প্রভু নানা মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। গোপাল মিত্রকে "জ্যেঠা", কেদার শীলকে "কাহা", কখনও বা 'উপানন্দ' 'ঠাকুর গোসাই' কহিতেন। বালকভক্তদের কাহাকেও "সোয়াতিনহাত", কাহাকেও "নেপোলিয়ন", কাহাকেও "বোতল", আখ্যা দিয়াছিলেন। কাহাকেও কাহাকেও "ব্রহ্মচারী" উপাধিও দিতেন। কৌতুক করিয়া "দুঃখীরাম ঘছ" "কৈঁদু মিঞা" "নফরধীপ ধাছ" ইত্যাদি মধুর সম্বোধন করিতেন, অথবা কাগজে ঐরূপ লিখিতেন। তাঁহার লিপিতেও নানা রহস্য কৌতুক দেখা যাইত। একটি বড় 'ঞ' লিখিয়া তাহার মধ্যে দুই তিনটা 'ঞ' বসাইয়া দিতেন। বড় কাগজে সুন্দর স্পষ্ট অক্ষরে সমস্ত লিখিতেন।

প্রভুবন্ধু কখনও কখনও মন্দির হইতে তাঁহার কীর্ত্তন বা

আদেশ-উপদেশ বলিয়া যাইতেন, কোন কোন ভক্ত বাহিরে বসিয়া উহা শুনিয়া লিখিতেন। কোথাও হ্রস্ব-ইকার কিংবা দীর্ঘ-ঈকার ইত্যাদি ভুল হইলে কিংবা লেখা বাদ পড়িলে, সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভু উহা বাহ্যতঃ না দেখিয়াই মন্দির হইতে তখন তখনই ভুলের কথা উল্লেখ করিয়া সংশোধন করাইয়া দিতেন। বন্ধু দর্পণ-সদৃশ সর্ব্বতশ্চক্ষু, কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না।

প্রভু ভজনাদি-সম্পর্কিত উপদেশের খাতায় "রামদাস", "কৃষ্ণচৈতন্য দাস" "হরেকৃষ্ণ দাস" "বৃন্দাবন দাস" "নবদ্বীপ দাস" ইত্যাদি নামকরণ করিয়া ভক্তগণকে আনন্দিত করিতেন। অতি প্রিয়গণকে সারিকা, রামী, রমারাণী, রমিকা, রমা, সুবল, বটু, সুবলরাণী, মধমঙ্গল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে চির আপন করিয়া লইতেন।

পুত্রবিয়োগে কাতর জয়নিতাই একসময় প্রভুকে "পুত্র" সম্বোধন করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া একস্থানে যাত্রাকালে জয়নিতাইকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "যাবার সময় পুত্রবানের মুখ দেখিয়া যাত্রা করিলে শুভ হয়। পুত্রবানের মুখ দেখিয়া যাই", এইকথা এমন মধুর ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে, জয়নিতাই বন্ধুসুন্দরকে পুত্রজ্ঞান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রশোক-ব্যথা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়াছিল।

জয়নিতাই একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রভুকে বলেন, "দয়াল নিতাইচাঁদের কি মহিমা!" প্রভু তৎক্ষণাৎ বলেন, "ছিঃ ওরূপ বলিতে নাই। মহিমা শব্দে ঐশ্বর্য্যের ভাব প্রকাশ হয়। বলিতে

হয়, নিতাইচাঁদের কি মাধুরী!" নিতাই-নিষ্ঠ জয়নিতাই এই সুন্দর সিদ্ধান্ত শুনিয়া আনন্দসমুদ্রে ডুবিয়া যান।

এক সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের এক চিত্রপট দেখাইয়া বন্ধুসুন্দর জয়নিতাইকে বলিয়াছিলেন—"আমাকে যোগী বা ব্রহ্মচারী মনে করিবেন না। আমার ভিতরে ইনি আছেন।" জয়নিতাই বলিলেন, "তিনি আছেন, এই বিশ্বাসেই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

জ্ঞানদীয়ার, স্বভক্ত শ্রীরজনীনাগকে, প্রভু লিখেন :

"তোমার ভজনের স্বরূপ আমাতে প্রত্যক্ষ করেছ। তুমি যে যুগল উপাসনা কর, আমি সেই। তোমার ভজনে ভুল নাই। অন্তে আমার সান্নিধ্যেই স্থান পাইবে। ইতি গুরু বন্ধু। ১২ই আশ্বিন, ১৩০৫। ঢাকা।"

উক্ত রজনীধামে প্রভু বন্ধুকে একাধারে রাধাকৃষ্ণরূপে দেখা পান।

একদিন নবদ্বীপ হরিসভায় আসনে উপবিষ্ট প্রভুবন্ধুকে সিতিকণ্ঠ মহাশয় নিবেদন করেন, প্রভু, আজ ঘরে সেবার দ্রব্য কিছুই নাই। অভেদ-শ্রীগৌরাঙ্গ বন্ধুহরি অমনি হরিসভার শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহবৎ যথাযথ দণ্ডায়মান হইয়া ঐপ্রকারে শ্রীহস্তদ্বয় মেলিয়া নিজেকে দেখাইয়া ঐরূপ নয়নভঙ্গী করিয়া অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন— "ওঁকে বল।" অবশ্য ভক্তের যোগক্ষেমবহনকারী প্রভুর কৃপায় যথাকালে সেবার দ্রব্য জুটিয়া গিয়াছিল।

এক সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে কৃষ্ণকথা আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রভু পিতলের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, আসন, পূজার দ্রব্য,

হ্যারিকেন প্রভৃতি আটদফা জিনিষের ফর্দ্দ করিয়া চম্পটী মহাশয়ের হাতে দিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দেন। মহর্ষি উহা পড়িয়া দ্বিপেন্দ্র ঠাকুর মারফত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে পরপর পাঁচদিন প্রশ্ন করেন। প্রভু চম্পটী মহাশয়ের মাধ্যমে তাহার উত্তর দেন। সে সকল তত্ত্বকথা ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ব্রাহ্মসমাজের প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া চম্পটী মহাশয় জনসাধারণে প্রচার করেন। আর একজন ভক্ত পরে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া দেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শেষভাগে উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহর্ষির আদেশে শ্রীদ্বিপেন্দ্র ঠাকুর চম্পটি ঠাকুরের কাছে প্রভুর ফর্দ্দ মত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ-আদি দিবার সুব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় আর একজন ভক্ত অতঃপর ঐ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া নিবেদন করেন।

প্রভুবন্ধু ঐ সময় একদিন চম্পটী মহাশয়কে বলেন, "তুই আর বেশী লেখালেখি করিস না। লিখে ও ছাপিয়ে তুই ওদের সর্ব্বস্ব হরণ করেছিস। তোর উদ্দেশ্য তো ওরা খোল করতাল ধরে। তা এখন ওদের তিন সমাজেই খোল করতাল বাজছে।"

বাকচরের মহিমদাসজীকে এক সময় বিবাহ ব্যাপারে পদ্মানদীর পথে যাইতে হইয়াছিল। ভাবী বিপদের চিত্র দেখিয়া ভক্তজীবন বন্ধু তাঁহাকে নৌকার পরিবর্তে ষ্টীমারে যাতায়াত করিতে বলিয়াছিলেন। প্রভুবাক্যে মনোযোগী না হইয়া মহিমদাসজী নৌকায় যান। ফিরিবার কালে নৌকায় প্রচণ্ড ঝড়ে বিপন্ন হইয়া প্রভুকে স্মরণ করিতে থাকেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল

নৌকাখানি কে যেন ঠেলিয়া তীরের দিকে আনিল। ভক্ত অঙ্গনে ফিরিয়া প্রভুকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই প্রভু তাঁহার শ্রীহস্তের রক্তাক্ত আঘাত-চিহ্ন দেখাইয়া জানাইলেন যে, তাঁদের নৌকা রক্ষা করিতে যাইয়া নিজ হাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তরক্ষায় প্রেমময় প্রভু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা যে ভক্তসঙ্গে থাকেন, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যে সকল ভক্তের কীর্ত্তনে ভাল তালমান থাকিত, তাহারা কীর্ত্তনকালে আনচিন্তাহেতু অথবা অসাবধানতা নিমিত্ত তাল ভঙ্গ করিলে প্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন, মনে হইত যেন তাঁহার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, ভাব ভঙ্গ হওয়ায় প্রাণে আঘাতহেতু কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

কিন্তু, যে ভক্তের গলায় সুর নাই বা তালজ্ঞান নাই, সেই ভক্ত বেতালে বেসুরে গাহিলেও ভাববাহী প্রভু নিজে খোল বাজাইয়া তাঁহাকে আরও গাহিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। বন্ধু সাহাজীর মুখে শুনিয়াছি প্রভুর আগ্রহে তিনি সময় সময় একা অঙ্গনে যাইয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া বেতালে করতাল বাজাইয়া হরিনাম করিতেন। আর তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া খোল বাজাইয়া প্রভু হাসিয়া বলিতেন, "তোর গাহন যে বাজায়, এমন কোন শালা বায়ান নাই।" প্রভুর এই বাক্যের ভাবটি এই, ভক্তের অন্তরের ভক্তিরসগ্রাহী প্রভু ছাড়া আর কাহারও পক্ষে ধৈর্য্য ধরিয়া বেতাল কীর্ত্তনে খোল বাজান সম্ভব নহে। এই ভক্তের পরে ভাল তালজ্ঞান হইয়াছিল।

এই বন্ধুপ্রিয় বন্ধুকে বন্ধুহরি একদিন বলিয়াছিলেন—"বন্ধো।

রে, ঘুড়ি উড়ায়ে দিছি, সুতো আমার হাতের মুঠে। যে যেদিক্ দিয়েই যাক্ না কেন, সকলকেই আমার কাছে আসতে হবে।"

এরোপ্লেন আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে সর্ব্বকালদর্শী প্রভু একদিন ভক্তগণকে বলেন—"ভারতবর্ষ হতে ইংলণ্ড মোটে দেড়দিনের পথ। কালে দেখবি ও বুঝবি; ফকিরের কথা সবই মেনে নিবি। কালে তোরা দেখতে পাবি, কত সহজ সুগমে, শুধু ইংলণ্ড কেন, সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ও পৃথিবীর সর্বত্র যাওয়া যাবে।"

একদিন কথাচ্ছলে চম্পটী ঠাকুরকে প্রভু বলেন—"ইংরাজেরা কি তোদের মত দু'হাত, দু'পাওয়ালা মানুষ! ইংরাজেরা অসুর। ওদের উত্তেজিত করলে, পৃথিবী হলাহলে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে। ওদের 'উইক পয়েন্টস্' (weak points) একমাত্র আমি জানি।"

পক্ষান্তরে প্রভু ইউরোপীয়দের সময়নিষ্ঠতা ও সুশৃঙ্খলার আদর্শ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন।

একবার কলিকাতায় গুরুবন্ধু চম্পটী মহাশয়কে তাঁহার শিক্ষক গণিতাধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের নিকট হইতে দুইশত টাকা আনিতে বলেন ও কোন্ ঘরে কোন্ বাক্সে ঐ টাকা আছে, তাহাও বলিয়া দেন। দে মহাশয়ের ঐ টাকাটি ঠিক তাঁহার নিজের নয় বলিয়া প্রথমে সে টাকার কথা মনে পড়ে নাই। পরে প্রভুর বাক্যমত চম্পটী মহাশয়ের কথায় তাহা স্মরণ হওয়ায় তিনি ঐ দুইশত টাকা আনিয়া দেন। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে প্রভুর সর্ব্বজ্ঞত্বের কথা ভাবিয়া অবাক্ হন। দে মহাশয় ঐ টাকা প্রভুর সেবার্থ দিয়া দেন।

কামজয়ী গৌরভক্তদের প্রশংসা করিয়া প্রভুবন্ধু একদিন চম্পটী মহাশয়কে বলেন,—

"কীট পতঙ্গ হ'তে উচ্চ উচ্চ দেবলোক ও ঋষিলোক এক মৈথুনে উন্মত্ত। একান্ত চৈতন্যদাস ভিন্ন কামজয় করিতে দেবতারাও অসমর্থ। ছাখ্ মহাপ্রভুর অবতারের পূর্ব্বে যত কিছু শাস্ত্র হয়েছে, সকলেতেই দেবতা ও ঋষিদের ব্যভিচার বর্ণনা আছে। কিন্তু মহাপ্রভু অবতারের পরে তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ হয়েছে, ব্যভিচার দূরের কথা, প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা অধ্যায় বা প্যারাগ্রাফ বা পেজ নাই। নির্ম্মল শুভ্র বেদমার্গ, নিবৃত্তি মার্গ।"

ঢাকা সহরে অনেক সময় প্রভু শ্রীরমেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। অর্থাভাবে প্রভুর ভাল সেবা হইতেছে না ভাবিয়া একদিন রমেশচন্দ্র চিন্তিত হইলেন। প্রভু তখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন—"তোদের দুর্দ্দিন বলে আসি। আমি যেখানে থাকি, স্বয়ং লক্ষ্মী সেখানে আমার সেবায় সর্ব্বদা কর জোড়ে দণ্ডায়মানা থাকেন। আমি আসি বলে তোরা দু'টি খেতে পারিস্। পৃথিবী-ময় আমার অষ্টকালীন ভোগ হ'য়ে থাকে। তোরা না দিলেও আমার ভোগ হয়। তোরা যে দিস্ এটা ও তোদেরই ভাগ্য।"

প্রভু চিকিৎসকগণকে সময় সময় ব্যাধিচ্ছলে কৃপা করিতেন। ১৩০৫ সনে বৈশাখ মাসে একদিন ঢাকায় রামধন শাহর বাগানে প্রভু নিজ পীড়ার কথা বলেন। ভক্ত ডাক্তার পূর্ণ ঘোষ ও ডাক্তার সুধন্ব সরকার প্রভুর ব্যাধিনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া তাঁহাদের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ঊষারঞ্জন মজুমদারকে ডাকেন। তিনি প্রভুর হাতের নাড়ীর ক্রিয়া ও বক্ষের স্পন্দন বন্ধ দেখিলেন। অধিকন্তু

প্রভুতে আরও নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়া প্রভুর চরণাশ্রিত ভক্ত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

উক্ত রামশাহর বাগানে একদিন নবদ্বীপদাস, কৃষ্ণদাস, চম্পটী ঠাকুর, বিপিনবিহারী প্রমুখ ভক্তগণ "জয় জয় প্রাণচন্দ্র নিত্যানন্দ রাম" গানটি গাহিতে গাহিতে প্রভুর কাছে উপস্থিত হন। প্রভু বলেন, "আমার মাথায় হাত দিয়ে ভ্যাখ্, আমার মহাবিকার অবস্থা। আমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় নিয়ে চল্। স্যালজার সাহেব, শ্যাম ডাক্তারদের দিয়ে আমায় ভ্যাখা।"

এইসব কথা বলিবার সময় প্রভুর ভাবটি সম্পূর্ণ বালকের মত হয়। কলিকাতায় কেবিন, হাইকোর্টের চেয়ার, টেবিল, হারমোনিয়ম ইত্যাদি দ্রব্য কিনিয়া রাখার জন্য প্রভু এক দীর্ঘ ফর্দ্দ দেন। উকীল মহিম ঘোষ প্রভুর আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন।

প্রভুবন্ধু কখনও কখনও এক ভক্ত-যূথের তত্ত্বাবধান হইতে স্থানান্তরে অন্যান্য সেবকের সেবাধীনে থাকিতে ইচ্ছা করিলে ঐরূপ ব্যাধির ভঙ্গী করিতেন। মূলতঃ চিকিৎসার আকুলতা ভক্তবাৎসল্য ও ভাবের আবরণ মাত্র।

প্রভু-সেবায় ভক্তদের একান্ত আগ্রহ ও ভাগ্য

ব্রজলীলায় সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের উদ্দেশ্যে গোপী ও সখীদের বিভিন্ন যূথ ছিল। ফরিদপুর, পাবনা, নবদ্বীপ, ঢাকা কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রভুকে রাখার জন্য ভক্তদের মধ্যেও ঐরূপ বিভিন্ন যূথ ছিল। চম্পটী মহাশয়, রমেশচন্দ্র, নবদ্বীপদাসজী প্রভৃতি বন্ধুভক্তগণ যাঁর যাঁর অভীষ্ট স্থানে প্রভুকে

লইয়া যাইয়া তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টা পাইতেন। যে দল প্রভুকে লইয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া অপর দল আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—ওরে, অক্রুর এসে প্রভুকে নিয়ে গেল। প্রভু অবশ্য কখন কখন ভক্তাধীনে থাকিতেন, কখন বা স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্র ভাবে-চলিতেন।

কখনও বা বন্ধু-বিরহাকুল কোনও ভক্তযূথ বন্ধুলীলাকথা পরস্পর আলোচনা করিয়া বন্ধুর অমিয়-মধুর বাণী উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার হাব ভাব গতি ভঙ্গীর অনুকরণে অভিনয় করিয়া কৃষ্ণবিরহাতুর গোপীদের ন্যায় নিজেদের বন্ধুবিরহতাপ বন্ধু-স্মরণ মঙ্গলে প্রশমিত করিতেন।

কখনও বা প্রভুর আবশ্যক দ্রব্যাদি যে ট্রাঙ্কে থাকিত ভক্তগণ সেইটি আগে বাহির করিয়া আনিয়া প্রভুকে জানাইতেন,—ট্রাঙ্ক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সবই লওয়া হইয়াছে ; সব প্রস্তুত, এখন প্রভু আসিলেই যাওয়া যায়। একবার কয়েকজন ভক্ত প্রভুকে ঢাকায় নেওয়ার জন্য আঙ্গিনার শ্রীমন্দিরের বেড়া খুলিয়া ট্রাঙ্ক বাহির করিয়াছিলেন। প্রভুকে যাঁর যাঁর স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য বন্ধুপ্রিয়গণের মধ্যে সময় সময় প্রতিযোগিতা চলিত।

সংসারে দেখা যায়, পুরুষদেহধারিগণ নারীজাতিতে আকৃষ্ট হয়,—রূপজ, গুণজ, অথব; কামজ মোহে। প্রভুর আকর্ষণ ছিল বিপরীত, তিনি পরম সত্ত্বময় ভাবের প্রকাশ করাইয়া নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই তাঁহার বিমল শান্তিময় চরণান্তিকে টানিয়া আনিতেন। ব্রহ্মচারী ছাত্র শেষরাত্রে অভিভাবককে ভুলাইবার জন্য কোলবালিশের উপর নিজ লেপ চাপা দিয়া প্রভুর কাছে

ছুটিতেন। মনে হইত ছাত্র বিছানায় শুইয়া আছে। বিবাহিত ভক্তগণও প্রভুর আহ্বানের কাছে নারীর প্রলোভন তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, এমনই ছিল প্রভুর কৃপাকর্ষণ। "সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন" ছাড়া এমনটি আর কুত্রাপি সম্ভব নহে।

কলিকাতায় শেঠের বাগানে প্রভুর অবস্থানকালে প্রভুর রচিত টহল কীর্ত্তন শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় এক কৃষ্ণকায় যুবক আশ্রয় লন। প্রভু তাঁহাকে 'কৃষ্ণদাস' নামে আহ্বান করেন। একদিন তথায় কীর্ত্তনানন্দে কৃষ্ণদাস নৃত্য করিতেছিলেন। বন্ধু দ্বিতল হইতে গবাক্ষ পথে কীর্ত্তন মধ্যে পুষ্পবর্ষণ করেন! কৃষ্ণদাসের মস্তকে প্রভুর স্পর্শ করা একটি কুসুম পড়িতেই তিনি গোপী-ভাবাবিষ্ট হইয়া মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া পনের ষোল দিন নিঃসঙ্গ অবস্থানে বন্ধুরূপ ধ্যান করিতে থাকেন। অতঃপর একদিন প্রভুর টহল কীর্ত্তনের আদেশে আবেশ ভঙ্গ হয়, কীর্ত্তন-আনন্দে মত্ত হন। লোকসঙ্গ এড়াইতে প্রভু কোন কোন দিন অধিক রাত্রে ফিটন গাড়ীতে কলিকাতার নানা রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেন। কৃষ্ণদাসজী একদিন রাত্রে অনুরাগে সমস্ত রাস্তা প্রভুর গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলেন। প্রভু পরদিন তাঁহাকে 'কৃষ্ণদাসবাবু' নামে অভিহিত করিয়া ঐরূপ ছুটিতে নিষেধ করেন। আদেশ পালিত হয়। তাঁহাকে প্রভু "সেবাইত কৃষ্ণদাস" আখ্যা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস মহারাজ এই অধম আমাকে ছাত্রাবস্থায় কণ্ঠীমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন ; সময়ে সাক্ষাৎ প্রভুর সেবাধিকারও দান করেন। তিনি অতি মধুরকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে গাহিবার জন্য আমাকে সস্নেহে ডাকিয়া লইতেন।

ভক্তগণের কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা, বন্ধুভক্তি

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥" চৈঃ চঃ অন্ত্য।৬

বন্ধুদাস শ্রীরমেশচন্দ্র, রামদাসজী, জন্মেজয়, ছোট জয়নিতাই, পুলিনবাবু (জয় জয় মহাপ্রভু), কৃষ্ণদাসজী, বৃন্দাবন দাস (সুধন্বা মিত্র), শ্রীবিধুরঞ্জন প্রমুখ ভক্তগণ চিরকুমার ছিলেন। গৃহী ভক্তগণের অনেকেও প্রভুর আদেশে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করিয়াছেন। উত্তর জীবনে গৃহী হইলেও ছাত্র বালকগণ প্রথম জীবনে কঠোর ভাবে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছেন। তাঁহারা অভিভাবকগণের কঠোর উৎপীড়ন-লাঞ্ছনাদির ভয় উপেক্ষা করিয়াও গভীর রাত্রে প্রভুবন্ধুর নিকট গোপনে উপস্থিত হইতেন।

রমেশচন্দ্র জীবনে বহু কঠোরতা সহ্য করিয়াছেন। এক সময় প্রভুর আদেশে তিনি শুধু আতপান্ন প্রসাদ পাইতেন। আনাজি রম্ভা, ঘৃত লবণাদি গ্রহণও তাঁহার পক্ষে নিষেধ ছিল। একদিন কলিকাতায় তিনি গোপনে অন্ন গ্রাসের সহিত কাঁচা লঙ্কা মুখে দিতেই অপর প্রকোষ্ঠে-স্থিত প্রভু ধমক দিয়াছিলেন ও গ্রাস ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। চক্ষুর অগোচরে কিছু করিলেও সর্ব্বদ্রষ্টা বন্ধুর কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না।

প্রভুবন্ধু নিজে পরিবেশন করিয়া ভক্তগণকে আকণ্ঠপূর্ণ করাইয়া প্রসাদ খাওয়াইতেন। কিন্তু ত্যাগী ব্রহ্মচারীরা তাঁহার

শাসনে রসনাসুখদ খাদ্য ভোজন করিতে পারিতেন না। একবার প্রভুসহ নৌকাযোগে গোয়ালন্দ হইতে টেপাখোলা যাওয়াকালে নবদ্বীপদাসজী নূতন হাঁড়িতে প্রভুর সেবার জন্য কিছু অধিক পরিমাণে রসগোল্লা কিনিয়াছিলেন। ভক্তের মনে ঐ প্রসাদের কিয়দংশ পাইবার অভিলাষ ছিল। প্রভু কিছু গ্রহণ করিয়া রসগোল্লাসহ হাঁড়িটি নদীতে ভাসাইয়া দেন। প্রভুর আদেশে ভক্ত চিড়া ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করেন।

গৃহীভক্ত বাদল বিশ্বাসজীকে প্রভু লিখিয়াছিলেন "বাদল, অনিষ্ঠাই প্রভুর মৃত্যু জানিবা।" বিশ্বাস মহাশয় স্বীয় ভক্তিমতী পত্নীর সহিত নিষ্ঠার সহিত কিছুকাল প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। বীরভক্ত বাদল একদিন প্রভুর আদেশে প্রসাদ সহ ডেগ মাথায় করিয়া অন্ধকার রাত্রে বাকচর হইতে ফরিদপুর গিয়াছেন এবং উহা পৌঁছাইয়া দিয়া রাত্রেই বাকচর ফিরিয়াছেন। প্রভুর আদেশে ভক্তগণ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া অম্লান বদনে পাঁচ ছয় ক্রোশ হাঁটিতেন, আরও কত কঠোরতা সহ্য করিতেন।

ব্রহ্মচারী পুলিনবাবু সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছিলেন, "পুলুবাবুর মধুর ভাব।" বহুদিন এই বন্ধুপ্রিয় ভক্তের সাত্ত্বিক আচরণ ও মধুর ভাব দেখিবার ভাগ্য পাইয়াছি।

কলিকাতা চাষাধোপাপাড়ার ধনী ভক্ত হররায় বাকচরে আসিয়া প্রভুর আদেশে ত্যাগীর ন্যায় সংযম-কঠোরতা পালন করিয়াছেন ও ফরিদপুর অঙ্গনেও প্রভুর মৌনের পূর্ব্বে কিছুদিন প্রভুর সেবা করার ভাগ্য পাইয়াছেন।

বৃন্দাবন দাসজী (সুধন্বা মিত্র) মৃদঙ্গ বাদন, মহোৎসবে রন্ধন,

প্রভুর আবশ্যক গ্রন্থাদির মোট বহন করিয়া বহুদূর প্রভুর অনুগমন ইত্যাদি বহু কষ্টসাধ্য সেবার কার্য্য করিয়া নিজ জীবনকে ধন্য করেন ও পরে বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুর আশীর্ব্বাদে ধনী হইয়া ও মন্দির স্থাপন করিয়া গৌরগোপাল-সেবক হন।

কখনও কখনও প্রভু কোন কোন ভক্তকে পর পর দুই তিন দিন উপবাসে থাকিতে আদেশ করিতেন। ঐ অবস্থায় আপন-বায়ু-ত্যাগেও তাহাকে গোময় মাখিয়া স্নান করিতে হইত। প্রভুর আদেশে কোন কোনদিন কোন ভক্তবিশেষ নিজে উপবাসী থাকিয়া অন্যান্য ভক্তকে উত্তম উত্তম প্রসাদ পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন।

প্রভুর আদেশে এক সময় রমেশচন্দ্র মাত্র ফল খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। ভক্তের ভাবী হাজত বাসের কথা প্রভু লিখিত ভাবে জানাইয়াছিলেন—"হাতকড়ি ভয়, ছোলা, বোড়া, আদা খেও।" সেই অবস্থায় পূর্ব্ব অভ্যাসমত ফলাদি খাইয়া থাকিতে তিনি ভক্তকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ভক্ত (কালিন্দী) কালীমোহন রমেশচন্দ্রের অনুগত হইলে তাঁহার শ্বশুর, না-বালক বাহির করিবার অভিযোগে রমেশচন্দ্রকে অভিযুক্ত করেন। তাহাতে হাজত বাসের সময় রমেশচন্দ্র মাত্র প্রভুর আদেশ মত ভিজান ছোলা ও ফলাদি গ্রহণ করিতেন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। পরে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া তিনি মুক্ত হন।

রমেশচন্দ্রকে প্রভুবন্ধু বহু যম-নিয়ম, তত্ত্বকথা ও জগতের ভাবী বিষয় লিখিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি লিপি

রাজরোষে পুলিশের করতলগত হইয়া নষ্ট হয়। তাহাকে প্রদত্ত গুরুবন্ধুর অল্প কয়েকটি বাণী এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। "রমা, তুমি বন্ধুর সত্য প্রতিনিধি।" "ব্রহ্মচর্য্য করিও, করাইও।" "লাল অঙ্ক মুখস্থ করিয়া মাষ্টার হইবে। বছরে তের কেতাব রচনা করিবে। ছাত্রদিগকে পড়াইবে। ঘন ঘন পড়ার চিঠি দিবে। স্কলারশিপ লওয়াইবে।" "অন্য ভাবিও না গুরু গোবিন্দ বই।"

শ্রীরাধিকাগুপ্ত কৈশোর বয়সেই বন্ধুর অলৌকিক রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। প্রভু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন লইয়া যান এবং ত্যাগীর বেশ দিয়া "রামদাস" নামে, কখনো কখনো শারিকা, রামী নামে অভিহিত করেন। রামদাসজী ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রভুর উপদেশানুসারে কঠোরতা পালন করিয়া ভজন এবং সময় সময় মধুর সুকণ্ঠে প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া সেবা করিতেন। তাঁহার কীর্ত্তনের সঙ্গে প্রভু উল্লাসে মৃদঙ্গ বাজাইতেন। রামদাসজী এককালে 'ভজ জগদ্বন্ধু, কহ জগদ্বন্ধু' ইত্যাদি টহল কীর্ত্তন গাহিয়া প্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন।

প্রভুবন্ধু মৌনী হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে রামদাসজী প্রভুর অনুমতি লইয়া, যিনি পুরীতে সুরমাতা আদিভক্তের কাছে প্রভু জগদ্বন্ধুই সেই গৌরাঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন, প্রভুর নিজ-জন, সেই প্রেমিক শ্রীরাধারমণ চরণদাসজীর আনুগত্যে থাকিয়া গুরুবন্ধুর অভিপ্রেত নিতাই গৌরের নাম ও লীলা প্রচারণ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ব্রজবাসের ও হরিনাম প্রচারের আগ্রহে

রামদাসজী বন্ধুর অনুমতি চাহিলে রামদাসজীর বিচ্ছেদে বন্ধুহরি যে বিদায় কবিতা লিখেন, তাহার কিয়দংশ এই গ্রন্থে শ্রীরামদাস প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বালক ভুবন ঘোষ অপরূপ বন্ধু-রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া সাত আট ক্রোশ হাঁটিয়া ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভুর নিকট উপস্থিত হন। প্রভু পরে ইহার নাম রাখেন, নবদ্বীপ দাস। প্রভুর লিপিতে "গুরু জগবন্ধু, শিষ্য নবদ্বীপ দাস" উল্লেখ আছে। ইনি প্রভুর সেবার্থ বাকচর, ঢাকা, কলিকাতা, পাবনা, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়াছেন।

রাজবাড়ী হইতে মাইল তিন দূরে নওডুবিতে তাঁহার বাড়ী। একবার প্রভুকে ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া তিনি প্রভুর জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রভুর দর্শন আশায় রেল লাইনের ধারে মেলট্রেনের সময় দাঁড়াইয়া থাকেন। সেদিন মেলট্রেনে প্রভু ছিলেন। ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া, গাড়ীর জানালা দিয়া প্রভু কমণ্ডলু ঢুলাইলেন। ভক্ত নবদ্বীপ অমনি প্রভুর জন্য পাগলের মত মেল ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন। প্রাণের আর্ত্তি প্রভুকে পাব ত? ক্ষত বিক্ষত চরণে, এক বস্ত্রে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ভক্ত রাজবাড়ী ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখেন, এক বৃক্ষতলে ভক্ত-প্রাণধন বন্ধু ভক্তের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটে একজন সেবক। ভক্তবর নবদ্বীপ প্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। কৃপাসিন্ধু বন্ধুর অভয় হস্ত স্পর্শে ভক্তের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে, সমস্ত অঙ্গ জুড়ায়। বন্ধু বলেন, "তোর অনুরাগ ত কম নয়! গাড়ীর সঙ্গে দৌড়ে এলি!"

শ্রীনবদ্বীপ কঠোর ব্রহ্মচারী ছিলেন, প্রভু মৌনী হইলে, অধিক বয়সে গৃহাশ্রমী হন। প্রভুর নিকট হইতে তিনি বহু আদেশ উপদেশ ও তত্ত্বকথা পাইয়াছেন। বহুকাল নবদ্বীপ দাদার দুর্লভ সঙ্গ পাইয়া বহু বন্ধুবার্ত্তা পাইয়াছি। তাহার অনেকগুলি এই গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানেও দু' একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম।

"মহাভোগালম্ভে আয়ুঃ শেষ। হরিসাধনে রক্ষা পাও।"

"দেহ, মন ও জীবন পণ করিয়া হরিসাধন করিতে হয়। এমত স্থলে সম্পূর্ণ কঠোরতা করিতে বৈমুখ হওয়া উচিত নহে।"

"মিষ্ট দ্রব্য একেবারে খাওয়া নিষেধ। দিবারাত্র একবার অন্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। দিনে দুইবার ও রাত্রে দুইবার টহল সহিত নগর ভ্রমণ করিও। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আর নিদ্রা-তন্দ্রা যাইও না। কাহারও চরণ ভিন্ন মুখ বা অন্য অবয়ব লক্ষ্য করিতে নাই। হরিনামের আবশ্যক ভিন্ন কাহারও সহিত সহিত কথা কহা নিষেধ।"

শ্রীঅতুলচন্দ্র আড়া হাইস্কুলে হেড্‌মাষ্টার থাকাকালে বন্ধুসুন্দর একদিন মেসবাড়ীর ভক্ত অতুলের শুদ্ধ ধৌত কক্ষে নিজ হাতে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া গ্রহণ করেন। প্রভু বন্ধুর আদেশে সেই সময় চম্পটী ঠাকুর স্কুলে যাইতে বাধ্য হন। প্রভু বন্ধু তাঁহার ভক্তের জন্য কচি কলাপাতায় মুড়িয়া স্বীয় কৃপাশক্তি সঞ্চারিত কিঞ্চিৎ ঘৃতসিক্ত আতপান্ন প্রসাদ রাখিয়াছিলেন। প্রভুর মুখে কিঞ্চিৎ পত্র প্রসাদ আছে এই বার্তা ও অন্বেষণের পর ঐ দিব্য প্রসাদ পাইয়া শ্রীঅতুল মহানন্দে পত্র সমেত সবটুকু প্রসাদ ভক্ষণ

করেন। ঐ প্রেমশক্তি সঞ্চারেও প্রসাদ আস্বাদনের পর মুহূর্ত্তে তিনি হরিবোল মুখর, হরিনামে উন্মাদনাজনক তীব্র বৈরাগ্যময় জীবন লাভ করেন ও প্রভুবন্ধু পদে আত্মসমর্পণ করেন।

চম্পটী মহাশয় গৃহাশ্রম ও আড়া হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টারী ত্যাগ করিয়া প্রভুর আদেশে হরিনাম প্রচার করিতেন। "কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম। রাধামাধব রাধিকা নাম" প্রভৃতি প্রভুর রচিত কীর্ত্তনে তাঁহার অতি নিষ্ঠা ছিল। "ভজ জগদ্বন্ধু" ইত্যাদি মহানামও তিনি ইচ্ছামত গাহিতেন। প্রভুর কৃপায় বুড়োশিবের আশীর্ব্বাদপুষ্ট শ্রীঅতুল চম্পটী গঙ্গাস্নানের পর, প্রত্যূষে জগন্নাথঘাট হইতে কালীঘাট পর্যন্ত প্রত্যহ বহুবার বহুদিন করতালনে নিত্য টহল দিয়াছেন। করতাল হস্তে টহল দিবার কালে অভিযাত্রী গোরা সৈনিকেরাও তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিত। তিনি নির্ভীক, সর্ব্বত্র, বড়লাটের ভবনেও "হরি-হরিবোল" বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেন। এইজন্য কখনো কখনো তাঁকে থানায় আটক করিয়াছে, আবার বিনা বিচারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।

একদিন ঊষায় গঙ্গাস্নান করিয়া চম্পটী মহাশয় করতালনে টহল দিয়া যখন ফিরিতেছিলেন, তখন কতিপয় কসাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলায় পশুর নাড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি অমেধ্য জড়াইয়া দেয়। চম্পটী মহাশয় প্রভুর স্মরণে হরিনাম করিতে করিতে রামবাগান হরিসভায় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে, প্রভু তাঁহাকে "এদিকে আয়" বলিয়া কছে আহ্বান করেন ও তাঁহার কাছে পানীয় জল চাহেন। চম্পটী মহাশয় স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া প্রভুর নিকট আসিতে চাহিলে প্রভু জানান যে, যে হরিনাম করে, সে চির

পবিত্র। কোন অপবিত্র বস্তু তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে না।
এইভাবে হরিনামের অনন্তপাবনী শক্তি জ্ঞাপন করিয়া প্রভু প্রিয়
ভক্তকে অপূর্ব্ব হরিনাম-নিষ্ঠা শিক্ষা দেন।

শ্রুত আছি, এক সময় ষ্টেশন হইতে কতকটা দূরবর্ত্তী স্থানে
ভ্রমণকালে দূর হইতে বোম্বে মেলট্রেন আসিতেছে দেখিতে পাইয়া
বন্ধুনিষ্ঠ চম্পটী ঠাকুর মনে করেন, "প্রভু সত্য সত্য বস্তু। তাঁহার
নামমাহাত্ম্যে দ্রুত গতিশীল মেলও অবশ্যই, আমার সম্মুখে নিশ্চল
হইয়া যাইবে"—এইরূপ চিন্তা, বিশ্বাস ও সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই
ভক্তবীর জয়জগদ্বন্ধু হরি হরিবোল্ বলিয়া রেল লাইনের উপর
নিশ্চিন্ত নির্ভীক ভাবে শয়ন করিয়া প্রভু বন্ধুহরিকে স্মরণ করিতে
থাকেন। ভক্তের অসীম ভক্তিযোগ বলে তীব্রগতি মেলট্রেনখানি
শয়ান ভক্তের কয়েক হাত দূরে অকস্মাৎ নিশ্চল হইয়া যায়।
স্মরণ ও নামমাহাত্ম্যের অচিন্ত্য প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্ত তখন
মহানন্দে 'জয় জগদ্বন্ধু বোল, হরিবোল্' বলিতে বলিতে প্রস্থান
করেন। অশেষ করুণাময় বন্ধুহরি অদৃশ্য ভাবে থাকিয়াও এইরূপ
দুর্ঘট ব্যাপার ঘটাইয়া তাঁহার প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করিয়া অচলা
ভক্তিনিষ্ঠার ও অকপট ভক্তের জয়-গৌরব জগতে প্রকট করেন।

চম্পটী ঠাকুরকে প্রভু একসময় লিখেন, "অতুল! হরিবোল!
ঠাকুর! মহানগরী, কলুষপূর্ণ, নিত্য তিনবার ঝাড় দিয়ে নির্ম্মল
ছাপ, সাদা, বরফের মত করিবা। কোথাও যেন কৈতব না
থাকে। হরিনামে ছোট বড়, বাছিও না।" চম্পটী মহাশয়ের
প্রভাবে যাদুমণি প্রমুখ অনেক গণিকার জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটে।
যাদুমণি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রভুরচিত দুইটি কীর্ত্তন দিয়াছিলেন।

উক্ত যাদুমণির আবেদনে কলিকাতা শোভাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র মদ্যাদি সেবনে আসক্ত মণীন্দ্র দেব, চম্পটী মহাশয়ের সহিত প্রভুর দর্শনার্থ ফরিদপুর গোয়ালচামট গিয়াছিলেন। প্রভু তখন গোয়ালচামটে নিতাই কবিরাজের কলাবাগানে একটি গৃহে ছিলেন। কত সাধু মহাত্মা উক্ত কুমার মণীন্দ্র দেবের বাড়ী পদার্পণ ও যাতায়াত করিয়াছেন। কিন্তু আর্ত্তি লইয়া দর্শনপ্রার্থী সেই ধনিসন্তানকে প্রভু দর্শন পর্য্যন্ত দিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাকে মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া মৌনিভাবে কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার জন্য চম্পটী মহাশয়ের মাধ্যমে প্রভু যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভুর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িয়াছে ভাবিয়া উক্ত ধনী দুলাল উহা পালন পূর্ব্বক নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন ও প্রভুর প্রভুত্ব অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন। তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি স্বভবনে প্রভুর চিত্রপট স্থাপন করিয়া প্রভুর পরমভক্ত বলিয়া সমাদৃত হন।

পরম একনিষ্ঠ বন্ধুভক্ত চম্পটী ঠাকুর আমার ছাত্র জীবনে পরম স্নেহে সন্ধান লইয়া কখন কখন আমার অবস্থিতিস্থানে আসিয়াছেন; কখন বা বন্ধুহরিস্মৃতিতে অশ্রুবর্ষণ করিয়া আনন্দে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, বন্ধুবার্ত্তা বলিয়াছেন।

পাবনার শ্রীপ্রসন্ন লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরণজিত প্রভুতে এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, গুরুজনের বাধা অতিক্রম করিতে তিনি একদিন দ্বিতলের ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়েন ও তীব্রস্রোতা নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া কলিকাতায় আসেন। সেখানে প্রভুর সাক্ষাৎ

না পাইয়া পরে বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া প্রভুর শরণ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে রণজিতচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন—

"I was in company of Prabhu Jagadbondhu about 5 years from 1890. When I was only 14 years old, my attraction for Him was so great that to overcome my guardians' obstacle, once I jumped from the roof of a building and swam across a swift streamlet I ultimately met the Lord at Brindabon (1893-94). Some very strict and rigid rules of conduct were prescribed for me principally to completely overcome hunger, sleep and fear".

প্রভু কার্য্যতঃ তাঁহাকে ক্ষুধা, নিদ্রা ও ভয় জয়ের উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাকে আদর করিয়া একখানি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত দান করেন। অধিক কঠোরতা-পালনে ভক্ত রণজিত অসমর্থ হইলে প্রভু তাঁহাকে গৃহে যাইতে বলেন। শ্রীরণজিত এম্, এ, বি, এল্ পাশ করিয়া আদর্শ গৃহী হন।

চির সংসার-ত্যাগে অসমর্থ ভক্তকে প্রভু আশ্বাস দিয়া বলিতেন—"গৃহে যাও, হতাশ হ'য়ো না। চিন্তা কি? আমি আছি। আমি রক্ষা করব। সবাই হরিনাম করো।"

প্রভুবন্ধু অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। যেমন, "বি, এ, এম্, এ পাশ করিয়া হাকিম হও।" "যত আইন

পরীক্ষা আছে, উহাই সংসারের পথ কর।" "তুমি ডাক্তারী পড়, খুব উন্নতি হবে।" "বিষয়ী হইও না; বিষয় বিষ ত্যাগ কর," ইত্যাদি। সকলকেই তিনি আলস্য ত্যাগ ও হরিনাম করিতে উপদেশ দিতেন।

অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার ভক্ত কিশোরী চক্রবর্ত্তী প্রৌঢ়-বয়সে প্রভুর আদেশে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া জীবনকে উন্নত করেন। তাঁহার বহুমূত্র রোগ ছিল। তিনি প্রভুর আদেশ পালন করিয়া ক্রমে সম্পূর্ণ নীরোগ হন। এই গ্রন্থের গুরুবন্ধুবাণীতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রদত্ত উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে।

ভক্তবর সর্ব্বসুখ সান্যালকে দারিদ্র্যহেতু ক্ষুণ্ণ না হইতে উপদেশ দিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে ২৪শে চৈত্র, ১২৯৮ সন তারিখে প্রভু লিখেন,—

"তোমার দারিদ্র্যে অতীব তুষ্টি লাভ করিলাম। কারণ ধনশালী মানবগণ লোভ, ক্ষোভ, ভোগ, অভিমান, অহঙ্কার, ও মাৎসর্য্যাদি নিবন্ধন ইষ্টকার্য্য বিমুখ হইয়া বিপথগামী হয়, তদ্বি-পরীতে দরিদ্র ব্যক্তিগণই কিঞ্চিদধিক ভোগশূন্য ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে।"

প্রভুর বালকভক্তগণও ত্যাগীর ন্যায় ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া আহারে, বেশভূষায় ও বাক্য প্রয়োগে সংযত হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন ও হরিনাম করিয়া প্রভুর শক্তিসঞ্চারী সঙ্গপ্রভাবে কতককাল অমৃতরসাস্বাদনে অধিকারী হইয়াছিলেন। জয় মহা-উদ্ধারণ বন্ধুহরি!

সঙ্গ ও অকৈতবে সখ্য রাখা

'সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজবাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান।' চৈঃ চঃ মধ্য। ২৪

ভক্তগণকে বিশেষ বিশেষ ভক্ত ব্যতীত, যার তার সঙ্গ করিতে প্রভু নিষেধ করিতেন। যেখানে সেখানে গেলে চিত্ত মলিন হয়, অনেকে ভাব ও অবস্থা বুঝিয়া কথা বলিতে পারে না; তাই সঙ্গ বিচার করিয়া চলিতে বলিতেন।

প্রয়োজন বোধ করিলে, তিনি এক ভক্তকে অন্য ভক্তের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেন। এক সময় এক বালকভক্তের গোপন ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন—"বাবুজি, ক্ষেপ পাশরিও॥ কৈতব দেখিয়া সখ্যে ভয় হয়॥ অকৈতবে, সখ্য রাখিও॥"

রাজর্ষি বনমালী রায়কে উপদেশ দিয়া প্রভু লিখেন, "খলের সহিত অধিক কথা কইতে নাই। ব্যবহারও। খল ও কেউটে-গুলিকে সরানই ভাল। সাবধানে, যতনে, গোপনে ও কৌশলে।"

নবদ্বীপ দাসজীকে এক সময় প্রভু আদেশ করিয়াছিলেন,—"বনমালী সাহা, গোপাল মিত্র, হরবাবু ও বৃন্দাবন দাস, ইহারা ভিন্ন আর কাহারো সহিত কথা কহা নিষেধ। দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত।"

পরস্পরের প্রীতির দৃঢ়তা পরীক্ষার্থ একবার বন্ধু কতিপয় বালকভক্তকে রমেশচন্দ্রের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। বালকগণ প্রভু ও রমেশচন্দ্র, ইঁহাদের কাহাকেও ছাড়িতে পারিবে না বলায় প্রভু আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা রমেশের, রমেশ তোমাদের, সকলেই আমার। আমি কাহাকেও দণ্ড দেই না। যে পাপ করে আমি তাকে নিষেধ করি। তোমরা সকলে একসঙ্গে থেক। সকলেই আমার, আমি কাউকে ছাড়ব না।"

প্রয়োজন বোধ করিলে প্রভু, "নিঃসঙ্গ হইও", উপদেশ দিতেন। প্রভুর উপদেশে রামদাসজী এক সময় প্রভুর শ্রীহস্ত-লিপি ছাড়া অন্যের লিখিত পত্র পর্য্যন্ত পড়িতেন না বা অন্যকে পত্র লিখিতেন না। বন্ধুতে প্রিয়ভক্তগণের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল।

অন্যত্র প্রভু উপদেশ দিয়াছেন—"ইষ্টগোষ্ঠী করিও।" "গুরুভাই, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভক্ত, নৈষ্ঠিক, ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী॥ ইতি ইষ্টগোষ্ঠী ॥"

"সঙ্গ ঃ মৃদঙ্গ, করতাল, জপমালা, মালা, গ্রন্থ।"

"স্মরণ বন্দন নতি বিগ্রহ দর্শন।
নিষ্ঠা পাঠ ইষ্টগোষ্ঠী গোবিন্দ স্তবন ॥
(এই নিবেদন রে) (শ্রীরাধা গোবিন্দ পদে)
(ভুল না বিষয় মদে)" [হরিকথা]

আত্মপরিচয় দান

এক সময় প্রভুর মৌনের পূর্ব্বে ঢাকায় রামশাহর বাগানে প্রভুর অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ সাধু ত্রিপুলিন স্বামী প্রভুকে দর্শন করিতে উক্ত বাগানের দরজায় উপস্থিত হন। আদেশ না থাকায় বাগানের মালী দরজা খুলিতে অসম্মত হয়। স্বামীজী অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যান।

স্বামীজী রমেশচন্দ্রকে চিনিতেন ও উমেশ বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তিনি রমেশচন্দ্রের কাছে "প্রভু কে?" এই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে একটি কটু মন্তব্য করেন। প্রাণে ব্যথা পাইয়া রমেশচন্দ্র লোককে দেখান যায়, এইরূপ প্রভুর একটি আত্মপরিচয় পাইবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করেন।

প্রভুবন্ধু তখন ঢাকা হইতে ফরিদপুর চলিয়া গিয়াছেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু অন্তর্য্যামী প্রভুবন্ধু ঠিক ঐ সময় ফরিদপুর হইতে ঢাকায় পত্রযোগে রমেশচন্দ্রকে "হরি। নাম জগদ্বন্ধু…" ইত্যাদি আত্মপরিচয় লিখিয়া পাঠান। উহা পাইয়া রমেশচন্দ্র মূল লিপির এক হাজার লিথো করাইয়া জনসাধারণে প্রচার করেন, ও উক্ত স্বামীজীকে সর্ব্বাগ্রে মূললিপি দেখান। আত্মপরিচয়ের ব্লকে প্রভুর এই অবিকল লিপি দ্রষ্টব্য।

রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়া এই বার্ত্তা বন্ধুবার্তা ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ও বন্ধুস্মৃতিদীপিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করি। ইহার পূর্ব্বে ভক্তদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, প্রভু ঢাকায় উপস্থিত থাকিয়া ঐ আত্মপরিচয় লিখেন।

ভক্ত মথুর কর্ম্মকার, তারক গাঙ্গুলী ও নবদ্বীপ দাস মহাশয়কে প্রভু নিজ দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, নবদ্বীপ দাসজীকে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, বদরপুরে মহা-ভাবোন্মাদ অবস্থায় আর একটি আত্মপরিচয় লিখিয়া দিয়াছিলেন। এ' সকল বাণী এই গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধে সন্নিবেশিত আছে। ১৩২৪ ও ১৩২৫ সনে মৎসংগৃহীত ঐ সকল বাণী ও লিপির অনেকাংশ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মহেন্দ্রজীর 'জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু' গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় কবিরাজ মহাশয়ের 'মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু' ও মহেন্দ্রজীর 'জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু' ছাপা হইবার পর, ঐ গ্রন্থদ্বয় সঙ্গে লইয়া আমি ১৩২৬-এ প্রভুর জন্মোৎসবে ফরিদপুরে প্রভুর আঙ্গিনায় উপস্থিত হই।

বাল্যভাবাবিষ্ট শ্রীশ্রীবন্ধুগোপাল

১৩২৬, ১৩ই জ্যৈষ্ঠের এই শ্রীমূর্ত্তি

শিশুভাবে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর

মহাভাবোন্মাদ অবস্থা।

১৩০৮ সনে, চৈত্রমাস হইতে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর ভাবান্তর লক্ষিত হয়। একদিন ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হইয়া প্রভু দেবীমাকে (দিগম্বরী দেবীকে) অনেক অদ্ভুত কথা বলেন। ওখান হইতে কবিরপুর জমিরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের পরিহিত বস্ত্রখানি দাওয়ায় রাখিয়া উলঙ্গ অবস্থায় স্থানান্তরে যান। কিছু পরেই আবার একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া ফিরেন। প্রাপ্ত বস্ত্রখানি জমির সযত্নে রাখিয়া দেন। দেবীমার মুখে শ্রুত আছি, একসময় জমিরের পীড়িত পুত্রকে কবিরাজ চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিলে, প্রভুর পরিত্যক্ত ঐ বস্ত্রধোয়া জল তাহাকে খাওয়ান হয়, তাহাতেই ঐ ছেলেটি আরোগ্যলাভ করে। পরবর্ত্তী কালে বহুলোক বস্ত্রখানি দেখিতে যাইত।

১৩০৮ সন, ২০শে চৈত্র, প্রভু মহাভাবোন্মাদ অবস্থায় উলঙ্গভাবে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে দেবীমা বন্ধুকে নূতন বস্ত্র দেন, বন্ধুহরি তাহা ফেলিয়া দেন। তিনি সকলকেই প্রশ্ন করেন,—"বল্ ত, আমি শব, না বৈতরণী ?"

ব্রাহ্মণকান্দা ভবনে পুষ্করিণীর পারে প্রভুবন্ধু, শ্রীতারিণীচন্দ্রের সপ্তবর্ষীয়া কন্যা ব্রজবালা (কিরণবালা) দেবীকে সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন করেন, "বল্ ত, আমি শব, না বৈতরণী ?" বালিকা অর্থ না বুঝিয়াও, উত্তর দেন, "বৈতরণী।" পরবর্ত্তী কালে উক্ত দেবীর

মুখেও ঘটনাটি শুনিয়াছি। ইহার পর বাটীর ভৃত্যকেও প্রভু ঐ প্রশ্ন করেন। দেবী ব্রজবালা বলিয়াছেন, জমিরকে প্রভুপ্রদত্ত বস্ত্রখানি সময় সময় বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিত।

প্রভু বাটীর ঐ ভৃত্যের হাত ধরিয়া তাহার জীবনের গুপ্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলেন; ভৃত্যটি প্রভুর দিকে তাকাইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে এবং প্রভুর কথা সবই সত্য বলিয়া স্বীকার করে। অতঃপর বন্ধুহরি তুলাগ্রাম মুখে দ্রুত গমন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে অনুসরণ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

পরদিন ২১শে চৈত্র, কর্দ্দমাক্ত ও কণ্টকক্ষত কলেবরে দিগম্বর বন্ধু কেদার কাকার বাটীতে আসেন, ও প্রশ্ন করেন,—"বল্ত, আমি শব, না বৈতরণী?" কাকা ধুইয়া মুছিয়া দিলে, প্রভু আঙ্গিনায় আসেন। সংবাদ পাইয়া বাদল বিশ্বাস মহাশয় পাল্কীযোগে দিগম্বর প্রভুকে বদরপুরে নিজ বাটীতে লইয়া যান।

সন ১৩০৮ সালের ২২শে চৈত্র, বদরপুরে প্রভু নিজের ষাটি-সহস্র ব্যাধির কথা বলিতে থাকেন। খবর পাইয়া সুরেশচন্দ্র ডাক্তার শ্রীধরবাবুকে লইয়া আসেন ও দেখেন, প্রভুর নাড়ী ও বক্ষঃস্থল স্পন্দনরহিত। তথায় উপস্থিত দেবীমা প্রভুকে বাতাস করিতেছিলেন। প্রভু তখন খেদসূচক ভাবে বলিতে থাকেন,—

"হায়! মানুষ হরিনাম করে না। ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন, এই আছে, এই নাই! সংসারী লোকেরই হরিনামে বেশী অধিকার।"

২৩শে চৈত্র বেলা ১টার পর প্রভুর নাড়ীর ও বক্ষস্থলের স্পন্দন-রহিত অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার শ্রীধরবাবু অবাক্ হইয়া যান। প্রভু তখন কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া স্বহস্তে "আমি ভিন্ন কিছুই নাই" ইত্যাদি আত্মপরিচয় লিখেন। ঐ লিখিত আত্মপরিচয়ের বাণী গুরুবন্ধু বাণীর শেষাংশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আত্মপরিচয় লিখিবার পর প্রভু বলেন, "এই নেও আমার পরিচয়। আমি আজ হ'তে মুক্ত হ'লাম।" অতঃপর বহু তত্ত্বকথা বলিয়া অবশেষে বলেন, "বাবুজী, ডাক্তার বাবুকে বলে আমায় এমন ঔষধ দেও, যা'তে আমি ধূলির মত পৃথিবীর সমস্তে মিশে যেতে পারি।" "...পৃথিবীর সকল মানুষের বাতাস গায় না লাগলে, আমার শরীর ভাল হবে না।"

ইহার পর নিকটস্থিত মোহান্তভক্তগণ প্রভুকে কোশনে উঠাইয়া মস্তকে লইয়া পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর প্রভু পানীয় জল চাহিলে একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত জল আনেন; প্রভু উহা গ্রহণ না করিয়া এক বুনা ভক্ত আনীত জল পান করেন। ঐ ভক্ত ও জলের প্রশংসা করিয়া বলেন—"সহুরে বাবুরা কুইনস্ হাউসে যায়, ওদের গায় গন্ধ! তাপ।"

পতিতপাবন বন্ধু কতকক্ষণ বদরপুর পথের ধারে শয়ানভাবে অবস্থান করিয়া উপস্থিত জনতাকে তাঁহার দিব্য দিগম্বর মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। মহান্ত ভক্তদের মস্তকে উঠিয়া ভ্রমণের পূর্ব্বে, প্রভু ভক্ত বাদলকে পাল্কী আনিতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ মত পাল্কী আসিলে, সহরে কালীবাড়ী রোডে এক বাসায়

পাল্কীযোগে গমন করিয়া সুরেশচন্দ্র-প্রমুখ বালক ভক্তদের তত্ত্বাবধানে তিনি অবস্থান করেন।

ঐখানে প্রভু রমেশচন্দ্রের অগ্রজ জ্যোতিষচন্দ্রকে বলেন, "আজ আপনাদের শরণ নিলাম। এখন আপনারা হরিনাম ক'রে আমায় স্মরণ ক'রে রক্ষা করুন। নিয়ম নিষ্ঠা নাই, আমিও নাই। হায়! হায়!" এইরূপ অনেক অপূর্ব্ব মধুর কথা বলেন। বালক ভক্তগণ সারারাত্রি জাগিয়া বন্ধুর সেবা শুশ্রূষা করিয়া ও তাঁহার মুখে পবিত্র আনন্দময় কত অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া ধন্য হন।

দিগম্বর বন্ধুকে দেখিতে এখানে প্রত্যহ দলে দলে, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর নরনারীর গমনাগমন হইত। ১৪শে চৈত্র (১৩০৮), সোমবার, ডাক্তার শ্রীধরবাবু আসিলে প্রভু বলেন, "পৃথিবী আর আমি, এক। হরিনামে দেহ হয়।" অতঃপর প্রভু ষাটিসহস্র ব্যাধির আক্রমণ জানাইলেন। ব্যাধি নাই বুঝিয়া ডাক্তার ঔষধ না দিয়া চলিয়া গেলে, প্রভুর বাক্যমত তাঁহার ভক্ত বৃন্দাবন দাসকে ডাকিয়া আনা হইল। বৃন্দাবন দাসজীর কাছেও ব্যাধির কথা জানাইলেন।

বৃন্দাবন দাসজী প্রভুর সরল বালকভাব জানিতেন, তাই তিনি ঔষধের গ্লাসে জিঞ্জারেড্, লিমোনেড্ ইত্যাদি একটু একটু করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। উহা খাইয়া বন্ধু, "ব্যারাম সারতেছে" বলিয়া শুদ্ধ সরল বালকের মত খুব খুসী হইয়া হইয়া খোল চাহিয়া বাজাইতে লাগিলেন, আর বালকগণ কীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন।

প্রভু সাধারণতঃ কাহারও সম্মুখে খাইতেন না, কিন্তু মহা-ভাবোন্মাদ অবস্থায় বালকগণ খাওয়াইয়া দিতেন। সুরেশচন্দ্রই ঐ কার্য্যে বালকদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন।

ঐ দিন (২৪শে চৈত্র), রাত্রে নিকটবর্ত্তী এক বাসায় কীর্ত্তন হইতেছিল। কীর্ত্তন জমাট হইলে বন্ধু ঐখানে যাইবার জন্য আবেগে উঠিয়া দাঁড়ান। ঠিক সেই সময়েই কীর্ত্তনে তালভঙ্গ হওয়ায় বন্ধু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। রাত্রি চারিটার পর প্রভুর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে খেদ প্রকাশ করিয়া বলেন, "পাপে ঘৃণা হয় না? হরিনামেও পাপ চিন্তা!" বালকগণ তখন মিলিতকণ্ঠে প্রভু-রচিত "জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে" ও তাঁহার প্রভাতি "উঠ উঠরে গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে" এই কীর্ত্তন দুইটি আবেগভরে গান করেন। অতঃপর প্রভু কিছু আহার করেন। বালকগণকে "পাপ করো না, রক্ত জল করো না।" ইত্যাদি বহু মূল্যবান্ উপদেশ দান করেন।

২৫শে চৈত্র, ১৩০৮ সন, (ইং ৮।৪।১৯০২), মঙ্গলবার, পাড়ায় আগত ভিক্ষাপ্রার্থী এক ফকিরকে প্রভুর আদেশ মত ডাকিয়া আনা হয় ও প্রভুকে ছুঁইয়া ফুঁ দিতে বলা হয়। ফকির প্রভুকে দেখিয়া কাঁপিতে থাকে ও হঠাৎ দৌড়াইয়া পলায়ন করে।

প্রভুবন্ধু বালকদের নিকট সাতদিন থাকিয়া বহু অমূল্য আদেশ-উপদেশ ও তত্ত্বকথা বলিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া রাখেন। যে সকল অভিভাবক প্রভুর প্রতিকূল ছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়া পড়েন।

২৯শে চৈত্র বৈকাল, প্রভু বালকগণের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে নানাকথা বলিয়া তাহাদের তাঁহার কাছে আর কি কি কামনা আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা যাহাই চাহিবে, প্রভু তাহাই দিবেন, বলেন। বালকগণকে প্রভু তাঁহার "মস্ত অভিভাবক" বলিয়া আদর করেন। কিছুক্ষণ পর "আমার শবদেহে জীবন সঞ্চার হচ্ছে" বলিয়া প্রভু কাপড়-চাদর চাহিলে, তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া চাদর দিয়া গা ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

ইহার পরে তিনি বালকগণকে 'তুই' 'তুমি' স্থানে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করেন ও তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে বলেন। তখন তাঁহার দুর্লভ দর্শনস্পর্শন-সেবা-পরিচর্য্যা হইতে বঞ্চিত হইয়া বালকগণ নিরতিশয় বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া পড়িল।

ঐ দিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় রমেশচন্দ্র ঢাকা হইতে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল! রমেশবাবু আসিলে বালকগণের বিষণ্ণতা দূর হয়। ৩০শে চৈত্র (১৩০৮) রবিবার রমেশচন্দ্র প্রভুকে ঢাকা লইয়া যান। বন্ধুকথা তৃতীয় সংস্করণে সুরেশ বাবু প্রভুর এই মহাভাবোন্মাদ দশার বর্ণনা করিয়াছেন।

মহামৌনের পূর্ব্বাভাস

শেষ মৌনাবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে প্রভু বলিয়াছেন,—"তোরা হরিনাম না করলে, আমি ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হ'য়ে যাব।" শেষবার ঢাকায় রামশাহর বাগানে গিয়া প্রভু রমেশচন্দ্রকে ঢাকা ছাড়িতে বলেন এবং আরও বলেন,—

"আমি নির্জ্জন বাস করব, ঘরের বাহির হব না। বড় দুঃসময় আসছে। দেখিস্, যেন আমি দানাপানির অভাবে মারা না যাই, আর দুষ্টলোক যেন আমায় কষ্ট না দেয়।—সাধ্যমত নিঃসঙ্গ হইও।"

ঢাকায় অন্যান্য ভক্তগণের আগমন হয়। কয়েকদিন পর বন্ধুহরি নবদ্বীপদাসজী প্রমুখ ভক্তগণ সহ কলিকাতা গমন করেন। সেইবার কলিকাতায় গৌর লাহা ষ্ট্রীটের এক বাসায় প্রভু ছিলেন। শেষ মৌনাবস্থার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রভু বাহ্যসম্পর্ক এক-প্রকার ত্যাগ করেন, কদাচিৎ কথা বলিতেন, ভক্তগণকেও সহজে দেখা দিতেন না, ঘর হইতে বাহির হইতে বলিলে বলিতেন, "তোরা কেউ তো আমার কথা শুনলি না, হরিনামও করলি না। আমি কার কাছে বের হব? আমায় চায় কে?"

শেষমৌনী হওয়ার পূর্ব্বে প্রভু বিভিন্ন সময়ে ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন— "সময়ে আমি পাঁচ বর্ষের শিশুর মত হব। জীবের পাপ তাপ গ্রহণ করতে করতে আমার দেহে ব্যাধির

লক্ষণ প্রকাশ পাবে।” “ওরে আমি বের হলে, আমায় চালাবে কে? আমার যারা তারা ত এখনো সবাই আসে নি। দেখবি মহাউদ্ধারণের জন্য তারা কামান বন্দুকের মুখে বুক পেতে দিবে। ভুবন মঙ্গল হরিনামের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করবে।” “আমাকে অনন্ত ব্রহ্মাতে একাই, সমস্ত নেশনে, অলক্ষিতে অণুপরমাণুর মধ্যেও ঘুরে বেড়াতে হবে। সময়কালে আমাকে ত যেতেই হবে। তোরা ত আমাকে রাখতে পারবি না।”

কোন কোন ভক্ত বলেন, জগজ্জীবের কল্যাণার্থ একাগ্র ভাবনা দ্বারা জীবের চিত্তক্ষেত্রে মঙ্গলকর স্পন্দন জাগাইবার জন্য মহাউদ্ধারণ বন্ধু মহামৌনব্রত গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, কোন কোন ভক্তের অনুভব এই যে, ব্রজরস-গৌররসে বিভোর হইয়া মহাগম্ভীরায় ত্রয়োদশ দশা আস্বাদনার্থ বন্ধুচন্দ্রের এই মহামৌনাবস্থা। অথবা আরও নিগূঢ়তর কোনও কারণ আছে,— কে বলিবে?

শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণোদ্দীপন-স্তুতিঃ

অবতার-শিরোমণি-বিশ্বগুরুং
সুধিয়াঞ্চ বরপ্রদ-কল্পতরুম্ ।
নবহেম-বিনিন্দন-কান্তিধরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্ ॥ ১

ভজনীয়নিধিং ত্রিদিবেশ-গুরুং
শুভধী-গুণিনাং শুভকল্পতরুম্ ।
হরিনাম-রবৈ বিধি-সৃষ্টিধরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম ॥ ২

ধৃত-মর্ত্ত্যভবং নরমুখ্যনবং
সহভক্তগণৈঃ কৃতনাম-সবম্ ।
জগদীশবরং স্বজ-দেহধরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্ ॥ ৩

অভয়ং সদয়ং দলিতপ্রলয়ং
কৃত-কামজয়ং চির-শান্তিময়ম্ ।
কলিতপ্তনৃণাং ভয়দুঃখহরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্ ॥ ৪

হরিনামপরং শিবচিত্তহরং
স্মিতবক্ত্র-মনোহর-রূপ-ধরম্ ।

---

১ । 'তোটকং' সঃ (১২) । সবম্-যজ্ঞম্ ।

সিতবস্ত্রধরং মৃদুপদ্মকরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্ ॥ ৫
চরণাব্জতলে হরিচিহ্নধরং
বলভদ্রধনং ভবপঙ্কহরম্ ।
কুসুমেষু-ভয়ঙ্কর-শৌর্যধরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্ ॥ ৬
নটরাজ-শিরোমণি-সর্ব্বপতিং
হরিনাম-সুধাপ্রিয়-জীবগতিম্ ।
প্রিয়ভক্ত-কৃপাকর-নেত্রধরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্ ॥ ৭
পুরুষপ্রবরং স্মরদর্পহরং
ব্রজবাসিধনং রসরাজবরম্ ।
নবগৌরবিধুং ভবপারকরং
ভজ মূর্ত্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্ ॥ ৮
সেবকেনোদিতাং বন্ধোঃ স্মরণোদ্দীপনস্তুতিম ।
পঠন্ হি লভতে ভক্তো বন্ধু-জাম্বূনদদ্যুতিম্ ॥
ভজ জগদ্বন্ধু হরি প্রাণারাম ।
বন্ধু গুরু গৌরাঙ্গ গোপীরাধাশ্যাম ॥
বন্ধু নিতাই গৌর গদাধর সীতারাম ।
একক জগদ্বন্ধু পুরুষ হরি শ্যাম ॥
মিলনে জগদ্বন্ধু হরি মহানাম ।
মধুর জগদ্বন্ধু হরিপুরুষ নাম ॥

অনন্তানন্ত অন্ত্যলীলা

শ্রীঅঙ্গনে মহামৌনী প্রভু

"হৃষীকেশ! নমস্তেঽস্তু 'মুনয়ে মৌনশীলিনে।' ভাঃ ১০।১৬।৪৭

কলিকাতা গৌরলাহা ষ্ট্রীটের বাসায় থাকাকালে, প্রভু চিঠিপত্র, উপদেশাদি লেখা প্রায় বন্ধ করিয়া দেন। ১৩০৯ সনে আষাঢ়ের মধ্যভাগে একদিন রাত্রে গড়ের মাঠে নবদ্বীপ দাসজীকে মাত্র দুই একটি কথা বলেন। তদবধি ১৩২৫ সন, ১লা মাঘ বৈকাল পর্য্যন্ত প্রায় সতের বৎসর কাল (ষোল বৎসর আট মাস), সম্পূর্ণ মৌনী হইয়া প্রভু ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে, গবাক্ষ-হীন অন্ধকার কুটীরে অসূর্য্যম্পশ্য-অবস্থায় অবস্থান করেন। ১৩১০ সনে, মৌনী প্রভু, একবার কয়েকদিনের জন্য সেবাইত কৃষ্ণদাস, ক্ষুদীরাম, বিহারী, সাহাজী প্রভৃতি সহ নগরবাড়ী ভক্ত রজনী-গৃহে ও কালিকাবাড়ী পূর্ণ সিকদারজীর ভবনে গমন করিয়া তাঁহার দেব-দুর্লভ দিগম্বর শ্রীমূর্ত্তির দর্শনদানে বহু নরনারীকে ধন্য করেন। ইহা ব্যতীত ঐ ষোল বৎসর আট মাসের মধ্যে আর কোন স্থানে ঐ দেহ লইয়া গমনাগমন করেন নাই। অবশ্য ভাগ্যবান্ ভক্তগণ ঐ অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে তাঁহার দিব্যরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না। তিনি যাহাকে দেখা দেন, দূরে থাকিয়াও তিনি দেখেন, অপরে কাছে থাকিয়াও তাঁহাকে দেখে না।

১৩২৫ সালের ১লা মাঘ বৈকাল, প্রভুকে পশ্চিমের কুটীর-মন্দির হইতে পূর্বদিকের পাকামন্দিরে আনা হয়।

প্রভু মৌনী-অবস্থায় অঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়াও কোথাও স্বপ্নে দেখা দিয়া, কোথাও বা ক্ষণদ্যুতির ন্যায় দিব্যদর্শন দিয়া, বিভিন্ন দেশের লোককে কৃতার্থ করিয়াছেন, কতজনের অসৎ জীবনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ভক্ত করিয়াছেন। গৃহাবদ্ধ প্রভু অলৌকিক শক্তির বিকাশ করিয়া তাঁহার অসীম কৃপাকর্ষণে বহু যুবককে গৃহত্যাগী করিয়াছেন।

বন্ধুকথায় উল্লেখ আছে: মৌনী প্রভু ১৩১৪ সনের কতক-দিন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে আবশ্যক দ্রব্যের ফর্দ্দ ও উপদেশাদি লিখিয়া মন্দির হইতে বাহিরে ফেলিয়া দিতেন। তাহার পর ১৩১৯ সন হইতে ঐরূপ লেখাও বন্ধ করেন: দোয়াত কলম ভিতরে দিলে ফেলিয়া দিতেন। সেবক নিত্যগোপাল বলিয়াছেন, চম্পটী মহাশয়ের সেবাকালেও সময় সময় প্রভুর লিখিত ফর্দ্দ পাওয়া গিয়াছে।

জীবগণের প্রাণোন্মাদক ও আনন্দবর্দ্ধক, বহুদূর বিস্তৃত তাঁহার সুদিব্য অঙ্গগন্ধ, বহু মানসপ্রশ্নের উত্তর-নির্দ্দেশক, সুমীমাংসক ও ভক্ত-চিত্তরঞ্জন তাঁহার সাময়িক কাসির শব্দ বা গলার সাড়া, তাঁহার মঙ্গলময় নাম ও লীলামৃত স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন এবং দিব্যভাবে বা স্বপ্নযোগে তাঁহার দর্শনাদি ব্যতীত, তখন ভক্তগণের প্রভু-সম্পর্কে আর কোনও সাক্ষাৎ অবলম্বন ছিল না।

প্রভুর দিব্য অঙ্গগন্ধ দ্বারা আঙ্গিনার পথ-নির্দ্দেশের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রভু মৌনাবস্থায় তখন

শ্রীঅঙ্গনে মন্দির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ভক্তিমতী সুরমাতা কলিকাতা হইতে প্রভুর আঙ্গিনায় যাইবার উদ্দেশ্যে ট্রেন হইতে প্রথমবার ফরিদপুর স্টেশনে নামিয়াছেন, আঙ্গিনার পথ তাঁহার জানা নাই। ভক্ত মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কাহারও কাছে আঙ্গিনার পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রভুর অদৃশ্য কৃপাকর্ষণে আঙ্গিনায় পৌছিবেন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ভক্তমাতা স্টেশনে নামিয়াই তাঁহার পরিচিত প্রভুর অপূর্ব্ব অঙ্গগন্ধ পাইলেন এবং ঐ দিব্য গন্ধ অনুসরণ করিয়াই তিনি শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ কৃপাপ্রাপ্তি সকল সময়ে, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রীহরি-সম্বন্ধীয় অনুভব ও তাঁহার বিশ্বরূপাদির দিব্য-দর্শন-লাভ এবং অন্যান্য অনুভূতি-প্রাপ্তি তাঁহার কৃপা-সাপেক্ষ।

একান্ত ভক্তি, আর্ত্তি ও আগ্রহের সহিত কীর্ত্তন বা স্মরণ করিবার সময়, কোন কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত আঙ্গিনা হইতে দূরদেশে থাকিয়াও প্রভুর দিব্য অঙ্গগন্ধ অনুভব বা দিব্যদর্শন-লাভ করিয়াছেন এবং এখনও করিয়া থাকেন।

ঢাকা মানিকগঞ্জের ভক্ত ললিত চক্রবর্ত্তী সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণে ব্যগ্র ছিলেন। প্রভুবন্ধু তখন অস্পৃশ্যাস্পর্শ্য মহা-মৌনাবস্থায় আঙ্গিনায় কুটীর মধ্যে ছিলেন। ললিত মানিকগঞ্জের এক শিব-মন্দিরে অকস্মাৎ পদ্মাসনবদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় প্রভুবন্ধুর দর্শন পান এবং প্রভুবন্ধু একখণ্ড কাগজে ভক্তের অভীষ্ট মন্ত্র লিখিতভাবে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া অদৃশ্য হন। ইহার পর মহাব্যাকুল ভক্ত শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া উপস্থিত হন।

ভক্তের এক রুমালে ঐ মন্ত্রের কাগজ, প্রভুর সেবার্থ তুই টাকা ও পাথেয় দশ টাকা বাঁধা ছিল। অন্তর্য্যামী ভক্তপ্রাণারাম বন্ধু একদিন ভক্তের ব্যাকুলতায় দরজা খুলিয়া মোহন দিগম্বর মূর্ত্তিতে ভক্তকে দর্শন দিয়া হাত পাতেন। ভক্তবর বন্ধুহরিকে তাহার ঐ রুমালের পুটলী অর্পণ করেন। প্রভুবন্ধু উহা শ্রীমন্দিরে লইয়া কিছুক্ষণ পর রুমালটি ভক্তের দিকে ছুঁড়িয়া দেন। ভক্ত দেখেন, পাথেয় দশটি টাকা রুমালে বাঁধা আছে; অন্তর্য্যামী প্রভুসেবার তুইটি টাকা ও মন্ত্রসহ কাগজটি রাখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীজী প্রাণের আবেগে মৌনী প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া একদিন শ্রীঅঙ্গনে আসেন। দর্শন না পাইয়া নিজের গলা টিপিয়া তিনি আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে পরমদয়াল প্রভু অকস্মাৎ দর্শন দিয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। এইরূপ বহু মহাত্মা মহাপুরুষ মহামৌনী প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া যাতায়াত করিতেন।

হেড্‌মাষ্টার শ্রীনরেশ চট্টোপাধ্যায় প্রভুর মৌনাবস্থায় তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া আকুল ব্যাকুল দানহীনভাবে কয়েকদিন শ্রীঅঙ্গনধামে পড়িয়াছিলেন, দেখিয়াছি। তিনি প্রভুর কৃপা-প্রাপ্তজন। প্রভুর কৃপায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'সমাধি-প্রকাশ আরণ্য' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া জীবকল্যাণ ব্রতে ব্রতী হন। সন্ন্যাসী অবস্থাতেও তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গনে দেখিয়াছি। তাঁহার শিষ্যগণ বন্ধুভক্ত।

প্রভুর মৌনাবস্থায়, সেবকগণ কেহ কেহ প্রভুর অসাধারণ শরীর-বল লক্ষ্য করিয়াছেন। চালিতাতলার নিকট টিন-ঘেরা স্থানে প্রভুর স্নানের জন্য জলভরা কয়েকটি কলসী রাখা হইত, প্রতিটি কলসীর ওজন জলসহ প্রায় আধ মন ছিল। প্রভুবন্ধু কখন কখন বাম হাতে এক একটি কলসী ঘটীর মত অক্লেশে তুলিয়া লইয়া স্বীয় মস্তকে জল ঢালিয়াছেন।

নয়খানি পায়াবিশিষ্ট প্রকাণ্ড একখানি চৌকিখাট প্রভুর ব্যবহারের জন্য শ্রীমন্দিরে রাখা হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর প্রভু একদিন ঐ ভারী খাটখানি বাম হাত দিয়া অনায়াসে অনেকটা দূরে সরাইয়া লইয়াছিলেন।

জগতের মহাউদ্ধারণ-কার্য্যে মহামৌনী প্রভুর এই নীরব ও কঠোর তপশ্চর্য্যার প্রভাব-সম্পর্কে বন্ধুপ্রিয় রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"চিন্তাশীল লোক, পবিত্র চিত্তে প্রভুর এই কঠোর সাধনার বিষয় একাগ্রমনে ভাবিতে ভাবিতে তপশ্চর্য্যার স্পন্দন হৃদয়ে অনুভব করিবেন—ইহাই প্রভুর জীবনের মহাগতিশীল বল (Dynamic force)—ইহার শক্তিতে পাপ দূরীভূত হইবে; লোকের অন্তরে ধর্ম্মচর্য্যার সুমতি জাগিবে। এইভাবেই জগদ্বন্ধুর মহাউদ্ধারণ-ব্রত সফল হইবেই হইবে, আমার এই ধারণা।"

প্রভু বলিয়াছেন—"অণুপরমাণুকে পর্য্যন্ত, আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"এবার ত্রয়োদশ দশা দেখতে পাবি। এবার আমাতে

ঐশ্বর্যগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য, বালকত্ব ও তন্ময়ত্ব, এই তিনটি বেশী দেখতে পাবি।" তাই মহাউদ্ধারণ-লীলায় প্রভুর মহামৌনব্রত।

আঙ্গিনায় প্রভুর মহামৌনাবস্থায় কোন কোন ভক্ত গভীর রাত্রে মন্দিরের মধ্যে অমৃত বংশীবাদন, মধুর দৈব নৃত্যধ্বনি ও অন্যান্য অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি হইতেছে, এরূপ অনুভব করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মন্দির-মধ্যে কখন কোন বাদ্যযন্ত্রই থাকিত না এবং সেবকের লোচনদৃশ্য কোন মানবেরই সেখানে প্রবেশ সম্ভব ছিল না।

বিশ্বাস মহাশয়ের সেবাধিকারকালে, বাংলা ১৩২১—২২ সনের মধ্যে এক গভীর রজনীতে এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে, ছাত্রজীবনে আমি শ্রীমন্দিরে প্রবেশলাভ করি। নিকটে দৃষ্ট বান্ধব বিশ্বম্ভরও আমার ইঙ্গিতে সঙ্গে আসেন। মহা-মৌনী প্রভু খাটে লেপ গায়ে পূর্ব্ব শিয়রে শয়ান ছিলেন। বিশ্বম্ভর প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করেন। আমি নিজের বুকে, উদরে ও মস্তকে প্রভুবন্ধুর পাদপদ্মতলের স্পর্শ লাভ করি এবং প্রভুর উভয় শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে মুখে পুরিয়া চুষিতে থাকি। তন্মধ্যে একবার আমি প্রভুর শয্যায় উঠিয়া প্রভুর শ্রীমস্তকে ও অন্যান্য অঙ্গে হাত বুলাইয়া এই অধম আমাকে তাঁহার নিত্যদাস করিবার জন্য প্রার্থনা করি। কিছুক্ষণ পর বাহিরে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই আমার দেহ আপনা আপনি গড়াইতে থাকে, মুখে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম উচ্চারিত হইতে থাকে। কি অদ্ভুত স্পর্শমাহাত্ম্য!

প্রণতি, লুণ্ঠন, মহাউচ্চারণ, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বতঃই হইতে থাকে। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সুগন্ধ আমার গাত্রলগ্ন হইয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত অনুভূত হয়।

ইহার পূর্ব্বে এক গভীর রাত্রে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে এক ছাপরায় সহ-সেবাইত শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর ক্রোড়ে এই ছোট ছাত্র মহেন্দ্র আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেরাত্রে মন্দিরে প্রভু ব্যতীত আঙ্গিনায় আর অন্য কেহ ছিলেন না। মহেন্দ্রজী আমাকে জাগাইয়া বলিলেন, 'ঐ শোন বংশীবাদন, নিত্য বৃন্দাবনে নিত্যই এই বাঁশী বাজে। প্রভুর কৃপা হতে শুনা যায় শ্রীমন্দির হইতে অতি অতি মধুর সূক্ষ্ম বংশীরব শ্রুত হইতেছিল, অথচ মন্দির-মধ্যে দৃশ্যতঃ কোন বাঁশীই রক্ষিত ছিল না। ক্রমে সেই রব বিলীন হইয়া গেল। আমরা উভয়ে অঙ্গনরজে গড়াগড়ি করিয়া, নানা প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কুণ্ড হইতে উষাস্নান করিয়া আসিলাম। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

প্রভুর মৌনাবস্থার শেষভাগে একদিন একনিষ্ঠ বন্ধুভক্ত ক্ষেত্র বসাক ঢাকা হইতে ফরিদপুর আসিয়াছেন। বাজার হইতে প্রভুর জন্য উত্তম সন্দেশ কিনিয়াছেন। পথে উহা লইয়া আসাকালে এক চিল-পাখী ঠোঙা সহ ঐ সন্দেশ ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। পুরীর মাধোদাসের ন্যায় সখ্যভাবাপন্ন ভক্ত ক্ষেত্র প্রভুর সেবায় সন্দেশ না লাগায় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রভুর উদ্দেশ্যেই ক্রোধোক্তি করিতে করিতে ঢাকায় ফিরিয়া যান।

অতঃপর তিনি একদিন নিজের কক্ষে বসিয়া এক উকীল

বান্ধবের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় এক এক করিয়া তিনখানি সেই ফরিদপুরের সন্দেশ তাহাদের সম্মুখে পড়িল। অপূর্ব্ব গন্ধ! অদ্ভুত ঘটনা। সেই প্রসাদী সন্দেশ তাহারা পাইলেন ও কিছু রাখিয়া দিলেন। বন্ধুসুন্দর স্বপ্নে ভক্তকে জানাইয়া দেন, ভক্ত আঙ্গিনায় পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই তিনি ভক্তের দ্রব্য পাখীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেবায় বঞ্চিত হইলে, ভক্তের ক্রোধমান-উক্তি, দেখিয়া শুনিয়াও প্রভুর সুখ। ধন্য ভক্ত! ধন্য ভক্তবশ প্রভু!

"তোরা আমায় স্মরণ করিস্ আর না-ই করিস্, আমি তো'দিগকে নিত্য চিরকাল স্মরণ করব, স্মরণ করে রক্ষা করব"। প্রভুর এই অভয় বাণী পড়িয়া ভক্তরাজ ক্ষেত্র মহানন্দে বলিয়া উঠেন, "এই হালাই একমাত্র প্রভু! আর কোন প্রভু নাই," ইহা বলিয়া প্রভুর চির শরণাগত দাস হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এমন আশ্বাসবাক্য আর কোন অবতারেই প্রভু দেন নাই।

গৌরহরি গম্ভীরায় বাহ্যদশা-শূন্য ও অন্তর্মনা হইয়া স্বীয় ব্রজলীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, সময় সময় স্বরূপ ও রামরায় তাঁহার ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠ করিয়া ও লীলাগীত গাহিয়া তাঁহার মহাভাবের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এবার প্রভুবন্ধু শ্রীঅঙ্গনে মহাগম্ভীরায় থাকিয়া একাধারে, একক, ব্রজগৌর-লীলা-রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের পাপ-তাপ আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ক্রমে মহাউদ্ধারণের পথে লইতেছেন। মহাভাবে

বিভোর প্রভুবন্ধুর স্থিতিস্থল, ভক্তগণের চিরকাম্য পরমধাম সেই শ্রীঅঙ্গনের জয় হউক।

জয় শ্রীঅঙ্গন, শ্রীবন্ধু-ভবন, সদা হরিনামময়।
শ্রীব্রজমণ্ডল, নবদ্বীপস্থল, একাধারে বিরাজয়॥

কল্পতরুভব, চারু অভিনব, আঙ্গিনায় শোভাময়:
প্রসাদ শুভদ, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, আস্বাদনে পাপক্ষয়॥

তুলসীকানন, শোভিত অঙ্গন, পুণ্যগন্ধ সদা বয়।
শ্রীকুণ্ড অতুল, রাধাকুণ্ড-তুল, সর্ব্বতীর্থ-বারিময়।

বাজে করতাল, মাদল রসাল, অঙ্গন মঙ্গলময়।
রম্য নবব্রজে, অমূল্য শ্রীরজে, নিত্যবাঞ্ছা দেহ-লয়।

---

* ভব ভব্য-চালিতা-তরু

প্রভুর সেবা ও সেবকগণকে কৃপা

"নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।

কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥ চৈঃ চঃ মধ্য।৮

প্রভুর মৌনী হওয়ার পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে ন'মা, জেঠিমা, দেবীমা, রমেশচন্দ্র, চম্পটী মহাশয়, প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় (গোকুলানন্দ), নবদ্বীপদাসজী, ছোট জয়নিতাই, শ্রীহররায়, বাদল বিশ্বাস মহাশয়, শিতিকণ্ঠ মহাশয়, গোপীকৃষ্ণদাস, ভাদুড়ী মোহিনী, রঘু গোঁসাইজী, শ্রীরামদাসজী, শ্রীতারণ গাঙ্গুলীজী প্রমুখ ভক্তগণ যার যার ভাগ্যমত সেবার কার্য্য চালাইয়াছেন। প্রভুর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি-অনুসারে প্রিয় ছাত্র ভক্তগণ ও গৃহী ভক্তগণও তাঁহাকে নানাভাবে সেবা করিবার ভাগ্য পাইয়াছেন।

প্রভুর মৌনাবস্থার পূর্ব্বে ১৩০৯ সনের কয়েক মাস পর্য্যন্ত নৈষ্ঠিক ভক্ত হররায় ও ছোট জয়নিতাই আঙ্গিনায় প্রভুর সেবাইত ছিলেন। অতঃপর প্রায় দেড় বৎসরকাল গোপীকৃষ্ণ দাস অঙ্গনে নিষ্ঠার সহিত প্রভুর সেবাকার্য্য করেন। প্রভু তৎকালের মধ্যে কলিকাতা ও ঢাকাতেও গমন করিয়াছেন।

প্রভুর মৌনী হওয়ার সময় কৃষ্ণদাসজী সেবাইত ছিলেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল—"ত্রিকালে সর্ব্বোত্তমভাবে সেবা চালাইবা আমার কাছে কিছু পাইবা না।" ব্যবহারিক জগতে কৃষ্ণদাসজী তেমন লেখাপড়া জানিতেন না। ভক্তের গৌরবদাতা প্রভু তাহাকে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণদাস বাবু, বিদ্যা, এম, এ।" "সেবাইত—কৃষ্ণদাস!" "ধর্ম করতঃ কর্ম কর

প্রখর যমরাজা।” “পৃথিবী মিথ্যা, পৃথিবী তৃণবৎ, পৃথিবী রাধানাম-বিহীন।” “রাধানাম জপ করিবা, প্রাণকে গড়ের মাঠ করিবা।”

কৃষ্ণদাসজী আঙ্গিনায় ১৩০৯ সনের পর হইতে ১৩১৭ সন পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর কাল সেবার কার্য্য চালান। তখন ভোগ-মন্দির ছিল না; রন্ধনস্থালী বৃক্ষে ঝুলান থাকিত, কাষ্ঠাদি কুড়াইয়া অতি ক্লেশ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাসজী নিষ্ঠার সহিত সেবাকার্য্য চালাইতেন। পরে প্রভুর সেবক প্রয়োজনে ভক্তদের উদ্যোগে দোচালা ছোনের ভোগ-ঘর ও কূপ প্রস্তুত করা হয়।

কৃষ্ণদাসজীর পর, ১৩১৯ সনের ২রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই বৎসরকাল অতুলচন্দ্র চম্পটী মহাশয়ের উপর সেবাভার অর্পিত ছিল। তদীয় পত্নী ক্ষীরোদা দেবী (দেবীমার কন্যা) মাতুলগৃহ হইতে প্রত্যহ আসিয়া মৌন থাকিয়া নাকে কাপড় দিয়া নৈষ্ঠিকভাবে ভোগরান্না করিতেন। কার্য্য শেষ হইলে আবার মামাবাড়ী যাইয়া অবস্থান করিতেন। তখন গৌরাঙ্গ দাস নামে এক উত্তম খোলবাদক যুবক ভক্ত, সহযোগী, শ্রীঅঙ্গন-সেবক ছিলেন। কিছুকাল গোপাল বিশ্বাসজীও সহকারিভাবে অঙ্গনে ছিলেন। আংশিক সেবাকার্য্যে, এ ছাড়া অন্যান্য ভক্তগণও সময় সময় উপস্থিত থাকিতেন। গোষ্ঠ দিদি নামে এক ভক্তা ক্ষীরোদা দেবীর সহচরী রূপে কতকাল ছিলেন। তৎকালে নিত্যগোপাল দাদা বহুদিন সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনাদি গাহিয়াছেন।

১৩১৯ সনের কতকদিন পর্য্যন্ত দরজার নিকট ভোগ আনিয়া নিবেদন জানাইলে, প্রভুবন্ধু সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় আসিয়া দরজা খুলিয়া পাশে সরিয়া থাকিতেন। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কেহ সাহসী হইতেন না। ভোগ সমেত ভোগপাত্রাদি মন্দিরে রাখিয়া আসা হইত। ১৩১৯ সনের কিছুদিন পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট সেবাইত ভিন্ন অন্যান্য ভক্তও একান্ত আগ্রহ হইলে এবং নিবেদন জানাইলে শ্রীমন্দিরে যাইয়া নিজেদের আনীত সেবার দ্রব্যাদি রাখিয়া আসিতে পারিতেন।

প্রভুর ভোগের সময় প্রসাদের আকাঙ্ক্ষায় বসিয়া থাকিয়া কেহ প্রভুর ভোগে বিঘ্ন না ঘটায়, এইজন্য পূর্ব্ব প্রভুর ভোজনাবশেষ এবং তিনি গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে আনীত বা পক্ক খাদ্যবস্তু সমস্তই জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। তখন প্রসাদের লোভে কেহ বসিয়া থাকিতে পারিত না। পরে প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ভক্তদের আগ্রহে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়।

প্রভুর জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ ট্রাঙ্ক, তোয়ালে, বস্ত্র, বালাপোষ, রুমাল, রবারের পাদুকা, ফুল, মালা, তোড়া, মিঠাই, ফল, ধূপ, লবাং, অগুরু, গোলাপজল, ল্যাভেণ্ডার, এসেন্স প্রভৃতি সময় সময় পাঠাইতেন বা সঙ্গে আনিতেন, অথবা আসিয়া কিনিয়া সেবাইতের কাছে দিতেন। ইচ্ছা হইলে উহার কিছু কিছু প্রভু গ্রহণ করিতেন।

সন্ধ্যায় বাহিরেই ধূপধুনা দেওয়া হইত। গবাক্ষহীন শ্রীমন্দির-কুটীর দিবসেও অন্ধকারময় থাকিত। তবে প্রভু কৃপা করিয়া দর্শনদান করিলে আঁধার ঘরেও তাঁহার দিব্যজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইত। ভিতরে আলো রাখার নিয়ম ছিল না, রাত্রে ভোগের সময় মাত্র অল্পক্ষণের জন্য মোমবাতির আলো জ্বলিত। প্রভু ভোগ লইলে, জল ঢালার ও ট্রাঙ্ক খোলার শব্দ পাওয়া যাইত। মন্দিরে জলসহ একটি কলসী, একটি ঝারি ও একটি ঘটি থাকিত। প্রভু ট্রাঙ্ক হইতে মুখ মুছার তোয়ালে লইতেন।

প্রভু ভোগ না লইলে অথবা যথাসময় দরজা না খোলায় প্রস্তুত খাদ্যাদি ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে, কোন কোনদিন উপর্য্যুপরি কয়েকবার ভোগ রান্না করিতে হইত। কোন কোনদিন তিনি আদৌ দরজা খুলিতেন না, বা দিলেও কিছু গ্রহণ করিতেন না। ভোগদ্রব্যে লোকের দৃষ্টিদোষ বা অন্যান্য ত্রুটি ঘটিলে অথবা কোন অভুক্ত আগন্তুক থাকিলে, তাহাকে না খাওয়ান পর্য্যন্ত প্রভু ভোগ লইতেন না। ভাব বিহ্বলতার দরুণও সময় সময় ভোগ লওয়া বন্ধ থাকিত।

পরবর্ত্তী অবস্থায় দেখা গিয়াছে, বন্ধুগোপাল কিছু মাখিয়া খাইতেন না। কখন কখন মাঝখান হইতে শুধু অন্ন কিছু তুলিয়া লইতেন, ব্যঞ্জনাদিও পৃথক্ পৃথক্ লইতেন, কখন বা যে কোন একটি দ্রব্য একটু লইতেন, আর সব পড়িয়া থাকিত। কখনও বা অন্নব্যঞ্জন একত্রও কিঞ্চিৎ লইতেন। রাজভোগ কি

লোভনীয় পায়স পরমান্নাদি পাতে প্রায় অগৃহীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত।

প্রভুর ভোগগ্রহণের পরিমাণ প্রায়ই এক তোলা, দুই তোলা, এক ছটাক দু'ছটাক ছিল। কখন কখন কিছুটা ভালভাবে লইতেন। মাঠা ঘোল সময় সময় লইতেন।

কিছুকাল প্রভু মাত্র একবার ভোগ লইতেন, তৎকালে কখন দরজা খুলিবেন, তা'ও ঠিক থাকিত না। বিভিন্ন সময়ে ভোগ গ্রহণের ধারা ও সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বদিকে চালিতা গাছ পাশে রাখিয়া মন্দিরের সঙ্গে তিন দিকে টিনের বেড়া দিয়া এক ছাপরা প্রস্তুত করা হয়। ঐ ছাপরায় জলসহ স্নানের দুইটি কলসা ও মলমূত্র ত্যাগের জন্য কলাই করা দুইটি পাত্র রাখা হইত। মলত্যাগের জন্য কলাপাতা দেওয়া থাকিত। সময়ে দেখা গিয়াছে প্রভু মল-ত্যাগের সময় মূত্র ত্যাগ করিতেন না, মলে কোনও দুর্গন্ধ পাওয়া যাইত না, সেবকগণ চিরদিন উহা গোময়ের মত অতি পবিত্র মনে করিয়াছেন।

সময় সময় প্রভু বিহ্বলভাবে শয্যাতেও মলত্যাগ করিয়াছেন, কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যাইত না, তাই তখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে কাহারও সাহস হয় নাই। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পরে শয্যা পরিবর্ত্তন কালে, উহা টের পাওয়া যায়; তখনও ব্যবহৃত শয্যাদি গাত্রগন্ধে সুরভিত। প্রভুবন্ধু নিরুদ্বেগে তন্মধ্যেই ভাববিহ্বল হইয়া শুইয়া থাকিতেন। পূর্ব্বে নিজের এই ভবিষ্যদ্দশা সম্বন্ধে

প্রভু ১৩০৭ সনে একদিন কয়েকজন বালকভক্তকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্, এমন সময় আস্‌বে, তখন আমি জড়ের মত হ'ব। কোন জ্ঞান থাকবে না পঞ্চবর্ষীয় শিশুর ন্যায়। সে সময় তোরাই আমার রক্ষাকর্ত্তা, একমাত্র অভিভাবক। তখন আমায় তোরা রক্ষা করিস্, প্রভুর ভার তোমাদের মস্তকে।"

১৩১৯ সনের পর ছাপরায় না আসিয়া মন্দির-মধ্যেই প্রভু মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, উহা পরিষ্কার করিতে করিতে ছোট গর্ত্ত হইলে আবার নূতন মৃত্তিকা দিয়া ঐ স্থান ভরাট করিয়া দেওয়া হইত। সেবাইত সানন্দে ঐ সকল পরিষ্কার করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন। ঐ অবস্থায় কতককাল প্রভু স্নান ও দন্তধাবনাদি বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ছাপরায় পূর্ব্বদিকে একটি দরজা ছিল এবং উহাতে তালাচাবি লাগানোর ব্যবস্থাও ছিল।

ঐকালে একদিন আঙ্গিনায় একই সময়ে অকস্মাৎ নানাবর্ণের বহু সর্পের আগমন ঘটে। সেবিকা ক্ষীরোদা দেবী ভোগঘর হইতে ছিদ্রপথে এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া ভীতা হইয়া প্রভুকে স্মরণ ও তাঁহার নাম করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি করিয়া সর্পবৃন্দ অন্তর্হিত হন। কিসের আকর্ষণে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, একমাত্র প্রভুই তাহা জানেন।

১৩১৯ সন, ৩রা অগ্রহায়ণ হইতে ৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রভু দরজা খোলেন নাই। ৬ই তারিখে অপরাহ্নে প্রভু দরজা

খোলেন ; ভোগ দেওয়া হয়, কিন্তু পাত্র বাহিরে আনিয়া দেখা গেল, মাত্র এক আধ তোলা পরিমাণ অন্ন ছড়ান ভাবে আছে, আর সব খাদ্য যথাবৎ ছিল ; জলও স্পর্শ করেন নাই। ১৪ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিবস তিনি সম্পূর্ণ অনাহারে ছিলেন, ৬ই তারিখ ভিন্ন আর দরজা খুলেন নাই। স্থানে স্থানে ভক্তদের কাছে টেলিগ্রাম, পত্রাদি যায়। ভক্তগণ অনেকে আসিয়া শ্রীঅঙ্গনে সমবেত হন। প্রভু জীবিত আছেন কি না সকলে সন্দেহ করেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ বেলা ১১টায় ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া পূর্ব্বদিকের বেড়ার অংশ খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করেন। উপস্থিত সর্ব্বজনের বহুকাল পর প্রভুর দুর্লভ দর্শন-স্পর্শন লাভের সৌভাগ্য ঘটে। তাঁহাকে একবার দেখিলে পুনঃ পুনঃ দর্শনেচ্ছা বলবতী হয়, জগৎ-সংসার ভুল হইয়া যায়। তাঁহার অতুল রূপের দর্শন হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, এক স্থানেই চক্ষু থাকে, সর্ব্বাঙ্গ একযোগে দেখাও ঘটিয়া উঠে না। উপবীতশূন্য, দিগম্বর, অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ মধুর রূপ। অপূর্ব আকর্ষণ! তাঁহাকে একবার স্পর্শ করিলে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবার বাঞ্ছা হয়। ঐ দিবস তাঁহার কামদর্পহর সর্ব্বদেব বাঞ্ছনীয় নবনীত-কোমল মধুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে উপস্থিত ভক্তগণের মানবজন্ম ধন্য ও সার্থক হয়।

১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে সূর্য্যাস্তকালে ভক্তগণের প্রার্থনায় প্রভু কিছু ভোগ লইয়াছিলেন। ১৬ই অগ্রহায়ণ, মন্দিরের

পূর্ব্বদিকের দরজায় বাহির হইতে তালাচাবি লাগাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিকের ভিতরের অর্গলটিও খুলিয়া রাখা হয়, যাহাতে সেবাইত ইচ্ছামত নিয়মিতভাবে মন্দিরে সেবার দ্রব্যাদি রাখিয়া আসিতে পারেন। দক্ষিণ দ্বারটি ভিতর হইতে বন্ধ, প্রভুর জন্য স্বতন্ত্র থাকে. দক্ষিণ দিকে বারান্দা, চটা ঘেরা ছিল। কুটীরের পশ্চিম ও উত্তর দিকে, বাহিরের দিকে বর্দ্ধিত চাল ছিল।

প্রভুবন্ধুর সেবা-কার্য্যের শৃঙ্খলার জন্য, সহরে এক বিরাট সভার আয়োজন হয় এবং তাহাতে "পর্য্যবেক্ষক কমিটি," "শ্রীঅঙ্গন ট্রাষ্ট কমিটি" ও "ফণ্ড" গঠিত হয়। কিন্তু মতভেদ হওয়ায়, এ সকল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত সেবাইতগণ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে প্রাচীন বাদল বিশ্বাস মহাশয় ১৩১৯ সন ১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২৪ সনের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর সেবাধিকার প্রাপ্ত হন এবং ঐ ৩০শে চৈত্র, শ্রীঅঙ্গনধামেই শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রয়ে বিশ্বাস মহাশয়ের দেহাবসান হয়।

বিশ্বাস মহাশয়ের সময় কৃষ্ণদাসজীও সময় সময় সেবায় থাকিতেন। ১৩১৮ সনে চম্পটী মহাশয়ের সেবাকালে কুমার ব্রহ্মচারী শ্রীমহেন্দ্রজী শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বপ্নে প্রভুর দর্শন পাইয়া শ্রীঅঙ্গনে ভক্তমুখে প্রভুর বার্ত্তা জানিয়া ছুটিয়া আসেন এবং কিছু-দিন মৌনী ভাবে থাকিয়া আবার শ্রীবৃন্দাবন যান। পরে বিশ্বাস

মহাশয়ের সেবাকালে মহেন্দ্রজী আহ্বান পাইয়া সহকারী সেবাইত-ভাবে কয়েক বৎসর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সেবাকার্য্য করেন।

মহেন্দ্রজী ছাত্রদিগকে ভালবাসিতেন ও কিসে তাহারা প্রভুর দিকে উন্মুখ হইবে, সেজন্য চেষ্টা করিতেন। তিনি রাজবাড়ী-ভক্ত যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে যাইয়া স্থানীয় স্কুলের ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইতেন ও তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও কীর্ত্তনে উৎসাহিত করিতেন। অতঃপর ১৩২৩ সনে মহেন্দ্রজী প্রভুর প্রেরণায় মহানামসম্প্রদায় গঠন করেন। প্রধান সহকারী ও মধুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া কুঞ্জদাসজী, প্রেমদাস, ভবতারণ দাস, উদ্ধারণ দাস, সতীশ কর, সতীশ মুখার্জি, বন্ধুদাস, বলভদ্র, গোপীদাস, লীলাপ্রকাশ, রোহিণী, (তেজোনারায়ণজী) সূর্য, শান্তি, রসময় প্রমুখ বহু ত্যাগী ভক্ত লইয়া এই সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহাদের কতকজন আগে, কতকজন বা পরে সম্প্রদায়ে যোগ দেন। মহানাম সম্প্রদায় দেশে দেশে প্রভুর মহানাম প্রচারণে বাহির হন। ছোট মহেন্দ্র আমিও প্রচারণের সূচনার দিন অঙ্গনে যোগ দেই এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে ও কিছুদিন পরে কয়েক বৎসর ঐ প্রচারণ-কার্য্যে অংশ গ্রহণ করি। মহানাম-প্রচারণে কুঞ্জ দাদা মহেন্দ্রজীর প্রধান সহকারী ছিলেন। মহেনদার অনুপস্থিতিতে কখনো কখনো কুঞ্জদা সম্প্রদায়ের পরিচালক হইতেন।

একই সময়ে বিভিন্ন জেলায় বন্ধুনাম প্রচারের সুবিধার জন্য কখনো কখনো মহানাম সম্প্রদায়কে দুই ভাগ করিয়া একদলের পরিচালক মহেন্দ্রদা ও অন্যদলের পরিচালক কুঞ্জদাসজী থাকিতেন।

এর মধ্যে অবকাশমত কখনো কখনো মহেনদা, কখনো বা কুঞ্জদা অঙ্গনে যাইয়া প্রভুর সেবা-ভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

আমার গুরুস্থানীয় রাজবাড়ীর যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই প্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। মহানাম-সম্প্রদায়ের তিনি সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রভু-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি মুদ্রণ, প্রচারণ, পরামর্শ দান, নিজ আবাসে শ্রান্ত-ক্লান্ত বা অসুস্থ ভক্তদের পালন ও আবশ্যক নানাবিধ সাহায্যদ্বারা তিনি সম্প্রদায়ের প্রধান বান্ধব হইয়াছিলেন। শ্রীঅঙ্গনেও প্রভুর সেবা-সম্পর্কে কবিরাজ মহাশয়ের অকপট ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

বিশ্বাস মহাশয়ের সেবাকালে প্রসন্ন সাহাজী, ধলাশ্যাম দাসজী ও জিতেন্দ্র গুহজী সময় সময় ভোগরন্ধনের ভাগ্য পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ধলাশ্যামজী বহুদিন ভোগ রান্না করিয়াছেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসজী, নিত্যগোপাল সরকারজী, কালোশ্যাম, শ্রীরাম প্রভৃতি ভক্তগণ আঙ্গিনায় আংশিক সেবাভাগ্য পাইয়া ধন্য হইয়াছেন; এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন সময় উপস্থিত থাকিয়া সাধ্যমত কিছু কিছু সেবাকার্য্য করিয়াছেন।

ঐ সময় (১৩২১-২২ সনে) জীবাধম এই ছোট মহেন্দ্রর ভাগ্যেও সময় সময় শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান, কীর্ত্তনে যোগদান ও কোন কোন সেবাকার্য্যের সাময়িক অংশ গ্রহণ ঘটে। প্রভুর সেবাভাগ্য প্রভুর কৃপায় হয়। যাহাকে যতটুকু কৃপা করিয়াছেন, তিনি ততটুকু পাইয়াছেন।

প্রভুর আবির্ভাবোৎসব

১৩১৪ সনে আঙ্গিনায় প্রভুর আবির্ভাব-তিথি সীতানবমীর স্মরণে, রমেশচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন ভক্তগণের প্রচেষ্টায় প্রভুর আবির্ভাবোৎসব আরম্ভ হয়। তখন ভক্তগোষ্ঠী-সম্মিলন, বন্ধুকথা-চর্চ্চা, অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা জন্মোৎসব সম্পন্ন হইত। সাত বৎসর এইরূপভাবে প্রভুর জন্মোৎসব চলে; পরে ১৩২১ সন হইতে বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের সময় উক্ত উৎসব ছাপ্পান্ন প্রহর কীর্ত্তন-উৎসবে পরিণত হয়। উহাতে প্রভু-রচিত কীর্ত্তন ও "জয় জগদ্বন্ধু বোল, হরিবোল্ হরিবোল্" "জয় জয় জগদ্বন্ধু জয় ভবতারণ। হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ" ইত্যাদি মহানাম-কীর্ত্তন অহোরাত্র অবিরাম হইত। পরেও প্রতিবৎসর কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে সপ্তাহব্যাপী কীর্ত্তন উৎসব এবং ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ হইতে থাকে।

তখন কীর্ত্তন মধ্যে ভক্তগণের আবেশ, সাত্ত্বিক হাস্য, আনন্দ, নৃত্য, ক্রন্দন, পুলক আদি নানা চমৎকার ভাবের প্রকাশ দেখা যাইত; ভদ্র মহিলাগণও কখন কখন কাঁদিয়া আকুল হইতেন। একবার এক বিশিষ্টা কুলবধূ প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি বুকে লইয়া নাম গাহিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। প্রভু মহামৌনী, কেবল তাঁহার প্রাণমাতান অঙ্গগন্ধে মাঝে মাঝে গলার গম্ভীর কাসির শব্দে মন্দিরে তাঁহার অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যাইত।

কোন কোন বৎসর রমেশচন্দ্রতে গুরুবুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধুভক্তগণ তাঁহার অনুগত রাজনাথ দাদা প্রভৃতি সদলে "জগদ্বন্ধু পুরুষ হরি" এই মহানাম গাহিয়া সকলকে মাতাইয়া জন্মোৎসবে বিমল আনন্দ দান করিতেন।

জন্মোৎসবে তখন প্রতিদিন সংগৃহীত পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত চাউল ও দাইল, লাফরা আদি পাক হইয়া সর্ব্বজনে প্রসাদ বিতরিত হইত। জগদ্বন্ধুধাম, জগন্নাথক্ষেত্র-শ্রীঅঙ্গনে, চিরকাল সর্ব্বসাধারণে অবিচারে প্রসাদ লইয়া থাকেন।

ঐ সময়কার জন্মোৎসব দেখিয়া ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাহার আর্য্যকায়স্থ পত্রিকায় মন্তব্য করিয়াছিলেন,—'তিনি (প্রভু) মৌনী হইলেও সহস্রকণ্ঠে তাঁহার পবিত্র বিশ্বজনীন বাক্য শ্রুতিগোচর হইতেছিল, লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত হইলেও তিনি যেন সকলের অন্তরাত্মা স্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন: তাহা যদি না হইত, তবে কি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নরনারী নির্ব্বিকারচিত্তে একাসনে আহার করিতে পারিত ? আমরা এই মহাত্মার ও তদীয় বিশ্বজনীন ধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিতেছি।' তৎকালে ১৩২২, শ্রাবণ সংখ্যায় ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় অধ্যাপক রসিকলাল রায় লিখেন, অনাচারী খুনী শ্রদ্ধাচারী হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিল…জগদ্বন্ধু বক্তৃতা করেন না…তিনি নীরব হইয়া মুখর, নিষ্ক্রিয় হইয়া কর্মশীল, মৌনী হইয়া প্রচারক…

শ্রীবালকৃষ্ণ লীলাম্বুধি গ্রন্থে লিখেন,

"গুপ্ত রহি জগদ্বন্ধু ভাসাইলা প্রেমে।"

প্রভুর উৎকাসি ও দর্শন দান

১৩২০ সন, ৩০শে কার্ত্তিক রাত্রে প্রভুর উৎকাসি আরম্ভ হয়। ১লা ও ২রা অগ্রহায়ণ ভোগ বন্ধ থাকে, উৎকাসির সহিত মাঝে মাঝে কিছুটা বমন হয়। বহু ডাক্তার কবিরাজ আসেন। তাঁরা দেখেন প্রভুর নাড়ী ও বক্ষস্থলের স্পন্দন সময় সময় একেবারে বন্ধ। এই ব্যাধিচ্ছলে প্রভু বহু ভাগ্যবান্ জনকে তাঁহার দেবদুর্লভ দর্শনস্পর্শনদানে কৃতার্থ করেন। ৩রা অগ্রহায়ণ তিনি স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ সুস্থ হন, কোনও ঔষধ সেবন করেন নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও কখন কখন প্রভুর উৎকাসি প্রকাশ পাইয়াছে।

বহিরঙ্গনে পদার্পণ ও মাঘীউৎসব

১৩২০ সন, ২৬শে মাঘ, নিতাইচাঁদের আবির্ভাব-তিথিতে শুক্লা ত্রয়োদশী রবিবার, কেদার কাহা দ্বারা প্রভুর ক্ষৌরকার্য্য করান হয়, বাদল বিশ্বাসজী ও মহেন্দ্রজী বহুকাল পর প্রভুকে তৈল-হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেন; প্রভু কোনও আপত্তি দেখান নাই। ঐদিন তিনি চার-পাঁচ মিনিটের জন্য বহিরঙ্গণে পদার্পণ করেন: পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে তাঁহার সানন্দ উদাস দৃষ্টি; উপবীত-শূন্য, সম্পূর্ণ উলঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি,—পায়ে মাত্র রবারের পাদুকা। উপস্থিত দর্শকগণের প্রাণে আনন্দ-বিদ্যুৎ-লহরী খেলিতে থাকে। ২৭শে

মাঘও ঐরূপ দর্শন দেন। পরদিন মাঘীপূর্ণিমায় তিনি ছাপরা পর্য্যন্ত আসিয়া দর্শন দেন। দর্শনানন্দে সেটেলমেণ্ট অফিসের কতিপয় ভক্তিমান্ কর্ম্মচারী সহ স্থানীয় ও শ্রীঅঙ্গনের ভক্তগণ একত্রে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। ইহার পর হইতে প্রতি মাঘীপূর্ণিমায় চব্বিশ-প্রহর কীর্ত্তন-মহোৎসব হইতে থাকে। কোনোবার বা অধিকও হইয়াছে।

শয্যা পরিবর্ত্তন, মোহনরূপের দর্শন

"দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম॥" চৈঃ চঃ

প্রভু দ্বাদশ বর্ষের ঊর্ধ্বকাল এক শয্যায় ছিলেন। ভক্তপ্রদত্ত অন্যান্য তোষকাদি ঐ শয্যার উপরই পাতা থাকিত। বার বৎসর পর বিশ্বাস মহাশয় প্রভুকে বহু নিবেদন জানাইয়া ঐ শয্যা-পরিবর্ত্তনে সাহসী হন। প্রভুর প্রসাদী শয্যা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তখন বহু ভক্তগৃহে নীত ও রক্ষিত হইয়াছিল।

১৩২১ সন, ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে প্রত্যহ প্রায় দুই সহস্র লোক কিছুক্ষণ করিয়া বন্ধুর অলোকসামান্য মনোহর দর্শন পাইতে থাকেন। দর্শনে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান, কোন জাতিবিচার ছিল না। সর্ব্বজাতি, বালক, বৃদ্ধ-যুবা সম্ভ্রান্ত নর-নারী, সবাই দর্শনে আসিতেন। প্রভুবন্ধু তখন স্নানের পূর্ব্বে বা পরে রবার-পাদুকা-পায়ে উলঙ্গভাবে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কখন বা শয়ান, কখন বা আসীন

অবস্থায় তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। তিনি যখন যেরূপে থাকিতেন, সেইরূপে—কখন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ, কখন সম্মুখ ভাগ, কখন পার্শ্বদেশ, কখন বা শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশমাত্র দর্শন-প্রাপ্তি ঘটিত।

একদিন প্রভুর দর্শনে ব্যগ্র এক মুসলমান সম্প্রদায়কে আঙ্গিনায় দেখিয়া কেহ বিস্ময়প্রকাশক মন্তব্য করিলে তাঁহাদের মধ্যে একজন উত্তর দেন, 'বাধা কি? এ তো হিন্দুর দেবমন্দিরে আসি নাই। ইঁহার নাম জগদ্বন্ধু: আমাদেরও বন্ধু বটেন। তাই আমরা জগতের বন্ধুকে দেখতে এসেছি।' ইঁহারা দর্শন পাইয়াছিলেন।

১৩২৩ সনের বৈশাখ হইতে ঐরূপ ধারাবাহিক দর্শনদান বন্ধ হয়; তবে কাহারও কাহারও ভাগ্যে কদাচিৎ স্বল্প-দর্শন যে না ঘটিত, এমন নহে।

প্রভুর বাসমন্দির জীর্ণ হইয়া যাওয়ায়, ঐ আদি-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, ১৩২২—২৩ সনের মধ্যে, উপরে উত্তম পাটী-খড়ের চালাবিশিষ্ট অধিক গবাক্ষ-দ্বারসংযুক্ত বৃহৎ ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিন্তু প্রভু ঐ নবনির্ম্মিত মন্দিরে থাকিতে ইচ্ছা করিতেন না। লোকের অলক্ষ্যে প্রভুর তথায় গতায়াতের সুবিধার জন্য আদিমন্দিরের পূর্ব্বদ্বার হইতে নবমন্দিরের পশ্চিমদ্বার পর্য্যন্ত চালিতাগাছ ভিতরে রাখিয়া উভয় পার্শ্বে টিনের বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। ভক্তবাঞ্ছা-পূরণার্থ দয়াময় প্রভু সময় সময় নূতন মন্দিরে যাইয়া অল্পক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেন।

ইহার পূর্ব্বেই প্রভুর অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার দর্শন-স্পর্শন পাইয়াছিলাম। উভয় মন্দির-পথে টিনের বেড়া দেওয়ার পর একদিন মনে হইল, "যেই নাম সেই হরি" নাম করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিব। মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া নিজের করতাল বাজাইয়া 'জয় হরিপুরুষ বোল, জয় জগদ্বন্ধু বোল' গাহিতে গাহিতে উত্তর দিকের টিনের বেড়ার ছিদ্রপথে দৃষ্টি দিয়া থাকিলাম, সঙ্গে সহপাঠী তারক ঘোষ (পরে তিনি গ্রাজুয়েট হন), মহানাম করিতেছিলেন। অন্তর্য্যামী বন্ধু কিছুক্ষণ পরই আদিমন্দির হইতে রবার-পাদুকাচরণে দিব্য শুভ্রকান্তি দিগম্বর মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া চালিতা-তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কারুণ্য ঈক্ষণে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে নিরুপম রূপ দর্শনে এ অধমের জীবন সার্থক হয়। স্বীয় "হরিশব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয়" বাণীর সত্যতা দেখাইয়া উত্তমশ্লোক-শিরোমণি প্রভু এই জীবনে নূতন কৃপা-শক্তির আধান করেন। ইহার পর তিনি নূতন মন্দিরে যান। আবার কিছুক্ষণ পর নব স্বর্ণকান্তিতে দর্শন দিয়া পুরাতন মন্দিরে প্রবেশ করেন। সেইদিন তাঁহার মহানাম গাহিবার কালে প্রাণে ধ্বনিত হইতেছিল—"ইনি গোলোক-বিহারী হরি! ইনি গোলোকবিহারী হরি!!"

অনুভবের ভাষা নাই। তবু সেই দিনকার সেই শুভ দর্শনটি ছন্দে যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।—

অনুপম বন্ধুরূপ নাশে মনোদ্বন্দ্ব।
বর্ণিনু সামান্য, ধরি কীর্ত্তনের ছন্দ ॥

"জয় হরিপুরুষ বোল" ধ্বনি সুমঙ্গলে।
উদিল শ্রীবন্ধুচন্দ্র ভব্য-তরুতলে॥

অমল ধবল গিরি বন্ধু দিগম্বর।
অনুপম প্রেমোজ্জ্বল হেম কলেবর॥

ও' রূপ বর্ণনে, সহস্র বদনে,
সে 'শেষ' না পায় শেষ।
'কীট' জীব ছার, কি বর্ণিবে আর,
হারি মানে ত্রিদিবেশ॥
বন্ধু দিগম্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
গোলোকেশ চন্দ্র বাঁকা।
বিংশ নখে মরি, যায় গড়াগড়ি,
রাশি রাশি শশী রাকা॥
দীর্ঘ চারিহস্ত, শ্রীদেহ প্রশস্ত,
মূরত হরি পুরুষ।
শিশ্ন হ্রস্ব অতি, দমে কাম-রতি,
নাশে মানস-কলুষ॥
কণ্ঠ মাল্যহীন, শিরে কেশ ক্ষীণ,
শ্মশ্রুগুম্ফ-শূন্য মুখ।
দীপ্ত চন্দ্রভাল, উরস বিশাল,
দরশনে ভক্তসুখ॥
যুগলশ্রবণ, ললিত-শোভন,
কৃষ্ণকেশ শিরে কারু।

পৃষ্ঠ সুবিমল, বিস্তৃত কমল,
নিতম্ব বিশাল চারু ॥
চিবুক কমল, কপোল অমল,
রক্তাধর সুশোভন।
রম্য কটী মরি, হরি গন্ধে হরি,
পদ্মপলাশলোচন ॥
সূক্ষ্মদন্ত সিত, কক্ষ-বক্ষ স্ফীত,
গতি মত্ত গজবর।
শ্রীরোম বিরল, অঙ্গ নিরমল,
সর্ব্বসুলক্ষণধর ॥
শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল, নবনী-কোমল,
কোকনদ পাণিতল।
করুণ ঈক্ষণ, কিনিল জীবন,
পদ্মআঁখি ছল ছল ॥
সর্ব্বাঙ্গুলি পর্ব্ব, নাশে দেবগর্ব্ব,
সুদীর্ঘ বর্ত্তুল ভুজ।
পদ্মগন্ধ অঙ্গ, মনসিজভঙ্গ,
অভয়দ মুখাম্বুজ ॥
নগ্ন মহাকায়, ইতি-উতি-চায়,
পঞ্চবর্ষী শিশুপ্রায়।
অপ্রাকৃত ভাব, ব্রজমহাভাব,
রসরাজ বন্ধুরায় ॥

রম্ভাতরু জিনি উরু, স্মরধনু গঞ্জে ভুরু,
'রবার' পাদুকা রাঙা পায়।
নাসা নিন্দে খগপতি, নাভি শ্রীগম্ভীর অতি,
চারু জঙ্ঘা করিশুণ্ড প্রায়॥
পয়স্বিনী গাভী বাঞ্ছে সুন্দর উদর।
সিংহগ্রীব বৃষস্কন্ধ মহামহেশ্বর॥
জয় জয় গুরুবন্ধু বিশ্বপ্রেমদাতা।
ক্ষেমধাতা বিশ্বপাতা নিত্য-পরিত্রাতা॥

বন্ধুসুন্দরের এই সময়কার জগজ্জয়ী ভুবনমোহন রূপের আলোকচিত্র তুলিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। ঐ জন্য কিছু চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। তিনি যদি শুধু ঐ রূপখানি লইয়া জগদ্বাসী জীবকে দর্শন দিতেন, তাহাতেই বিশ্বজন তাঁহার চরণে আত্মদান করিত। কোন প্রচারের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু, তিনি তাহা করেন নাই। চির আবরণের দেবতা, আবরণেই রহিয়াছেন।

একদিন শ্রীবাদল বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর উভয় মন্দিরে প্রভুর গতায়াত পথে স্থিত টিনের বেড়ার ছিদ্রগুলি বন্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এমন সময় শিরোদেশে ময়ূর পুচ্ছের চূড়ায় শোভিত হইয়া ষড়্‌বর্ষবয়স্কবালোচিত দিব্য মনোহর বপু ধারণ করিয়া বন্ধুসুন্দর পাকামন্দিরের পশ্চিম দ্বারে আসিয়া অকস্মাৎ উদিত হন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে যেন ঢল ঢল অমিয় লাবণী গলিয়া পড়িতেছিল। যজ্ঞেশ্বর

বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীরামানন্দ রায় যেমন দেখিয়াছিলেন শ্যামের সর্ব্বাঙ্গ কাঞ্চন পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে ঢাকা, ঠিক সেইরূপ অপরূপ গৌরাঙ্গরূপ লইয়া বন্ধুসুন্দর দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্বাস মহাশয়ের ইঙ্গিতে যজ্ঞেশ্বর ক্ষণকালমাত্র সেই অপরূপ দিব্যরূপ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সেইদিকে অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার সাধ্য কাহারও হয় নাই। ঐ শ্রীমূর্ত্তি এক নিমেষ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সকলেই দৃষ্টি ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হন ভক্ত-নয়নমণি বন্ধুচন্দ্রও অমনি বিদ্যুদ্‌গতিতে পশ্চিমদিকের মন্দিরে যাইয়া আত্মগোপন করিলেন।

বন্ধুপ্রিয় ভাগ্যবান্ ভক্তগণ ভক্তপ্রেমবশ প্রভুবন্ধুর অযাচিত করুণায় বিভিন্ন সময়ে তাঁহার বিবিধ ভগবদ্‌রূপের দেবদুর্লভ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

লীলায় ব্যাধির অবস্থা গ্রহণ করতঃ তিনি যখন অসহায় শিশুর মত বাহিরে প্রকাশিত হইয়া মানুষের করায়ত্ত হন, তখনকার রূপের সহিত এই সময়কার রূপের বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছি। তবু, তখনও যাঁহারা বন্ধুসুন্দরকে দেখিয়াছেন, অন্যান্য সঙ্ঘের শিষ্য সাধুগণও একবাক্যে বলিয়াছেন "এমনটি আর দেখি নাই। এমন রূপ, আকৃতি, বর্ণ মানুষের হয় না। একেবারে সোনার তনু।"

বেড়া ভাঙ্গিয়া প্রভুর দর্শন

১৩২৩ সনে, ২৮শে বৈশাখ জন্মোৎসবে বহুভক্ত-সমাগম হয়। প্রভুর দর্শন প্রার্থনায় আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে কয়েকজন ভক্ত পুরাতন মন্দিরের বেড়ার কিয়দংশ খুলিয়া দ্বার উন্মোচন করেন। প্রায় বার চৌদ্দজন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শয়ান প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর পতিত হইয়া "হা প্রভু দয়া কর" ইত্যাদি কাতরোক্তি করিতে থাকেন। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর প্রভু পাশ ফিরিতেও অসমর্থ হন। তথাপি সহাস্যবদন—কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি-বোধ নাই। অনেক চেষ্টায় জনতা সরান হয়। প্রভুর মধুর অঙ্গুলি-সঙ্কেত-অনুসারে তখনই ভগ্নস্থান সংস্কৃত হয়।

মহানাম-সম্প্রদায়ের প্রচারণ

১৩২৩ সন, অগ্রহায়ণ শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীঅঙ্গনে মহানাম-সম্প্রদায়ের প্রথম মহানাম-অষ্টপ্রহর-কীর্ত্তন হয়। এই কীর্ত্তনে আমি উপস্থিত ছিলাম। অবশ্য অন্যত্র এর আগে জগদ্বন্ধু-মহানাম অষ্টপ্রহর আরও বহু গৃহে হইয়াছে। সে সমস্ত কীর্ত্তনে যোগ দেওয়ার ভাগ্যও পাইয়াছি। সম্প্রদায় গঠনের পর শ্রীঅঙ্গন হইতে উক্ত সম্প্রদায়, মহেন্দ্রজী ও কুঞ্জদাসজীর পরিচালনাধীনে, বাহির হইয়া বিভিন্ন জেলার নানা গ্রামে, ঘরে ঘরে জগদ্বন্ধু-মহানাম প্রচার করেন। নানা স্থানে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

শ্রীঅঙ্গনে প্রভু মৌনী হইয়া থাকিলেও, সম্প্রদায়ের প্রচারণ-কালে নানাস্থানে কীর্ত্তনক্ষেত্রে অনেককে দিব্যদর্শন দেন। কোথাও কোথাও তাঁহার ভোগ গ্রহণের চিহ্ন দেখা যায়। কীর্ত্তনে অনেকের কলুষিত জীবনের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শত শত অষ্টপ্রহর, ষোল প্রহর, চব্বিশ প্রহর-কীর্ত্তন হয়। পাঁচ বৎসরের মধ্যে বহু চৌদ্দমাদল নগর-কীর্ত্তন, চার পাঁচটি ছাপ্পান্ন মাদল কীর্ত্তন, একটি একশত বারো মাদল নগর-কীর্ত্তন হয়। সহস্র মাদল নগর-কীর্ত্তনও হইয়াছে। মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচারণে চারিদিকে মহাবতারীর শুভ আগমনের একটা সাড়া পড়িয়া যায়, অন্য সমাজ ও সম্প্রদায়ের অনেকেও শ্রদ্ধাপন্ন হন। দূর-দূরান্তর হইতে আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী প্রভুর কাছে ছুটিয়া আসিতে থাকেন। এই প্রচারণ-কার্য্য পাঁচ ছয় বৎসরকাল পূর্ণ উদ্যমে চলে। প্রভুবন্ধুর প্রিয় ব্রহ্মচারী ভক্ত-গণ মধ্যে রমেশবাবু, মহেন্দ্রদাদা ও কুঞ্জদাকে মাতৃজাতির সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্য-আলাপ আদি সংস্রব যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিতে দেখিয়াছি। ব্রহ্মচারীর পক্ষে এইরূপ আচরণ যথাসাধ্য অনুকরণীয়।

দণ্ডপাণি প্রভু ও কীর্ত্তনোৎসব

১৩২৪ সন হইতে সেবকদের নানা ত্রুটিবশতঃ সময় সময় প্রভু ভোগ লইতেন না। শ্রীমন্দিরে ভোগের থালা রাখা বা আনয়ন কালে সেবাইতকে সময় সময় তিনি তাড়া করিতেন।

তখন সেবাকার্য্য-বশতঃ মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে সেবকগণ ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইতেন। প্রভুবন্ধুর বাণী ঃ

"বাদল, অনিষ্ঠাই প্রভুর মৃত্যু জানিবা"
"অনিষ্ঠা অনাচারে প্রভুপাত জানিবা।"

১৩২৪ সনের জন্মোৎসবে, ১৮ই বৈশাখ, পাদপদ্ম-যুগলে রবারের পাদুকা-পরিহিত, দিগম্বর বন্ধুহরি রঞ্জন-খঞ্জন-গমনে আদি মন্দির হইতে বাহির হইয়া নূতন মন্দিরের এক উন্মুক্ত দীর্ঘ অর্গল হাতে লইয়া দক্ষিণ দ্বারের সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান হন। ইহা যেন 'অনিষ্ঠা অনাচারে প্রভুপাত জানিবা' এই বন্ধুবাণীর স্মারক। সংকীর্ত্তনকারিগণের মধ্য হইতে তিনজন সাহস করিয়া প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হন। অগ্রবর্ত্তী সত্যব্রত প্রভুবন্ধুর শ্রীহস্তের কৃপাদণ্ডস্বরূপ অর্গলদণ্ডের আঘাত প্রাপ্ত হন। সে স্পর্শকে ভক্ত পরম ভাগ্য মানিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বন্ধু-হরিনাম করিতে থাকেন। তখন রাজনাথ দাদা সদলে তুমুল ভাবে "জগদ্বন্ধু পুরুষ হরি" মহানাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সত্যব্রতের মত সৌভাগ্যসূচক দণ্ডপ্রাপ্তির আশায় ঐ সময় আরও কয়েকজন ভক্ত প্রভুর নিকটে ছুটিয়া আসে। মহামৌনী প্রভু অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। ওদিকে তুমুল সংকীর্ত্তন, ঘন ঘন হরিধ্বনি ও উলুধ্বনি হইতে থাকে।

১৩২৪ সনে পৌষমাসে, বড়দিনে, শ্রীঅঙ্গনে মহানাম-সম্প্রদায়ের ষোলপ্রহর কীর্ত্তন-মহোৎসব হয়। ঐ কীর্ত্তনে

উপস্থিত থাকার ভাগ্য পাই। জলকেলির দিন রাত্রে, উপস্থিত ভক্তগণ একবার প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশ দর্শন পান।

১৩২৪ সনের ৩০শে চৈত্র ভাগ্যবান্ প্রভুসেবক বিশ্বাসজী শ্রীঅঙ্গনেই দেহত্যাগ করেন, প্রভুর নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হন এবং তখন হইতে শ্রীঅঙ্গনে প্রভুবন্ধুর সেবাভার পূর্বসেবাইত কৃষ্ণদাসজীর উপরে ন্যস্ত হয়।

১৩২৫ সনের জন্মোৎসবে প্রভু-রচিত কীর্ত্তন ও মহানাম-কীর্ত্তনের প্রতিযোগিতায় একদিন কীর্ত্তন-কোন্দল হইয়াছিল। শেষে শ্রীরমেশচন্দ্রের মধ্যস্থতায়, সকলের সম্মতিক্রমে মহানাম-কীর্ত্তন চলিতে থাকে।

১৩২৫ সনে ২৬শে পৌষ, মহানাম সম্প্রদায় আঙ্গিনায় অষ্টপ্রহর মহানাম কীর্ত্তন করেন।

অন্যান্য বারের মত প্রতি বৎসর মাঘীউৎসবও আঙ্গিনায় যথাযথ সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীঅঙ্গনে এই সকল বার্ষিক উৎসব ব্যতীত কখন কখন সাময়িক মহোৎসব, অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনাদিও হইয়া থাকে। ১৩২৭ সনে ১১ই অগ্রহায়ণ রাসপূর্ণিমায় অঙ্গনে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন উৎসব হয়।

অবশাঙ্গ বন্ধুহরি

"চতুর্থ প্রহর পর, চবন চেবন হর,
মহাকায় ধূলায় লুটায়।
(ধূলা ধূলা ধূলা রে) (ধাম কাম ক্ষাম ধাম)"

চন্দ্রপাত, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ

১৩২৫ সন, ১৯শে পৌষ সন্ধ্যাগতে মন্দিরে ভোগ রাখিয়া আসার পর প্রভু ভোগ গ্রহণের প্রারম্ভে পড়িয়া যান। পাদুকার ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া সেবকগণ তালা খুলিয়া দেখেন, দিগম্বর প্রভু উত্তান অবস্থায় বিহ্বলভাবে ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। মৌনের পূর্ব্বে প্রভু এক সময় জানাইয়াছিলেন, "এখন আমি বাহির হতে পারি না। আমাতে যে সমস্ত বিষ্ণু লক্ষণ আছে, কঠিন ব্যাধি দ্বারা ও'সব লোপ করায়ে মানুষের সঙ্গে মানুষ ভাবে মিশব।" বন্ধুহরির একদিকে ত্রয়োদশ দশা আস্বাদন, অন্যদিকে জীবের পাপ-তাপ-ব্যাধি আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বরক্ষণ।

তাঁহার নিকটে যাইয়া সেবাকরণে তাপিত জীবগণের এই সুযোগ। নানাস্থানে প্রভুর এই অবস্থার সংবাদ পাঠান হয়। আঙ্গিনায় ডাক্তার কবিরাজ ও অন্যান্য ভক্তসম্মিলন হয়। প্রভুর দক্ষিণাঙ্গে পক্ষাঘাত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 'দুর্দ্ধর্ষ রহস্য কয় পঙ্গুপঙ্গ পাঙ্গমা।" (চন্দ্রপাত)

১৩০৬ বঙ্গাব্দে হরিকথার 'অলসে' লিখিত একটি অংশ, "পঙ্গু-রঙ্গ, ভুক্তি-ভঙ্গ :—পতন-পাতু ॥"

ইহাতে প্রভুর নিজের ভবিষ্যদ্দশার ইঙ্গিত কোনো কোনো ভক্ত অনুভব করেন। ১৩২৫, ১৯শে পৌষ, চতুর্থ প্রহর পরে, ভোজন-ভুক্তি-কালে বিঘ্ন, 'ভুক্তিভঙ্গ', আর প্রলয়াঘাত গ্রহণ দ্বারা বিশ্ব-রক্ষণে প্রভুর 'পতন' এবং রঙ্গলাল বন্ধুর পঙ্গুত্ব 'পঙ্গুরঙ্গ,' আর ঐ পঙ্গুত্ব দশা হওয়াতেই জীবের পক্ষে প্রভুর দুর্লভ দর্শন,

স্পর্শন ও সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ, তাতে তিনি জীবের পবিত্রীকরণে, রক্ষণে ও উদ্ধারণে পাতা-ত্রাতা, নিজেই নিজের কাছে প্রার্থনা করেছেন 'পাতু'। "হা কীটপতন",-জীবপাবন, উদ্ধারণ।

প্রভু ত্রিকালে লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মচর্য্য জরা।" পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের সত্ত্বময়ী পরিণতিতে প্রভুর এই জরা ভাবগ্রহণ। হরিকথায় লিখিয়াছেন, "অবশ দ্বাদশ ভাব, প্রভুবলে, লো বিলাব।" তাই জীব কল্যাণার্থ প্রভুর অবশ দ্বাদশভাব, অপ্রাকৃত দশা।

সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, প্রকর একনিষ্ঠভক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত হন এবং প্রভুর আংশিক সেবাকার্য্য করিবার ভাগ্য পান। এতদ্ব্যতীত রমেশচন্দ্র, পূর্ণ ঘোষ, রণজিত লাহিড়ী, যোগেন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ বন্ধুপ্রিয় ও প্রবীণ ভক্তশ্রেষ্ঠগণ শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া অবস্থান করিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা-সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করেন।

১৩২৫ ১লা মাঘ বৈকাল প্রভুকে নূতন মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। ৮ই মাঘ ঐ পাকা মন্দিরে লেপগায়ে শয়ান মহাভাবে বিভোর বন্ধুগোপালের এক আলোকচিত্র তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

এই মাঘ মাসে পুরাতন বাসস্থলের মন্দির পুনর্গঠনের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী হইতে শ্রীঅঙ্গনে এ'বৎসর মাসাধিককাল অবিরাম বন্ধুহরি-মহানাম-কীর্ত্তন-যজ্ঞ চলিতে থাকে; মহানাম-সম্প্রদায় কীর্ত্তনের ভার লন, অন্যান্য ভক্তগণও যোগ দেন।

ঐ সময় একদিন আমেরিকা-ফেরত জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রভুর দর্শনে আসেন। তিনি যুক্তকরে দৈন্যের সহিত প্রভুকে বলেন—প্রভু, আপনাকে আমাদের প্রয়োজন। আমাদের জন্যই দু'টি দুধ ভাত খাবেন। ভক্তের নিবেদন শুনিয়া প্রভু মধুর ভাবে হাসিলেন। তখন মন্দিরে উপস্থিত ছিলাম।

৪ঠা ফাল্গুন, প্রভুকে কলিকাতা লইবার জন্য শ্রীরমেশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় প্রথম শ্রেণী ইনভ্যালিড্‌কার আনীত হয়। পরে ভক্তদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় উহা ফেরত যায়।

প্রভুকে তৎকালে শায়িত অবস্থায় আঙ্গুরের রস, বেদানার রস ইত্যাদি খাওয়াইয়া দেওয়া হইত। ৫ই ফাল্গুন, প্রভু ভক্ত-স্কন্ধে হাত দিয়া নূতন মন্দিরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়িতে আসেন। চেয়ারে তাঁহাকে বসান হয়। সংবাদ পাইয়া প্রভুর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-গৌরের লক্ষণদ্রষ্টা অদ্বৈতবংশীয় বৈষ্ণব রঘু গোস্বামীজী ছুটিয়া আসিয়া 'আমার বন্ধু, আমার প্রভু' বলিয়া একবার প্রভুকে জড়াইয়া ধরেন এবং আমার প্রভু, জয় জগদ্বন্ধু বোল বলিয়া মহানন্দে নাচিয়া গর্জন করিতে থাকেন। আনন্দের বাজার বসে। তখন কীর্ত্তন হইতেছিল। অতঃপর সুকণ্ঠ গায়ক ভক্ত কেদার শীল গৃহে প্রভুকে নেওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানান; তখন তামাকের গন্ধপূর্ণ, ভক্তের টিনের গরম ছাপরায় কাঙ্গালের ঠাকুর দিগম্বর বন্ধুগোপালকে চেয়ারে বহন করিয়া নেওয়া হয়। প্রভু বন্ধু ভক্তের ময়লা শয্যায় নিরুদ্বেগে, স্বচ্ছন্দে, হাস্যমুখে অবস্থান করেন। পরে আঙ্গিনা হইতে শয্যাদি আনা হয়।

কীর্ত্তনের দল সঙ্গে সঙ্গে চলে, অহর্নিশ মহানাম গান হয়। তথায় উপস্থিত থাকার ভাগ্য পাই।

৬ই ফাল্গুন সকালে প্রভু শ্রীঅঙ্গনে আসেন। কিছু পরে প্রভুর ইঙ্গিতে সম্মতি পাইয়া ক্রমে ইজিচেয়ার-দোলায় প্রভুকে লইয়া খোল করতালে কীর্ত্তন সহ টেপাখোলা যাত্রা করা হয়। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সহর গ্রাম হইতে দলে দলে সর্ব্বজাতীয় নরনারী, কুলবধূ পর্য্যন্ত বাহির হন, প্রভুর সঙ্গে যাইবেন।

প্রভু টেপাখোলায় ভক্ত সরকার নিত্যগোপাল-গৃহে দু'দিন এবং তথা হইতে প্রাচীন ভক্ত মথুর কর্ম্মকার-ভবনে ৮ই ও ৯ই ফাল্গুন, দুই দিন থাকেন।

এখানে প্রভুর সেবার ব্যাপার লইয়া প্রাচীন ও নবীন ভক্তদের মধ্যে মতবৈষম্য ঘটে। পরিশেষে নবীনদের সেবাধীনেই প্রভু থাকিয়া যান।

১০ই ফাল্গুন মোহান্তপাড়া হইয়া প্রভুকে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে আনা হয়। ভ্রমণকালে বন্ধুসুন্দর সময় সময় সময় পথ-নির্দ্দেশার্থ অঙ্গুলি সঞ্চালন অথবা মস্তক আন্দোলন করিতেন।

১৩২৫ সনে ১৩ই ফাল্গুন হরিনামের সময়ে প্রভু ভ্রমণের ইজি-চেয়ার হইতে প্রাঙ্গণে নিজ হাতের উপর ভর দিয়া মহানাম-কীর্ত্তনের মধ্যে, আসিয়া অঙ্গন-রজে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। প্রভুর কোমল অঙ্গে কাঁকরআদি শক্ত দ্রব্য না বিঁধে এইজন্য কৃষ্ণদাসজী ঐ স্থান ঝাড়িবার মত দ্রব্য তাড়াতাড়ি না পাইয়া নিজের বহির্বাস খুলিয়া ঐ স্থান ঝাড়িতে থাকেন। কি অপূর্ব

সেবাবুদ্ধি ও দ্রুত সাবধানতা। প্রভুর জয়ধ্বনিতে আনন্দের বাজার বসে। তথায় উপস্থিত থাকার ভাগ্য আমি পাই।

মহামৌনাবস্থার পর বন্ধুগোপাল

সুদীর্ঘ ষোল বৎসর আটমাস পর প্রভুবন্ধু ১৩২৫ সনে ১৭ই ফাল্গুন আমাদের অনেকের উপস্থিতিতে "ফ-ফ-ফ-ফরিদপুর" এই শব্দটি প্রথম উচ্চারণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার কয়েকদিন আগেই প্রভু 'হুঁ, না' ইত্যাদি রূপ শব্দ মন্দিরে উচ্চারণ করিয়াছেন।

১৩২৫, ২৫শে ফাল্গুন, ভক্তদের কাঁধে দোলনা ইজিচেয়ারে ভ্রমণরত শিশুপ্রভু বাজারের খালের নিকট নামিয়া, সেতু থাকা সত্বেও খাল পার হইবার জন্য ইঙ্গিত-আদেশ করেন। কুঞ্জদাদার সঙ্গে আমরা তখন মহানন্দে জয় জগদ্বন্ধু বোল কীর্ত্তন করিতে ছিলাম। সেখানে সাঁতার জল, অথচ ভক্তগণ জলে নামিয়া দেখেন, সেখানে, প্রায় হাঁটু জল। কীর্ত্তন সহ প্রভুকে লইয়া পার হইবার পর, লোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, সেখানে তখন সাঁতার জলই আছে। শিশুবন্ধুর এও এক বিচিত্র খেলা! জয় জগদ্বন্ধু হরি!

১৩২৪ সনের ৩০শে চৈত্র, বিশ্বাস মহাশয়ের দেহাবসানে কৃষ্ণদাসজী পুনরায় শ্রীঅঙ্গনে সেবাইত হন ইহাও পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। তাঁহার অধীনে ধলাশ্যাম, রাখালদাস, কালোশ্যাম, যজ্ঞেশ্বরদাস, সত্যব্রত, সীতানাথ আদি ও কখন কখন প্রাচীন

শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক এবং আরও কেহ কেহ সেবার কার্য্যাদি করিতেন। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণদাসজীর সস্নেহ অনুমতি পাইয়া এই দীন-লেখক আমারও অনেক দিন শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর শয্যাদি রচনা, প্রভুকে উঠান, শোয়ান, মুছান ইত্যাদি অধিকার সহ প্রভুর শ্রীচরণ-পার্শ্বে থাকিবার ভাগ্য ঘটে। তখন প্রভু যখন যাহা করিতেন, সাধ্যমত ডাইরীতে লিখিয়া রাখিতাম। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ঐ সকল অমূল্য ডাইরীর অধিকাংশই হস্তান্তরিত হয়। যাহা কিছু স্মৃতিতে ও এখানে-ওখানে নোট করা ছিল, তাহা হইতেই এই অন্ত্যলীলা লিখিত হয়।

শিশুভাব দশায় বন্ধুগোপাল কখনও কখনও শয়নে থাকিয়া, কখনও-বা বসিয়া ভোগ লইতেন। শয়ান-অবস্থায় সাধারণতঃ তরল বা মিশ্রিত ভোগদ্রব্য শ্রীমুখে ঢালিয়া দেওয়া হইত। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু খাওয়াইয়া দিলে উহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিতেন। সেবক বেশী আগ্রহ দেখাইলে, তিনি বালকের মত চাহিয়া লইয়া উহা মুখে রাখিয়া পরে ফেলিয়া দিয়া বিছানা ভিজাইতেন।

শিশুভাবে বসিয়া কিছু গ্রহণকালে বামহস্তে খাইতেন। ভোগের দ্রব্য কণা কণা লইয়া পাশে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ফেলিয়া দিতেন। কখন-ও বা থালাতেও রাখিতেন। দৃষ্টি সর্ব্বদা অন্যদিকে থাকিত। এ জগতের কোন দ্রব্যে লক্ষ্য থাকিত না। কোথায় কোন্ রাজ্যে কোন্ মহাভাবে তন্ময় থাকিতেন, তাহা বুঝা যাইত না। কখনও বা অদৃশ্য কাহারও সহিত কথা কহিতেন বা

ইঙ্গিত করিতেন। ভোগগ্রহণের পরিমাণ অনেক সময় একটা পাখীর আহার অপেক্ষাও কম দেখা যাইত। কোনও দিন বা একটু বেশী লইতেন।

বন্ধুগোপাল আপন ইচ্ছায় "আসমান ফেলে দেও" "পৃথিবীটা এনে দে" "বিভূতি আকাশে আছে, আর ঘরে থাকতে পারে না" "বাহিরে গেলে দেখাব" "এটা কার ষ্টেট" (ইং ২৮।৩।১৯১৯) ইত্যাদি মধুর কথা বলিতেন—এ সকল কথার অর্থ সকল সময় হৃদয়ঙ্গম হইত না।

একদিন মহেনদা প্রভুকে স্পর্শ করিলে প্রভু বলেন, "ছুঁয়ে ছুঁয়ে পুণ্যি কর" ?"

বন্ধুসুন্দর মৌনের আগে বহুদিন পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন— "আমার বয়ঃ পাঁচ বর্ষ। আমাকে শিশু কহে।" মৌন-ভঙ্গের পর বন্ধু-গোপালের মধ্যে স্বরচিত চন্দ্রপাত গ্রন্থোক্ত "পঞ্চম বর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাষে" এই বাণীটি সর্ব্বতোভাবে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। এমন শিশুভাবের পূর্ণ প্রকাশ কেহ কোনও দিন দেখে নাই; আধ আধ দুই চারিটি কথা যাহা বলিতেন, তাহার নিরুপম মাধুর্য্য সকলের মনপ্রাণ কাড়িয়া লইত। শ্রীমুখ হইতে যাহা বাহির হইত, তাহা শুনিতে ও তাহা লইয়া পরস্পর পুনঃ পুনঃ আলাপ আলোচনা করিতে ভক্তগণের বিপুল আনন্দের উদয় হইত।

প্রভুর গতিবিধি রাজকীয় বিধিতন্ত্র নহে
প্রভুর আইন হয় না

সেবকগণ দোলায় উপবিষ্ট প্রভুবন্ধুকে স্কন্ধে লইয়া তাঁহার ইঙ্গিত মত বিভিন্ন পথে বেড়াইতে লইতেন। সময় সময় বাজারের মসজিদের নিকট দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুকে লওয়া হইত। এই কার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়ায় ১৩২৫ সনে, ১৪ই চৈত্র পুলিসের লোকেরা দোলা (ইজিচেয়ার) সহ প্রভুকে থানার প্রাঙ্গণে বহন করিয়া লইয়া যান। পুলিসদলের অগ্রণী ছিলেন দেবেন সিং। থানার প্রাঙ্গণে প্রভুর দোলা রাখিবার পর, শিশুপ্রভু সেবক-স্কন্ধে হাত দিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। তাঁহার চরণতলে দোলাস্থিত শয্যার কিয়দংশ পাতিয়া দেওয়া হয়। তিনি উহার উপর দিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাকে আর অল্পক্ষণ বসিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রভু তখন বসেন।

পরে জানা গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভুর স্বাধীন গতিবিধির উপর কোন বাধানিষেধই আরোপ করেন নাই, মাত্র সেবকগণের নাম লিখিয়া রাখার কথা ছিল। ইহার পর পুলিসের লোকজন দোলা সহ প্রভুকে কাঁধে করিয়া কতক পথ আগাইয়া দিলে, সেবকগণ প্রভুকে লইয়া শ্রীঅঙ্গনে যান।

শুনিয়াছি, এই ঘটনার পর দেবেন সিং তাঁহার অধিকৃত পদ

হইতে অবনমিত (degraded) হইয়া অনুতপ্ত হন ও বন্ধুভক্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আত্মশোধনার্থ প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে ভক্তহস্তে কিছু অর্থ অর্পণ করিয়া চিত্তে তৃপ্তিবোধ করেন।

জেলখানা ও লাইনের সিপাহীরা ভক্তিশ্রদ্ধাভরে দোলায় আসীন প্রভুকে কখন কখন কতক পথ বহন করিয়া লইতেন। একদিন প্রভুকে জেলগেটের নিকট লওয়া হইলে, জেলগেট খুলিয়া দেওয়া হয়। সেদিন প্রভু ভিতরে লইতে অনুমতি দেন নাই। অন্য একদিন উহার ভিতরে লইতে সম্মতি জানান। সেইদিন জেলখানার আসামীরা প্রভুদর্শনে ধন্য হন। ১৩১৬, ১৩ই বৈশাখ শিশুপ্রভু বলিয়াছিলেম, "আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারি না।" "কীর্ত্তন কর।"

শুদ্ধ মাধুর্য্য, বালকত্ব, তন্ময়ত্ব

প্রভু প্রিয়ভক্ত নবদ্বীপ দাসকে মৌনী হওয়ার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "শ্রীমতীর দশম দশা হয়েছিল, মহাপ্রভুর দ্বাদশ দশা হয়েছিল, এবার ত্রয়োদশ দশা দেখতে পাবি। এবার আমাতে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন শুদ্ধমাধুর্য্য, বালকত্বও তন্ময়ত্ব, এই তিনটি বেশী দেখতে পাবি।"

সময় সময় যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ প্রভু অজ্ঞ বালকের মত দশায় থাকিতেন। ইহার বহু দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে স্থানে স্থানে দেওয়া হইয়াছে। এখানে ঐরূপ আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম। মৌনী হওয়ার পূর্ব্বে ঢাকায় রমেশ বাবুর সেবাধানে থাকাকালে

প্রভু একদিন ভক্ত পূর্ণ ঘোষের নিকট অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে একটি "রাদারহাম" ঘড়ি চাহিয়াছিলেন। পূর্ণবাবু তখন ছাত্র, অর্থাভাববশতঃ উহা দিতে অপারগ হওয়ায় অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্য দেন, সঙ্গে একটি ঘড়ি-মার্কা বাঁশী দেন।

বাঁশীর উপর ঐ অঙ্কিত-ঘড়িই প্রভু আসল ঘড়ি মনে করিয়া আসল ঘড়ির ন্যায় যত্ন করিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া তাকাইয়া থাকিতেন। অনেকক্ষণ তাকাইয়া প্রভু ভক্ত রমেশচন্দ্রকে বলেন, "রমেশ রে, পূর্ণ যে ঘড়ি দিল, তার কাঁটা তো চলে না রে।" উত্তরে রমেশ বলিলেন, "তার পড়ার খরচ চলে না। সে রাদারহাম ঘড়ি পাবে কোথা? তাই ঘড়ি আঁকা বাঁশী দিয়েছে।" ইহা শুনিয়া "তাইত, সে পাবে কোথায়?" বলিয়া, প্রভু বালকের ন্যায় মহা-আনন্দে বাঁশীটিতে ফুঁ দিতে লাগিলেন! এই পরম মাধুর্য্যময় বালকভাবের মধ্যে একবিন্দুও কৃত্রিমতা ছিল না।

একান্ত ভক্তির সহিত ভক্ত কিছু দিলে, ভক্তাধীন প্রভু ভক্তদত্ত দ্রব্যে পরম আদর দেখাইতেন। প্রভুর মৌনাবস্থার পূর্ব্বে একদিন বন্ধুপ্রিয় ডাক্তার পূর্ণ ঘোষ প্রভুকে একটি খাগড়াই পালি (জলপাত্র) দিয়াছিলেন; পাত্রটি অপরিষ্কৃত অবস্থায় দেওয়া হইয়াছিল, উহা ধুইয়া আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই শিশু প্রভু আনীত পাত্রে, বালকের মত আগ্রহ দেখাইয়া জলপান করিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ, আজকের জলের মত এমন মিষ্টি জল কোনো দিনই খাই নাই। জল খুবই মিষ্টি লেগেছে। পালির ভাগ্য…"

আর একদিন ঘোষ পূর্ণচন্দ্র প্রভুর জন্য একটি শীতল পাটী আনিয়াছিলেন; উহা ধুইয়া শুকাইতে দিবার অবকাশ না দিয়াই মধুর শিশুভাবাপন্ন প্রভু নিজে উহা পাতিয়া উহাতে শয়ন করিয়াছিলেন।

বন্ধুগতপ্রাণ রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, লোভনীয় দ্রব্য সাধিয়াও প্রভুকে খাওয়ান যাইত না। কিন্তু প্রভুর স্মরণে তন্ময় হইয়া তাঁহার জন্য পটলভাজা আদি সামান্য খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করা হইলে, দেখা গিয়াছে, প্রভু পিছন দিক্ হইতে আসিয়া রাঙা পদ্মহস্ত মেলিয়া নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত জানাইয়াছেন। প্রভু ভক্তের প্রস্তুত ঐ খাদ্য পাইবার জন্য বালকের মত পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। প্রভুর পদ্ম-কোমল হস্তে ঐ গরম ভাজা পটলের স্পর্শে ফোস্‌কা পড়বে, এই ভয়ে, সেবক ভক্ত রমেশ ব্যস্ত হইয়া বলেন, "এ যে এখনও গরম, হাতে দিলে হাত পুড়ে যাবে যে! এ সব ত তোমার জন্য রান্না করা হয়েছে। সমস্তই তোমাকে দেওয়া হ'বে।"

বন্ধুপ্রিয় রমেশচন্দ্র ও প্রাচীন ভক্তগণ বন্ধুর এরূপ মধুর বালকভাবও ভক্তবশ্যতা আস্বাদন করিয়াছেন এবং আমরাও কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে প্রভুর কতিপয় সেবার দ্রব্য সহ একটি বাঁশী ও মাথায় চাপ দিলে শব্দকারী এক খেলনাকুকুর লইয়া ১৩২৬ সনের ঝড়ের পরদিন শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছি এবং কালোশ্যামদা ও আমি ঐ বাঁশী ও কুকুর প্রভুর কাছে দেই। গোপালবন্ধু বালকের মত ঐ বাঁশী মুখে দিয়া একটু বাজাইয়া ও

ঐ কুকুরটির গায়ে হাত বুলাইয়া সহজ অপ্রাকৃত শিশুভাব প্রকট করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মহাভাবোন্মাদ অবস্থায় ঔষধের শিশিতে একটু একটু লিমনেড প্রভৃতি দিলে শিশুবন্ধু উহা ঔষধ বিশ্বাসেই লইতেন এবং অকপট ভাবেই "অসুখ সারিতেছে" বলিতেন।

মৌনভঙ্গের পর একটি খাদ্য ভালভাবে গ্রহণ না করিয়াই বলিতেন, "আর কি আছে, আর একটা দেখাও।" ভক্তগণ বন্ধুগোপালকে ভুলাইয়া ঐ দ্রব্যই, কখনও বা কিছু নূতন দ্রব্য ঘুরায়ে ফিরায়ে বার বার সামনে ধরিতেন। তিনিও উহা হইতে বালকের মত আবার কিছু লইতেন। একেবারেই সরল শিশু, তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ১৩২৭, ১১ই আষাঢ়, ক্ষৌর-কার্য্যে বালকের ন্যায় "দুষ্টামি করিস্ না" "তোরা তোর মত যা" বলিয়া বাধা দেন। ক্ষুরের আঘাত লাগিবার ভয়ে অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় উহা বন্ধ রাখা হয় ও ঐ অবস্থায় প্রভুকে স্নান করান হয়।

স্নানের সময় এক ঘটী জল ঢালিবামাত্র "ওরে আর না, ছাড়ান দে" বলিয়া বালকের ন্যায় বাধা দিতেন। এমন কি শয়ন অবস্থায় মলমূত্র মুছাইবার সময় কখনও কখনও শিশুর মত চরণ ছুঁড়িতেন, ধমক দিতেন ও সেবককে 'মতির মা ছাড়ান দ্যান' ইত্যাদি বলিতেন।

ভ্রমণে লওয়ার প্রাক্কালে একদিন ইজিচেয়ারে হাত উঠায়ে বসা অবস্থায় শিশুবন্ধুর আলোকচিত্র তোলা হইয়াছিল। পরে

ইজিচেয়ার স্থলে, পার্শ্বে দুইটি বালিশ সহ সিংহাসন আঁকিয়া উহার ব্লক করা হয়। ঐ শ্রীমূর্ত্তিতে শিশুভাবের প্রকাশ দেখা যায়। ঐ চিত্র তোলার সময় প্রভু "তুলে নে" বলিয়াছিলেন। ঐ বাক্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, ফটো 'তুলে নে', আমরা কেহ কেহ বা উহা কাঁধে দোলা তুলে নেওয়ার আদেশ মনে করিয়াছিলাম।

১৩২৭, ১৮ই বৈশাখ, আঙ্গিনার রাস্তার ধারে মণীন্দ্র টানা গাড়ীতে প্রভুর বসা অবস্থায় আলোক চিত্র তোলেন। পরে গাড়ী-স্থলে টুল আঁকিয়া উহা প্রচারিত হয়। উহার মধ্যেও শিশুভাবের প্রকাশ দেখা যায়। সেই মূর্ত্তশিশুভাবকে রূপ দিতে ক্যামেরার কতটুকুই বা সামর্থ্য আছে?

চিরদিনই প্রভু মহাভাবে তন্ময়। মৌনভঙ্গের পর ঐ তন্ময়তা আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কখনও বা মলমূত্রের উপরই নিরুদ্বেগে আনন্দবিহ্বল অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। মনে হইত যেন ভাব-সিন্ধুমগ্ন আনন্দ-বিগ্রহ।

একটি মাছিকেও যেমন, তিনি "বিটী, নেত্য করে" "খেমটা নাচে" ইত্যাদি মধুর ভঙ্গিতে বলিতেন, আমাদিগকেও তেমন, বাহিরের পুরুষ বা নারীদেহে ভেদদৃষ্টি না রাখিয়া, সমান ভাবে, "বিটী, জালিয়াৎ, শালিয়াৎ, শালী, চাঁদকপালা-শালা, জুটিয়াল, ইষিগুির পিষিগুির" ইত্যাদি বলিতেন।

স্নান করান কালে, জলচৌকী বা টবে বসিয়া বন্ধু শিশুর মত অস্ফুট শব্দ করিতেন ও মধুরভাবে হাত নাড়িতেন। অপ্রাকৃত দিব্য শিশু, সদা বিহ্বল। আধ আধ বোলে শিশুবন্ধু কখনও

কখনও, "ভেণ্ডিল, মিসিকিল, ইবিণ্ডিল" ইত্যাদি শব্দ বলিতেন, এ জগতের ভাষা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। হল্‌দে বা লাল রং-অনুসারে নিজ খুসী মত জিঞ্জারেড্‌, রোজেড্‌, ইত্যাদি চাহিবার সময়, "একটা দুর্গা দে, একটা গণেশ দে, তিন পয়সার জল দে, বন্দুকের জল দে" ইত্যাদি কথা মধুর ভঙ্গীতে বলিতেন।

চট্টগ্রামের ঝরণা জলে প্রস্তুত এই সোডা ওয়াটার প্রভৃতি এক বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার [illegible]কটরী হইতে নিজব্যয়ে নিয়মিত পাঠাইতেন। অঙ্গন হইতে শূন্য বোতল ফেরত পাঠাবার ব্যয়ও তিনি বহন করিতেন।

পঞ্চবর্ষীয় শিশুভাবাপন্ন বন্ধুগোপালের দিব্য শিশুর মত ক্রোধ প্রকাশের বা অনুনয় বিনয় প্রকাশের ভাব, ভক্তি, ভাষা সমস্তই অনুপমন অনবদ্য-সুন্দর-মধুর ছিল। ভক্তগণ প্রভুবন্ধুতে শুদ্ধমাধুর্য্য, বালকত্ব ও তন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলাম।

ইং ৩।৪।১৯২০ শয়ান শিশুবন্ধু বলেন, "আমি কোনো সময় শুয়ে থাকি" এখানে "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।" এই শ্রুতি বাক্য স্মরণীয়।

ইং ৭।৫।১৯২০: সন্ধ্যার পর জয়নিতাই বন্ধুগোপালকে নিজে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকলকেই দর্শন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে, প্রভু বলেন, "আর বাকি কি? এই ত দাঁড়ালাম, তার হ'ল কি?"

১৩২৬, ১০ বৈশাখ, প্রভুকে দোলায় নিয়ে ভ্রমণকালে আটদশ

জন ভক্ত 'জয় জগদ্বন্ধু বোল' কীর্ত্তন করিতেছিলেন, দোলায় কাঁধ বদল করার সময় ভক্তরা নাম বন্ধ করেছিল বলে অমনি প্রভু "বল বল" আদেশ করেন। তখনই ভক্তগণ মহানন্দে, জয় জগদ্বন্ধু বোল কীর্তন আরম্ভ করেন। শিশু প্রভুজগদ্বন্ধুর জগদ্বন্ধু নামে কত অনুরাগ এই কীর্ত্তনে তা প্রমাণিত হইল।

শিশুপ্রভু একবার জিজ্ঞাসা করেন, "আমার কথা কেউ বলে ?" এই বন্ধুবাণী দ্বারা হরিপুরুষের [illegible] কতটুকু প্রচার হইল, কতজন লোক প্রভুকে মানিল।

ইং ২৮।৫।২০ : পূর্ব্বাহ্নে ভোগ লইতে প্রভু অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা চার পাঁচজন ভোগ লওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিলে, প্রভু বলেন, "যত নাস্তিক পরামর্শ কর, আমি তাই শুনি"

ইং ২০।৭।২০ : যজ্ঞেশ্বর প্রভুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে, শিশুপ্রভু বলেন "ও কি রে!" প্রভুর কাছে শক্তি প্রার্থনা করিলে বলেন, "উয়্যা কস্ ক্যা ?"

ইং ২১।৭।২০ : প্রভুর শকটে ভ্রমণকালে এক বৃদ্ধা প্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় দিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, শিশুবন্ধু বলেন, "পাইছিস্! পাইছিস্!! আরে বিটী পাইছিস!"

ইং ১০।৮।২০ : প্রভু মলত্যাগ করিবেন বুঝিয়া, তাঁহার শয়ান অবস্থায় পিছনে নেকড়া পাতিতে যাই, তখন বলেন; "বিটী আস্ত পাগলী।"

ইং ১৭।৮।১৯২০ : আমি সকালে প্রভুর মাথায় একটু জবা-কুসুম তৈল দিলে, বলিয়া উঠেন, "কি করলি রে!"

ইং ১৮।৮।২০ : একটি মাছি প্রভুর গায় বসিয়া বিরক্ত করিলে, বন্ধু বলেন, “দূর বিটী শালী। বাচলামি হয় ত চলে যাই। চলে যাই শালী!” সেবক রাখাল মাছিটিকে তাড়াইতে গেলে, প্রভু তাহাকে ধমক দিয়া তাড়া করেন; মাছির প্রতিই অধিক কৃপা দেখান।

১৩২৬, ১৫ই ফাল্গুন, শিশুপ্রভু বলেন, “মাছি মারিস্ না। ওরে আমারে মাইরা নিয়ে যা।”

ইং ১৯।৮।২০ : মাছি বিরক্ত করায়, বন্ধুগোপাল বলেন, “শালী! আয় তোর কানমলে দেই। চারটা কানমলা খ্যায়া যা।”

১৩২৬, ২৫শে বৈশাখ, বেলা প্রায় ২টায় কতিপয় মহিলা ও ছাত্রী অকস্মাৎ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, শিশুপ্রভুবন্ধুর চরণে সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্র অর্পণ করিলে, শিশুপ্রভু স্বগতভাবে কিছু উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকেন,

“দুর্গাপূজা! দুর্গা পূজা! শালা ভগবানের কাণ মলে দেই! ···কিসের দুর্গা পূজা!···

এটি জানিস কাণমলা। স্বয়ং ভগবান্ হরিপুরুষ শাস্তা। তাঁর কালীতত্ত্ব অবতার ভগবানদের তিনি শাসন করিতে পারেন। যেমন, সুকুমার রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া ভগবান্ পরশুরামের দর্প চূর্ণ করেন ; মহাশক্তির উপাসক রাবণকে রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নিধন করেন ; মূল বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গাপূজা, দুর্গাস্তব, মহাবীর হনুমানজী কর্ত্তৃক মৃত্যুবাণ হরণ, রামের সঙ্গে মূলবকুলের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি উল্লেখ নাই ; এ সমস্ত কবি কৃত্তিবাসের

কল্পিত রচনা। আরও দেখা যায়। শ্রীহরি দ্বারকেশ্বররূপে শিব ও তৎশক্তির আশ্রিত ও রক্ষিত বাণাসুরের দন্তচূর্ণ করেন। বালক কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া দেবেশ ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করেন, গোবৎস ও বৎসপালকহরণকারী সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ ব্রহ্মার মোহ-অভিমান ভঙ্গ করেন। এই মোহিনী মূর্ত্তিধর হরি মদনভস্মকারী কামজয়ী শিবকে মদনার্ত্ত করেন। এগুলি তাত্ত্বিক কামনার দৃষ্টান্ত। 'যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা।' 'একালে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সবে ভৃত্য। যারে যৈছে লালন, সে তৈছে করে নৃত্য।' (চৈ. চঃ)। শ্রুতি—'এক ঈশঃ পরিপূর্ণ-শক্তি র্বলিহরা ইতরে স্ম্যঃ।'

ইং ২৩।৮।১৯২০ঃ প্রভুকে গায়ের চাদর দেই, সেখানি পছন্দ না হওয়ায় হরিপুরুষ বন্ধু শিশুভাবে বলেন, "চাঁদকপালী শালী।"

ইং ১৪।৯।২০ঃ অপরাহ্ণ ৪টায় প্রভুর আহ্বানে প্রভুকে ধরিয়া বসাই। প্রভুর সর্দ্দি। যজ্ঞেশ্বর, কালোশ্যাম, রাখাল ও আমি প্রভুর কণ্ঠ ও চরণাদিতে কিছু উষ্ণ তৈল মর্দ্দন করিয়া তুলা গরম করিয়া সেঁক দিতে থাকি। ক্রমে "যাও, এখন যাও" "শালীর বিটা শালী, জেলিয়াৎ।" ইত্যাদি বলিয়া ঐ সেবাকার্য্য নিষেধ করেন ও "নটীগিরি ছুটায়ে দেব শালী" ইত্যাদি বলেন। গরম তুলা অঙ্গের স্থানে স্থানে ধরায় তিনি বলেন, "এখনও না কি? আরও নাকি? এখানেও নাচনা আরম্ভ হল নাকি?"

ইত্যাদি বলেন। ইহার পর শিশুভাবে প্রভু বেড়াইতে যাইতে ব্যস্ততা দেখান।

ইং ১৫.৯।২০ঃ প্রভু ক্ষৌর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, চাবি আনিয়া বাক্স খুলিতে যাই, শিশুপ্রভু বলেন, "হ্যা! আছে। সমস্ত আছে।" তারপর "নাপিত কই" বলিয়া প্রভু বারে বারে ব্যস্ততা প্রকাশ করিলে, কালোশ্যাম শিশুবন্ধুকে ভুলাইবার জন্য আমাকে দেখাইয়া দেন। সরল শিশুবন্ধু তখন মধুমাখা কণ্ঠে বলেন, "আর একটা আলাদা আছে।"

ইং ২।১০।২০ঃ দ্বিপ্রহরে প্রভু ভ্রমণে ব্যগ্র হইয়া "তুমি এদিকে আইস" বলিয়া আমাকে ডাকেন, কাছে গেলে হাত ধরিয়া বলেন, "আর একজনকে ডাক। ডেকে আন, সকলেই তুচ্ছ করে!" যজ্ঞেশ্বর আঙ্গুরের রস তৈয়ারী করিয়া প্রভুর কাছে আনিলে, বলেন, "ও খারাপ!" মিশ্রিপানা মিশায়ে দিলে উহা না খাইলে, আমরা হয়ত শিশুবন্ধুকে বেড়াইতে লইব না, তাই উহা লন। একেবারে স্বভাব-শিশু।

ইং ৭।১০।২০ঃ অপরাহ্ণে প্রভুর বামচরণ সেবা করিয়া দক্ষিণ চরণে হাত দিলে বলেন, "ওটা খরচ করিস্ না। একটা দে, একটা থাক।" বামচরণের সেবাটা তিনি পছন্দ করিতেন। ভোগ লইতে বলিলে, বন্ধু বলেন, "ও শাস্ত্রে নাই।" শাস্ত্র মানি না বলিলে, "এই বিচার হল!"

ইং ১১।১০।২০ঃ বৈকালে প্রভুকে বেড়াইতে লওয়া হইবে বলায়, শিশুবন্ধু নিজেই সাগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিতে থাকেন;

নেবা নে ত? নেবা ত? আপনি নেবা ত?" ভোগ নিলে লওয়া হইবে, শুনিয়া সরল শিশুর মত বন্ধু বলিতে থাকেন, "যাবা ত? এখনই যাবা? যাবা ত?" ভোগের পর প্রভুকে শকটে লইয়া ভ্রমণে যাওয়া হয়।

ইং ১৪।৭।২০ঃ বেড়াইতে ব্যগ্র হইয়া শিশুবন্ধু, "আয় রে নিয়ে যাও রে" বলিয়া সেবকদের ডাকিতে থাকেন। সেবকদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, বলেন, "তোর মার সঙ্গে আইসা গান শোন।" ইহা বিলম্বের জন্য বকুনির পূর্ব্বাভাস।

ইং ১৭।১০।২০ঃ দ্বিপ্রহরের পর ভ্রমণে ব্যগ্র হইয়া বন্ধু বলেন, "কি বুলিস্ প্রতাপ ভূয়্যা! বুল্ল্যা যা।" কালোশ্যাম আসিলে, বন্ধু বলেন, "আর কে নেবে?" কালোশ্যাম আমাকে দেখায়ে আমাকে দুর্ব্বল বলিলে, বন্ধু বলেন, "তুই মিথ্যা বলিস্? ও' তুই সমান। দু'জনে সমান। দু'জনে নে।"

ইং ১৭।১০।২০ঃ অপরাহ্নে প্রভুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্লাসের ভোগ খাওয়াইলে, তিনি উহা কুলি করিয়া ফেলিয়া শয্যা ভিজান, আর বলেন, "তোমরা যা কও তাই করি"। খাওয়ানের জন্য আর চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে, খুসী হইয়া বলেন, "ছাড়লে? ছাড়লে? ছাইড়া দিলা"!

ইং ১৮।১০।১৯২০ঃ আজ উঠিয়া বসিয়া নিজ হাতে ভোগ লন। দাইলের বড়ি ভাজা ইত্যাদি দেওয়া হয়। পূর্ব্বাহ্নে গন্ধ শুকিয়া দুই তিনবার ভোগ ফেরত দেন ও "মাসে ক'টাকা নিবি শালী"—বলিয়া ধমক দেন। গ্লাসের তরল গোলান ভোগ মুখে

লইয়া কুলি করিয়া বিছানা ভিজান। "আন" বলিয়া আবার চাহিয়া লইয়া; উহা বিছানায় ফেলেন ও বলেন, "যা বল, তাই করি"।

ইং ২০।১০।২০ঃ ভোগদ্রব্য প্রভুর কাছে আনিলে প্রভু বলেন, "আর কার্ত্তিক পূজা করিস্ না। চলে যা"।

ইং ২১।১০।২০ঃ অপরাহ্নে ভ্রমণে ব্যগ্র হইয়া, বন্ধু-গোপাল যজ্ঞেশ্বরকে কাছে পাইয়া বাম হাত দ্বারা ধরিয়া তার হাত নিজ বাম চরণের নীচে রাখিয়া দেন, যেন সেবক পালাইতে না পারে। আবার আমাকে কাছে পাইয়া, টানিয়া আনিয়া বলেন, "ধর্ ধর্, নে"। তারপর আদর করিয়া আমার মাথা আস্তে আস্তে থাপরাতে থাকেন, যাতে সত্বর তাঁহাকে বেড়াইতে লই। কি সহজ সরল শিশুভাব! সেদিন প্রদোষকালে প্রভুর শকটের সহিত গঙ্গাবর্দীর দিকে কালোশ্যাম, যজ্ঞেশ্বর, ভদ্র ক্ষিতীশ, মনোমোহন, বিনোদ দত্ত আদি ও আমি ছিলাম। মহানবমীর জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ রজনী। ফিরিয়া সহরে যাইবার কালে প্রভুর বাল্যসঙ্গী শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক কালোশ্যামও বৃদ্ধ মোহন্ত ভক্ত যান। রাত্রি ৯ টায় প্রভু অঙ্গনে ফিরেন।

ইং ৩১।১০।২০ঃ বৈকালে অদৃশ্য কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "পায় হাত দিস্? কান ম'লে দেবো, হারামজাদ!"

ইং ১।১১।২০ঃ দিক্‌নগরের দিকে ভ্রমণ কালে, গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখিয়া প্রভুকে কিছু ফলআদি ভোগ দেওয়া হয়। তন্ময় প্রভুবন্ধু শুধু বাটিতে চুমুক দেন। নদী হইতে জল আনিতে

গেলে বালকের মত ব্যস্ত হইয়া বলেন, "কৈ বৈরাগীরা! কৈ বৈরাগীরা ?" জল দিলে কিছু জল পান করেন।

ইং ১৫ | ১১ | ২০ : সকালে বন্ধুকে বড় টবে বসাইয়া স্নান করানোর পর, প্রভু শয্যায় বসিলে, থালে করিয়া খুব গরম সিদ্ধপক্ক অন্ন-ভোগ আনা হয়। বন্ধু শিক্ষা দিয়া বলেন, "এমন আগুন-মাখা তা দিস্ না।"

ইং ১৭ | ১১ | ১৯২০ : পূর্ব্বাহ্নে প্রায় সাড়ে দশটায় শকটে গঙ্গাবর্দীর দিক প্রভুকে লওয়া হয়। কালোশ্যাম ও আমি সঙ্গে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ভদ্র ক্ষিতীশ আসিয়া যোগ দেন। পথে গাড়ী রাখিয়া পেস্তা ও ডাবশাঁস ভোগ দেওয়া হয়। পরে আমরাও কিছু জলযোগ করি। আমাদের ভোজন হইলেই বন্ধু বলেন, "উড়ায়ে নে! লক্ষ্মীপূজা হইছে। এখন যা।" দ্রুত ফিরিতে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ বলেন॥ সেবকদের জলযোগকে শিশুবন্ধু লক্ষ্মীপূজা বলেন।

ইং ২৫ | ১১ | ১৯২০ (১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৭), রাত্রি প্রায় ৮টায়। অন্যান্য সেবকেরা তখন ভোগঘরে ও অন্যান্য কাজে ছিলেন। এই সময়টা প্রায় একক মন্দির বারান্দায় থাকি। প্রভুবন্ধু নিজেই আমাকে কাছে ডাকেন, শ্রীঅঙ্গে হাতবুলাই, শ্রীচরণ সম্মর্দ্দন করি। এরপর কোন কোনদিন, সাহস হওয়ায় প্রভু না ডাকিলেও, মন্দিরে যাইয়া শ্রীঅঙ্গ সেবা করিয়াছি। সময় সময় নিজের মাথায় ও বুকে প্রভুর পাদপদ্মদ্বয় ধরিয়াছি, কোনও আপত্তি করেন নাই, ধমকও দেন নাই।

ইং ২৬ | ১১ | ২০ ; সেন রাস উপলক্ষ্যে আঙ্গিনায় অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইতেছিল। রাত্রে ভোগ দেওয়া হইলে বন্ধুহরি একটু একটু সিদ্ধপক্ক ও অতি সামান্য কিছু অন্ন গ্রহণ করেন। মহোৎসবের লাফরা তরকারী পাশে দেওয়া হইয়াছিল ; ঝাল তিনি সহ্য করিতে পারেন না, তথাপি সর্ব্বজনের পক্ষে প্রস্তুত লাফরা একটু গ্রহণ করেন। প্রভু শয়ন করিলে, শ্রীঅঙ্গ সেবা করি ; "এখানে না" বলেন, কিন্তু কোন্ অঙ্গ সেবা করিব, তাহা বলেন না। তখন মৃদু মৃদু চাপে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ টিপিয়া দেই। বন্ধু শান্ত বালকের মত নীরবে শুইয়া থাকেন।

যখন কিঞ্চিৎ অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রভু তেমন অন্যমনস্ক থাকিতেন না, তখন কেহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলে, বা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলে, ধমক দিতেন। আর যখন বিহ্বলভাবে থাকিতেন, অথবা নিজেই আদেশ করিতেন তখন অবাধে তাঁহাকে স্পর্শ করা যাইত. পাদপদ্মে সময় সময় তুলসী চন্দন দেওয়া হইত ; কণ্ঠে পুষ্পমালা দেওয়া হইলে, তখনই উহা ফেলিয়া দিতেন, বড় ধমক দিতেন। ১৯২৭, ২৯শে আশ্বিন, প্রভুর গলায় শেফালী ফুলের মালা দিয়াছিলাম, সেদিন ধমক দেন নাই। ১৩২৭, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রভুর গলায় মালা দেই। প্রভু বলেন, "চলে যাব" তিনি মালা খুলেই ফেলেন।

শিশুপ্রভু অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁকে সাধিয়াও খাওয়ান যাইত না। আবার কখনো বা তিনি হঠাৎ ভোগ চাহিয়া বসিতেন। এইজন্য মন্দিরে এক বেঞ্চের উপর কিছু কিছু ভোগের দ্রব্য থালায়

ঢাকিয়া রাখা হইত। এক দিন অন্য সেবকদের অনুপস্থিতিতে আমার কাছে প্রভু হঠাৎ ভোগ চাহেন। আমি থালায় প্রস্তুত ভোগ দ্রব্য প্রভুকে দেই, তিনি দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। রন্ধনে এই পরম অপটু ভৃত্যকে সুখী করিতে প্রভু আরও কয়েক দিন (৯,১১,২৪,২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬, ৩রা কার্ত্তিক, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩২৭) আমার প্রদত্ত ভোগ কৃপা পূর্বক গ্রহণ করিয়া আমার মানব জন্ম সার্থক ও ধন্য করেন।

শিশুবন্ধুর মধুর ভাষণ ও দোলায় ভ্রমণ

বাহির হইবার পর বন্ধুগোপাল ভ্রমণ বিষয়ে অধিক আগ্রহ দেখান। ভ্রমণ কালে জনতার পথের ধূলি লাগিয়া একবার তাঁহার একটি চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল, ঐ অবস্থাতেও বেড়াইতে চাহিতেন। চক্ষু লাল হওয়ার কথা বলায় ইং ২৮।৮।১৯২০ তে তিনি বলেন, "অন্যায় বলবি কেন? লাল কেমন করে হল? কোথায় হল?" চক্ষুলাল হওয়ায় সেবকরা যদি বেড়ান বন্ধ করেন, তাই শিশুবন্ধু ইহা বলেন। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বেশী বেড়াইতেন। কোন কোন দিন মধ্যরাত্রে ও শেষরাত্রে বেড়াইয়াছেন।

ভ্রমণকালে ভক্তগণের আগ্রহ ও প্রার্থনায় প্রভু কিছু দিন সময় সময় পথে কণিকা কণিকা ফল-মিষ্টাদি লইয়া গোষ্ঠ ও রাখালি খেলার উদ্দীপন করিয়াছেন। পথে ভোগগ্রহণ কালে চাদর ধরিয়া ধরিয়া আবরণ করা হইত। যশোহর রোড, কানাইপুর, দিক্‌নগর

রাজবাড়ী রোড্, সহর, বাজার, কোর্ট, টেপাখোলা, ভাঙ্গার রাস্তা ইত্যাদি বিভিন্ন পথে প্রভুকে বেড়াইতে লওয়া হইত।

হরিনামের প্রভু। তাঁহাকে হরিনাম ছাড়া সেবা করিলে, বিরক্ত হইতেন। ঐ শিশুর মত অবস্থাতেও একদিন রাজুয়াকে বলেন, "হরিনাম করে না, বাঘের মত খামচায়।" ১৩১৬, ১৩শে মাঘ, সর্ব্বানন্দজীকে প্রভু বলেন, "হরিনাম করে না, তেল দেয়।"

প্রভুর ভ্রমণকালে ভক্তগণ 'জয় জগদ্বন্ধু বোল' গাহিতেন। তাই ১৩২৬, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ভ্রমণে যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া শিশু-ভাবে বন্ধু বলেন, "তোমাদের বুলি বল।"

চলিবার পথ কখনও কখনও প্রভু নিজেই ইঙ্গিত করিয়া দেখাইতেন অথবা "এদিকে, ইষিণ্ডির, ফিরে চল" ইত্যাদি দু'চারটি কথাও বলিতেন।

২১শে বৈশাখ, ১৩২৬, অনভ্যস্ত বাহক জমিদার নৃপেন্দ্র মিত্রের কাঁধ বদলাইবার সময় বাহকদের অসাবধানতাবশে যশোহর ও রাজ-বাড়ী রোডের সংযোগস্থলের নিকটে প্রভু দোলাচেয়ার হইতে নীচে পড়িয়া যান, আঘাতহেতু একটু রক্তপাত হয়, তা' ছাড়া কোনরূপ অনিষ্ট বুঝা যায় নাই। সামান্য ত্রুটিতে শিশুভাবে যিনি "বিটী" "শালী" বলিয়া মধুর কণ্ঠে ধমক দিয়াছেন, সেদিন এতবড় অপরাধেও তাঁহার কোন ভৎর্সনা নাই, বালকের ন্যায় একটু ব্যথা প্রকাশ করেন মাত্র।

এই ঘটনার পর নৃপেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা যাইয়া ভ্রমণকালে প্রভুর উপবেশনযোগ্য উত্তম দোলা প্রস্তুত করাইয়া ফরিদপুর

আঙ্গিনায় পাঠাইয়া দেন। ঐ দোলা ব্যবহৃত হয় নাই। কিছুকাল পর রণজিত চন্দ্র প্রেরিত টানাগাড়া আসিয়া পড়ায়, প্রভু ঐ গাড়াতেই বেড়াইতে থাকেন।

২৯শে বৈশাখ, ১৩২৬, (ইং ১৯।৫।১৯১৯), জন্মোৎসবের পঞ্চম দিবসে কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া মহেন্দ্রজী-লিখিত "জগদ্‌গুরু মহা মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু" ও শ্রীযোগেন্দ্র কবিরাজ-লিখিত "মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু" লইয়া শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছাই। এখন উৎসব-মধ্যে প্রভু একদিন বলেন—"বাহিরে বেশ কীর্ত্তন হচ্ছে।" ঐ সময় দোলায় বেড়াইতেন।

৩০শে বৈশাখ, (১৩২৬), ধূলাদি হইতে ফিরিবার সময় বন্ধু বলেন—"তোমরা রাত ভরে কি কাজ কর? বৈকুণ্ঠের কাজ কর।", "তোরা নিকৃষ্ট।"

১লা জ্যৈষ্ঠ, রাজেশ্বর নামক হিন্দুস্থানী বালক সেবকটি চঞ্চলতা করিলে, প্রভু বলেন—"আরে বাইরা ত্যক্ত করিস্ না। আরে বাইরা তোরে আমি চিনি।" অন্য সময় অন্যান্য ভক্তদের শিশুভাবে বলেন,—"ষ্টাফিড্ এন্‌ভেলোপ দে" "শ্যামবাজার কোথায়?" "সরায়ে দে," "আমারে টানায়ে দে।"

৩রা জ্যৈষ্ঠ, সকালে আপন মনে ফোঁপাইয়া কাঁদেন। এক সময় গায়ে দেওয়ার জন্য ভাল চাদর দিলে উহা লন না। বলেন, "দৌরাত্ম্য কর, ঠাট্টা কর?"

৩রা জ্যৈষ্ঠ স্নানের পূর্ব্বে তৈল মাখাইবার চেষ্টা করিলে, বন্ধু বলেন—"এ সব সয়তানের কাণ্ড।"

বেড়াইতে ইচ্ছুক হইয়া দোলাচেয়ার আনিবার জন্য বলেন, "রোহিণীর চেষ্টা কর।" দোলা আনা হইলে বলেন—"তোরা প্রস্তুত ?"

হ্যাঁ প্রভু,—বলিয়া উত্তর দিলে বলেন,—

"অ্যাক্কেবারে প্রস্তুত ? আচ্ছা। একটু ব'সে নি।"

দোলার উদ্দেশ্যে বলেন—"বালিশ আন, বালিশ আন।" মধ্যরাত্রে বেড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, বলেন—"দেখি, সাজান হ'ল ?" সেদিন অন্যান্য বান্ধব ভক্ত সহ প্রভুকে লইয়া নিশাভ্রমণে, মহানাম গাহিতে গাহিতে যাই।

১৩২৬, ৭ঠা জ্যৈষ্ঠ, বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বন্ধু বলেন—"তোমরা কিছু বল না যে ?"

"তিনটা ড্যাম দেও" বলিলে লাইম ওয়াটার দেওয়া হয়। তাঁহার শয়ন-অবস্থায় সেবক সীতানাথ প্রস্রাব মুছাইতে গেলে, হরিপুরুষ প্রভু সেবককে মা বানাইয়া বলেন—"মতির মা, ছাড়ান দ্যান্।"

৫ই জ্যৈষ্ঠ, প্রভু বলেন—"সময় হইছে, দশজনকে ডাক দেও।" এইদিন প্রভুর স্নান কালে একজন প্রভুর আলোকচিত্র তুলিয়া লন।

এইদিন একবার বলিয়াছিলেন—"আমি একটা ভাল পাখী। আমার মত পাখী নাই রে!"

প্রভুর মহাউদ্ধারণ কার্যের সহায়ক যোগ্য লোক নাই, তাই ১৩২৭, ১২ই কার্ত্তিক, শিশুবন্ধু স্বগতভাবে বলিয়াছিলেন,—"এর মধ্যে লোক নাই। কি করি!"

মহেন্দ্রজী প্রভুর অঙ্গ টিপিতে গেলে, বলেন—"আরে, মহীন্দির !"

১৩২৬, ২৯শে কার্ত্তিক, নূতন পাকামন্দিরে প্রভুকে দোলনায় বসাইয়া ঝুলনলীলা হয়। প্রভুর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত রৌপ্যদণ্ড রাজছত্র প্রভুর মস্তকের উপর ধরা হয়। মন্দিরে পদ-কীর্ত্তন হয়। আজ প্রভুবন্ধু স্বগতভাবে এক সময় বলেন, "আমি পৃথিবীতে একাই বেড়াই। আমার সঙ্গে কেউ নাই।"

প্রভুকে বাকচর লওয়া

বাকচরের ভক্তগণ কিছুদিন ধরিয়া প্রভুকে বাকচর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এইভাবে তিনবার ব্যর্থ হওয়ার পর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, (১৩২৬), মঙ্গলবার, বাকচরের ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসেন। বাকচরের কথা উল্লেখ করিলে, প্রভু "যাব" বলায়, প্রভুকে নূতন মন্দির হইতে ইজিচেয়ারে বসাইয়া কাঁধে লওয়া হয়। সেবক আমরা কেহ কেহ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ সহ বাকচর-শ্রীঅঙ্গন যাই।

বাকচরে আসিয়া তিনি নানা খেলা খেলেন। প্রথমে দোলায় পরে কিছুদিন দোলায় ও নৌকায় বেড়াইতেন, সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন হইত। পরাণপুর, কানাইপুর, হাটগোবিন্দপুর, খলিলপুর ইত্যাদি বিভিন্নদিকে বিভিন্ন দিনে শিশুপ্রভুর নৌবিহার চলিত।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬, (ইং ৭।৬।১৯১৯), কয়েকজন ভক্ত

কথাবার্ত্তা বলায় তিনি বলেন—"বোঝাখানি বিটী!" মশারী নামাইবার জন্য বলেন,—"নারায়ণটা দেও।" লেপ চাহিতে বলেন—"চ্যাপ্ দাও।" প্রভুর প্রয়োজন বুঝিয়া সেবককে তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে হইত।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, দৈন্য প্রকাশ করিয়া শিশুবন্ধু বলেন—"তোদের পায় ধরি, আমায় মাইরো না।"

ইহার মধ্যে মন্দিরে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রভু স্বগতভাবে একা একা বলিয়া উঠেন—"সমাজ রাখব্ না, সমাজ রাখব্ না" "সমাজ থাকবে না, "সমাজ করিস্ না" ইত্যাদি। কিছুপর একেবারে নীরব হন। এই সংসারে কার জল-চল, কার জল অচল শ্বেতজাতি, কৃষ্ণজাতি ইত্যাদি রূপ ছিল। পৃথিবীতে বর্ণ বিদ্বেষ ব্যাপ্ত। তাই প্রভু প্রভু জীব দুঃখে ব্যথিত হইয়া এরূপ উক্তি করেন।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, কোনও ভক্তের বেশী কথা বলা শুনিয়া শিশুপ্রভু বলেন—"ট্যা ট্যা করিস্ না।"

১২ই আষাঢ়, (১৩২৬) হাত ধোয়ার জল চাহিতে বলেন, "কর্ম্মজল দেও।"

এবার রথযাত্রার দিন মাতা ব্রজবাসিনী বাকচরে গ্রামবাসীদের সহযোগে মহানন্দে রথোৎসব সম্পন্ন করেন। বহু নবনারী সাক্ষাৎ জগন্নাথ জগদ্বন্ধুর দর্শনে ধন্য হন।

বাকচরে শিশুবন্ধু ১৩২৬, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বালকগণ-আনীত বড় কাল-জামফলের বাটি হইতে একটি জাম লইয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে

ভক্ষণ করেন। দৃশ্যটি আমাদের সকলেরই পরমানন্দপ্রদ ও বড়ই মধুর দর্শনীয় হইয়াছিল।

প্রভুকে যখন বাকচরে আনা হয়, তখন কৃষ্ণদাসজীর তত্ত্বাবধানে গোয়ালচামট আঙ্গিনায় আদিমন্দির-স্থানে পুনরায় খড়ের চালা-বিশিষ্ট, কাঠের খুঁটি ও দরজা-জানালা-সম্বলিত, ও চারিদিকে কাঠের রেলিং-বেড়া-লাগান বারান্দাযুক্ত উত্তম শ্রীমন্দির প্রস্তুত হইতেছিল।

বাকচরে বহু পানের বরজ। বহুভক্ত তাম্বুলিক। শিশুবন্ধু একদিন ফোঁপাইয়া কাঁদেন। বন্ধুপ্রাণা হিমী জিজ্ঞাসা করেন, "পিরভু, কাঁদেন কেন?" বন্ধুগোপাল উত্তর দেন, "পান খাব।" হিমীর তৈয়ারী পান তিনটি খাইয়া প্রভু বলেন, তবে দেখাও। ভক্ত সীতানাথ অনুমানে আরসীর কথা বলিলে, প্রভু "হু, হু" বলেন। দর্পণ আনা হইলে, প্রভু স্বয়ং শ্রীমুখ দেখেন, কয়েক দিন পান ও দর্পণ দিয়া সেবা করা হয়। পরে আপনিই ঐ সেবা বন্ধ হইয়া যায়। পান সেবনে ও দর্পণে শ্রীমুখ দর্শনে প্রভু অভ্যস্ত ছিলেন না। ভক্তকে কৃপা করিতে ইহা আকস্মিক রঙ্গলীলা মাত্র। এরূপ কৃপা আরও কখনও কখনও করিয়াছেন।

১৩২৬, ৫ই কার্ত্তিক, ফরিদপুর অঙ্গনে কালোদা প্রভুকে পান দিলে, প্রভু উহা ফেরত দেন। সেবক বলেন, মাঝে মাঝে তো খান। তদুত্তরে প্রভু বলেন, "তোর মাথা খাই।"

বাকচর হইতে ফরিদপুর অঙ্গনে

১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৬, বাকচর কাবেরী নদীতে প্রভুর নৌকায় ভ্রমণকালে ফরিদপুরের কতিপয় ভক্ত প্রভুকে তাঁহাদের নৌকায় উঠাইয়া লইয়া কয়েকটি বাধা অতিক্রম করিয়া জল পথেই বাকচর হইতে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে চলিয়া আসেন। অবশ্য তাঁহারা পূর্ব্বে প্রভুর সম্মতি লইয়াছিলেন।

আসাকালে পরাণপুরের ভক্তগণ ও একদল ঐ অঞ্চলের মুসলমান প্রভুর নৌকা ধরিয়াছিলেন; কিন্তু ফরিদপুর যাইতে প্রভুর সম্মতি আছে জানিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেন। ঐ সময় বাকচর হইতেও বহুসংখ্যক ভক্ত ছুটিয়া আসিতেছিলেন; প্রভুর নৌকা ধরিতে না পারায় তাঁহারা বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া যান।

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর নৌবিহারের জন্য ঐ সময় কাঠের ছাদবিশিষ্ট একখানি নূতন নৌকা ও খাটদোলা প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরিদপুরে ভ্রমণকালেও নৌকায় কীর্ত্তন আদি হইত। একদিন এক কুমীর প্রভুকে দেখিতে দেখিতে বহুদূর পর্যান্ত ভাসিয়া আসে। নৌকায় ভ্রমণ সময়ে খাল-নদীর তীরে তীরে স্থানীয় ভক্তগণ ফল, মিষ্ট, পুষ্প, মালা, তুলসী, চন্দন ইত্যাদি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন ও অবসর মত সেবকের হস্তে প্রভুর জন্য ঐ সমস্ত দিয়া কৃতার্থ হইতেন। ফরিদপুরে ফিরিয়া আসার পর প্রথমে প্রভু অন্য এক নৌকায় বেড়াইতেন। তাহাতেও ঐরূপ আনন্দ কীর্ত্তন হইত।

গোপালপুরের ভক্তগণ ১৩২৬, ৬ই কার্ত্তিক প্রভুসহ নৌকা-

খানি ডাঙ্গায় তুলিয়া প্রভুর সেবাপূজা করিয়া কিছুক্ষণ পর, নৌকা জলে ভাসাইয়া দেন। সেইদিন সন্ধ্যায় নৌকায় মোমবাতির আলোক-সজ্জা হইয়াছিল। ঐদিন বদান্যবর জমিদার ঈশানবাবুর বালকপুত্র শ্রীধীরেন্দ্রকে ঐ ভক্তদলে দেখিয়াছিলাম। তখন প্রভুকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন হইতেছিল। ১৩২৬ সনের ২৭শে কার্ত্তিক পর্যন্ত ফরিদপুরে প্রভুর এইভাবে নৌবিহার লীলা চলে। আবার ১৩২৬, ১৮ই চৈত্র হইতে প্রভু কয়েকদিন নৌবিহার করেন।

মহাউদ্ধারণ মহাশক্তিদর্শন

বাকচর-আঙ্গিনা হইতে আসিবার পর প্রভুবন্ধু একদিন মন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন, নিকটে ভক্ত সীতানাথ বসিয়া-ছিলেন। প্রভুর কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দেখিবার তীব্র আগ্রহ তাঁহার অন্তরে অনেক দিন ধরিয়াই ছিল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু অকস্মাৎ প্রশ্নসূচক ভাবে বলিলেন,—"হরিপুরুষ কে ?

ভক্ত সীতানাথ উত্তর দিলেন, "প্রভু আপনি।"

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিপুরুষ কি করেন ?"

সীতানাথ বলিলেন—"শুয়ে আছেন।"

প্রভু তখন বলেন—"হরিপুরুষ কি শুয়ে থাকে ? সব জায়গায় হেঁটে বেড়ায়। এখনও হাঁটছে।" *

তারপর প্রভু জিজ্ঞাসা করেন—"হরিপুরুষ কিজন্য এলেন ?"

তদুত্তরে ভক্ত বলেন,—জীব উদ্ধারের জন্য।

* শ্রুতিঃ—"আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ॥"

প্রভু তখন বলিলেন,—“শুধু কি জীব উদ্ধারের জন্য? উদ্ধার ত হ’লি, আর কি জন্য?”

সীতানাথ উত্তর দেন, প্রেমভক্তি দানের জন্য।

প্রভু আবার প্রশ্ন করেন, “শুধু কি প্রেমভক্তি দান? তুই কি চাস?”

ভক্ত প্রার্থনা করিলেন, মহাউদ্ধারণ-মহাশক্তি দেখিতে চাই।

প্রার্থনা-বাক্য শেষ হইতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ভক্ত আত্মহারা হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখেন, প্রভুবন্ধুর শ্রীচরণের নিকট দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ী দশভুজা ভগবতী দেবী দণ্ডায়মানা। সীতানাথ অল্পক্ষণ মধ্যেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। জ্ঞান হইতেই দেখেন বন্ধুগোপাল শিশুভাবে নীরবে শয়ান আছেন। সেবক যজ্ঞেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন। ভক্তের নিকট অবশ্য-বিশ্বাসযোগ্য এই মহাগোপ্য বার্ত্তা সেবক যজ্ঞেশ্বরকে সীতানাথ বলিলে সেবক দেখেন, প্রভুর শয্যাপার্শ্বে প্রায় সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ একগাছি অতি সুন্দর কেশ পড়িয়া আছে। ভক্ত-বাঞ্ছাপূরণে যোগমায়া রূপ ধরিয়াছিলেন। যোগমায়ার এই প্রকাশ হইবার বার্ত্তা ঘনিষ্ঠ ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে প্রচারিত হয়। বন্ধুপ্রিয় শ্রীযোগেন্দ্র কবিরাজ একদিন আঙ্গিনায় আসিয়া ঐ শ্রীকেশটি লইয়া যান ও সযত্নে রক্ষা করেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর, ১৩২৬, ৫ই আশ্বিন, দ্বিপ্রহরে সীতানাথের জলাতঙ্ক প্রকাশ পায় এবং সজ্ঞানে ‘জয় জগদ্বন্ধু’ নাম

করিতে করিতে শ্রীঅঙ্গনে দেহরক্ষা করিয়া শ্রীধাম প্রাপ্ত হন। এর আগে ১৩২৬, ৩রা শ্রাবণ, রাত্রি ৩টায় বাকচরে এক ক্ষিপ্ত শৃগাল সীতানাথকে দংশন করিয়াছিল।

প্রভু কৃপা করিয়া দিব্যদৃষ্টি দান করিলেই প্রভুর ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বিভূতি দর্শন সম্ভব, অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এখানে 'বিভূতি আকাশে আছে, বাইরে গেলে দেখাব' এই বন্ধুবাণী স্মরণীয়।

১৩২৬, ২৪ কার্ত্তিক, আমাদের অদৃশ্য কাহারো উদ্দেশ্যে শিশুপ্রভু স্বগতভাবে বলেন, "আমার পা ছেড়ে দে?' কেন আমার পা ধরবি?"

"তোর শিব টিব নিয়ে যা।" প্রভু আরো বলেন, "শালী! হারামজাদী! দুরন্ত বেটী! আবার পা ধরিস?" "এক দুরন্ত বেটী আমার পা ধরে। দু'চার ঘণ্টা আমার পা ধরে থাকে।" সেবকরা কাছে আসিলে, প্রভু বলেন,—"তোমরা এখন যাও, শোও গিয়ে।"

১৩২৬, ২৬ পৌষ, শিশুপ্রভু বলেন,—"তোরা আমাকে চিনলি না।" প্রভুর কৃপা ছাড়া, তাঁহার তত্ত্ব কে জানিতে পারে, তাঁহাকে কে চিনিতে পারে?

১৩২৭, ৫ই ভাদ্র, আমাদের অদৃশ্য দেবীর প্রতি লক্ষ্য করে শিশুপ্রভু বলেন,—"কালী শালী! কালী শালী! দাঁড়ায়ে আছিস কেন?" ইহা শিশুবন্ধুর আদরের উক্তি। প্রভুর বাল্যকালের রচনায় আছে, "এস হে ওহে পাগলা কালী, লয়ে প্রেমের ডালী। তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হে, তুমি গণপতি অংশুমালী।"

ব্যাধি-গ্রহণ

১৩২৬ সনের মাঘমাসে নানাস্থানে বসন্তরোগ দেখা দেয়। ফরিদপুর ও অন্যান্য ও বহু স্থানের বহু নরনারী ঐ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। ৩রা মাঘ আঙ্গিনায় ভক্ত ব্রজবন্ধু ঐ ব্যাধিতে দেহ রাখেন। ১৩২৬, ১৭ই মাঘ প্রভুবন্ধু স্বীয় অঙ্গে ঐ উৎকট ব্যাধি গ্রহণ করেন। জীবের পাপতাপ-ব্যাধি প্রভু গ্রহণ করিবেন, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ১৮ই মাঘ (১৩২৬) প্রভু স্বীয় দেহে ঐ ব্যাধি গ্রহণ করার পর হইতে সর্ব্বত্র ঐ ব্যাধি হ্রাস পাইতে থাকে। ১৩২৬, ২১শে মাঘ, কবিরাজ মহাশয়ও শ্রীযজ্ঞেশ্বরের উপস্থিতিতে, কুঞ্জদাসজী প্রভুর কাছে তাঁর জ্বালার ভাগ দিবার জন্য প্রার্থনা করিলে প্রভু বলেন, "লোক নাই।" পরে বলেন, "এত দুঃখ দিল রে।"

"আমার কেউ নেই রে!" ১৩২৬, ২২শে মাঘ, কুঞ্জদা আদি প্রিয় সেবকদের উপস্থিতিতে প্রভু বলেন, "এত দুঃখ দিল রে! জীবের জন্য এত ঝড়!" জীবের ব্যাধি বলিয়া প্রভুর এত কষ্ট, শ্রীমুখেই তা প্রকাশ করিলেন।

তখন সেবকগণ প্রভুর সেবা করিয়া হাত ধুইতেন না, প্রতিষেধকও কিছু লন নাই, কিন্তু কাহারও আর ঐ ব্যাধি হয় নাই। প্রভুর এই ব্যাধির মধ্যে আঙ্গিনায় পাঁচদিন চল্লিশপ্রহর মহানামকীর্ত্তন হয়। পরে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ঐ দুষ্ট ব্যাধির অণুমাত্র চিহ্ন ছিল না। একেবারে বিমল দেহ।

১৩২৬ সনের ৮ই ফাল্গুন বন্ধুসুন্দর বাহিরে বেড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আজ প্রভু দোলায় সহর ভ্রমণ করেন।

ঐ ব্যাধির উপশম হইলে, প্রথম প্রথম কয়েকদিন ইজিচেয়ার দোলায় মশারি খাটাইয়া তাহার মধ্যে প্রভুকে বসাইয়া বাহিরে বেড়াইতে লওয়া হইত।

১৩২৬, ১৯শে ফাল্গুন ভ্রমণকালে পুলিসের লোক সেবকগণ দ্বারা দোলাসহ প্রভুকে থানায় আনান ও সেবকদের নাম লিখিয়া লন। প্রভু তখন বলেন,

"তোমরা অন্যায় কর কেন?"

অতঃপর তখনই প্রভুকে দোলায় লইয়া সেবকগণ অঙ্গনে রওনা হন। আঙ্গিনায় আসিয়া কিছুপরই প্রভু আবার ভ্রমণে বাহির হন। ঐ দিন প্রভু একসময় বলেন, "লেখাপড়া ক'রে নিয়ে যাও।"

১৩২৬, ২০শে ফাল্গুন, আঙ্গিনায় আসিয়া প্রভু বলেন, "নামায়ে মেয়েলোকের (রাধিকার) নাম ধ'রে নিয়ে যা।" "আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাও।"

এখানে মেয়েলোকের নাম অর্থে ভক্তগণ শ্রীরাধার নাম বুঝেন। তাঁরা 'রাধামাধব রাধিকা নাম' কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৩২৬, ২০শে ফাল্গুন প্রভুকে ধূলদির পুলের দিকে বেড়াইতে লওয়া হয়। প্রভু তখন তন্ময় দশায় ছিলেন, বাহকগণ প্রভুর অনুমতি না লইয়াই ফিরিয়া চলিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রভুর

ঐ দিকে দৃষ্টি পড়ায়, তিনি বলেন, "যেখানে ছিল, সেখানে ফিরিয়া যাও।" সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবার পর, প্রভু বলেন,

"এখানে নামায়ে কীর্ত্তন কর" প্রভুর আদেশ পালিত হয়। তারপর প্রভু বলেন,

"আর একটা নাম ধরে চলে যাও।"

তখন আর একটি কীর্ত্তন ধরিয়া প্রভুকে ফিরাইয়া লওয়া হয়।

কয়েকদিন পর প্রভুকে উন্মুক্তভাবেই বেড়াইতে লওয়া হইত। মশারী ব্যবহার করা হইত না।

মিউনিসিপ্যালিটি হইতে লোক আসিয়া দেখিয়া যান, প্রভুর অঙ্গে ব্যাধির অণুমাত্র চিহ্ন নাই।

একদিন শয্যার নিকট ভক্তবর কুঞ্জদাসজীকে দেখিয়া প্রভু বলেন, "তুমি দাঁড়াও ত!"

কুঞ্জদাদা বলিলেন, "প্রভু, এই ত দাঁড়ায়েছি।" প্রভু বলিলেন, "এই পৃথিবীটা এখানে এনে দাও ত?" বন্ধুহরিনামে পৃথিবীবাসীদের বন্ধুদাস করিতে পারিলেই পৃথিবীটা প্রভুর কাছে আনা যায়।

১৩১৬, ১লা ফাল্গুন কুঞ্জদা ও সর্ব্বানন্দদা প্রভুকে একখাট হইতে অন্য খাটে বহন করিয়া লইবার কালে, কুঞ্জদা প্রভুকে স্বাধীনভাবে চলাফিরা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন শিশুবন্ধু বলেন,—

"তোরা ইচ্ছা করলে, আমাকে দাঁড় করাতে পারিস।"

প্রভুর এই বাণীর ভাব—আমরা সকলে মন-প্রাণে হরিনাম করিলে, নাম নিষ্ঠায় থাকিলে হরিনামে প্রভুকে সুস্থ করিতে ও দাঁড় করাইতে পারি। প্রভু বলিয়াছেন "নামনিষ্ঠা নাই আমিও নাই।" "হরিনামে দেহ হয়।" "তোরা হরিনাম না করলে আমি ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হয়ে যাব।"

একদিন অঙ্গনে শিশুবন্ধু প্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে নিজের নামের জয়ধ্বনি দিয়া কুঞ্জদাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "কুঞ্জ জয় জগদ্বন্ধু"। মহানামী জগদ্ববন্ধুর মুখে মহানামের "জয় জগদ্বন্ধু" ধ্বনি কি মধুর! "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু।"

১৩২৮, ২৯শে আষাঢ়, সেবকে প্রভুর অঙ্গে ঔষধের তৈলমালিশ করিতে গেলে, বাধা দিয়া হরিনাম পিপাসু শিশুপ্রভু বলেন,

"আমি উয়্যা দিয়া শরীর বানাব না।"

এখানে 'হরিনাম করে না, তেল দেয়' এইবন্ধুবাণী স্মরণীয়।

১৩২৬, ১৯শে কার্ত্তিক, শিশুবন্ধু বলেন,

"আগে হরিনাম, পরে বাহ্য।"

হরি জগবন্ধুর শ্রীমুখের এই বাণী শুনিয়া সেবকগণ মহানন্দে জয় জগদ্বন্ধু কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

মহাপ্রভুর জন্মভিটায় কীর্ত্তন ও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা

১৩২৬ সনে, ৫ই ফাল্গুন, প্রভু খাটে শয়ান আছেন। কুঞ্জদাসজী প্রভুর শয্যার নিকট আসিলে প্রভু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—

"আমায় একটা কথা বলে দাও ত।"

কুঞ্জদাদা বলিলেন,—আমি একটা কথা কি বলব ?

প্রভু বলিলেন, "একটা কথা বলে দাও, আমি চলে যাই।"

শ্রীকুঞ্জ তখন বলিলেন—একটা কথা জয় জগদ্বন্ধু।

প্রভু বলিলেন, "কীর্ত্তন থাকে, চলে যাও।"

ইহার পর কুঞ্জদাদা জগদ্বন্ধু-মহানামকীর্ত্তন-দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রমে শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হন। প্রভুর নাম প্রচারণ মহাউদ্ধারণ লীলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গৌরহরি নিত্যানন্দ দ্বারা হরিনাম প্রচার করেন।

মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বে প্রভুবন্ধু শ্রীধাম-নবদ্বীপে একদিন গঙ্গাস্নান কালে গঙ্গাগর্ভস্থ একটি স্থান দেখাইয়া তাঁহার প্রিয় সেবক নবদ্বীপকে বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত মায়াপুর ঐখানে।"

তৎকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল 'মায়াপুর' গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন। অতঃপর কালক্রমে ঐস্থানে 'চর' পড়ে। তখন শ্রীব্রজমোহন দাস (বি, এ) বাবাজী মহাশয় নানা প্রমাণ প্রয়োগে মায়াপুর সম্বন্ধে প্রচার করিতে থাকেন।

১৩২৬ সনে দোলপূর্ণিমার কয়েকদিন পূর্ব্বে কুঞ্জদাসজীর নেতৃত্বে মহানাম সম্প্রদায় ঐ স্থলে সপ্তাহকাল বন্ধুমহানাম কীর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন করেন। ইহার পর সেইবার শ্রীমদ্ রাম-দাস বাবাজী, শ্রীব্রজমোহন দাসজী, শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী প্রমুখ বৈষ্ণব-প্রধানগণের পরিচালনাধীনে নাম সংকীর্ত্তন সহ "শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা" মহানন্দে সুসম্পন্ন হয়। কুঞ্জদাদা সর্ব্বদলের অগ্রণী ছিলেন এবং প্রভুবন্ধুর শ্রীমূর্ত্তি, মহানাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিলেন। পরিক্রমায় কুঞ্জদাদা শেষপর্যন্ত জগদ্বন্ধু মহানাম করেন। অন্যান্য দল অনেকেই সরিয়া পড়েন, শ্রীনবদ্বীপে কুঞ্জদাদার প্রচেষ্টায় একদিন জগদ্বন্ধু মহানামে চৌদ্দ মাদল নগর কীর্ত্তন মহানন্দে সম্পন্ন হয়।

টানা-গাড়ীতে ভ্রমণ ও শিশুবন্ধু-কথা

বন্ধুপ্রিয় রণজিতচন্দ্র ও জমিদার যোগেন্দ্র মৈত্র কলিকাতা হইতে অর্ডার দিয়া প্রভুর জন্য একখানি বড় টানা-গাড়ী (উত্তম দ্বিচক্র শকট) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৩২৬, ৩১শে চৈত্র হইতে প্রভু ঐ শকটে বসিয়া বেড়ানই পছন্দ করিতেন। ১৩২৭, ১৯শে বৈশাখ জন্মোৎসবে জনতার চাপে গাড়ীখানির কিছু ক্ষতি হইয়াছিল।

জন্মোৎসবের সময় কয়েকদিন বাল্যভোগের পর একবার ও সায়ংভোগের পর একবার উপবিষ্ট বন্ধুর সামনে পঞ্চপ্রদীপ, চামর

ইত্যাদি লইয়া আরতি করা হইয়াছিল। আরতিকালে বন্ধু মৃদুমধুর হাসিতেন। অল্পক্ষণ মাত্র বসিতেন, তাই আমরা একই সময়ে কেহ পঞ্চপ্রদীপ, কেহ চামর ইত্যাদি লইয়া তাড়াতাড়ি আরতি শেষ করিতাম। কখনো কখনো আমাদের এক একজনে প্রভুর আরতি করিয়াছি। বাহিরে চিত্রপটের সম্মুখে, বহুক্ষণ পৃথক্ আরতি হইত। ইহা ছাড়া সময়ান্তরে প্রভুকে দৈনিক তিন চারবার আরতিও করা হইয়াছে।

১৩২৭, ১৫ই বৈশাখ সন্ধ্যায় সেবকরা আরতির আয়োজন করিলে, শিশুপ্রভু বলেন, "আগে আইসা নি।" প্রভু আসিলে তাঁহার আরতি হইল।

১৩১৬, ২১শে পৌষ, প্রভুর আরতির ঘন্টা সরাইয়া রাখাকালে, ঘন্টার শব্দ শুনিয়া শিশুপ্রভু বলেন, "পূজার ধূমধাম উঠাইছে।"

১৩২৭, ২০শে বৈশাখ অপরাহ্নে ছাপ্পান্ন মাদলে নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। ৩০শে বৈশাখ, আঙ্গিনায় ভক্ত নীলমাধব বেসুরে প্রভু-রচিত প্রভাতী কীর্ত্তন গাহিতে থাকিলে, প্রভু মন্দির হইতে ধমক দিয়া শাসন করেন।

১৩২৭ সন ৯ই জ্যৈষ্ঠ, (ইং ২৩।৫।১৯২০) শ্রীরণজিতচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ সেলুন ভাড়া করিয়া প্রভুকে পাবনায় লইবার জন্য আসেন। ঐ গাড়ীতে গোপালবন্ধুকে উঠান হইয়াছিল। গাড়ীর ভিতরটি যেন-খুসী হইয়া দেখিলেন ও "বেশ গাড়ী", বলিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিলেন, "তবে চালা"। কিন্তু তখন ট্রেণ ছাড়িবার অনেক বিলম্ব থাকায় ও স্টেশনে কোন ইঞ্জিন

না থাকায়, গাড়ী চালান গেল না। নিশ্চল বগীতে বন্ধুগোপাল অধিকক্ষণ থাকিতে চাহিলেন না; সুযোগ পাইয়া রোরুদ্যমান ভক্তগণ প্রভুকে কোলে তুলিয়া টানা-গাড়ীতে বসাইলেন এবং মহোল্লাসে শ্রীঅঙ্গনে লইয়া আসিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ টানা-গাড়ীতে প্রভুর বসা অবস্থায় একজন আলোকচিত্র তুলিয়া লন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, (ইং ১১।৬২০), বৈকালে কালোশ্যাম দাস, দীনেশ ও আমি গাড়ীতে প্রভুকে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে প্রভুর সম্মতি লইয়া, বাকচর শ্রীঅঙ্গন পর্য্যন্ত যাই। বড় রাস্তা থেকে গাড়ী নামানকালে এক কৃষক সাহায্য করেন। বিনোদাদি সঙ্গে ছিলেন। জঙ্গলাপথে অসমতল ভূমিতে চলিতে প্রভুর কষ্ট হয়। সংবাদ পাইয়া পরে ফরিদপুর হইতে ভক্তগণ আসেন। পরদিন সকালে সকলে মিলিয়া প্রভুকে লইয়া শিবরামপুরের পথ দিয়া ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছি।

২রা শ্রাবণ, ১৩২৭ : অপরাহ্ণে আমাদের অদৃশ্য একজনকে প্রভু ধমক দিতে থাকেন। "ওর গলায় গামছা দিয়া ট্যানা আন। কাণ মলি।" কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন, পরে ধীরে বলেন, "তুমি যাও।" আমাদের অদৃশ্যভাবে কত মহাত্মা প্রভুর কাছে যাতায়াত করিতেন এবং তখন প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই সমস্ত বাণী শুনা যাইত।

দোলা ও শকট-বহন-কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গন-সেবকগণ এবং সময় সময় স্থানীয় ও আগন্তুক ভক্তগণ থাকিতেন। এই কার্য্যে মোহান্ত বিজয়, মনোমোহন, ও এক বৃদ্ধ মোহন্ত কতককাল নিযুক্ত

ছিলেন। এ ছাড়া হরমোহন (কল্যাণবন্ধু), ক্ষিতীশ ভদ্র, বরিশালের রাজেন্দ্র পাল, বুড়োদা, বসন্ত ভট্টাচার্য্য, পাগলাকুঞ্জ, ঘোষ দুঃখীরামজী, উদ্ধারণের পিতা, দীনেশ, মনোহর, নিতাই, বলরাম, ভোলা, দোলগোবিন্দ, ঘোষ শচীন, জ্ঞান প্রভৃতি অনেকদিন বিভিন্ন সময়ে কেহ বেশীদিন, কেহ বা অল্পদিন প্রভুর দোলা ও শকট-বহন-সেবাকার্য্য করিবার ভাগ্য পাইয়াছেন।

২১শে কার্ত্তিক (১৩২৭), ভ্রমণকালে যজ্ঞেশ্বর দাস, রাজেন্দ্র, রাখাল দাস ও অন্যান্য কতিপয় ভক্তকে মাধবপুর বাজারকান্দি দত্তবাড়ী লইয়া যান। পথ অসমতল বলিয়া গাড়ীতে ঝাঁকানি লাগে। প্রভুর কষ্ট হয়, রাত্রি হইয়া যায়। প্রভুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐরূপ লওয়াতে তিনি প্রথমে খুব ধমক দেন ও নামিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কীর্ত্তন সহ প্রভুকে গাড়ীতে করিয়া ঘুরান হয়। "সে ঘরে নে" অর্থাৎ আঙ্গিনার ঘরে নিতে বলেন। অবশেষে রাত্রে ওখানে থাকার জন্য অনেক অনুরোধে, প্রভু বলেন,

"জোর ক'রে নেওয়া। তাই কি করা। আগে বললেই হয়।" পরে বড় ঘরে তোলা হ'লে, শিশুবন্ধু বলেন, "দেখি, দেখি, কি রকম ঘর? এ কেমন ঘর?" শেষ রাত্রে তিনি বলেন, "নিয়া চল। নেও।" শ্রীঅঙ্গনে ফিরিতে ব্যগ্র হন। গাড়ীতে তোলা হইলে বলেন, "ভাল পথে নিবি ত?" কৃষ্ণদাস-জীর আদেশে প্রভুকে আনিবার জন্য অঙ্গন হইতে মাধবপুরগামী কালোশ্যাম, ধলাশ্যাম, নবদ্বীপ ঘোষ এম্. এ. বি. এল্.-আদি

ভক্তগণ শেষ রাত্রে রওনা হন ; পথে প্রভুর শকটবাহী যজ্ঞেশ্বর আদি ভক্তগণের সহিত তাঁহাদের মিলন হয়। তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর জয় কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুকে লইয়া ২২শে কার্ত্তিক দ্বিপ্রহরে তাঁহারা অঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করেন।

জীবস্বভাবে আমরা অনেক সময় প্রভুর দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারে চলি। কোন কোন ভক্ত নিজ স্বপক্ষে প্রভুর আদেশ-বাক্য বাহির করিতে চেষ্টা পাইতেন। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ পাকা মন্দিরে মহেন্দ্রজী প্রভুর কাছে আদেশসূচক কিছু বন্ধুবাণী প্রার্থনা করিলে, শিশুবন্ধু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সেবককে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকে শিক্ষা দিবার জন্য মধুরকণ্ঠে বলিলেন,—

"আমি বলি, আদেশ চলে। এরা স্বভাবে চলে। উপদিশে (উপদেশে) চলে না।" উপদেশ শব্দটি মিষ্টি করিয়া "উপদিশ" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তখন ঐস্থানে উপস্থিত ছিলাম।

১৩২৬, ১৫ই চৈত্র, শিশুপ্রভু বলেন, "কয় এক, কাজ করে এক।" কথায় ও কাজে আমরা বিপরীত চলি, তাই প্রভু ঐ কথা বলেন।

প্রভুবন্ধু শিশুভাবে নব-সংস্কৃত আদিমন্দিরে আছেন। তাঁহার অন্তর্যামিত্ব জানিতে মনে ইচ্ছা হইয়াছিল। ঐ সময় কিছুকাল হরিনাম কীর্তন ভিন্ন কথা বলিতাম না। ঐ অবস্থায় প্রভুর প্রসাদী পরিত্যক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য, মিষ্টি ও ফলাদি কিছু কিছু গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া প্রভুর দৃষ্টির বাহিরে গোপনে খাইতাম। সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভু ঐরূপ তন্ময় অবস্থাতেও একদিন আমার দিকে

ফিরিয়া বলিলেন,—“গোপনে গোপনে খাস।” আরও কয়েকটি কথা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন।

১৩২৭, ৩১শে আশ্বিন, প্রভুবন্ধু স্বগতভাবে “আমার টাকা নিল; আমাকে দিল না”, বলিয়াছিলেন।

প্রভুর সেবার জন্যে টাকা পয়সা মণিঅর্ডারযোগে আসিত, অনেকে আবার মন্দিরের বারান্দায়, কেহ কেহ বা সেবকদের হাতেও অর্থাদি দিতেন। মনে হয়, ঐ টাকা পয়সার সমস্তটা যথাযোগ্যভাবে প্রভুর সেবায় ব্যয়িত হইত না, তাই সর্ব্বদ্রষ্টা শিশুবন্ধুর মুখে ঐ কথা অকস্মাৎ উচ্চারিত হয়। শিশুপ্রভুর কাছে কখনো টাকা থাকিত না, কে তাঁর সেবায় টাকা দিল, বা কে ঐ টাকা ব্যয় করিল, ঐ সব দিকে তাঁর কোনও লক্ষ্য ছিল না।

প্রভুবন্ধু আহার করিতেন সামান্য, কিন্তু ভোগ দেওয়ার সময়-সম্বন্ধে অমনোযোগী হইলে দেখা গিয়াছে, কখন কখন শাসনবাক্যও বলিয়াছেন। একদিন যথাসময়ে আহার্য্য না আনায় তিনি ধমক দিতেছিলেন। ভোগরান্নায় বিলম্ব ও ত্রুটি হইয়াছিল, অতি বিলম্বে, মাত্র বেগুন ভাতে ভাত, গরম অবস্থায় প্রভুর সামনে দেওয়া হইয়াছিল, অন্য কোন উপকরণ ছিল না। বন্ধুগোপাল আহার্য্য না আনা পর্য্যন্ত বসিয়াই ছিলেন; উহা আনা হইলে সামান্য কিছু গ্রহণ করেন।

শ্রীগৌরচন্দ্রের ন্যায় প্রভুবন্ধুতেও ভক্তগণ কখন কখন লক্ষ্য করিতেন,

"অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
যা বলিতে যোগ্য নয় তাও প্রভু ভাষে॥" চৈঃ ভাঃ

একজন সেবক আর একজন সেবককে, প্রভুকে শুনাইয়া ডাকিলে, শিশুবন্ধু কখন কখন ঐ ভক্তের আহ্বান কিছুটা বদলাইয়া মধুর প্রতিধ্বনি করিতেন। যেমন, একদিন শ্যামকে ডাকিতে শুনিয়া, "শ্যামবাজার কোথায়?" প্রতাপ ভৌমিক মহাশয়, নিত্যসেবক কোথায় গেলি, বলিলে, "নিত্য কোথায় আছ?" ইত্যাদি রূপ প্রতিপ্রশ্ন করিতেন। এইসব কথা শুনিতে সামান্য হইলেও মর্ম্মী ভক্তের প্রাণের বস্তু, মধুর হইতেও মধুর। পুনঃ পুনঃ শুনিলেও আরও শুনিতে ইচ্ছা হয়।

১৩২৭, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, অধিক রাত্রে প্রভু শয্যায় নিজেই বসিয়া ডাকিতেছিলেন। মন্দির বারান্দায় কয়েকজন সেবক তখন নিদ্রিত ছিলেন। আমার দেহ জীবস্বভাবে অশুচি ছিল, জয়জগদ্বন্ধু বলিয়া ডাকিলেও আর কেহ জাগিলেন না বলিয়া, তৎকালে মৌনী আমি বাধ্য হইয়া প্রভুর নাম স্মরণ করতঃ ঐ অবস্থাতেই মন্দিরে যাই। অমনি প্রভু একটু ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলেন—"কি করছিস? আউ, আউ, ছি! ছি!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিরপূত পাপ-তমোহর বিমল-কোমল তনুখানি ধরিতে বলিয়া শিশু হইয়াও সর্ব্বদ্রষ্টা তিনি সব জানেন, "পাপীকে নহে, পাপকে ঘৃণা করেন," এই প্রত্যয় ও প্রমাণ দৃঢ় করিয়া দিলেন।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩২৬ মন্দির-বারান্দায় প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় প্রাতে পঠনীয় বলিয়া প্রভু-নির্দিষ্ট "ব্রহ্মামুরারি" ইত্যাদি স্তব যৌবন-

কালের পূর্ব্বে-অভ্যাসবশতঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন। তখন শিশুবন্ধু মধুরকণ্ঠে বলেন,—"এখানে উয়্যা পড়া লাগে না।" বস্তুতঃ হরির কাছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবের নাম স্মরণীয় নহে, তাঁহার কাছে হরিনামই শুধু গেয়। আমি তখন মন্দিরে ছিলাম। প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া ভৌমিকজী তখন জয়জগদ্বন্ধু নাম করিতে থাকেন।

১৩২৮ সনে আষাঢ়ে প্রভু কিছুদিন অন্যান্য প্রকার ভোগগ্রহণ বন্ধ রাখেন। ফলের রস, ডাবজল অথবা বসিয়া দুই এক টুকরা শশা, কিংবা আম বা দুই একখানি ছোট লুচি লইতেন।

১৬ই আষাঢ়, (১৩২৮), গ্লাসের ভোগ একটু লইয়া "মিসিণ্ডির, খুলে দাও," বলেন। কিছুপরে বেড়াইতে বাহির হন।

প্রভুর ভোগগ্রহণের রীতি অদ্ভুত ছিল। একসময় দেখিয়াছি, বন্ধুগোপাল কলাই শাক লইতেছেন। উপর্য্যুপরি কয়েকদিন হয়ত ঐ শাক ছাড়া আর কিছু লন না। কতকদিন বা প্রধানতঃ পেস্তা কিসমিস, কখনও পানিফল, কখনও বা কুমড়া ভাতে, কখনও বা ভিজান ছোলা, কখন কখন বাতাসা লইতেছেন, আর কিছু দিলে লইতেন না। আবার কখন ইচ্ছা হইলে অন্যান্য দ্রব্যও কিছু কিছু লইতেন।

দেখা গিয়াছে, ভাববিহ্বল বন্ধু শুকনা দ্রব্যের বাটী মুখের কাছে লইয়া চুমুক দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কখনও বা তরলদ্রব্য আঙ্গুল দিয়া উঠাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। একেবারে অপ্রাকৃত শিশু! মহাভাবে তন্ময়!

বন্ধুসুন্দরের মাধুর্য্যময় শিশুভাবাবস্থার কথা মনে পড়ায়, এখানে আরও দু'তিনটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম।

বন্ধুসুন্দরের মধুর শিশুভাব দেখিবার উদ্দেশ্যে ১৩২৭, ২রা কার্ত্তিক একটি জলশূন্য পাত্র লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জল ঢালিবার ভান করিয়াছিলাম। তিনি উহা সত্য সত্যই জল মনে করিয়া অসহায় বালকের মত শঙ্কা ও আপত্তি প্রকাশ করিয়া হাত তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপ্রকৃত শিশুভাব ছিল, সহজ, সরল ও অকৃত্রিম।

২রা কার্ত্তিক ১৩২৭ শারদীয়া সপ্তমীপূজার দিন, টানা-গাড়ীতে লইয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বন্ধুসুন্দরকে গাড়ীতে করিয়া চালিতাতলায় আনা হইলে তিনি বালকের মত মধুরভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিলেন—"নেমন্তন্ন ক'রে নে।"

মনঃপ্রাণে নিষ্ঠার সহিত হরিনাম করিতে করিতে ঘরে ঘরে সাদরে বন্ধুচাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আবাহন করিয়া লইয়া তাঁহার সেবা করাই ত ভক্তগণের কাম্যপূজা! ইহা ছাড়া ভক্তগণের আর কোন আনন্দ-উৎসব পূজা-পার্ব্বণ নাই।

বন্ধুসুন্দরকে গাড়ীতে বসাইবার পর, তাঁহার গায়ে চাদর দেওয়া হইত। তিনি নিজ হাতে চাদরের আঁচল এমনভাবে গুছাইয়া গায় দিতেন যে, কেহ সহজে উহা খুলিয়া লইতে পারিতেন না, দরকার হইলে নিজেই খুলিয়া দিতেন।

একদিন সিল্কের ও অন্যান্য ভাল ভাল কোন চাদরই বন্ধু-গোপালের পছন্দ হইতেছিল না, সব ফেরত দিয়া দিতেছিলেন।

আমি তখন দিগম্বর শিশুবন্ধুকে ভুলাইবার জন্য, মন্দির হইতে একখানি ময়লা স্যূতী চাদর তাঁহার কাছে লইয়া যাইতেই, সেখানি তিনি পছন্দ করিয়া লইতে চাহেন। তখন ওখানি কৌশলে লুকাইয়া রাখিয়া আর একখানি পরিষ্কার উত্তরীয় শিশুবন্ধুকে দেই। এইভাবে শিশুবন্ধুকে লইয়া সময় সময় খেলা চলিত।

দক্ষিণ উরুদেশে প্রচণ্ড আঘাত-গ্রহণ

১৩২৮ সনে ১৭ই ভাদ্র তারিখে অপরাহ্নে কালোশ্যাম দাস ও দুর্ব্বল রোগী যজ্ঞেশ্বরদাস ভ্রমণার্থ বাহিরে লইবার জন্য প্রভুকে চৌকী হইতে নীচে নামাইতে থাকেন। হঠাৎ প্রভু হস্তচ্যুত হইয়া সেবকগণসহ ভূমিতলে পড়িয়া যান। দক্ষিণ উরুর মধ্যস্থলে নিদারুণ আঘাত পান। অস্থি স্থানচ্যুত হয়। ডাক্তার সত্যবাবুকে আনাইয়া চিকিৎসকোচিত সেবার ব্যবস্থা করা করা হয়। ১৮ই ভাদ্র সন্ধ্যাকালে সত্যবাবু সহকারীদের লইয়া ঐ আঘাত স্থানে নূতন ভাবে আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন।

১৯শে ভাদ্র রাত্রি প্রায় দুইটায় "সকলে আইস। জগন্নাথ আইস" বলিয়া প্রভু ডাকিতে থাকেন। বলা বাহুল্য জগন্নাথ নামে কোন সেবক ওখানে তখন কেহ ছিল না। প্রভু তখন ঐ অবস্থাতেও বাহিরে বেড়াইতে চাহেন। "চারিজনকে ডাক" বলেন।

পণ্ডিত হারাণ পাঠক ও যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় কাছে আসিলে, "আর দুইজনকে ডাক, নেপোলিয়ানকে ডাক" বলেন। হারাণ পাঠক "কি নাম করব" প্রশ্ন করিলে, প্রভু বলেন,

"হরিপুরুষ বল্‌তে পার।" প্রভুর মুখে ঐ নাম শুনিতে চাহিলে, প্রভু বলেন, "উয়্যা আমার মনে আছে।"

ঘটনাচক্রে প্রভুর এই আঘাত প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে জীবাধম আমি শ্রীঅঙ্গনে অনুপস্থিত ছিলাম। শ্রীকালো-শ্যামের পত্রে সংবাদ পাইয়া ২০শে ভাদ্র কুষ্টিয়া বন্ধুমিলন না হইলে সকালে ট্রেণে রওনা হইয়া বেলা প্রায় দুইটায় ফরিদপুর আঙ্গিনায় উপস্থিত হই।

ঐ দিন বেলা দুইটার পর আমি প্রভুর কাছে গেলে তিনি আমাকে "দাদা" "দাদাবাবু" "দাদা মহারাজ" "মামা" ইত্যাদি বিবিধ আদরের সম্বোধন করিয়া উঠাইবার জন্য মিনতি করেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় উঠানো ডাক্তারের নিষেধ ছিল।

ঐ দিন বৈকালে উপবিষ্ট অবস্থায় বন্ধুচন্দ্র করুণস্বরে বলিয়াছিলেন—"ওরে বন্ধু, আমার বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু রে!"

কোন ভক্ত একটু কটুভাবে কথা বলায় বন্ধু দীনভাবে বলেন—"আমি তোমার চেয়ে নীচ!"

আজ একসময় প্রভু বলেন—"আমার কত সন্তান!"

"তোমরা সকলে মিলে আমার কাজ কর।"

২১শে ভাদ্র (১৩২৮), ঐ অবস্থায়, প্রায় ঘন ঘন উঠিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখান। মিনতি করিয়া "আইস" "বাবা" "আসেন", "নলিত আসেন" "তফাতে থাক কেন?" "উঠায়ে দে ভাই, তোর পায়ে ধরি" ইত্যাদি কথা কাতরে বিনয়ভাবে মাঝে মাঝে বলিতে থাকেন।

ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি (এম্ বি.), ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ (এম্. বি.) কলিকাতা হইতে আজ দুই জোড়া ফুল, মালা, (splint) যন্ত্র ইত্যাদি লইয়া আসেন। হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধু, মহানাম-কীর্ত্তন হইতেছিল। মাঝে মাঝে গ্লাসে করিয়া তরল (ফলের রস প্রভৃতি) সেবার দ্রব্য শিশুপ্রভুকে খাওয়ান হয়।

উঠিবার ব্যগ্রতায় তিনি "আসেন, মশায় আসেন" "এ যায়গা আপনার নামে কিছু নাই" "এ যায়গা আসেন" ইত্যাদি বলেন।

"বেলা ১১-৪৫-এ ডঃ সত্যচরণ, ডঃ হরিহর, ডঃ তিনকড়ি, এই তিনজন এম্. বি. ডাক্তার অন্যান্য ভক্তদের সহযোগে প্রভুর আঘাত স্থানের (splint এস্‌প্লিণ্ট) লাগাইয়া বিশেষরূপ সেবার ব্যবস্থা করেন। এ কয়দিন পশ্চিম শিয়রে প্রভু শুইয়াছিলেন, আজ অন্য চৌকীতে দক্ষিণ শিয়রে শোয়ান হইল। সন্দেহ থাকায় ঐ যন্ত্রটি খুলিয়া দ্বিতীয়বার ভাল করিয়া লাগান হয়।

রাত্রি ৯টার পর শিশুপ্রভু বলেন, "গোবিন্দ কথা বললে, ফাঁকি দিলে?"

২২শে ভাদ্র, সকাল ৫টা ৩০এ নিজেই বাম হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসেন ও মাঝে মাঝে ঐরূপ চেষ্টা পান। ধলাশ্যামজী বাধা দিয়া একটু অভিভাবকত্ব-সূচক কথা বলিলে, প্রভু বলেন— "নলিত, তুমি কটু কথা ব'লো না, আমি বড় গরীব!" আজ কখন কখন প্রভুকে ডাবজল বা অন্য তরল ভোজ্যদ্রব্য কিঞ্চিৎ খাওয়াইয়া দেওয়া হয়।

বেলা ১টার পর, প্রভু "আমাকে ছাইড়া দেও", "পিঠ ভাইঙ্গা গেল" বলিয়া উঠিতে ব্যগ্রতা দেখান।

বারান্দায় মনোমোহন মোহান্ত ভক্তগণকে লইয়া কীর্তন করিতেছিলেন ; কীর্তনকালে প্রভু অনেকটা শান্ত থাকেন, বাম চরণ নাচাইতেছিলেন। প্রভু-রচিত বাক্য, "কোন্ বিধি গড়েছিল" ইত্যাদি স্থলে মনগড়া "ওজন কি ছিল না", আঁখর দেওয়ায়, প্রভু বাম হাত উঠাইয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। আমি প্রভুর কাছে ছিলাম। কীর্তনীয়াকে সাবধান করিয়া দেই। পূর্ব্বেও কেহ প্রভুর রচনা ভাঙ্গিলে প্রভু শাসন করিতেন ও বলিতেন যে, তাঁহার শব্দে, রচনায় সংকর্ষণ-শক্তি, উহা বদলাইলে অপরাধ হয়। তবে খাঁটি আঁখর, তালে, প্রভু কীর্তন গাহিতে বলিতেন।

মশারী তোলা ছিল, কীর্তন শেষের সঙ্গে "ইষিণ্ডির ত্যাগ ক'রে যাও" বলেন, মশারী নামান হয়। ভোগ দিতে চেষ্টা করিলে, "কাল আনিস্" বলেন।

১৩শে ভাদ্র। আমাদের অনবধানতায়, বন্ধুগোপাল মাঝে মাঝে নিজেই উঠিয়া বসেন। প্রায় ১২টায় মশারীটা নামাইয়া দিবার জন্য বলেন "ইষিণ্ডির পিষিণ্ডির!" "ইষিণ্ডিরটা উঠায়ে দেও।" শিশুবন্ধুকে পাহারা দেওয়া হইত। একটু বাহিরে গিয়াছি, অমনি নিজে উঠিয়া বসিয়া বলেন—

"কষ্ট হয় না!"

৩টার পর উঠিবার ইচ্ছায় বলেন—"একটা কথা ক'তে চা'লাম।" কালোশ্যামদা ও আমি প্রভুকে মুছাইতেছিলাম, তখন

বলেন—"মহীন্দির তাই হ'ল ? আমি পাগল হ'লাম।" আমাকে নিত্যসেবক ছাড়া মহেন্দ্র নামে কোনো সেবক বলিতেন না, শিশুবন্ধু সর্বজ্ঞ, তাই মহীন্দর বলেন।

রাত্রি ৭টায় একটু বেদানার রস খাওয়ান হয়। উঠিবার ব্যগ্রতায় আমাকে ধরিয়া "দাদা, দাদা, আইস, দাঁড়াই" বলিতে থাকেন। লক্ষ্মী প্রভু, সোনা প্রভু, একটু শুয়ে থাকুন, বলায় সকলকে চলিয়া যাইতে বলেন। সকলে চ'লে গেলে, ঐ সুযোগে উঠবেন, বলায়, বলিলেন—"তা উঠব না, একজনকে রাখ্যা যা !"

রাত্রি ১১ টায় ধলাশ্যামকে বলেন—"শো গড়া, আমি বুল্‌লাম্, তুমি ঘুমাগা হা।" সকলে গেলে, নিজেই উঠিতে পারিবেন, এইজন্য শিশুবন্ধু ঐরূপ বলেন।

রাত্রি ২টায় প্রভু উঠিতে চাহিলে, গায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে থাকি। তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া ভক্ত মণিদেকে রাখিয়া যেই বাহিরে গিয়াছি, অমনি "কোথায় গেলি" বলিয়া ডাক দেন; আসিয়া গায় হাত বুলাইতে থাকি। যখন স্বেচ্ছায় গায় হাত দিতে দিতেন, তখন নিষেধ না করা পর্য্যন্ত বাহিরে যাইবার উপায় থাকিত না, কাছে থাকিয়া গায় হাত বুলাইতে হইত। অন্য সময় স্পর্শ পর্য্যন্ত করা যাইত না।

২৪শে ভাদ্র, সকাল ৫টা ৫০এ উঠিতে ব্যগ্র হইয়া আমাকে কাছে পাইয়া হাত দিয়া ধরিয়া বলেন—"বাবা! বিদ্বান্! অবতার!" কিছুপর যজ্ঞেশ্বর আসিলে, দু'জনে প্রভুকে বসাই। এক সপ্তাহ পর, প্রভুর মুখ দাঁত ধোওয়ান হল।

সমস্ত সময় দন্তধাবনাদি বন্ধ থাকিলেও তাঁহার দাঁতগুলি মুক্তার মত পরিষ্কার ও মুখ সুগন্ধ থাকিত।

বারান্দায় গোপীদাস, উদ্ধারণ, মণি আদি ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রভু উঠিতে ব্যগ্র হন, আমি কেউ আসে না বলায়, "ডাক", "আনালে আসতে পারেন, আপনি বলেন।" "একাই পারবা" "আনন্দ দাও" ইত্যাদি মিনতি করেন। আজ সন্ধ্যায় রাখাল প্রভুর উরুতে জিয়া পক্ষীর শিং বুলান।

২৫শে ভাদ্র (১৩২৮), মহেন্দ্রজীর নির্দেশে ভোরে মহানাম-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, চব্বিশপ্রহর সংকল্পে। কীর্ত্তন করিলে প্রভু অনেকটা শান্ত থাকেন, মাঝে মাঝে বাম চরণ নাচান।

২৬শে ভাদ্র, অবিরাম মহানাম-কীর্ত্তন চলিতে থাকে। সকাল ৬টায় প্রভুকে উঠাই। আজ প্রভুর হাত-পায়ের নখ ব'লে ক'য়ে ফেলান হয়। ১০টায় ভোগ দেওয়ার কালে, বমি-ভাব প্রকাশ করেন। বৈকাল ৪টায় উঠার ব্যগ্রতায় "বাবা, সোনারচাঁদ', "আমি বোল্‌লাম, সোনার বাবা" ইত্যাদি বলিয়া মিনতি করেন। শুইয়া শুইয়া পিঠে অসহ্য ব্যথা, তাই মাঝে মাঝে মাথার বালিস ফেলে দেন।

২৭শে ভাদ্র, অবিরাম মহানাম-কীর্ত্তন হয়। মহেন্দ্রজী চন্দ্রপাত গ্রন্থ পাঠ করত প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া ঝাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—দুর্ব্বোধ্য চন্দ্রপাত কোনদিন বুঝতে পারব ত? প্রভু বলিলেন,—"পারবে।" শ্রীদেহের অবস্থা

দেখিয়া শঙ্কান্বিত চিত্তে মহেন্দ্রজী পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন,—এই দেহে থাকবেন ত? শিশুবন্ধুর শ্রীমুখ হইতে উত্তর আসে—"থাকব।" জগতে যে কার্য্য সাধনার্থ প্রভুর আগমন, তাহা তিনি করিবেন কি না, এই প্রশ্নে উত্তর দেন—"না ক'রে যাবার যো নাই।" শিশুবন্ধুর শ্রীমুখের এই তিনটি আশ্বাস বাক্য পাইয়া মহেন্দ্রজী সঙ্গে কয়েকজন ভক্তকে লইয়া ঢাকায় রওনা হন।

কোন কোন সেবকের মত হওয়ায়, বেলা ১১টা ৩৫ এ, নবগ্রামের কবিরাজের ব্যবস্থা মত, ডাক্তারী ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া বালাপাতা, পাথরচুণি, অন্যান্য গাছগাছড়া, মরিচ ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যের বাট্‌না প্রভুর উরুতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ডাক্তার সত্যচরণদাদাদের পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের মত ছিল না। চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটে।

১৩০৬ সনে শ্রীবন্ধু চন্দ্রপাতে ভাবী অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—

"হা মধু মাধুক ধা ধা ছি বধ বিধান।
বন্ধুপাত অকস্মাৎ যম অগ্রে যান॥
(যম যম যম মা) (হরিপাত ক'রো না)"

"মধু, বালাপাতার গাছ। মাধুর, পাথরচুণির গাছ।" (ত্রিকাল গ্রন্থ)

আজ কবিরাজী ব্যবস্থায় চব্বিশ ঘণ্টা প্রভুকে তোলা নিষেধ। বৈকাল ৩টা ১০এ আমি প্রভুর কাছে গেলে, করুণ-স্বরে বলেন—

"যান, যান! আর ত মইরা গেছি!"

বেদানার রস খাইতে দিলে, মুখে লইয়া কুলি করিয়া সবটুকু ফেলিয়া দিয়া বালিশ ভিজান। আমি অন্ধভক্ত কানাইকে প্রভুর কাছে আনিলে, প্রভু বাম চরণ উঁচু করেন, ভক্তকে স্পর্শ করিতে দেন।

রাত্রি ১০টার পর, উরুদেশে বাঁধা স্থান লক্ষ্য করিয়া শিশুপ্রভু করুণ স্বরে বলেন—

"সোনার অঙ্গে তালি পল।" হেমাঙ্গী বৃষভানুনন্দিনী সমন্বিত পঞ্চতত্ত্বময় সোনার শুদ্ধ বিগ্রহ শিশুবন্ধু, নিজের শুদ্ধসত্ত্বময় দেহকে 'সোনার অঙ্গ' 'সোনার তনু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রাত্রি দেড়টার পর প্রভুর কাছে যাই, আমার হাত টানিয়া ধীরে ধীরে তাঁর সুকোমল হস্তে আদর করিয়া মোচরাইতে থাকেন, ও উঠাইবার জন্য আবদার জানাইয়া আস্তে আস্তে থাপরাইতে থাকেন। আজ আর উঠানো হয় নাই, রাত্রে আমি ও কালোশ্যামদা কতকক্ষণ থাকি; পরে সাড়ে তিনটায় রাখাল পাহারায় ছিলেন।

২৮শে ভাদ্র (১৩২৮), ভোরে শিশুবন্ধুর অলস-নিদ্রাভাব, মাঝে মাঝে হাত ছড়াইয়া দিতে থাকেন, বুলায়ে দেই। পদ্মআঁখি অলস, মুদ্রিত। সকাল ৮টা ৫'এ কাছে, টুলে বসে আছি, তখন সুর করিয়া বন্ধুসুন্দর করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"আমার ওযে সোনার তনু বাঘে নিয়ে গেল! আমার ওযে সোনার তনু বাঘে নিয়ে গেল।"

ইহা জগদ্‌রক্ষার্থ মহাপ্রলয় করালে প্রভুর আত্মোৎসর্গের বাণী।

একই কথা কয়েকবার বলেন এবং আরও অনেক কথা অস্পষ্টভাবে বলিতে থাকেন। বাঘ এখানে মহাপ্রলয় অর্থে প্রভু প্রয়োগ করিয়াছেন।

বেলা ১১টা ৩৭'এ কবিরাজের বাটনা-বাঁধা খুলিয়া দেওয়া হয়। তীব্র বিষাক্ত বাটনার বিষে প্রভুর উরু ফুলিয়া লাল হয়, অসীম ধৈর্য্যে, নীরবে সহ্য করেন। সর্ব্বদা চিৎভাবে শুইয়া থাকায়, সোনার অঙ্গে, পিঠে লাল লাল দাগ হয়; প্রস্রাব ভালভাবে মুছানোর সুবিধা না থাকায়, ঐ স্থানে লাল-লাল গুটরী হয়।

বেলা ১২টা ২৫'এ চব্বিশপ্রহর মহানাম-যজ্ঞের সমাপ্তিধ্বনি দেওয়া হয়। খাদ্যদ্রব্য আজ নামমাত্র লন। রাত্রে তিনি উঠিতে চাহিলেও তেমন ব্যগ্রতা দেখান নাই। রাত্রি দশটায় হাত ছড়াইয়া দিয়া আমাকে ডাকেন—"এদিকে আয়"। কিছুক্ষণ অঙ্গে হাত বুলাইবার পর চলিয়া যাইতে বলেন; দু'এক মিনিট পরেই আবার ডাকেন—"এ যায়গা আস।"

মাথা কুটিয়াও যে প্রভুর দর্শন পাওয়া যাইত না, সেই প্রভু আজ আমার মত কামকামনামুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন অধম জীবকে কাছে ডাকেন, কখন বা মাথার কাছে মশারিটি তুলিয়া খোঁজ নেন, আছি কি না! কত অসহায় দীনভাব! জীবের জন্য কি অনন্তানন্ত করুণা! কি অপার প্রেম!

২৯শে ভাদ্র। আজ আহার-গ্রহণে প্রভুর অনিচ্ছাভাব দেখা যায়, ঢেকুর তোলেন।

প্রভুর ছাত্রাবস্থায় জিলাস্কুলের প্রাচীন শিক্ষক দক্ষিণা নাগ মহাশয়ের পরম বন্ধুভক্তিমতী পত্নী এই তারিখের একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনার বর্ণনা আমাকে দেন। শিশুবন্ধু প্রায় অচল অবস্থায় আঙ্গিনায় পড়িয়া আছেন, অথচ ঐ দিন সন্ধ্যায় উক্তা দেবীর বাসায় উজ্জ্বল দিগম্বর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রভু বলেন—

"আমি ইংরেজ-মুলুক চল্‌লেম, আমি যে তাদেরই যীশু তাই জানাতে। আর শ্রীক্ষেত্রে চল্লেম, আমি যে তাদেরই জগন্নাথ, তাই জানাতে। মুসলমান রাজ্যে চল্লেম, আমি যে তাদেরই মদিনা-মক্কা, তাই জানাতে। তোমাদের মদনমোহন, তাদের মদিনা-মক্কা, একই কথা।"

"কেউ হরিনাম করে না, তাই আমি ব্রহ্মাণ্ডময় একই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে চল্লেম। এ সময় আমার মৃতবৎ অবস্থা হবে। আমার দেহ সম্পূর্ণ সাতদিন রেখে অবিরাম হরিনাম করতে বলবে।..."

কথা বলা শেষ হইতেই আর প্রভুকে দেখা গেল না।

৩০শে ভাদ্র (১৩২৮), মাঝে মাঝে প্রভুর ঢেকুর উঠিতে থাকে। মনে হইল বুকে শ্লেষ্মা জমিয়াছে। মাঝে মাঝে শিশুর মত "নেও, নেও" বলেন ও বামহাত বাড়াইয়া দেন। হাতের কাছে যাহাকে পান, তাহাকেই ধরেন। কাপড়ের আঁচল পাইলে তাহাও ধরেন।

রাত্রে প্রভু ভোগ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, হাত পা জোর করিয়া ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়া একজন সেবক একবার বলপূর্ব্বক কিছু খাওয়াইয়া দেন। না খাইলে দুর্ব্বল হইবেন মনে করিয়া ঐভাবে খাওয়ান হয়। ইহার কিছু সময় পর হইতে আঠা আঠা তরল বমি হইতে থাকে। সমস্ত রাত্রেই সময় সময় একটু একটু বমি হয়। মনে হইতেছিল, প্রভু ঢেকুরে কষ্ট পাইতেছেন।

বন্ধু শিশুভাবে বাহিরে প্রকাশ হইবার পর প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় মাঝে মাঝে শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া থাকিতেন, সেবাকার্য্যাদিও করিতেন। ঐ অবস্থাতেও প্রভু তাঁহাকে চিনিয়া "প্রতাপ", 'প্রতাপভূয়্যা' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন ভৌমিক মহাশয় বলিয়াছিলেন—"তোরা প্রভুর সেবার কি জানিস্? যারা ছোট ছেলে মেয়েকে নিজহাতে লালনপালন করে নাই, তারা গোপাল-গোবিন্দ-প্রভুর কি সেবা করবে?" বস্তুতঃ আমাদের মত অযোগ্য সেবকদের হাতে পড়িয়া প্রভুর "সোনার অঙ্গ ভালি পল," "সোনার তনু বাঘে নিয়ে গেল!"

৩১শে ভাদ্র। প্রভুর ঢেকুর ও বমির ভাব মাঝে মাঝে দেখা দেয়। ঔষধ বা ডাবজল দিলে প্রভু মুখে লইয়া ফেলিয়া দেন। কিছুই গলাধঃকরণ করেন না। দুর্ব্বল ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি প্রায়ই "নেও নেও" বলিতে থাকেন। নিদ্রা একরূপ নাই। মাঝে মাঝে প্রভুকে উঠাইয়া বসান হয়।

বন্ধুলীলাকার্য যোগমায়া-সমাবৃত

আমাদের স্থূল নয়নে শিশুপ্রভুকে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে, ভ্রমণে, ব্যাধিতে বা নিদ্রায় যে ভাবে দেখি, মাত্র ঐটুকু কার্য্য নিয়া মহাউদ্ধারণ প্রভু থাকেন না। তিনি তৎ-তৎ সময়ে তাঁর অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে স্বসৃষ্ট দিব্যদেহে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানে মহাউদ্ধারণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। হরিপুরুষ শুয়ে আছেন, সেবক সীতানাথের এই কথার উত্তরে শয্যায় শয়ান হরিপুরুষ বন্ধু বলেন,

"হরিপুরুষ কি শুয়ে থাকেন? সব জায়গায় হেঁটে বেড়ায়। এখনও হাঁটছে।" এই প্রকার, শিশুপ্রভু নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন, দেখে শুনে, আমরা যদি মনে করি প্রভু ঘুমুচ্ছেন, সেটাও যোগমায়ার প্রভাবে আমাদের ভ্রান্তি। ঐ সম্পর্কে প্রভুবন্ধুর বাণী আছে,

"সব দেবদেবী নিদ্রিত। কেবল জেগে আছি আমি। আমি চিরকাল জেগে থাকি। আমি ঘুমালে পলকে প্রলয় হ'য়ে যায়।"

সুতরাং আমাদের চোখেতে শিশুপ্রভুর নিদ্রা যোগমায়ার আবরণ মাত্র। প্রভুর শয়ন, ভ্রমণ, ভক্ত হস্ত হইতে নাচে পতন, ত্রয়োদশ দশা আদি, সমস্তই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক।

১৩২৮, ২৯শে ভাদ্র, আমাদের চোখেতে অঙ্গন মন্দিরে শয্যাশায়ী বন্ধুপ্রভু সেদিন দিব্যদেহে ভক্তা নাগভার্যার বাসায় গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহাউদ্ধারণ কার্যে নানাস্থানে তাঁর যাওয়ার বিবৃতি

দেন। বন্ধু না জানালে, তাঁর লীলার, গতিবিধির গূঢ় রহস্য কে জানিতে পারে?

১৩২৮ সনে, ২৮শে ভাদ্র প্রভুর কাছে টুলে বসিয়া থাকিয়া স্বকর্ণে তাঁর করুণ উক্তি শুনিয়াছিলাম.

"আমারও যে সোনার তনু বাঘে নিয়ে গেল!"

কই, বাঘ ত চোখে দেখিলাম না! ঐ বাঘ, মহাপ্রলয়। ১৩০৬ সনে প্রভু চন্দ্রপাতে লিখিয়াছেন, "মহামৃত্যু। মহাপ্রলয়ন।" ঐ মহামৃত্যুও মহাদশা বিশেষ। হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানামেই মহাপ্রলয় দমন, মহামৃত্যুর অবসান ও প্রভুবন্ধুর মহাপ্রকাশ। মহাপ্রলয়দমন, মহা-উদ্ধারণ কার্যে প্রভুবন্ধু হরি আমাদের একেবারে ছাড়িয়া যান নাই ও যাবেনও না। তিনি আছেন। তবে তাঁর মহাপ্রকাশের প্রতীক্ষায় মহানাম করিতে বলিয়াছেন, "হরি হরি হরি কও, মহানাম মহানাম।"

"হায় হায় যায় যায় প্রলয় পায়।
তায় থায় দায় ধায় বন্ধু নাই যায়॥
হরি হরি হরি কও, মহানাম মহানাম"—চন্দ্রপাত

প্রভুবন্ধু স্বয়ং হরিনাম মহানাম স্বরূপ। তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত লিপিতে তাঁর স্বরূপ পরিচয় দেখিয়াছি—

"আমি হরিনাম মহানাম নাম মাত্র।"

প্রভু বলেছেন, "চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্মসংস্থাপন করব, তবে জানবি জগদ্বন্ধুর লীলা শেষ হবে।"

জয় জগদ্বন্ধু হরি। নিত্যসেবক।

মহাপ্রলয় গ্রহণে মহামৃত্যুদশাশ্রয়

১৩২৮ সনে আশ্বিনের প্রথম দিন ভাদ্রপূর্ণিমা শনিবার, (ইং ১৭।৯।১৯২১), শ্রীমন্দিরের বারান্দায় কীর্ত্তন চলিতেছে। আমি পূর্ব্বাহ্নে কীর্ত্তনে ছিলাম। মহানাম কীর্ত্তন হইতেছিল। একবার ১৩০৬ সনে লিখিত প্রভুর স্ব-রচিত রহস্যময় গ্রন্থ চন্দ্রপাত কীর্ত্তন সম্পূর্ণ গাহিলাম। ঐ গ্রন্থে প্রভু নিজের লীলাকথা বহুদিন পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়াছেন। হরিনাম বিরহেই হরিনাম-স্বরূপ প্রভুবন্ধুর মহামৃত্যু-দশা, ইহা ত্রয়োদশ দশারই অঙ্গবিশেষ। গ্রন্থের শেষদিকে আছে—"মহামৃত্যু, মহাপ্রলয়ন, ইতি"। গ্রন্থের সর্ব্বশেষ শ্লোকাংশ—

"হরিনাম হে বিরাম, পরিণাম রে অনাম,
বন্ধুবধ দ্বিতীয় ঘাতন॥
(ছি ছি ছি ছি) (দয়া নাই দয়া নাই)"

এই পদ গাহিতে গাহিতে "বন্ধুবধ" কথাটা মনে তোলপাড় করিতেছিল। "হরিনাম হে বিরাম"—সত্যসত্যই হরিনাম বিরামের জন্য, হরিনাম বিরহের জন্যও আমাদের হরিনাম বিমুখতার জন্যই বন্ধুবধ। ঐ সময় দেখি, কেহ কীর্ত্তনে যোগ দেয় না। আমার সঙ্গে মাত্র আর একজন আছেন। তখন সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সমাপ্তিধ্বনি দিতে দিতে আবার মহানাম আরম্ভ করি। কয়েকটি ভক্তপ্রাণ আসিয়া যোগ দিলেন। আমি কীর্ত্তন ছাড়িয়া মন্দিরের মধ্যে গেলাম।

ডাক্তার সত্যচরণ ও সহকারী নরেশচন্দ্র আসিয়াছেন। মন্দিরে অন্য সেবক নাই। অনেকে ভোগ-ঘরের নিকট কার্য্যান্তরে ব্যস্ত। প্রভু জলবৎ একটু বমি করেন। আমি মুছায়ে দেই। আর কেহ প্রভুর কাছে নাই বলিয়া, সত্যবাবু একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন। তখন মন্দিরের পূর্ব্বদিকের সিঁড়ির কাছে যাইয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলি—"এ দিকে যে শেষ হয়ে গেল!" আমার ডাক শুনিয়া অনেকে আসিলেন।

প্রভুর শ্রীমুখে একটু ফেনা মতো বাহির হইল। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে প্রভুবন্ধু বামচরণ ও বামহস্ত বক্ষের দিকে একবার টানাইলেন। তারপর সবঅঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব [illegible] হইল। নিশ্চল হিমাচলের মত পড়িয়া থাকিলেন।

আমি অগ্রে করতাল লইয়া বারান্দায় মৃদঙ্গসহ কীর্ত্তনকারি-গণকে মন্দির-মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া সকলে প্রভুকে ঘিরিয়া "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ" গাহিতে লাগিলাম। ক্রমে বহু [illegible]। বহু ভক্ত তখন বারান্দায় [illegible] করতালে তুমুল মহাকীর্ত্তন করিতে থাকেন। মহাদশাপ্রাপ্ত প্রভু হরিনাম [illegible] "হরিনাম কীর্ত্তন"—[illegible]। [illegible] প্রভু [illegible] ও মহাকীর্ত্তন দুই মিলিয়া আকাশে বাতাসে যেন [illegible] উঠিতে থাকে। বারান্দা ঘিরিয়া অহর্নিশ কীর্ত্তন চলে। [illegible] কবি-রাজজী আসেন।

প্রভুকে ঐ অবস্থায় দর্শন-স্পর্শনের জন্য গ্রাম ও সহর হইতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা, শিশুকোলে কুলবধূ পর্য্যন্ত উধাও হইয়া ছুটিয়া আসে। পত্র, টেলিগ্রাম পাইয়া দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে ভক্তগণ আসিতে থাকেন। ২রা আশ্বিন ঢাকা হইতে মহেন্দ্রজী আদি বন্ধুপ্রিয়গণ শ্রীঅঙ্গনে আসেন।

৩রা আশ্বিন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাসন্তীদেবী, পত্রিকা সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, তারিণী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আসেন। জনতার আধিক্যে চারিদিকের বেড়া খুলিয়া ফেলা হয়। ধূপ ধুনা, লবাং, গুগ্‌গুল, কর্পূর, চন্দনকাঠ ইত্যাদি মন্দিরে ভূরি ভূরি জ্বালান হয়। গোলাপ জল, অগুরু, অটো, আতর, ওডিকলন, ল্যাভেণ্ডার ইত্যাদি রাশি রাশি ছড়ান হয়।

৪ঠা আশ্বিন। নীলপরদায় প্রভুর শয্যা ঘেরা হয়।

৫ই আশ্বিন শ্রীমুখ হইতে একটি অস্ফুট শব্দ বাহির হয় ও সর্ব্বদেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়।

আজ কাশী হইতে কুঞ্জদাদা মহানাম সম্প্রদায়সহ আঙ্গিনায় আসেন।

৬ই আশ্বিন কলিকাতা রামবাগানের ডোমভক্তবৃন্দের দল আসেন। চার পাঁচটি কীর্ত্তনের দল ও অসংখ্য ভক্ত শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত হন। কেবল কীর্ত্তন ও ক্রন্দনরোল শোনা যায়। কেহ কেহ শ্রীঅঙ্গে ও শ্রীচরণে চন্দন-তুলসী অর্পণ করেন।

৭ই আশ্বিন দেবীমা আসেন। "রাজাসাধু" নামক সিদ্ধ যোগী মলিন বিমর্ষ-মুখে দক্ষিণ দিকের সিঁড়িতে আসিয়া বসেন।

ইনি একবৎসর পূর্ব্বে যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আগামী ১লা আশ্বিন, প্রভু তাঁহার নিজদেহে মহাপ্রলয়ের সংঘাত গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বোধ হয় এ দেহে রাখা যাইবে না।

ইতিমধ্যে অরুণাচলের দয়ানন্দ মহারাজ আঙ্গিনায় এক টেলিগ্রাম করেন; তাহার মর্ম্ম এইরূপ—জগদ্বাসীর কল্যাণার্থ যে সাধনা প্রয়োজন, প্রভু তাহা করিয়া গিয়াছেন।

হরিকথা ও চন্দ্রপাতে এই প্রলয় সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে এ' সম্বন্ধে আর দু'চারটি বাণী উদ্ধৃত করিলাম।

"দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বে যে সন্ধ্যার পর গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হইত, যাহা ইংরাজেরা এ' পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই, উহা কি জানিস্? উহা বরিষার গান বা কারণবারি গর্জ্জন।" "১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে, ২২শে নভেম্বর তারিখে পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া যে মহাপ্রলয় স্থির করিয়াছিলেন, উহা সত্য। ঐ দিবস কারণ-সমুদ্রের জল মৃত্তিকার দশহাত নিম্নে গর্জ্জন করিয়া মহাপ্রলয় করিতেছিল, আমিই উহা হইতে দেই নাই। ঐ তারিখ হইতেই বরিষার গান লোপ পাইয়াছে।"

"কলি শেষ হইয়াছে, সত্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে।"

"পাপ নাই, কেবল কুহক আছে। তাহাও শীঘ্র বিদূরিত হইবে। দৃশ্যমান পাপ প্রকৃত পাপ নহে, ধাতুগাত্রে আঘাত জনিত "ঝুন" শব্দ মাত্র। ওরে, তোরা যে মহাপাপী মহাপাপী

বলে চীৎকার করিস্, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তোরা ত বালুকণা হ'তেও অতি ক্ষুদ্র, তোদের হৃদয়ে কতটুকু পাপ থাকতে পারে? মহাপাপী মহাপাপী ভেবে অযথা আত্মমলিনতা সাধন না ক'রে, সর্ব্বদা হরিনাম কর। আমার সান্নিধ্যে এ'লে কি কারো পাপ-তাপ থাকতে পারে?"

"একমাত্র হরিনামই রক্ষার উপায়, তোরা হরিনাম ক'রে সৃষ্টি রক্ষা কর।" "এর পর আমার কাজ বুঝতে পারবি।"

"আমাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুর মধ্যে পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াতে হবে। আমি পুরুষ। আমি না গেলে, কেউ কিছু করতে পারবে না। তাই আমাকে যেতে হবে। তোরা ত আমায় ঘরে রাখতে পারবি না!"

১১ই আশ্বিন (১৩১৮), মন্দিরমধ্যে প্রভুর শ্রীদেহ চৌকীতে রাখিয়া, প্রভুর চৌকীর নীচের মাটী সিমেন্ট করা হয় এবং চৌকীর চারিপাশে কাঠের বেড়া দিয়া, উপরে কাঠের ছাদ করিয়া মৃত্তিকাদির প্রলেপ-লেপিয়া দেওয়া হয়।

১লা আশ্বিন হইতে আরব্ধ মহানাম কীর্ত্তন, ১১ই আশ্বিন, পর্য্যন্ত, দ্বাদশ দিন দিবারাত্র অবিরাম মহানাদে চলিতে থাকে।

১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার হওয়ায়, কুঞ্জদাসজীর মতানুসারে ঐ কাঠের প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিয়া চৌকীসহ প্রভুর দেহ পার্শে, পশ্চিম দিকে সরাইয়া রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনস্থানে প্রায় চারিহাত গভীর ও চারিদিকে চারিহাত প্রশস্ত বিবর খনন করা হয় এবং ঐ বিবরটি কাষ্ঠপ্রকোষ্ঠে পরিণত করা হয়। নীচেও কাঠের পাটাতন করা

হয়। অতঃপর কাষ্ঠসিংহাসনে প্রভুর শ্রীদেহ দক্ষিণমুখো করিয়া বসাইয়া, স্নানাভিষেক ও পূজা অর্চনাদি ভোগ নিবেদনাদির পর, ঐরূপ উপবিষ্ট অবস্থায় ঐ বিবরকক্ষে রক্ষা করা হয় এবং উপরে কাঠের ছাদ দিয়া, দোলভিটার আকারে তিন স্তরে মৃত্তিকাস্তূপ লেপিয়া দেওয়া হয়। ঐদিন আঙ্গিনায় মহোৎসব হয়, সকলে প্রসাদ পান।

১লা আশ্বিন হইতে দ্বাদশ দিন অবিরামভাবে যে মহানাম-কীর্তন-যজ্ঞ চলিতেছিলেন, তাহা ১৩ই আশ্বিন ত্রয়োদশ দিনে মহা-সমাধির পর বন্ধ হয়। তবে সাময়িক কীর্তন ও সেবা-পূজা আরতি প্রত্যহই চলিতে থাকে। আজ অঙ্গনে মহোৎসবে সর্ব সাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীঅঙ্গনে মহানাম যজ্ঞ ও মহানাম

১৩২৮ সন, ২রা কার্তিক শ্রীকৃষ্ণদাসজী আদি বন্ধুপ্রিয়গণদ্বারা সংগঠিত মহানাম-সম্প্রদায়, শ্রীযোগেন্দ্র কবিরাজের আন্তর উৎসাহ পরামর্শ ও সহায়তায়, শ্রীমহেন্দ্রজীর নেতৃত্বে শ্রীঅঙ্গনে মন্দিরবারান্দায় পুনরায় দিনরাত্র অবিরামভাবে জগদ্বন্ধু মহানাম-কীর্তন যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

১৩২৮, ২রা কার্তিক প্রথমে কুঞ্জদাদা ও মহেনদাদা করতাল বাজাইয়া 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ' গাহিয়া মহানাম যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ক্রমে অন্য সেবকগণ আসিয়া পৌঁছিলে, খোল

করতালে তুমুলভাবে মহাকীর্ত্তন চলিতে থাকে। ফরিদপুর অঙ্গনে পঞ্চাশ বৎসর কাল অবিরামভাবে এই মহাকীর্ত্তন-যজ্ঞ চলে। হিংস্র পাকসৈন্যের আক্রমণের পর কলিকাতা মহাউদ্ধারণ মঠে মহানাম-যজ্ঞ প্রকাশ হল।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, (১৩৬৬), ২৫শে মে, (১৯৫৯), তারিখে শ্রীসম্পুটে প্রভুবন্ধুসহ মহানাম-যজ্ঞ পূর্ব্বদিকের নূতন মন্দিরে যান। এদিকে শ্রীমন্ মহানামব্রত-প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুপ্রিয়-গণের একান্ত আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় প্রভুর মহামৌনাবস্থায় স্থিতির আসন-স্থলে বহু ব্যয়সাধ্য সু-উচ্চ ও সুদৃঢ় পাকা শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতে থাকেন। ১০ই বৈশাখ ১৩৬৮, ইং ১৯৬১, ২৩শে এপ্রিল রবিবার, শেষ রাত্রে নবনির্ম্মিত পুরাতন আসন স্থলের শ্রীমন্দিরে শ্রীসম্পূটস্থ বন্ধুহরি মহানাম-যজ্ঞ সহ পুনরাগমন করেন!

মহাকীর্ত্তন-যজ্ঞে প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত চন্দ্রপাতোক্ত মহানাম মহাকীর্ত্তন—

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন।
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)"

—খোল করতালে, নানা সুর-তাল লয়ে, সময় সময় লুণ্ঠন, অবলুণ্ঠন, নর্ত্তন, প্রদক্ষিণ, গর্জ্জন, ক্রন্দন, স্মরণ ও মহাউদ্ধারণ ধ্বনিসহ চলিতে থাকে।

১৩৭৮ সনে, ৭ই বৈশাখ, একাদশী দিনে, গোধূলিতে হিংস্র, পশুধম পাকচমূ ফরিদপুর শহরে প্রবেশ করিয়া প্রভুর-আঙ্গিনায়

মহানাম-যজ্ঞে কীর্তনরত কীর্তনব্রত, নিদানবন্ধু, আশী বছরের বৃদ্ধ-অন্ধ কানাইবন্ধু, চিরবন্ধু, গৌরবন্ধু, ক্ষিতিবন্ধু, বন্ধুদাস ও রবিবন্ধু, এই আটজন ব্রহ্মচারী ভক্তকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। ঐ সঙ্গে অঙ্গনে আগন্তুক এক অতিথি ভক্তও গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। দুর্বৃত্তরা গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া শ্রীমন্দির ও বিগ্রহাদির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে; মৌনের পূর্ব্বে বন্ধুসুন্দর আঙ্গিনায় তাঁর কয়েকজন ভক্তকে ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিয়াছিলেন,—

"দেখ্, সময়ে এখন সব লোক আমার কাছে আসবে, তোরা দেখে অবাক্ হয়ে যাবি।...তারা ভুবনমঙ্গল হরিনামের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে।" "দেখ্‌বি, তারা মহাউদ্ধারণের জন্য কামান বন্দুকের মুখে বুক পেতে দেবে।"

আঙ্গিনায় জগদ্বন্ধু হরিনাম মহাযজ্ঞে, পূর্বে বর্ণিত চিরবন্ধু, কীর্তনব্রত আদি ভক্তবৃন্দ পাক আক্রমণে জীবন উৎসর্গ করেন।

ঐ পাকদস্যুরা কয়েকদিনের মধ্যে মন্দিরে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটায় ও নানা ক্ষতিসাধন করে। ঐ দানবদের প্রশ্রয়ে বিহারী ও স্থানীয় দুষ্ট মুসলমানগণ আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় কয়েকদিন ধরিয়া লুণ্ঠনকার্য চালায়। বহুসহস্র টাকার খাট, পালঙ্ক, আলমারী, অমূল্য গ্রন্থরাজি, জ্বালানি, চাল, ডাল, তেল, মসলা, ঘি, দরজা, জানালা, ট্রাঙ্ক, বাক্স ইত্যাদি, হাজার হাজার টাকার গাড়ী, টিন, নৌকা, প্রচুর প্রসাদী দ্রব্যাদি, চিত্রপট, ফটো ইত্যাদি লুট, কতক

নষ্ট, কতক দগ্ধ করে। কয়েক লক্ষ টাকার ভক্তাবাস, আসবাবপত্র ও সম্পত্তির বিলয় ঘটে।

হিংস্র পাকসৈন্যগণের ভাবী অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া ১৩৭৮, ৬ই বৈশাখ শ্রীমন্দিরস্থিত অষ্টধাতুনির্মিত বিগ্রহের মধ্য হইতে প্রভুর চিন্ময় শ্রীঅস্থিদেহ বিমুক্ত করিয়া অমরবন্ধু প্রমুখ কতিপয় বন্ধুভক্ত তাঁহাকে অন্যত্র সরাইয়া রাখেন এবং ক্রমে ১৩৭৮, ১১ই জ্যৈষ্ঠ বন্ধুকমল ও বন্ধুপ্রসাদ কলিকাতা মহা উদ্ধারণ মঠে ঐ চিন্ময় শ্রীদেহ আনিয়া রক্ষা করেন। ১৩৭৮, ৭ই বৈশাখ পাক-আক্রমণে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আরব্ধ পঞ্চাশ বৎসরের জগদ্বন্ধু মহানাম যজ্ঞ বাহ্যতঃ দৃশ্যতঃ স্তিমিত থাকিলেও, উভয়-বঙ্গে বন্ধু ভক্তদের ও হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম জপযজ্ঞে ও ভারতে ডাহাপাড়া জগদ্বন্ধুধামে এবং অন্যান্য স্থানে ও বন্ধুআশ্রমে অষ্টপ্রহর আদি মহানাম কীর্ত্তনে জগদ্বন্ধু হরিনাম যজ্ঞাগ্নি অনির্বাপিতই ছিল। ঐ বৎসরই ১৩৭৮, ২রা কার্ত্তিক, উষাকালে কলিকাতা মহা উদ্ধারণ মঠে

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন॥
প্রভু প্রভু প্রভু হে, অনন্তানন্তময়"

এই মহানাম মহাকীর্ত্তন যজ্ঞের দৃশ্যতঃ প্রকাশ ঘটে। ঐ দিন ঐ কীর্ত্তনযজ্ঞে উপস্থিত থাকার ভাগ্য পাই।

উৎকট হরিহিংসা রূপ মহাপাপের ফলে ভারত-বাংলার প্রধান সেনানীর হাতে দুষ্ট পাকচমূ আত্মসমর্পণ করে, ১৯৭১, ১৬ই

ডিসেম্বর। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হইবার পর ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর মন্দির, সংস্কার যজ্ঞ ও হরিনাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা শোধন করিয়া সেখানে প্রভুবন্ধুর শ্রীমূর্তি বসান হয়। তখন হইতে আসনে প্রভুর দৈনিক সেবাপূজা, কীর্ত্তন, পাঠ ও বার্ষিক জন্মোৎসব, মাঘী উৎসব আদিতে মহাকীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। প্রভুর লিখিত চন্দ্রপাতের পূর্বোক্ত হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম কীর্ত্তন ডাহাপাড়া জগদ্বন্ধু ধামে, প্রতি আঙ্গিনায়, প্রভুবন্ধুর প্রত্যেক মঠে ও আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাংলা ১৩৮৫, ২রা কার্তিক কলিকাতা মঠ হইতে ভক্তমাধ্যমে প্রভুর চিন্ময় দেহ স্থানান্তরিত ও ক্রমে ফরিদপুর অঙ্গনে উপনীত হন এবং তথায় ২৬শে মাঘ, মাঘী ত্রয়োদশীতে মহানাম যজ্ঞের পুনঃ প্রকাশ হন, কলিকাতা মঠেও মহানাম যজ্ঞ যথাযথ চলিতে থাকে।

চন্দ্রপাতে লিখিত ঐ মহাকীর্ত্তনের মহানাম তত্ত্ব জানিতে অনেক ভক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসার তৃপ্তি বিধানের জন্য উক্ত মহানাম তত্ত্ব এখানে যথারীতি কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিলাম :

হরি

নিতাই গৌর গোপীরাধাশ্যাম-মিলিত স্বরূপ, পাপ-তাপ-হরণকারী, সর্ব্বচিত্তহারী, সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনিই 'হরি'। বন্ধুবাণী, 'আমি, হরি, পুরুষ একই', 'আমি হরিনাম মহানাম মাত্র', 'হরিনাম

প্রভু জগদ্বন্ধু।' 'গুরু গৌরাঙ্গ গোপী রাধাশ্যাম, সব মিলিয়া এক হরিনাম।' 'স্বাদতে হরিঃ'—শ্রুতি।

অক্ষয় সরোবর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের মত সত্ত্বনিধি অদ্বিতীয় মহাবতারী হরি হইতে অসংখ্য অংশরূপী ভগবৎ-অবতার-গণের উৎপত্তি।

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥" ভাঃ ১।৩।২৬

পুরুষ

বন্ধুবাণী—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পুরুষ আমি, আর সব প্রকৃতি। দ্বিতীয় পুরুষ নাই।" "আমি কৃষ্ণ, গৌর।" "কৃষ্ণই ত একমাত্র পুরুষ, আর সব প্রকৃতি—ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত।' সর্ব্ব হৃদয়পুরে যিনি শয়ন করিয়া থাকেন, তিনিই পুরুষ। 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।" 'ত্বমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।' —শ্রুতি।

জগদ্বন্ধু

জগতের চির নিত্য বন্ধু সেই জগন্নাথ জগদ্বন্ধু প্রেমের বন্ধনে জগজ্জীবকে বাঁধিতে জগদ্বন্ধু নাম ধরিয়া প্রকট হইয়াছেন। 'স নো-বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।' শ্রুতি। ভাগবত দর্শনে গোপীবাণী, 'প্রেষ্ঠো-

ভবাংস্তমনুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা।' 'বন্ধুগুরুরহং সখে।' ভাঃ ১১।১৯
"হরিপুরুষের প্রকাশ নাম, জগদ্বন্ধু।" বন্ধুবাণী।

মহাউদ্ধারণ

তিনি জগতের কৈতব কলুষাদি আবর্জ্জনা দূরকারী, Sweeper (সুইপার, ঝাড়ুদার)। প্রলয় দমন, ও জগৎ শোধন করিয়া পবিত্রতা আনয়নকারী,—মহাত্রাতা, উদ্ধারকর্ত্তা,—অণু, পরমাণুগণকে পর্যন্ত স্বরূপ-আস্বাদন কারয়িতা, তাই তিনি "মহাউদ্ধারণ"। শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্ধারণ। রাধাভাবময় শ্রীকৃষ্ণই গৌর। রাধাভাবময় সযূথ চন্দ্রাবলী নিতাই। নিতাই-গৌর-মিলিতাঙ্গ বন্ধুসুন্দরই—মহাউদ্ধারণ। "প্রলয়-মহা-প্রলয় দমন, মহাউদ্ধারণ, সবে হরিনাম প্রেমদান, আমার কার্য জানবি।" বন্ধুবাণী।

চারিহস্ত

ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল তনু। ন্যগ্রোধে, ব্যাস-পরিমাণে অর্থাৎ উভয় দিকে উভয় হস্তে বিস্তার করিলে একদিকের করাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর দিকের করাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত "চারিহস্ত" পরিমাণ বিস্তার। আবার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত চারিহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ পুরুষ।

"দৈর্ঘ্য বিস্তারে তিহঁ আপনার হাত।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত।" (চৈঃ চঃ) আদি, ৩য়।

"চারিহস্ত পুরুষ"—শ্রীহস্তলিখিত আত্মপরিচয়।

চন্দ্রপুত্র

প্রভুর বাণী, "চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সঙ্গে বর্ত্তমান সাড়ে তিন মণ দেহের ওজন মিশায়ে অশোক পুষ্পের কুঁড়ির অগ্রভাগের আভা লয়ে এসেছি। চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় জন্মেছি, তাই চন্দ্রপুত্র।" আবার চন্দ্রপদে মন, ভক্তিতে ভক্তের মনে তাঁর জন্ম বা প্রকাশ তাই চন্দ্রপুত্র। আরও গভীর দৃষ্টিতে চন্দ্রপদে পাই, সার্ধ চতুর্বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট গায়ত্রীমন্ত্র। সেই মহামন্ত্রের, 'সেই অক্ষর চন্দ্রচয়ের', নির্য্যাস হইতে তাঁহার উৎপত্তি, তাই চন্দ্রপুত্র। চন্দ্ ধাতু আনন্দ বা হ্লাদনার্থ অতএব চন্দ্রপুত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' 'আনন্দেন জাতানি জীবন্তি' 'অস্যান্ত-রাত্মানন্দময় স্তেনৈষ পূর্ণঃ' —শ্রুতি।

হা কীটপতন

হা = পাপহরণ, আ = পর্য্যন্ত, কীট = স্রষ্টা, কীট = জীব, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মায়ামুগ্ধ জীব। পতন = পতঙ্গ। হা + আ কীটপতন,—স্রষ্টা হইতে সৃষ্ট-কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলের পাপহরণকারী যিনি, তিনিই "হা কীটপতন।" আবার "কীট স্রষ্টা, কীটের দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য" (ত্রিকাল) "কীট ব্রহ্মাণ্ড নাশকারী কীট সৃষ্টিধ্বংসকারী।" স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্ট জীব কীটের উদ্ধারে নিজে অসমর্থ হইয়া—উদ্ধারণ-প্রয়াসী হইয়া হরিপুরুষের অভয় শরণ করিলে, করুণাকর্তারী প্রভু

কীটের দুর্দ্দশায় খেদ প্রকাশ করিয়া "হা" বলিয়াছেন। কীটের উদ্ধারণের জন্য কীটের কীটত্ব পতন বা নাশনের জন্য গোলোক হইতে, তাঁহার চিরসুখময় নিত্যবৃন্দাবন হইতে চিরদুঃখময় ধরাধামে পতন বা অবতরণ হইয়াছে। পতন—আগমন প্রতিগমন নিধন। তাই তিনি হা কীটপতন,—জীবপাবন, কলি-কীট কুহকমোক্ষণ।

প্রভু প্রভু প্রভু হে

তিনবার বলিয়া সত্যের দার্ঢ্য জানাইয়া ঘোষণা করিতেছেন,—"তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু সকল প্রভুর প্রভু, মহাপ্রভু। তাঁহার উপরে উপাস্য কেহ দ্বিতীয় প্রভু নাই। তাই "প্রভু প্রভু প্রভু হে।" সকলকে এই বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ঘোষণায় ও সম্বোধনে "হে" বলিতেছেন।

* শ্রুতি :—"স এক ঈশঃ পরিপূর্ণশক্তি র্বলিহরা ইতরে স্যুঃ।"

'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।

যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।' চৈঃ চঃ

অনন্তানন্তময়

"অনন্তানন্ত নামকে মহানাম কহে"

"অনন্ত বিগ্রহে আমার স্থিতি। তাই অনন্তানন্তময় + গুরু + প্রভু + বন্ধু + জগৎ-বন্ধু"—বন্ধুবাণী।

অন্ত নাই বলিয়া অনন্তদেবের কেহ অন্ত পায় না। সেই অনন্ত ও যাঁহার অন্ত পান না, তিনি সেই অনন্তের অনন্ত। নামের নাম মহানাম। ময় = সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ মহানামরূপে ব্যাপ্ত ও বিরাজিত, এমন যে অনন্তানন্ত মহানাম, তিনি সেই "অনন্তানন্তময়"—মহানাম-ময় প্রভু।

এই মহানাম মহাকীর্ত্তন-মন্ত্র সর্ব্বতোমুখ। যার দিকে যে-মুখ ফিরাইয়া মন্ত্র যেরূপ কৃপাশক্তি প্রকাশ করেন, তিনি সেইরূপ আস্বাদন করেন। আমাকে দিয়া যে একবিন্দু আস্বাদন করাইলেন, তাহাই লিখিত হইল। ভক্তগণ প্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া নিজ নিজ ধ্যানে অনুভব করিবেন।

মহাউদ্ধারণ মঠে অবিরাম ও ডাহাপাড়া ধামে শ্রীঅঙ্গনাদি বন্ধুধামে প্রত্যহই মহাকীর্ত্তন হইয়া থাকে। এই অবিরাম অনাহত মহানাম-নাদ-ধ্বনিই শূন্যে বিশ্বকল্যাণ মহাউদ্ধারণ তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিয়া মহাপ্রলয় হইতে জগতের সৃষ্টি, কৃষ্টি রক্ষা করিতেছে ও শান্তিময় সত্যযুগের দীর্ঘকাল স্থিতির সুদৃঢ় ব্যবস্থা করিতেছে। এই মহাকীর্ত্তনে ভক্তগণ প্রভুর প্রকাশের প্রতীক্ষায় আছেন।

প্রভুর শ্রীগ্রন্থ ও লিপি

"প্রভুর গ্রন্থ উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ।"

শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থ শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীহস্তে ১৩০৬ সনে পৌষমাসে সমাপ্ত করেন। ১৩০৭ সনে রমেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে উহা প্রথমে ঢাকাতে মুদ্রিত হয়। প্রায় সমসময়ে "চন্দ্রপাত" ও সংক্ষিপ্ত সূত্রবাণী "ত্রিকালগ্রন্থ" ফরিদপুর হিতৈষী প্রেসে শ্রীগোপীকৃষ্ণজীর মাধ্যমে ছাপান হয়। অন্যান্য নামসংকীর্ত্তনাদি ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রথমে ছাপা হইত। ১৩০৭ সন, শ্রাবণে প্রভু "কেলিকদম্বতলে" হইতে আরম্ভ করিয়া "কেরে কাঙালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়" পর্য্যন্ত সাতাশী (৮৭) টি সংকীর্ত্তন পৃথক্ করিয়া "সংকীর্ত্তন" নামকরণ করিয়া ছাপিতে দেন। উপরে প্রভুর নিজ রীতি-অনুসারে মঙ্গলাচরণে শ্রীমতি শব্দ ছিল,—সেজন্য ভক্তগণের মধ্যে ইহা "শ্রীমতি সংকীর্ত্তন" নামে পরিচিত।

'চন্দ্রপাত' রচনা সম্পর্কে দুইটি অদ্ভুত বার্ত্তা শুনা যায়। তন্মধ্যে একটি এইরূপ, ১৩০৭ সনে এক অমাবস্যা রাত্রে শ্রীঅঙ্গনে ঝাউতলায় প্রভুবন্ধুর সহিত হরিদাস মোহন্ত ও কেদার কাকা ছিলেন। প্রভুর আদেশে হরিদাস প্রভুরচিত কীর্ত্তনে শ্রীমতীর দশম দশা গাহিতেছিলেন। বন্ধুহরি শ্রীরাধার বিরহদশা-স্মৃতিতে ও কীটজীবের হরিনাম-বিমুখতার দুঃখে অশ্রু বর্ষণ করিয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন, এমন সময় মূর্ত্তিমতী অকৃতি 'তেরহস্ত দুই অক্ষি এক

নাসিকা,' খলব্যাল মহাসর্পরূপে বন্ধুর মস্তকে দংশন করে। প্রভুর আদেশমত হরিদাসের আনীত কালকূট বিষ প্রভু নিজে গ্রহণ করিয়া 'বিষে বিষক্ষয়' রূপ উহার প্রতিকারও করেন।

প্রভুর আদেশে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুকে আঙ্গিনায় আনা হয় এবং ঐ রাত্রেই প্রভু চন্দ্রপাত রচনা করেন। পরদিন প্রভাতে প্রভুর আদেশে সেবক শ্রীতারকেশ্বর গোপীকৃষ্ণদাসজী উহার প্রতিলিপি লিখিয়া মুখস্থ করিবার জন্য কেদার কাকাকে দেন। সন্ধ্যায় কাকা ও হরিদাসকে লইয়া খোল করতালে 'চন্দ্রপাত' কীর্ত্তন হয়। প্রভু স্বয়ং মৃদঙ্গ বাজান এবং চন্দ্রপাতের—

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)"

অংশটুকু গাহিবার সময় প্রভু স্বয়ং করতাল বাজাইয়া সুমধুর কণ্ঠে আগে আগে কীর্ত্তন করেন।

চন্দ্রপাত রচনা সম্পর্কে আর একটি বিবরণ। সুরেশ বাবু নিম্নলিখিতরূপে পরে প্রকাশ করেন।

১৩০৬ সালে ফরিদপুরে বাদল বিশ্বাসজীর গৃহের নিকট পানের বরাণ্ডে শয়নে প্রভুর দক্ষিণ চরণে এক গোখরা সাপ দংশন করে। প্রভু নীলবর্ণ হইয়া যান। সংবাদ পাইয়া সর্পদংশন চিকিৎসা বিশারদ ভক্ত হরিদাস মোহন্ত আসেন। তিনি বন্ধুহরি স্মরণে প্রতিষেধক তৈল প্রস্তুতের পর উহা মালিশ করিয়া বন্ধুহরিকে সুস্থ করেন।

সুরেশ বাবুর অনুমান, ইহার কয়েকদিন পর চন্দ্রপাত রচনা হয়। প্রভুবন্ধু ১৩০৬ সনে চন্দ্রপাত লিখিয়া, উহা মুদ্রণের ভার সেবক শ্রীগোপীকৃষ্ণকে দেন, এবং অঙ্গনেই প্রভুর মূললিপির প্রতি-লিপি করেন শ্রীগোপীকৃষ্ণজী প্রভুর আদেশে।

অন্যান্য প্রাচীন ভক্তদের বর্ণনায় জানা যায়, অঙ্গনেই সর্প-দংশনের পর প্রভু চন্দ্রপাত রচনা করেন। চন্দ্রপাত মুদ্রণে সুরেশ বাবুর কোনো সংস্রব ছিল না।

প্রভু জীবের পক্ষ হইয়া জীব-শিক্ষার্থ দৈন্যপ্রকাশক "দাস জগদ্বন্ধু" "দুষ্ট বন্ধু" "খল বন্ধু" ইত্যাদি ভণিতা দিয়াছেন। পরে কোন কোন স্থানে "প্রভুবন্ধু" "বন্ধুপ্রভু" "গুরুবন্ধু" ইত্যাদি পরিবর্ত্তিত ভণিতা লিখিয়া বলেন, "আমি ভণিতায় যে সব পদ বসাইয়াছি, উহাই আমার পরিচয়।" "আমার রচনা ভাঙ্গিও না।" "শব্দে সংকর্ষণ শক্তি।" "নিতাই শক্তি বদলালে মহাপরাধ।" "আমি যখন যা বলে দেই তা বদল করো না।'

বস্তুতঃ প্রভুর অপ্রাকৃত রচনা পাঠ, স্মরণ, কীর্তন ও শ্রবণ করিলে ব্রজ-গৌর-বন্ধুলীলা যেন একত্র মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেন। তৎকালে প্রথমে ভক্তবর বিপিন বসু সংকীর্ত্তনের একটি সংস্করণ ও রমেশচন্দ্র আর একটি সংস্করণ ছাপেন।

১৩০৮ সনে প্রভুর কতিপয় "সংকীর্ত্তনাবলী" নামকরণে মুদ্রিত হয়। ঐ গ্রন্থ দেখিয়াছি। প্রভু তখন মৌনী হন নাই। দেখা যায়, ভক্তগণ পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রপাত, হরিকথা প্রভৃতি ছাড়া কোন কোন সংকীর্ত্তন গ্রন্থের নামকরণ নিজেরাই করিয়াছেন।

প্রভু মৌনী হওয়ার পর বন্ধুপ্রিয় "সুবল বটু" "সুবলরাণী" সুরেশচন্দ্র, প্রভু-লিখিত "এস এস নবদ্বীপ রায়," প্রভৃতি প্রভুর অনেকগুলি সংকীর্ত্তন একত্র করিয়া "নামকীর্ত্তন" নাম দিয়া, এবং কয়েকটি ভজনকীর্ত্তন "বিবিধ সঙ্গীত" নামকরণ করিয়া মুদ্রিত করেন। সুরেশচন্দ্র হরিকথা, চন্দ্রপাত গ্রন্থও পুর্ণমুদ্রিত করেন, এবং বন্ধুচরিত "বন্ধুকথা" লিখিয়া প্রকাশ করেন। তৎপূর্বে সর্বপ্রথম রমেশবাবু ক্ষুদ্রায়তন "প্রভু জগদ্বন্ধু" রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী কালে মহানাম-সম্প্রদায়, প্রভুর সংকীর্ত্তন, ভজন-কীর্তনাদি একত্র করিয়া প্রাতঃকালীন, সায়ংকালীন ইত্যাদি ক্রমে অভিনবভাবে সাজাইয়া "সংকীর্ত্তন-পদামৃত" নামে মুদ্রিত করেন। একই ভাবে একই সময়ের কীর্তনযোগ্য সংকীর্তনগুলি এক এক ভাগ করিয়া বিন্যস্ত হওয়ায়, উহা পাঠক ও কীর্তনকারীর পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইয়াছে।

সম্প্রতি প্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত শ্রীহরিকথা-গ্রন্থের শেষার্দ্ধের অবিকল শ্রীহস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ শ্রীহরিকথার রাজ-সংস্করণ মুদ্রণ করিয়া মহানাম-সম্প্রদায় ভক্তগণকে আর একটি অমূল্য সম্পদ্ দান করিয়াছেন। বাংলা ১৩২৫-২৬ সনের মধ্যে বাকচরে প্রাচীন ভক্তদের খাতা হইতে কয়েকটি প্রভু-রচিত কীর্ত্তন সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উহা বহুবৎসর অমুদ্রিতভাবে পড়িয়াছিল। অতঃপর শ্রীমান্ মহানামব্রতের চেষ্টায় "সংকীর্ত্তন-পদামৃতে'র পরিশিষ্টে ঐগুলি মুদ্রিত হইতে দেখিয়া পরম সুখী হইয়াছি।

প্রভু রচনায় "প্রভুবন্ধু" "গুরুবন্ধু" ইত্যাদি ভণিতা এবং

দ্বাদশ নাম ও অন্যান্য আত্মপরিচয়ের লিপি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, তিনি এ'জগতের মায়িক সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না। একমাত্র ভক্তি বাৎসল্যের সম্বন্ধই স্বীকার করিতেন।

তিনি "প্রভু জগদ্বন্ধু" "গুরু জগদ্বন্ধু" "ব্রাহ্মণকান্দার ব্রাহ্মণ' "গুরু জগদ্বন্ধু গোস্বামী" "জগদ্বন্ধু ভট্ট ব্রহ্মচারী" "বন্ধু কাক-চরিত," "ফকির" "জটাহান ফকির" ও ইত্যাদি নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

রচনা ও পত্রলিপির শিরোদেশে বেশীর ভাগ "শ্রীমতি" লিখিতেন। কখন বা "রাইকিশোরী ভরসা" "শ্রীহরি" শ্রীহরিঃ শরণং" "ওঁ" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। আবার স্বীয় মহানাম 'জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু,' 'আনন্দময় জগদ্বন্ধু' 'প্রেমময় জগদ্বন্ধু' 'জীবউদ্ধারণ বন্ধু,' "পরাণ নিধিয়া বন্ধু" 'বন্ধুপ্রভু' "প্রভু জগদ্বন্ধু," উপরে ঐ স্থানে লিখিয়াছেন, এমন লিপিও দেখিয়াছি। রচনা ও লিপির মধ্যেই প্রভু বিশেষভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

প্রভুবন্ধু সময় সময় বড় কাগজে বড় স্পষ্ট অক্ষরে ফাঁক ফাঁক করিয়া আবশ্যক দ্রব্যের ফর্দ্দ লিখিয়া প্রিয় ভক্তগণকে দিতেন। এখানে প্রিয় ভক্ত তারক গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত ফর্দ্দের নমুনা দিলাম। স্থানাভাবে দ্রব্যের নামগুলি প্রভুর মত নীচে নীচে না সাজাইয়া এক পঙ্‌ক্তিতে এক সঙ্গে দেওয়া হইল :

"আমার আবশ্যক—খাতা শাদা বড়, কাগজ, শাদা খাম শাবান, গন্ধী, লেপ, বালাপশ, থান, কাপড়"।

"আমার আবশ্যক—ফাষ্ট ক্লাশ রাজ ট্রাঙ্ক, কালি, কলম, নিফ্ দ্রব্যাদি, বস্তু আদি।"

"আবশ্যক—রাজদ্রব্য, রাজ এচ্‌টকিং, চাদর, শিলই চাদর রবর জুতারাজ, রাজ কঁইচ্চি, ব্লটিং"।

প্রিয় নবদ্বীপকে প্রভু লিখেন,—

"...পঙ্গুবৎ, বল নাই।...এক মৃদঙ্গ হইলে দেহে পুনঃ বল সঞ্চার হবে। ইহা জানিবা।...লিখিত দ্রব্যগুলি সহ সত্বর রওনা হইও।

(১) লবাং, (২) আয়ুর্ব্বেদ অভিধান, (৩) খোল, (৪) করতাল, (৫) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা; পাঁচখানি।"

রঙ্গলাল প্রভু নানা সময় নানা ভঙ্গী করিয়া নাম স্বাক্ষর করিতেন। "য ঘ ব ন্দ্" এইরূপ স্বাক্ষরও দেখিয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই তিনি প্রচলিত বানান বদলাইয়া ও 'মাইল মাইল নোট দিবা' 'ক্রোশ ক্রোশ নোট উপার্জন করিবা' 'মাইল মাইল টাকা উপার্জ্জন করিবা' ইত্যাদি অদ্ভুত কথা লিখিয়া ভক্তানন্দ বৃদ্ধি করিতেন।

বন্ধুবান্ধার প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট

নিজজনের কাছে প্রকাশ

শ্রীলক্ষ্মীর বন্ধু-অর্চ্চনা

প্রভু চিরকালই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে অতীব পটু হলেও সুচতুর ভক্তগণ তাঁকে খুঁজে টেনে বাইরে প্রকাশ করেন, তিনি নিজে ধরা দেন। ফরিদপুর, ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, পাবনা, কলিকাতা, নবদ্বীপ, ঢাকা, বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থানে ভক্তদের কাছে প্রভু প্রকাশ হয়েছেন, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে ঐ সম্পর্কে আরও কিছু মধুর বার্ত্তা চলিত ভাষায় প্রকাশ করলাম।

প্রভুর মৌনাবস্থার আট দশ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপধামে বাক্‌সিদ্ধা ক্ষেপীমা একদিন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলেন, 'তোদের ঘরে নব-গৌরাঙ্গ আসবেন।'

মহেন্দ্রবাবুর নয় দশ বৎসর বয়সের বালিকা কন্যা লক্ষ্মী অসামান্যা রূপগুণ ভাব সম্পন্না ছিলেন। শুনা যায় শান্তিপুরে কন্যাটির জন্মকালে বন্ধুচন্দ্র তথাকার গোবিন্দ রায়ের মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষেপীমার পূর্বোক্ত ভবিষ্যদুক্তির পর লক্ষ্মী একদিন হরিসভার চতুষ্পাঠীছাদে বন্ধুচন্দ্রকে বিদ্যুৎপ্রভার মতো ক্ষণিক দর্শনে উন্মাদিনা প্রায় হয়ে পড়েন। দু'দিন পর বালিকা বলেন, "গৌরকে পেলে ভাল হব।" স্নেহময় পিতা একটি সুন্দর গৌরাঙ্গ-শ্রীমূর্ত্তি কন্যাকে

এনে দেন। লক্ষ্মী এক গৃহপ্রকোষ্ঠে ঐ গৌরাঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করে সেবাপূজা করতে থাকেন। একদিন লক্ষ্মীর আগ্রহে ভট্টাচার্য মহাশয় বিভিন্ন কীর্তনদল আনিয়ে বাসায় কীর্তন করান। সন্ধ্যাকালে হরিসভা হতে শ্রীরামদাসজী কীর্তনদলসহ তথায় এসে কীর্তন করেন। কিছুপর বন্ধুসুন্দর স্বেচ্ছায় এসে লক্ষ্মীর ঠাকুর ঘরে গিয়ে দ্বার বন্ধ করেন। লক্ষ্মী দ্বারের ছিদ্রপথে বন্ধুকে দর্শন করেন।

এই ঘটনার পরদিন ক্ষেপীমা বলেন,—'এই নব-গৌরাঙ্গ।' তখন থেকে মহেন্দ্র বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যায় পত্নী ও কন্যা সহ আকুল আগ্রহে হরিসভায় প্রভুর দর্শনার্থী হয়ে যেতেন। প্রভু কখনো কখনো ক্ষণিক দর্শন দিতেন, কখনো বা মন্দির হতে দু-চারটি মধুর কথা বলতেন।

একদিন জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যায় লক্ষ্মী রাইমাতান কুঞ্জে, ব্রজ স্মরণার্থ প্রস্তুত রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থলে পূজারিণী বেশে ইষ্টের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ভক্তা রাইমাতা জপমালা হাতে মন্দিরের দ্বারে, যোগিনী মাতা ভোগঘরের সামনে ধ্যানমগ্না, লক্ষ্মীর সহচরী পার্বতী সুগন্ধি পুষ্পভরা সাজি নিয়ে লক্ষ্মীর পার্শ্বে স্থিতা। কিছু দূরে এক কোণে লক্ষ্মীর প্রতিবাসী বালক 'খোকা' সঙ্গে বসে আছেন। এমন সময় ভক্তির মহতী ব্যাকুলতায়, অপরিমেয় আগ্রহের আকর্ষণ বলে, বন্ধুচন্দ্র স্বপ্নরাজ্যের স্বর্ণচিত্রের ন্যায় লক্ষ্মীর সম্মুখে মোহনভাবে প্রকট হয়ে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী জানু পেতে বসে কি যেন প্রাণের মন্ত্র পড়ে একটি একটি করে পুষ্প নিয়ে সমুদয় পুষ্পে সর্বান্তর্যামী বন্ধুর শ্রীপাদ-

পদ্ম অর্চ্চনা করলেন। তারপরই বন্ধুচন্দ্র ছায়াচিত্রের ন্যায় অদৃশ্য হলেন। লক্ষ্মী তখন আকুলভাবে বলে উঠলেন—'এবারকার মত শেষ দেখা।'

বস্তুতঃ বন্ধুকে দেখার মত দেখা হিসাবে উহাই লক্ষ্মীর প্রথম ও শেষ দেখা। খোকার কাছে লক্ষ্মী নিজেকে আবেশে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' বলে প্রকাশ করেছিলেন। খোকা বাল্যকাল থেকেই বন্ধুকে প্রাণের ঠাকুর বলেছিলেন। উত্তর কালে তিনি শ্রীচরণ দাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য হয়ে 'নিতাই দাস' নামে পরিচিত হন। এই শ্রীনিতাই দাস বাবাজীর লিখিত 'শ্রীবন্ধুপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ অবলম্বনেই এই সব বার্ত্তা প্রচারিত হল। তৎকালে নবদ্বীপে রাইমাতা, নন্দকিশোরের মাতা, শিতিকণ্ঠ মহাশয় প্রমুখ ভক্তগণ বন্ধুকে সাক্ষাৎ গৌর জ্ঞানে তাঁর শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিতেন।

লক্ষ্মী প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে কুমারী অবস্থায় নিত্য বন্ধু গৌরধাম প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মী বালিকা হয়েও বন্ধুহরির উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে অপূর্ব আত্মসমর্পণের কথা, অনবদ্য মধুর ভাষায় লিখতেন, সে সমস্ত ভক্তজনের ভজন সহায়ক কথার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"বন্ধু! ··আমি ভক্তিমন্দিরে তোমায় ভালবাসি। আমি প্রেমমন্দিরে তোমায় পূজা করি। আমি আবেশ মন্দিরে তোমায় অনুভব করি।···আমি শান্তিমন্দিরে তোমায় উপভোগ করি।"

"তুমি যে আমার জীবন। রাত্রে বিরহের
পরে উল্লাসে উঠিয়া বসি উষার আসনে,
উচ্চারিরে তালে তালে আমার পরাণ,—

বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!"
"তন্তুবায় মন মোর নিদ্রা বস্ত্রোপরি
বুনিতে শিখিবে যবে স্বপন সুন্দর
সেথায় তোমার নাম বুনিব প্রথম।
ওগো প্রাণের বন্ধু বন্ধু!"

পুরীর বড় বাবাজীর মুখে বন্ধু কথা

বন্ধুচরণাশ্রিতা সুরমাতার মুখে শুনেছি, শ্রীচরণ দাস বাবাজী মহাশয় প্রভুর মৌনাবস্থার পূর্ব্বে পুরীধামে অক্ষয় বটতলায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উক্ত,

"এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥"

ইত্যাদি গৌরহরির উক্তির শ্লোক পড়ে' সেই শ্রীগৌরাঙ্গই প্রভু জগবন্ধুরূপে এসেছেন বলে, ব্যাখ্যা করছিলেন। ঐখানে তাঁর মুখে এই বন্ধুবার্ত্তা পেয়েই সুরমাতা মনে মনে বন্ধুচরণে আত্মসমর্পণ করেন।

নবদ্বীপ দাদার মুখে শুনেছি, উক্ত বড় বাবাজী মহাশয় কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ায় থাকাকালে একদিন বন্ধু ভক্তদের 'জয় জগদ্বন্ধুবোল' আদি কীর্ত্তনের সহিত যোগদান করে 'প্রভু, অনন্তানন্ত-ময়' ইত্যাদি বহু আখর সংযোগ করেছিলেন। অন্যসময় তিনি নবদ্বীপে বন্ধুসুন্দরের অবস্থান গৃহের সামনে এসে, বন্ধুসুন্দরের

উদ্দেশ্যে কোনদিন নববস্ত্র, কোনদিন ফলমূলাদি ভক্তি-উপহার রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। একদিন তিনি প্রভুর জন্য একটি ট্রাঙ্ক এনে প্রণাম করেন। প্রভু দর্শন দিতেন না বলে বড় বাবাজী মহাশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। একদিন তিনি দর্শনে হতাশ হয়ে ফিরে যাবার সময় উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বন্ধুর শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশ দর্শন পেয়ে ঐখানেই অমনি সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েন! এমন প্রেমিক রসিক ভক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্ত্তী কালে তাঁরই আনুগত্যে থেকে বন্ধুসুন্দরের প্রিয় শারিকা, রামদাসজী দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করেছেন।

প্রভু ও শ্রীরামদাস প্রসঙ্গ

ফরিদপুরের শ্রীরাধিকা গুপ্তই, ভাবাবেশে রাধিকা নাম উচ্চারণে অসমর্থ বন্ধুসুন্দরের আদরে প্রদত্ত শারিকা, শারী, রামী, রামু বা শ্রীরামদাস নামে ভক্ত সমাজে পরিচিত, খ্যাত ও বৈষ্ণব গণের মুকুট মণিরূপে চির পূজিত।

বন্ধুর দেওয়া শারিকা আদি নামে রাধিকা উল্লসিত হতেন। কিশোরবয়স্ক রাধিকা (শারিকা) তাঁহা অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় বন্ধুসুন্দরের নিকট সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য শিক্ষা, উপদেশ এবং তাঁর সাক্ষাদ্দর্শন, সুদুর্লভ সেবাসঙ্গ প্রাপ্ত ও বন্ধুরচিত হরিনাম কীর্ত্তন গানে অভ্যস্ত হয়ে চিরত্যাগী কঠোর বৈরাগী হন। প্রভুর একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত রাধিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ বৃত্তিপ্রাপ্ত

ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বন্ধুর ইঙ্গিত মত সময় সময় তিনি ফরিদপুরের এক নির্দিষ্ট দেবদারু তরুতলে বন্ধুসুন্দরের সহিত মিলিত হতেন।

তরুণবয়স্ক প্রভু বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী থেকে প্রথমে সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল নগর কীর্ত্তন বের করবার অভিপ্রায়ে উহার প্রস্তুতির জন্য তাঁর অনুবর্ত্তী বাকচর, পরাণপুর আদি স্থানের ভক্তগণকে নির্দেশ দেন। উক্ত চৌদ্দ মাদল নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভের দু'চারদিন পূর্ব্বে পরাণপুরে ত্রিনাথের মেলা চলতে থাকে। তখন যন্ত্রী প্রভু একদিন তাঁর মনোনীত হরিনাম প্রচার যন্ত্রস্বরূপ প্রিয় শারিকাকে 'কথা আছে' বলে মেলা দেখার ছলে পরাণপুর গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আদেশ করেন। আদেশ মত শারিকা নির্দিষ্ট দিনে পরাণপুর গিয়ে মেলার নিকট এক নির্জন বৃক্ষতলে বন্ধুসুন্দরের সাক্ষাৎ পান। ঐদিন প্রিয় শারীকে কথিত, পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামদাসজীর শিষ্যরত্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী লিখিত 'চরিত মাধুরীতে' প্রাপ্ত ও লেখকের মুখেও শ্রুত, কয়েকটি গুরুবন্ধু বাণী উদ্ধৃত করিলাম।

"...তারা (ইংরাজরা) যে শিক্ষা দিচ্ছে, তাতে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নাই। ধর্ম্মহীন শিক্ষায় মানুষের মাথায় কেবল কুবুদ্ধি যোগায়। সত্য, দয়া, সরলতা, সব নষ্ট করে দেয়। তাখ, খুব শীগ্‌গীর আমি হরিনামের মহাসংকীর্ত্তন বের করব। তুই থাকবি কীর্ত্তনের আগে।" 'ম্লেচ্ছ বিধর্মীরা দেশকে ছারে খারে নিয়ে যাচ্ছে। দেখিস্ নি, নিরীহ দুলে বাগদী গুলোকে ওরা ম্লেচ্ছ

করতে চাইছে। তা হতে দেবো না। ওরাই হবে হরিনামের দাতা, ওদের নিয়েই আমার কাজ। আর তুই হবি আমার সব কিছুর সহায়।'

শারিকার অগ্রজগণ প্রভুর প্রতি ছোট ভ্রাতার আনুগত্য জেনে প্রভুর প্রতি খুব রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই বন্ধুসুন্দর সেদিন সূর্য্যাস্তের আগে শারীকে গৃহে ফিরতে নির্দেশ দেন। এদিকে গৌর সাহা, মহিম দাস, গোপাল মিত্র, কেদার সাহা, রামসুন্দর, জন্মেজয় আদি বন্ধুপ্রিয়গণ প্রভুর খোঁজে ব্যস্ত হয়ে সেখানে বন্ধু-প্রভুকে দেখে, সারা মেলাটায় খুজছি আপনাকে ইত্যাদি কথা বলেন। তাঁরা এসে দেখেন, প্রভু তাঁর প্রিয় ভক্ত রাধিকার গমন পথে তাকিয়ে আছেন, আর কিশোর রাধিকা যেতে যেতে মাঝে মাঝে ফিরে বন্ধুসুন্দরকে দেখছেন। কি অপূর্ব্ব আকর্ষণ। বিদায়কালে বন্ধু শারীকে বলে রাখেন,

'দুদিনের মধ্যে নগর সংকীর্তন বের হবে। তুই আমি থাকবো কীর্তন নিয়ে। পরশু সেখানে আসবি!"

রাধিকা তার অভিভাবকদের কড়া শাসনের কথা এক সময় বন্ধুকে জানিয়েছিলেন। তাতে সর্বনিয়ন্তা বন্ধুপ্রভু শারীকে অভয় সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবিস্ কেন?"

যথোক্ত দিনে রাধিকা ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হন। নব-গৌরাঙ্গ বন্ধুসুন্দরের পরিচালনাধীনে সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদলে

অসংখ্য ভক্তসমন্বয়ে বিরাট নগর সংকীর্ত্তনের শোভাযাত্রা ব্রাহ্মণকান্দা হতে বের হয়। প্রভুর আদেশে অমৃত মধুরকণ্ঠ তাঁর প্রিয় শারীকা সর্ব্বাগ্রদলে প্রভু-রচিত 'ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ চরণ' সংকীর্ত্তনটি ধরে সদলে অগ্রসর হতে থাকেন। তুলসী টব, পতাকা, নিশান, বিউগল, আশাসোটা, পেটাঘড়ি, বড় করতাল আদি সঙ্গে চলে। সারদালে পর পর পৃথগ্‌ভাবে প্রভু রচিত বিভিন্ন কীর্ত্তন প্রভুর নির্দেশে মহানন্দে মহারোলে গভীর জয়ধ্বনি সহ গীত হতে থাকে। অগ্রিম দলে কীর্ত্তনে মধুবর্ষী রাধিকা, তার আগে সহ মৃদঙ্গ বস্ত্রাবৃতাঙ্গ, নবগৌরাঙ্গ কাঞ্চনবর্ণ বিরাট তেজঃপুঞ্জ কলেবর, দীর্ঘ বাহুধর সংকীর্ত্তনেশ্বর বন্ধুসুন্দর নৃত্যভঙ্গীতে দুই বাহু তুলে সংকীর্ত্তনে মহাশক্তি সঞ্চার করে, চৌদ্দ মাদল বিরাট সংকীর্ত্তনে, নগরে দূর হতে সকলেরই দৃশ্যমান হয়ে নগর সংকীর্ত্তন পরিচালনা করে চলেছেন, কখনো বা উদ্দণ্ড নৃত্য করে গ্রাম সহরের জনগণকে আকর্ষণ করছেন, আর শ্রীরাম দাস, শ্রীগোপাল মিত্র আদি অমৃতকণ্ঠ গায়কগণ হরিনামে মধুবর্ষণ করে অগ্রসর হচ্ছেন। গ্রাম সহর ভেঙ্গে ছোটবড়, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল,বৃদ্ধ, উচ্চনীচ আদি জলস্রোত জাতি-কুল-সমাজ, বর্ণবিদ্বেষ ভুলে সেই হরিনামময় বন্ধুসুন্দরের সৃষ্ট হরিনামের প্রেমসমুদ্রে মিলিত হচ্ছেন, সেই সময় জনগণ দেহ-গেহ-ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে মহানন্দময় হরিনামের অমৃতরস পানে মত্ত হন। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে দেশে বিদেশে, লোক মুখে ও সংবাদপত্রে প্রভুবন্ধুর এই অলৌকিক প্রভাব ও হরিনামে জীব উদ্ধারণ বার্ত্তা প্রচারিত হতে থাকে। এই বিরাট

নগরকীর্ত্তনে (১২৯৭ বঙ্গাব্দে) ১৪ খানি খোল ও বহুসংখ্যক জোড়া করতাল বাজে।

প্রভুর কৃপাশক্তিতে বুনাভক্তগণ পাদরীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চির বন্ধুদাস হন। তাদের সর্দার রজনা বাবাজীকে প্রভুবন্ধু ক্রমে সদাচার শিক্ষায় সুসংস্কৃত করে 'হরিদাস' নামে ভূষিত ও সম্মানিত করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানের ও অন্যান্য স্থানের বুনাগণ 'মোহন্ত সম্প্রদায়' নামে প্রভুর কৃপায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং খোল মাদলে হরিনাম সংকীর্ত্তনে উত্তম অধিকারী ভক্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত বিরাট নগর কীর্ত্তনের পর রাধিকার অগ্রজগণ ভ্রাতাকে প্রভু বন্ধুর সংস্রব হতে দূরে রাখার ও তাঁকে কবিরাজী পড়াবার উদ্দেশ্যে বরিশাল রায়কাঠিতে রাধিকার অপর অগ্রজ বীরেশ্বর বাবুর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। একদিন প্রত্যূষে রাধিকা অপর অগ্রজ যতীন্দ্রবাবু সহ রওনা হন। নগর কীর্ত্তনের পর হতে রাধিকা আর বন্ধুসুন্দরের কাছে যাবার সুযোগ করতে পারেন নি, তিনি ভ্রাতাদের কড়া শাসনাধীনে ছিলেন। সেদিন পথে চলার সময় বন্ধুসুন্দরকে একবার দর্শন করার জন্য রাধিকার প্রাণে একান্ত আগ্রহ ও আকুলতা জন্মে। কি আশ্চর্য্য, সেই মুহূর্ত্তে অন্তর্যামী বন্ধুপ্রভু প্রিয় শারিকার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপদেশ ও সান্ত্বনা দেন। যতীন্দ্র বাবু আগে আগে, যোগমায়ায় তিনি ইহার কিছুই জানতে পারেন নাই।

রায়কাঠিতে রাধিকাকে চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি করা হয়। এখানে প্রভুবন্ধুর আদিষ্ট ঊষাস্নান, নিরামিষভোজন, ব্রহ্মচর্য পালন, হরিনাম

কীর্ত্তন ইত্যাদি কর্ত্তব্য পালনে রাধিকা কোনো বাধা পান নি। কিন্তু রাধিকা তাঁর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, যেন পীড়ার ছলে তিনি ফরিদপুরে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রাণ-বন্ধু-সুন্দরের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। অচিরে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রাধিকার পীড়ার সংবাদ পেয়ে তাঁর অপর অগ্রজ অনুকূল বাবু রায়কাঠিতে গিয়ে ছোটভাই রাধিকাকে ফরিদপুর নিয়ে আসেন। প্রভু বন্ধু তখন বৃন্দাবনে, এই সংবাদে রাধিকা মনমরা হন। রাধিকা সুস্থ হওয়ার পর, তাঁকে আবার রায়কাঠিতে পাঠাবার উদ্যোগ হয়। রাধিকা তাঁর মাতা সত্যভামা দেবীর কাছে আবদার করে জানান, রায়কাঠির জলবাতাস তাঁর সহ্য হয় না। মাতা ছোট ছেলের আবদার রাখেন। রাধিকাকে তখন ব্রাহ্মণকান্দার টোলে ভর্ত্তি করা হয়। বন্ধুর বার্ত্তা সংগ্রহে একদিন রাধিকা ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে গেলে বন্ধুর জেঠাত বড়দিদি দেবীমা, পরিচিত ভক্ত ছেলেটিকে দেখে বলেন, জগৎ বৃন্দাবনে গেছে। শোনা কথা আবার শুনে রাধিকা হতাশ, বিষণ্ণ হন। ঐ সময় প্রভুর জেঠাত দাদা গোপাল বাবু তাঁকে দেখে বলেন, জগতের শারী নাকি? জগতের কাছে চিঠি গেছে, সে আসতে পারে। এই সন্দেশ পেয়ে শারী হর্ষোৎফুল্ল হন।

এদিকে বন্ধুর অনুরাগী সঙ্গী বন্ধু বিশ্বাসজীর ও সুধন্বা (সুধন্য) মিত্রজীর সৌহার্দলাভ করে বন্ধুকথা আলাপনে শারিকার বন্ধুর বিরহব্যথা অনেকটা উপশান্ত থাকত। অতঃপর একদিন ব্রাহ্মণ-কান্দার বাড়ীতে আসতেই রাধিকার কর্ণে বংশীবিনিন্দন অনুপম মধুর

কণ্ঠস্বর প্রবেশ করে। তখন রাধিকার দেহ-মন-চিত্তে অনির্বচনীয় আনন্দের স্পন্দনশিহরণের তরঙ্গলহরী ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম সাক্ষাতেই বন্ধু হেসে শারীর কাছে প্রস্তাব করেন—"আমার সঙ্গে পাবনায় চল, সেখানে তোকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তরাজ ও বুড়োশিবকে দেখাব।" বন্ধুসঙ্গলাভের অত্যুৎসাহে শারিকা উত্তর দেন—চল। অতঃপর রাধিকা কৌশলে তাঁর স্নেহময়ী মাতার নিকট হতে পাবনা যাওয়ার অনুমতি আদায় করেন।

পরদিনই বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে শারিকা পাবনায় পরমবৈষ্ণব-চূড়ামণি অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ নিত্যসিদ্ধ দীনবন্ধু বাবাজী মহারাজের নিতাই গৌরাঙ্গের আশ্রমে আশ্রয় পান। সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, লুণ্ঠন ও অপূর্ব দর্শনে রাধিকা নিজেকে ধন্য মনে করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বন্ধু সেখানে আচরণে বাবাজী মহারাজের ও মাতা বিন্দুদেবীর কাছে একান্ত প্রিয় শিশুসন্তানের মত। রাধিকাও তাঁদের দুর্লভ স্নেহ-আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। একদিন রাত্রে মন্দিরের সামনে প্রভুর আদেশে শারিকা তাঁর সুমধুর রসাল কণ্ঠে প্রভু-রচিত

"নবদ্বীপ নিশীথ কীর্ত্তন মঙ্গল।

অম্বর আবরি বাজে মধুর মধুর মাদল॥ রস মধুর রে"

সংকীর্ত্তনটি গান করেন, সঙ্গে বন্ধুসুন্দর সুমধুর ধ্বনিতে মৃদঙ্গ বাজাতে থাকেন। বাজানকালে বন্ধুর হাতের এক আঙ্গুল ফেটে রক্ত বের হয়, কীর্তনাবেশে সেদিকে দৃক্‌পাত না করে বন্ধু রসাল মাদলে অপূর্ব মধুর ধ্বনি তোলেন। উপস্থিত জনগণ তন্ময়চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত বহুক্ষণ সেই কীর্তনরস পান করেন। প্রভুর রচিত

অনেক সংকীর্ত্তন শ্রুতিস্মৃতিধর শারিকার কণ্ঠস্থ ছিল। শারিকার রামদাস নামটি দীনবন্ধু বাবাজী মহারাজের আশ্রমেই পাকা ও খ্যাত হয়।

এই আশ্রম থেকেই প্রভুবন্ধু তাঁর অনুরক্ত ব্রহ্মচারী ছাত্রদের নিয়ে মধুকণ্ঠ শ্রীরামদাসকে মূল গায়ক করে পাবনায় নগর কীর্ত্তনের প্রচলন করেন। ছাত্রদের অভিভাবকগণ রুষ্ট হয়ে বন্ধুকে নির্জ্জনে আকর্ষণ করে প্রহারের ষড়্‌যন্ত্র করেন। একদিন প্রাতে তাদের নিযুক্ত মদ্যপানে উন্মত্ত কতিপয় দুর্বৃত্ত প্রভুবন্ধুকে পথে পেয়ে অকস্মাৎ দারুণ প্রহার করে; ঐ কার্যে বাধা দিতে গিয়ে রামদাসও প্রহৃত হন। বন্ধু এই ঘটনার কথা গোপন রাখার জন্য শারিকাকে নির্দেশ দেন। ক্ষমার দেবতা বন্ধু উদ্ধৃত বাণীর মর্মে উপদেশ দিয়ে বলেন—'অহিংসায় সিংহবিক্রমে হরিনাম প্রচার করতে হবে। উদ্ধারণ হরিনাম প্রচারণ কাজটি এখন এগিয়ে আসছে।' এই ঘটনার পরও প্রভুবন্ধুর ব্রহ্মচর্য-শিক্ষাদানের ও হরিনাম প্রচারণ কার্যের প্রতিবাদে অসুরপ্রকৃতির অভিভাবকগণ বন্ধুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কয়েকবার অমানুষিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু পীড়নে মরণাপন্ন হয়েও গুরুবন্ধু চিরদিন তাঁর জীবউদ্ধারণ কার্যে অটল ও নির্ভয় থাকেন।

ইতোমধ্যে প্রভুবন্ধুর প্রযত্নে একদিন শ্রীরামদাস বুড়োশিবের (শ্রীশ্রী৺হারাণ ক্ষেপার) দুর্লভ দর্শন ও কৃপালাভে ধন্য হন।

অতঃপর একদিন বন্ধুসুন্দরের মধুর মৃদঙ্গ বাদনে ও মধুকণ্ঠ

মূলগায়ক রামদাসজীর সঙ্গে ছাত্রদের নগরকীর্ত্তন ও শ্রবণে আকৃষ্ট হয়ে ঐ পথে যাত্রী রাজকুমার রায় বনমালী তাঁর শকট হতে অবতরণ করেন এবং প্রণাম আদির পর তিনি ঐ অবস্থাতেই ঐ কীর্ত্তন প্রয়াসে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রভুবন্ধুর কাছে আকুল আবেদন জানান। প্রভুর সম্মতিতেও ইঙ্গিতে তাড়াসে বিনোদজীর মন্দিরের সম্মুখে সংকীর্ত্তন উপস্থিত হলে মন্দিরেরর দরজা খুলে দেওয়া হয়। সুবিগ্রহ জামাই বিনোদজীর অপূর্ব সুন্দর মধুর দর্শনানন্দে উল্লসিত রাধিকা তখন প্রভুর আদেশে প্রভুরচিত,

'খোল করতালে ভাই কর সংকীর্ত্তন,' এই গানটি আরম্ভ করেন। কীর্ত্তনের মাধুর্যে কীর্ত্তনীয়াগণ ও শ্রোতৃবর্গ, সকলেই আত্মহারা হন। কীর্ত্তন বিরতির পর শ্রীরঘুগোস্বামীজী সহ শ্রীবনমালীর সবিনয় আমন্ত্রণে উপস্থিত সকলেই বিনোদজীর প্রসাদ ভোজনে পরম পরিতৃপ্ত হন। ভক্ত রায়ের একান্ত অনুরোধে প্রভু শারিকাকে নিয়ে ঐ রাত্রে তাড়াসে অবস্থান করেন, সকলে স্ব স্ব গৃহে ফেরেন। পরদিন প্রত্যূষে বনমালী বাবুর শকটে প্রভু শারিকাকে নিয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। পাবনায় এ যাত্রায় প্রভু দু'সপ্তাহের অধিককাল ছিলেন। তারপর শারিকাকে নিয়ে ফরিদপুর ফেরেন। পাবনায় ও তাড়াসে প্রভু অনেকবার যাতায়াত করেছেন। একবার পাবনা হতে প্রভুকে তাড়াসে নিবার জন্য রঘু গোঁসাইজী হাতী এনেছিলেন। বিভিন্ন ভক্ত-মুখে এইসব ঘটনার বর্ণনায় প্রকারান্তরও শুনা যায়। পাবনা হতে ফরিদপুরে ফিরে আসার পর রাধিকা গৃহে ভ্রাতৃবর্গের কাছে তীব্রভাবে তিরস্কৃত হন। তাঁর অন্য অগ্রজ দেবেন্দ্র বাবু রাধিকাকে জগদ্বন্ধুর

ক্রীতদাসের মত অনুগত দেখে, একদিন অতিক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে গিয়ে গৃহমধ্যে অবস্থিত বন্ধুসুন্দরের উদ্দেশ্যে অনেক কটূক্তি বর্ষণ করেন। বারান্দায় অবস্থিত হরিদাস প্রমুখ ভক্তগণকে সহনধর্ম-শীল প্রভু তখন একবার মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—'ওটা কে রে ?'

কয়েকদিন গৃহে আবদ্ধ থেকে রাধিকা তাঁর বন্ধুর অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে উপস্থিত হন। প্রভু তাঁকে দেখেই তখনি বাকচরে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। বন্ধুসঙ্গ-লুব্ধ রাধিকা তখনি প্রভুর প্রস্তাবে সম্মত হন। বন্ধুর বাক্য তাঁর কাছে বেদবাক্য, বন্ধুর মধুর বাণীতে যেন যাদুমন্ত্রের শক্তি মাখানো। এখানে বন্ধু-মাধুর্যের প্রভাবে গৃহের উৎপীড়ন তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ। দুই জোড়া করতাল নিয়ে প্রভুবন্ধু শারিকা সহ বাকচরে গিয়ে তীব্র-স্রোতা কাবেরীর ঘাটে বাঁধা এক ছোট নৌকায় উঠেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। স্রোতের অনুকূলে নৌকা চলছে, বন্ধুর আদেশে শারিকা করতালযোগে তাঁর সহজ সুমধুর কণ্ঠে নিত্যানন্দ গুণগান করতে করতে দিব্য ভাবাবেশে হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দেন। প্রভুবন্ধুও তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিয়ে মূর্চ্ছিত ভক্ত-দেহ বালুকাময় তীরে তুলে সেবাশুশ্রূষা করেন। সেদিন নির্জন প্রত্যুষে বন্ধুপ্রভু স্বয়ং নিরুপম বংশীবিনিন্দী কণ্ঠে প্রভাতি কীর্ত্তন গেয়ে প্রিয় ভক্তের মূর্চ্ছাভঙ্গ করেন। অতঃপর সিক্তবস্ত্র-চাদর নিঙ্‌ড়িয়ে বাতাসে খানিকটা শুকিয়ে নিয়ে উভয়ে পদব্রজে ফরিদপুরে উপস্থিত হন। এই ঘটনার পর প্রভু আবার পাবনা গমন করেন। সেই সময় একদিন প্রভুবন্ধুর দর্শনার্থী শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী মহারাজ প্রভুর সন্ধানে ব্রাহ্মণকান্দা এসেছেন

শুনে, সুধন্য মিত্রজী সহ শারিকা তথায় এসে সেই মহাত্মাকে প্রণাম করেন এবং সুমধুর স্বরে কীর্ত্তনগান করে ভারতীজীকে পরিতুষ্ট করে ভারতীজীর প্রেম-আলিঙ্গন ও স্নেহাশীর্বাদ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

অতঃপর একদিন পাবনা হতে দ্বিপ্রহরে বাকচরে এসেই প্রভুবন্ধু প্রিয়ভক্ত বকুর মাধ্যমে শারিকাকে তখনই বাকচর আসার জন্য আদেশ পাঠান। শারিকা এসেই শুনলেন, বন্ধু একদিন পরেই কীর্ত্তনদল সহ নবদ্বীপধামে যাবেন। বন্ধুপ্রভু রাধিকার বাড়ী খবর পাঠালেন যে, সে রাত্রে রাধিকা প্রভুর কাছে থাকবে। একটু রাত্রে তুর্জ্ঞেয় বন্ধু শারিকাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে একটা বড় বিলের কাছে এসে ভক্তকে শক্ত করে কোমরে চাদর বাঁধতে বললেন ও দ্রুতবেগে জলকাদা ভেঙ্গে বিলের অন্য-পারে অগ্রসর হলেন। বন্ধুর আদেশে প্রাণ দিতেও অকুণ্ঠিত শারিকা প্রায় দৌড়িয়ে বিলের ওপারে বন্ধুর অনুগমন করলেন। বন্ধু সেই অন্ধকারে আলোক দিয়া গ্রামে নিস্তারিণী (নিচু) দেবীর গৃহে এসে তাঁকে ডেকে উঠালেন। প্রভু নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত জানিয়ে তাঁদের তুজনকে শুধু তুধ দিবার জন্য আদেশ দিয়ে গোয়ালঘরে আশ্রয় নিলেন। নিচু দেবী জানতেন, খেয়ালী বন্ধুর ইচ্ছা ও আদেশ অদ্‌ভুত, উহার অন্যথা করার সাধ্য কারো নাই। তুগ্ধপানের পর গোয়ালঘরে প্রিয়ভক্ত মোহিনী ভাতুরীকে ডাকিয়ে এনে বন্ধু খেলতে বসেন। রাধিকার কোলে একটি কালবস্তু দেখে বন্ধু বললেন, 'ওটা কি দড়ি!' রাধিকাও দড়ি বললেন। একটু পরেই বন্ধু বললেন 'সাপ!

সাপ!' রাধিকাও অবিচলিতভাবে নির্ভয়ে বসে থেকেই প্রতিধ্বনি করে বললেন,—সাপ। মোহিনী ভাদুরী দেখলেন, সত্যই একটি ছোট কেউটে সাপ, ভয়ে উঠে তিনি দূরে সরে গেলেন। প্রভুর উপদেশ মত ঘরের আলোটি সরিয়ে নিতেই সাপটি সরে নিজ গর্ত্তে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। রাত্রি তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, প্রভু বললেন, আমি এখনি যাব। ঐরূপ স্থানে ঐসময় বিল পার হওয়া কি বিপজ্জনক! কিন্তু বন্ধুকে বাধা দেয়, কার সাধ্য, যেই কথা সেই কাজ! প্রভু পথে গিয়ে শারিকাকে বললেন, 'তুই একটু ভয় পেলি না! আমি যা বলি, তুইও তাই বলিস্।' শারী উত্তর দিলেন, 'তুমিই বললে, তুমিই জান। তুমিও ত ভয় পেয়ে সরে গেলে না।' উত্তর শুনে বন্ধু মৃদু হাসতে লাগলেন। শারিকার ভাবটি এই, বন্ধু যখন যা বলেন, তখন সেটা সত্য, আর যার বন্ধু সহায়, তার সাপে বাঘে নাহি ভয়। বন্ধুতে রাধিকার অবিচল অনুরাগ ও আনুগত্য কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনা পরীক্ষার মত অকৃত্রিম ও কৈতবহীন, তা প্রমাণ হয়ে গেল। ভোরে ব্রাহ্মণকান্দা পৌঁছে, একদিন পর নবদ্বীপ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে প্রভু শারিকাকে আদেশ দিয়ে, তাঁকে গৃহে পাঠালেন। প্রভু শারিকাকে তাঁর গৃহে রেখেই তাঁকে ঘর ছাড়া করেছেন। বন্ধু স্মরণে পরাণ-শারিকার উক্তি 'দেখি তার চাঁদমুখ, জনক জননী সুখ, সব ভুলি ছিনু তার কোলে।'

যথোক্তদিনে কীর্ত্তন দলসহ শারিকাকে নিয়ে বন্ধুপ্রভু নবদ্বীপ হরিসভায় উপস্থিত হন। প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ সকলেই বৃন্দ পদরত্ন মহাশয়ের ও তৎপুত্র শিতিকণ্ঠের কাছে আদর যত্ন পান। সেখানে

কত দিব্য কীর্ত্তন আনন্দ হয়। এই খানে প্রভুর দর্শনার্থী প্রেমানন্দ ভারতীজী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী প্রমুখ বহু মহাত্মার চরণ ধূলি, দর্শন স্পর্শন, আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ পেয়ে রামদাসজী নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন এবং মহাত্মগণও রামদাসজীর মধুর ভক্তি মাখা কণ্ঠে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন শুনে পরম পরিতুষ্ট হন। বন্ধুর কৃপায় রাধিকার নানাসাধু-সঙ্গ ও বৈরাগ্যময় জীবন গঠিত হয়।

বন্ধুর আদেশে রন্ধনে অপটু শারিকা কয়েকদিন তৈল স্পর্শ শূন্য গব্যঘৃত যোগে ভোগ রন্ধন করেন, প্রভু তাহা গ্রহণ করেন। প্রভুর সেবায় পঞ্চরসপূর্ণ মধুরভাব শারিকাতে প্রকাশ পায়।

রামদাসজী ক্রমে ঘটনা পরম্পরায় বন্ধুসুন্দরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আদেশে গৃহত্যাগী চির ব্রহ্মচারী হয়ে নবদ্বীপ, কলিকাতা, ফরিদপুর, বাকচর, বৃন্দাবন আদি স্থানে থেকে ভজন সাধন, কঠোর ব্রহ্মচর্য ও হরিনাম সংকীর্ত্তন আদি দ্বারা প্রাণবন্ধু-সুন্দরের সেবা করেন। এক সময় রামদাসজী 'ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু' ইত্যাদি গেয়ে টহল কীর্ত্তনও করেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু বন্ধু সর্ব্বদা, কি ত্যাগী, কি গৃহী, কি ছাত্র, তাঁর সকল ভক্তেরই কল্যাণ চিন্তায় বিব্রত থাকতেন এবং অবস্থা ভেদে যার যেটা অভাব বা প্রয়োজন, দূরে থেকে পত্রযোগে উপদেশ দিয়ে, বা আবশ্যক অর্থাদি পাঠিয়ে, কখনো বা নিজে দেখা দিয়ে, তা পূরণ করতেন। এক সময় তিনি প্রিয় শারিকাকে নবদ্বীপে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সেখানে যাওয়ার পাথের স্বরূপ দশ টাকা মনিঅর্ডার যোগে রাঁচি থেকে ফরিদপুরে এক ভক্তের ঠিকানায়

পাঠান। বাড়ীর লোকে সেটা গোপন করে। হাতরাসে অস্থায়ী ভাবে স্থিত ব্রজযাত্রী শারিকাকে বন্ধুপ্রভু ব্রজে বৈরাগ্যময় জীবনে আচরণীয় বিষয়ের ও সেখানে গন্তব্য স্থানের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে ভক্ত অটল নন্দীর ঠিকানায় পত্র দেন। যথা সময়ে ব্রজে বন্ধুর সঙ্গে শারিকার সাক্ষাৎ হবে, এই সান্ত্বনা বাক্যও সেইপত্রে ছিল। জগদ্‌গুরু বন্ধুর কৃপায় ব্রজে রামদাসজী বন্ধুপ্রিয় ব্রজবালা সচ্চিদানন্দজী, প্রেমানন্দ ভারতীজী, রঘু গোস্বামীজী আদি ভক্তদের ও সংসারবিরক্ত বহু সিদ্ধ ব্রজবাসীদের দুর্লভ দর্শন, সঙ্গ ও স্নেহাশীর্বাদ প্রাপ্ত হন।

ইতোমধ্যে প্রভুবন্ধু কলিকাতা রামবাগানে ডোমভক্তদের সুসংস্কৃত করে পরম বৈষ্ণবে পরিণত করেন এবং 'হিত হরিদাস ডোম' 'দয়াল তিনকড়ি', ভীম, পীতাম্বর আদি ডোম প্রধানদের নিয়ে তথায় শক্তিশালী হরিসংকীর্তন দল গঠন করেন।

প্রভুর আদেশে তাঁর প্রিয় শারিকা ব্রজে থেকে ভজন সাধন নিয়ে তাঁর বিষয়বিরাগী কঠোর জীবন গঠন করেন এবং প্রভুও সময়ে নিজে ব্রজে গিয়ে শিক্ষা-উপদেশ দিয়ে ভক্তকে ভক্তিরাজ্যের রত্নে পরিণত করেন। প্রভু কলিকাতায় এসে কতককাল পর শারিকার সম্পর্কে ভক্তগণকে সানন্দে বলেন,

"বৃন্দাবন থেকে একটি হরিনামের চারা আনাচ্ছি, ভাল বীজের চারা। এর আগে তাকে বৃন্দাবনে রেখে এসেছি। সেখানকার জল হাওয়ায় ওটি বেশ পুষ্ট হয়েছে, অল্ প্রুফ্ হয়ে গেছে, শীগ্‌গীর আসছে।"

বস্তুতঃ প্রভুর এই হরিনামের চারাটি কালক্রমে প্রভুবন্ধুর নিত্যানন্দ শক্তি-সঞ্চারে বিশুদ্ধ ভক্তিপুষ্প পল্লবশোভিত, হরিনামের গানে দানে অসংখ্য জনাশ্রয় বৈষ্ণবরাজ, রামদাস নামক মহীরুহরূপে পরিণত ও দেশে দেশে বিখ্যাত হন। অতঃপর রামদাসজী কলিকাতায় এসে অনেকদিন প্রভুবন্ধুর আশ্রয়ে অবস্থান করেন। প্রভুবন্ধুকে অবশ্য কলিকাতা হতে ও ব্রজ, নবদ্বীপ, ফরিদপুর ই᠁্যাদি স্থানে কখনো একক, কখনো ভক্তদের নিয়ে নিজের প্রয়োজন ম᠁ যাতায়াত করতে হত।

কলিকাতার কুমারটুলি, আলমবাজার বাগান, চাষাধোপাপাড়া, রামবাগান ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন সময়ে বন্ধুপ্রিয় চম্পটী ঠাকুর, শ্রীহররায়, শ্রীনবদ্বীপদাস, ব্রহ্মচারী রমেশ বাবু, বাদল বিশ্বাসজী, জয় নিতাইদেব আদি ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামদাসজীর ঘনিষ্ঠ᠁া জন্মে। ফরিদপুরে থাকাকালেই রামদাসজী প্রভুর আদেশে রমেশ বাবুর অনুগত হন। রমেশ বাবুর বাসায় রামদাসজীর সময় সময় গতায়াত ছিল।

লীলারঙ্গময় বন্ধুসুন্দর কখনো কখনো ইচ্ছামত অমৃতমধুকণ্ঠী ব্রজসখীগোপীর মতো সুমধুর সুধাসার মৃদুস্বরে গীত গেয়েছেন, কথা বলেছেন, বন্ধুর শারিকা স্বকর্ণে এই সুধা পান করেছেন, বন্ধুর অপার্থিব দিব্য রূপাদি প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজে বর্ণনা করে 'অহো কি কণ্ঠের ধ্বনি, কোকিলা লজ্জিতা শুনি, তোলে কিবা সুধা তরঙ্গিণী' 'কথা শুনে বিকায় পরাণ,' 'অহো কি মোহন মূর্ত্তি, কাঞ্চন বরণ দ্যুতি' 'অপরূপ শ্রীঅঙ্গ-লাবনী' 'একবার যেই হেরে, তার মনপ্রাণ

হরে' 'ব্রজরস গৌররস নিঙারি তার নির্যাস, পিয়াইলে মিটাইয়া আশ' ইত্যাদি। এক সময়ে প্রাণ বন্ধুসুন্দরের আহ্বানে শারিকা ব্রজ হতে এসে চাষাধোপাপাড়ায় অবস্থান করেন। প্রভুর ব্যবস্থামত চম্পটী ঠাকুর প্রমুখ প্রিয়গণ তখন দর্জিপাড়ার বাসায় ছিলেন। তন্মধ্যে একদিন রাত্রে রেশমী বসনে আবৃতহেমাঙ্গ নবগৌরাঙ্গ বন্ধুসুন্দর শারিকার কক্ষে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে নিজের খাতায় তাঁর নিজ রচিত,

'হাস লো যমুনে হাস হাস ও চারু বদনে।
মিশাব নয়ন নীর তোর নীল নীর সনে॥'

এই নূতন গানটি শারিকাকে দিয়ে আদেশ করেন, 'নে ধর।' অসাধারণ শ্রুতিস্মৃতিধর শারিকা গানটি আগাগোড়া পাঠ করে নেন। বন্ধুসুন্দর মৃদঙ্গ নিয়ে গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাদনে উদ্যত হলে গাত্রাবরণ হঠাৎ গাত্রচ্যুত হয়। তখন শারিকা অপলকনয়নে বন্ধুসুন্দরের ত্রৈলোক্যসুভগ অসমোর্ধ্ব কাঞ্চনবর্ণদ্যুতিবর্ষী চিত্তনয়নাভিরাম অমিয় হাসিমাখা বদনশশী সহ অনুপম রূপলাবণ্যরাশি ক্ষণিক দর্শনেই রায় রামানন্দের মত নিঃসংশয় ও দৃঢ়নিশ্চয় হন, যে, বন্ধুসুন্দরই সেই 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' বিগ্রহস্বরূপ, নিত্যবৃন্দাবনের নিত্যধন। অচিরেই বন্ধু আবৃতাঙ্গ হন, তাঁর মনঃপ্রাণাকর্ষী দিব্য অঙ্গসৌরভে কক্ষ আমোদিত হয়।

প্রকৃতিস্থ হয়ে অতঃপর শারিকা রসাল করতালযুগল নিয়ে যথোচিত সুর সংযোগে মধুবর্ষী কণ্ঠে আরম্ভ করেন, বন্ধুর আদিষ্ট নূতন গানটি। *বন্ধু সুকোমল করে তালে তালে অপূর্ব্ব মৃদু মধুর-

গম্ভীর ধ্বনিতে মধুর মৃদঙ্গ বাদন করেন ও গানের সঙ্গে সঙ্গত রেখে ভক্তের সঙ্গে অমৃতসুমধুর মিহি মৃদু সুমধুর কণ্ঠে গানটি গাইতে থাকেন। উভয়ে গানে তন্ময় হয়ে নয়ন নীরে ভাসেন, অতি আনন্দে, যেন ক্ষণকাল মধ্যে রাত্রি ভোর হয়ে যায়। অভিন্ন বন্ধু-জীব (দোপাটি) পুষ্পসম বন্ধুপ্রাণ নিত্যবন্ধুদাস, রামদাসজীর নিকট বন্ধু আত্মগোপন করতে পারেন নি, ধরা পড়েন।

প্রভুর শিক্ষায় রামদাসজী ব্রজে কঠোর বৈরাগীর জীবনযাপন করতেন। অযাচিত স্থূল ভিক্ষায় অথবা মাধুকরীতে প্রাপ্ত লালসা-বর্দ্ধক মুখ-রোচক পেড়া, লাডডু, পুরী কচুরী প্রভৃতি প্রসাদের কণিকামাত্র গ্রহণ করে অবশিষ্টাংশ উপস্থিত থাকলে বৈষ্ণবকে দিয়ে দিতে; অথবা কাউকে না পেলে উহা যমুনায় ভাসিয়ে দিতে শারিকার প্রতি বন্ধুর আদেশ ছিল। আদেশ যথাযথ পালিত হত।

প্রাণবন্ধুর প্রতি এমন অসীম অনুরাগ শারিকার ছিল যে, এক সময় তিনি বন্ধুর লেখা পত্রাদি ছাড়া অন্যের লেখা পত্রাদি পাঠ করতেন না। শারীর মুখে প্রায় সময় 'বন্ধু' শব্দ উচ্চারিত হত। তিনি বলতেন যে আমার কোষ্ঠীতে আছে, আমার 'বন্ধু সহায়।' তিনি বলেছেন, একবৃন্ত বন্ধুজীবপুষ্প (দোপাটিফুল) দেখলে, সেই বন্ধুজীব ফুলের মধ্যে 'বন্ধু' শব্দের মর্মার্থ পাওয়া যায়, বন্ধুই যার জীবন, সেই বন্ধুজীব।

প্রভুর আদেশে শারিকা প্রভুর শেফালিকাপাতার রস তৈরী করে উহা প্রভুবন্ধুপ্রদত্ত 'সবুজ সরবত' নাম স্বীকার করেই হাসিমুখে এক গ্লাস পরিমাণ নিত্য পান করতেন। বন্ধু উপস্থিত থাকলে

নিজে অগ্রেই উহা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। একসময় শেষরাত্রে বস্ত্রাবৃতাঙ্গ বন্ধুর নদীতে স্নানের পর বন্ধুর গাত্রলগ্ন-সিক্ত বস্ত্র ভেদ ক'রে তাঁর দিব্য অঙ্গজ্যোতিই বন্ধুর পরিধেয় শুষ্কবস্ত্র নিয়ে তীরে দাঁড়ান শারিকার চোখের উপর এসে পড়ায় শারিকা প্রায় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েন। পরে বন্ধুই তাঁকে প্রকৃতিস্থ করেন। কোনো কোনো ভক্তের বক্তব্যে প্রকাশ, একবার বাকচর কাবেরী নদীতে, অন্যবার বৃন্দাবনে যমুনা নদীতে রামদাসজী এইরূপ দিব্য অঙ্গজ্যোতিঃ দেখেন। বন্ধুর দিব্য অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শনের কথা রামদাসজীর মুখে আমিও শুনেছি। তবে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার সময় পাই নি।

প্রাণবন্ধুসুন্দরের প্রতি শারিকার এমন সহজ অপ্রাকৃত ভালবাসা ছিল যে তিনি বন্ধুসুন্দরকে একদিন বলেন, 'তুমি ঠাকুর কি ভগবান্ সে পরিচয়ে আমার দরকার নাই। উহা আমার ভাল লাগে না। ওতে তোমাকে দূরে ঠেলে ফেলতে হবে।' গোপীদের মতই রামদাসজীর বন্ধুর প্রতি কি এক অপূর্ব মধুর নিরুপাধি ভালবাসা ছিল।

শারিকার স্থির লক্ষ্য, জগদ্বন্ধু। ব্রজে প্রভুবন্ধুর কাছে থাকাকালে একদিন ব্রজপরিক্রমায় বন্ধুসুন্দরের সুকোমল রাঙা চরণতল কী করে আহত ও আরো রক্তরাঙা হয়েছে দেখে বন্ধুপ্রাণ শারিকা ব্যথিত হয়ে অন্যের অলক্ষ্যে একটি ভাল মালিশ তৈরী করেন এবং অন্যের প্রবেশ-নিষিদ্ধ বস্ত্রেঘেরা বন্ধুর স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে রাত্রে নীরবে প্রবেশ করে, শয়ান প্রভুর চরণের নিকট উপবিষ্ট

হ'য়ে বন্ধু-সুন্দরের রাঙা চরণযুগল তুলে নিজ কোলের মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে বহুক্ষণ নিজ প্রস্তুত মালিশ দ্বারা চরণ-যুগল মালিশ করেন ও ধীরে ধীরে টিপে দেন। প্রিয় ভক্তের সেবায় চরণের ব্যথা উপশমে বন্ধুর সুখনিদ্রাযোগ ঘটে। ধন্য ভক্ত, ধন্য ভক্তের প্রাণের গোপন ঠাকুর। ঐ পরিক্রমায় প্রভুর চরণ পাদুকাশূন্য ছিল। অন্য সময় প্রভু রবার পাদুকা পরিধান করতেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দের দোল-পূর্ণিমায় নবদ্বীপে গৌরহরির জন্মতিথির কীর্তন-উৎসবের কয়েক দিন আগে বন্ধুপ্রভু ব্রজ হতে কলিকাতা স্থিত ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হন। কলিকাতা হতে শারিকা আদি প্রিয় ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু যথাসময়ে নবদ্বীপ সভায় আসেন। এইবার প্রেমানন্দ ভারতীজী, ভক্তরাজ শিশির ঘোষ আদি মহাত্মাদের প্রচেষ্টায় নবদ্বীপে জগদ্বন্ধুরূপে নব-গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কথা প্রচারিত হয়েছিল। আত্মগোপনের ইচ্ছায় প্রভু-বন্ধু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নবদ্বীপ হতে অদৃশ্য হন। এইবার সদলে এক মহাত্মার মুখে 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম' গান শুনে রামদাসজী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রভুবন্ধুর কাছেই জানতে পারেন ঐ মহাত্মা পুরীর বড় বাবাজী। এই সময় হতে প্রভুবন্ধু ক্রমশঃ দুর্লভদর্শন হতে থাকেন। প্রভুবন্ধু অতঃপর কলিকাতায় ফিরে আসেন। প্রাণ বন্ধুসুন্দরকে আর আগের মত যখন তখন নিকটে পাওয়া যায় না, তাই বন্ধুর দর্শনসঙ্গ হতে বঞ্চিতপ্রায় রামদাসজী বন্ধুবিরহকাতর চিত্তে চিন্তা করতেন, এ অবস্থায় ভজন

সাধন নিয়ে ব্রজে থাকাই শ্রেয়স্কর। ভক্তান্তর্যামী বন্ধু প্রভু তখন একদিন তাঁর প্রিয় রামীকে বলেন,

"তুই ত ব্রজে যাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করছিস্, তা বুঝেছি। ছ্যাখ, আপন আপন খাওয়ার যোগাড় পশুপাখীরাও করে। যে দশজনকে খাইয়ে খায়, সেই খাঁটি মানুষ।"

ভজন সাধন নিয়ে নিজের আত্মোন্নতির জন্য ব্রজে বাস করা অপেক্ষা জীবের কল্যাণে দেশে দেশে নিতাই গৌর হরিনাম বিতরণ, দান, অনেক বড় খাটি মানুষের কাজ, ইহাই গুরু-বন্ধুর অভিপ্রেত কার্য, সেইটি প্রভু ইঙ্গিতে প্রিয়ভক্তকে জানালেন ও তাঁর উদ্ধারণ কার্য করবার জন্য প্রিয়ভক্তের মধ্যে নিতাই-শক্তি সঞ্চার করলেন।

মহাউদ্ধারণ বন্ধুকে তাঁর প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে গতায়াত করতে হত। বন্ধুর শেষ মৌনের পূর্ব্বে, তিনি ক্রমশঃ দুর্লভদর্শন হতে থাকলে রামদাসজী, প্রভুবন্ধুতে প্রকাশ্যে প্রণত, অনুগত শ্রদ্ধাশালী ও বিশ্বাসী শ্রীরাধারমণ চরণ দাসজীর আনুগত্যে থেকে গুরুবন্ধুরই অভিপ্রেত হরিনাম প্রচারণে আগ্রহান্বিত হয়ে, ফরিদপুর অঙ্গনে গিয়ে, প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রভুবন্ধু লীলাকার্যে প্রিয়বিরহে কাতর হয়ে পিছন ফিরে অনুমতি দিয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন,

'মহাপ্রভুর কৃপা হয়েছে, সুযোগ উপস্থিত হলে আর হারিয়ো না।'

মহাপ্রভুর কৃপা, আর প্রভুবন্ধুর কৃপা অভিন্ন, কেবল লীলার সময়টা ভিন্ন। প্রিয় শ্রীচরণদাস বাবাজীর করেই প্রভু তাঁর

রামীকে সমর্পণ করেন, একথা রামদাসজী মুখেও বলেছেন, বন্ধুর উদ্দেশ্যে লিখিত সূচক কীর্ত্তনে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, 'সমর্পিলে যার পাশে, তিহঁ গেল অন্য দেশে, পহুঁ মোর শ্রীরাধারমণ।'

এতৎসত্ত্বেও আমরা যদি রামদাসজীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলি, প্রভুবন্ধু রামদাসজীকে ত্যাগ করেছিলেন, তবে বৈষ্ণব অপরাধের মতো হাতীর রোষ থেকে আমরা নিস্তার পাব না। সংসারে পার্থির বন্ধুর লক্ষণ 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ।' আর জগতের বন্ধু অপ্রাকৃত জগবন্ধু বলেছেন,

"আমাকে কেউ ত্যাগ করে চলে গেলেও, আমি কদাচও ত্যাগ করি না। আমি কাহাকেও ত্যাগ করি না, করবও না। আমি ত্যাগের বেদনা সইতে পারি না।"

প্রিয় শারিকার বিরহে কাতর হয়ে বন্ধু তাঁর ভক্তকে এক পত্র দেন। রামদাসজী ঐ পত্রখানি চিরজীবন কণ্ঠহার করে রাখেন। কোনো ভক্তের বিরহে প্রভুর ঐরূপ কাতরতা আর দেখা যায় নাই, কোনো ভক্তের গৌরব কীর্তনেও প্রভু ঐরূপ পঞ্চমুখ হন নাই। সেই পত্রের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে!
কেমনে কহিব রে কেমনে সহিব রে!
কেমনে লিখিব রে কেমনে দেখিব রে!
সাধিতে স্বীকার হয়ে হৃদয় বিদরে!
স্মৃতি শেল নিদারুণ রহিবে অন্তরে!
সুখময় সঙ্গ আর কার দিব ধরে।"

'যার আগে আজ্ঞাকারী ছিল নারে কেহ।'
'যার সঙ্গে অহরহ ব্রহ্মরস লেহ।'
'সাত্ত্বিক ভূষিত বপু থাকিত যে সদা।'
'অন্য লক্ষ্য সঙ্গ যার নাহি ছিল কদা।'
"যতনে পোষিত স্মৃতি ডুবাব কেমনে!
কেমনে বুঝাব করে মৃদঙ্গ দর্শনে।'
'বন্ধু নাম অম্বরে যে তুলিত সুস্বরে!
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।"

মিলন-বিরহ ভক্ত-ভগবানের লীলাখেলার অঙ্গ। একজন ভক্তের হাবভাব কার্য অন্য ভক্তের আচরণীয় ও অনুকরণীয় না হলে, প্রভু বন্ধু কখনো কখনো এক ভক্তকে অন্য ভক্তের সঙ্গে মিশতে সাময়িকভাবে নিষেধ করেছেন। এমন কি চম্পটী ঠাকুর ও শ্রীরমেশ বাবু ও শ্রীরামদাসজীর মত মহা-অধিকারী ভক্ত সম্বন্ধেও ঐরূপ আলোচনা শুনেছি। মতপার্থক্যে মিশতে নিষেধ করার পর প্রয়োজনের সময় প্রভু ভক্তগণকে পরস্পর মিলে মিশে কাজ করতেও উপদেশ দিয়েছেন। "তোমরা সকলে মিলে আমার কাজ কর", শিশুপ্রভুর শ্রীমুখের এই আদেশবাণী নিজ কানে শুনেছি।

সময় ও হাবভাব কার্য ভেদে একই ভক্তকে প্রভু সম্পূর্ণ বিপরীত কথাও বলেছেন। যেমন, এক সময়ে প্রভুর সেবায় একান্ত মগ্ন যে ভক্তকে প্রভু 'রমেশ, তুই অমর,' 'তুমি ব্রজের বস্তু', 'তুমি আমার নিত্য সত্য অভিভাবক' ইত্যাদি বলেছেন, অন্যসময় সেই ভক্ত বিষয় চিন্তায় মগ্ন বা অভিমান যুক্ত হ'লে, প্রভু বলেছেন, 'রমেশ,

তোর আয়ু নাই,' 'তোরা দুনিয়ার মহাপাপী, ভেসে যাচ্ছিলি, ধরেছি বলে আছিস' ইত্যাদি। প্রভুবন্ধু একই ভক্তকে 'ব্রজের বস্তু,' 'মহাপাপী,' 'লম্পট' ইত্যাদি বলতে পারেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেই ভক্তকে শুধু 'ব্রজের বস্তু' বা অভিভাবক বলারই অধিকার, ভক্তকে 'মহাপাপী' 'পতিত' ইত্যাদি বললে আমাদের পক্ষে ভক্তাপরাধ হবে।

শ্রীরামদাসজী শেষভাগে প্রভুবন্ধুকে প্রকাশ্যে প্রচার করেন নি বলে, আমরা কেহ কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করি, এটাও আমাদের ভুল ধারণা। কোনো নগরকীর্ত্তনে প্রভু জগবন্ধুর শ্রীমূর্ত্তি ও বন্ধুভক্ত দল এনে, শ্রীরামদাসজী প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সহ বন্ধুভক্ত দলকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন, কুঞ্জদাদা ও শ্রীমান্ মহানামব্রত ইহা প্রত্যক্ষ করেছেন। কলিকাতায় বিভিন্ন ভক্তগৃহে, পোস্তার ঠাকুরবাড়ী ও ফরিদপুরে বহুবার শ্রীরামদাসজীকে সাক্ষাৎ দর্শন করবার, তাঁর মুখে বন্ধুর মধুর লীলাবার্ত্তা ও মধুবর্ষী কীর্ত্তন শ্রবণ করবার আমার ভাগ্য হয়েছে। তিনি নিজেকে বন্ধুর ক্রীতদাস বলতেন, বন্ধুর পাদপদ্মই তাঁর ভজন সাধন বলতেন, তাঁর ভজন কালে কার্যতঃ তা প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের পেলে স্বভাবতঃ তাঁর আনন্দ আদর ভাব প্রকাশ পেত; বন্ধুর স্মৃতি আরও প্রগাঢ় হত, আমাদের প্রসাদ পাবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতেন।

একবার পুরীধামে রথাগ্রে রাঘববংশীয় শ্রীনারায়ণ গোস্বামীজী শ্রীরামদাসজীর প্রাণ মাতান প্রেম মধুর কণ্ঠের কীর্তন শুনেন। বিশ্রাম কালে উক্ত বন্ধুভক্ত গোস্বামীজীর উপস্থিতিতে এক ভদ্রলোক

রামদাসজীকে সাগ্রহে প্রশ্ন করেন, এই প্রেম আপনি কি ভাবে লাভ করলেন? বন্ধুজীবন রামদাসজী তখনি বিনা দ্বিধায় সহজ সরল-ভাবে উত্তর দিলেন, 'প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কৃপায়। তিনি সাক্ষাৎ গৌর নিত্যানন্দ।' উক্ত গোস্বামীজীর মুখেই ঘটনাটি শুনেছি।

ফরিদপুরে সুধন্বা মিত্রজীর দেহরক্ষার পর, গৌরগোপালজীর মন্দিরে, একবার সদলে শ্রীরামদাসজীর কীর্তন করার আমন্ত্রণ হয়। তাতে বেদীর চারদিকের একদিকে প্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীমূর্ত্তির বসাবার জন্য শিষ্যদের প্রতি শ্রীরামদাসজীর আদেশ ছিল। মন্দিরে কোনো কোনো কর্মচারী ঐ কার্যে প্রভুবন্ধুর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেন। ঐ কথা পরের দিনে এসে শুনে রামদাসজী মর্ম্মাহত হন, এবং কীর্তনের মধ্যে প্রভুবন্ধুর স্বরূপ প্রকাশ করে, প্রভু জগদ্বন্ধুই যে সেই গৌরাঙ্গসুন্দর এই মর্মে এক সময় তিনি গদ্গদ কণ্ঠে আঁখর দিয়ে ভাবাবেগে কীর্তন করেন। বন্ধুভক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গল মুখার্জী সহ সেই কীর্তন আমি নিজে শুনেছি। ফরিদপুরে শ্রীরাম-দাসজীর এইটি শেষ আগমন।

কৈশোরকাল হতে বন্ধুহরির চির কৃপাস্পর্শ প্রাপ্ত ও হাতে গড়া হরিনামের চারা চিরপ্রিয় শারিকা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চিরবন্ধুদাস রামদাসরূপে থেকে প্রোজ্জ্বল বৈরাগ্যময় জীবন নিয়ে বন্ধুসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা, বন্দনা, স্মরণ, ধ্যান করেছেন, বুকে বন্ধুর লকেট মূর্ত্তি ঝুলিয়েছেন। শ্রীরামদাসজীর নিকট সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে স্নেহ-কৃপাপ্রাপ্ত, চির অনুগত শিষ্য, পঞ্চতীর্থ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শাস্ত্রীজীর মুখে শুনেছি, দেহান্তকালে শ্রীরামদাসজীর

অলৌকিকভাবে তাঁর প্রাণবন্ধুসুন্দরের দর্শন ও আহ্বান পেয়ে গম্ভীর স্বরে প্রাণভরে তিনবার 'বন্ধুসুন্দর! বন্ধুসুন্দর! বন্ধুসুন্দর!' উচ্চারণ করে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মত প্রভু গৌরবন্ধু নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করে নিত্যগৌরবন্ধুধাম প্রাপ্ত হন (১৩৬০ সনে, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাদ্বাদশীতে)। প্রভুবন্ধুসুন্দরের স্মরণে শ্রীরামদাসজী লিখিত অনবদ্য সুমধুর ভাব-আর্তিভরা সূচককীর্ত্তনের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে 'মধুরেণ' এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করছি।

"জয় রে জয় রে জয়, প্রভু জগদ্বন্ধু জয়,
প্রেমদাতা পতিত পাবন।
অহো কি মোহন মূর্ত্তি, কাঞ্চন বরণ-দ্যুতি,
রঙ্গময় সুখের সদন॥
রসে ঢর ঢর তনু, বিধি নিরমিল জনু,
প্রেমসিন্ধু মথিয়া নবনী।
ধাতা কতকাল বসি, গড়িল সে মুখশশী
অপরূপ শ্রীঅঙ্গ লাবনী॥
ব্রহ্মচর্য দৃঢ়ব্রত, করি করায় অবিরত,
কঠোর নিয়ম সদাচারে।
নন্দে ব্রজ উপাসনা, রাত্রিদিন অন্তর্মনা,
'রা' ভাবিতে ধৈরয পাসরে॥
মহাপুরুষের চিহ্ন, দেহে শোভে ভিন্ন ভিন্ন,
তাবাবলী অঙ্গে শোভা পায়।

মহাভাগবতোত্তম, ভক্তিরসে সদা মগ্ন,
প্রেমদানে অবনী ভাসায় ॥
অহো কি কণ্ঠের ধ্বনি, কোকিলা লজ্জিতা শুনি,
তোলে কিবা সুধা তরঙ্গিণী।
অহো সে মধুর হাসি, উগরে অমিয়া রাশি,
কথা শুনে বিকায় পরাণি ॥
প্রেমরস-ঘনাবর্ত্ত, বিধাতা করি একত্র,
গড়ি কি পাঠাল ধরাতলে ?
একবার যেই হেরে, তার মন প্রাণ হরে,
ভাসে সদা সে প্রেম হিল্লোলে ॥
কবিত্ব, পাণ্ডিত্য সার, প্রেমামৃত পারাবার,
গৌর গোবিন্দ লীলা বর্ণে।
ভাবাবেশে মাতি চলে, ফুটে যেন পদ্মদলে,
কি আবেশে হরি সংকীর্ত্তনে ॥
তাঁর ভালবাসা রীতি, অসীম গুণসম্পত্তি,
মনে হলে হৃদয় বিদরে।
মোর অধ্যয়ন কালে, আকর্ষিয়া কৃপা বলে,
ডুবাইলা অমিয়া পাথারে ॥
তাঁরই বাৎসল্য স্নেহ, সোহাগে লালিত দেহ,
তাঁরই হৃদয় মন প্রাণ।
তাঁর মুই ক্রীতদাস, সেই পদে সদা আশ,
সেই মোর ভজন সাধন ॥"

প্রভু সম্বন্ধে ভক্ত মহাত্মাদের উক্তি অনুভূতি

পাবনার শ্রীশ্রীহারাণ ক্ষেপা (বন্ধুর প্রিয় বুড়ো শিব) সময় সময় প্রভুর জেঠাত দিদি গোলোকমণি দেবীকে নেচে নেচে বলতেন "দিদি, জগা মানুষ নয়, আর আমিও মানুষ নই। তবে জগা রাজা, আমরা তার প্রজা" "জগা গৌর" 'জগা রে জগা' ইত্যাদি শিবের উক্তি প্রিয়ভক্তগণ শুনতেন।

প্রভুর মৌনের পূর্ব্বে নবদ্বীপে লোকগণনার সময়, মানুষের মধ্যে প্রভুকে লোকে গণনা করতে পারে, এই জন্য শিশুর মত শঙ্কা প্রকাশ করে বন্ধুপ্রভু রামীকে সাবধান করে বলেন, "আমি (গণনার সময়) এলে, আমাকে যেন লুকিয়ে রাখা হয়। ওরা আমাকে মানুষের মধ্যে গণনা করে ফেলবে।"

মায়ার অতীত বস্তু অপ্রাকৃত হরিপুরুষকে প্রাকৃত মানুষের মধ্যে গণনা করলে যে জীবের মহা অপরাধ হবে। তাই বন্ধুর এই শিশুসুলভ শঙ্কা।

বন্ধুসুন্দর কৈশোর বয়সে একদিন পর্যটন ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে, জগদম্বার চিহ্নিত প্রিয় সন্তান সর্বজ্ঞ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দৃষ্টিপথে তিনি পতিত হন। পরমহংস দেবের তখন আবিষ্টভাব। অঙ্গুলি নির্দেশে বস্ত্রাবৃত জগদ্বন্ধুকে দেখিয়ে প্রিয় শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তদের বলেন,

"এই জগদ্বন্ধু জগৎ উদ্ধার করবেন। প্রতি ঘরে ঘরে তাঁর পূজা হবে।"

পরমহংস দেবের সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থে এই ঘটনার কথা মুদ্রিত হয়। শ্রীমহেন্দ্রজী প্রণীত 'জগদ্‌গুরু মহামহা-প্রভু জগদ্বন্ধুপ্রভু'র ৪১৮ পৃষ্ঠায় ঘটনার কথা পরে মুদ্রিত হয়। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে প্রভুর জন্মোৎসবে কলিকাতা থেকে ছেপে এই গ্রন্থ অঙ্গনে আসে, ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে একনিষ্ঠ বন্ধুভক্ত প্রেমযোগ-প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্র কবিরাজজীর মুখেও এই ঘটনার কথা শুনেছি।

তখন কিছুকাল পরেই দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ আদি বিভিন্ন শতাব্দীর ত্রিশজন ধর্মপ্রবর্ত্তকের শ্রীমূর্ত্তি তিন সারিতে সাজিয়ে এক চিত্রপট মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, তন্মধ্যে মধ্য সারির প্রথমেই পদ্মাসনবদ্ধ উনিশ বছরের তরুণবয়স্ক শ্রীবন্ধুবিগ্রহ আছেন্। আর তৎকালে প্রভুবন্ধুর পতিতপাবন লীলা আনসারী, ইংলিশম্যান, অমৃতবাজার ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। আবির্ভাবের পর এত অল্প বয়সে, ইহাই ত বন্ধুহরির প্রতি ঘরে ঘরে পূজার সূচনা।

শ্রীজ্ঞানানন্দ অবধূতজী একদিন তাঁর শিষ্য শ্রীকেশবানন্দজীকে প্রভু বন্ধুর স্বরূপ সম্বন্ধে সমাধিস্থ অবস্থায় বলেন,—

"বন্ধুরূপে ভগবান্।" প্রভুর মৌনাবস্থায় এই সমস্ত বার্ত্তা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। শ্রুতিবাণী, 'স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।' ভাগবতী গোপীবাণী, 'প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।' ১০।২৯।৩২, সেই বন্ধু আত্মাই এবার জীব-উদ্ধারণে, প্রভু জগদ্বন্ধু-নাম-রূপ ধরে এসেছেন।

শ্রীহরনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীঅটল নন্দাজী প্রভুর মৌনের পূর্বে প্রভুর বৃন্দাবনে যাতায়াতের সময়ে প্রভুর দর্শন ও আদেশ উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রভুর মৌনাবস্থায় তিনি বন্ধুসেবক মহেন্দ্রজীকে জানান যে, তাঁরা জগদ্বন্ধুকে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গজ্ঞানে ও নিজ গুরুদেবকে নিত্যানন্দজ্ঞানে অর্চনা করেন।

প্রভুর মহামৌনাবস্থার সময়ে একদিন শিলচরের প্রসিদ্ধ সাধু শ্রীদয়ানন্দ স্বামীজী প্রভুবন্ধু সম্বন্ধে শ্রীতারিণী ঠাকুর মহাশয়কে বলেন, আমি ওঁরই। ওঁরই আদেশ উপদেশ নিয়ে সমস্ত কাজ করে থাকি।

প্রভুর মৌনাবস্থায় ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে এসে প্রভু সম্বন্ধে অনুভূতি ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্যের ইঙ্গিত সংগ্রহের আশায় আমাদের অজ্ঞাতনামা বহু মহাত্মা পুরুষের এবং শ্রীরাম দাস কাঠিয়া বাবাজী, শ্রীসমাধি প্রকাশ আরণ্যজী, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীজী, প্রমুখ বহু সাধু মহাত্মার অঙ্গনে গতায়াত, সাময়িকভাবে উপস্থিতি ও অবস্থিতি, ও প্রভুর দর্শন ঘটেছে। মহামৌনাবস্থায় প্রভু বাজিতপুরে সাধন কুটীরে প্রভুর জন্য অনুষ্ঠিত কীর্ত্তন মধ্যে শ্রীপ্রণবানন্দজীকে ও কাশী বৃন্দাবন আদি স্থানে বহু সাধু সজ্জনকে অলৌকিকভাবে দর্শন দেন ও তাঁদের মধ্যে উদ্ধারণ শক্তি সঞ্চার করেন। বাজিতপুরে ঐরূপভাবে প্রভুর দর্শন দান প্রণবানন্দজী নিজে শিষ্যদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

প্রভুবন্ধুর পরিচয় দ্যোতক, মহাত্মা শ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথজীর কতিপয় উক্তি ও ভক্তসুখদায়ক বার্ত্তা এস্থানে উদ্ধৃত করলাম।

"শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের লীলার প্রথমেই দেখি, ব্রজলীলা।

দ্বিতীয় পতিতপাবন অধমতারণ লীলা। কলিকাতা রামবাগানের পতিত ডোমগণের প্রতি কেউ কখনো দৃষ্টিপাত করে নাই। সেই অনাচারী মদ্যপ বাগ্দীদের হরিনাম দান করে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর আপনার চেয়েও আপনার করে নিয়েছিলেন। তারা বন্ধুসুন্দরকে পরমাত্মীয় বলে জানতো, 'জগদ্বন্ধু আমাদের, আমরা তাঁর।'

ফরিদপুরের উপান্তবর্ত্তী সমাজের উপেক্ষিত শূকরভোজী বুনো বাগদীদের প্রতি কেউ ফিরে চাহে নাই। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর হরিনাম প্রেমপ্লাবনে তাদের আপন করে নেন। তাদের ধর্মান্তর গ্রহণের প্রলোভন দূরীভূত করে নবজীবন দান করেন। বুনোদের সর্দার রজনী বাগদীর নাম দেন 'হরিদাস মোহন্ত'। তাদের সম্প্রদায়ের নাম দিয়েছিলেন, মোহন্ত সম্প্রদায়।

শোকাতুরা পতিতা নারী শ্রীসুরতকুমারী আকুল প্রাণে তাঁর শরণাগতা হন, পতিতা ভজনময়ী হয়ে, প্রেমভক্তি লাভে ধন্য হন। তাঁর নাম দেন সুরমাতা।

ভারতের বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রমধর্ম। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের তাতে উপেক্ষা প্রদর্শনের কারণ চিন্তা করলে স্বতঃই মনে হয়, সেই অধমতারণ পতিতপাবনের আবির্ভাব হয়েছিল, অধম ও পতিতগণকে উদ্ধার করবার জন্য। জাতির বাঁধন থাকলে তাঁর পতিতপাবনী প্রেমলীলা সুষ্ঠুভাবে হতো না।...

শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমাধবদাসজী, শ্রীমনোহরদাসজী, ভোতড়া শ্রীনিত্যানন্দদাস, শ্রীজগদীশবাবা প্রমুখ মহাত্মগণ তরুণ-কান্ত শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের রূপ-গুণ-মাধুর্যে মুগ্ধ ছিলেন।

একবার (১৩০০ বঙ্গাব্দে) শ্রীধাম নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষে রটে যায়, গৌরাঙ্গের নূতন অবতার জগদ্বন্ধুসুন্দর। চুঁচুড়ায় ভাবাবিষ্ট হয়ে পরম একনিষ্ঠ গৌরভক্ত অন্নদাবাবু একদিন বললেন, জীব উদ্ধারের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর নাম জগদ্বন্ধু। একদিন অন্নদাবাবু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলেন, প্রভু জগদ্বন্ধুর দেখা কালই পাওয়া যাবে। নবদ্বীপধামের ষ্টীমারে তিনি থাকবেন।...পরদিন অন্নদা দত্ত, শিশিরকুমার প্রভৃতি ষ্টীমারে প্রভুকে আবিষ্কার করেন। তাঁরা তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে কৃতার্থ হন। ইহার কিছুদিন পর শিশিরকুমার পত্রিকায় প্রভুর পুণ্য কাহিনী প্রকাশ করে বলেন।

...তাঁরা প্রভুকে নবগৌরাঙ্গ বলে প্রচার করেন।

তিনি নিজে কখনো কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। তাঁর শ্রীমুখের বাণী, 'মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদ্গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।'

তিনি বলেছেন, 'ওরে এটা আমার অপ্রাকৃত দেহ, স্থান কালের অধীন নয়।...এবার সময় এলেই অণু পরমাণুগুলোকে পর্যন্ত আমার স্বরূপ আস্বাদন করাব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

নবদ্বীপের হরিসভায় শ্রীবন্ধুসুন্দরকে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়।

'তাঁর শ্রীমুখে তাঁর আত্মপরিচয় জেনে আমাদের জ্ঞাতব্য বক্তব্য আর কিছুই নাই। নমো নমস্তে·· প্রভুবন্ধুসুন্দর। তোমার [illegible] ব্যবস্থা তুমি কর, আমরা যন্ত্রমাত্র' সীতানাথ।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ দেবের শিষ্য, বন্ধুর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত ব্রজবালা বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দজীর লীলাম্বুধি গ্রন্থ হতে প্রভুবন্ধুর জয়ঘোষক কিছুবার্ত্তা এখানে উদ্ধৃত হল।

'জয় প্রভু জগদ্বন্ধু জগদুদ্ধারণ।
মহাউদ্ধারণ প্রভু শ্রীহরিপুরুষ।
বালকৃষ্ণ প্রাণারাম, বন্ধু নয়নাভিরাম,
তুমি গৌরকৃষ্ণ রাম সুরেশ্বর নারায়ণ।'
'কৃৎস্ন বিশ্ব চরাচর রাধে রাধে বলি
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ জগদ্বন্ধু জয়,
গাইবে পঞ্চম স্বরে পরম হরিষে।'

বালকৃষ্ণজীর মুখেও মধুর মধুর বন্ধুবার্তা শোনার ভাগ্য আমার ঘটেছে। জয়নিতাই দেব বলেছেন, তৎকালে ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রভুকে একাধারে বৈজ্ঞানিকের নিউটন ও ধর্মপিপাসুদের পক্ষে ত্রাণকর্তা যীশুর অবতার বলে প্রচার করা হয়। জয়নিতাই দেবের মুখে শ্রুত, ইংলিশম্যানের প্রচলিত বার্তার কিয়দংশ নিম্নলিখিতরূপ ছিল,

'Whispers are now abroad of the advent of a New Incarnation in whom Science will find a Newton and religion a Saviour'.

ফরিদপুরের মধুরকণ্ঠ গায়ক হরিচরণ আচার্যকে বন্ধুপ্রভু সখ্যভাবে 'মধুমঙ্গল' বলে ডাকতেন, সময়ে তাঁর কাছ থেকে কাঁচামিঠে আম চেয়ে নিয়ে ভক্ষণও করতেন। একদিন প্রভুর [illegible] [illegible]

জ্যোতির্ময় ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মধুমঙ্গল বলেন, 'প্রভু, আপনার চরণে চাঁদ দেখছি!' ভক্তের কাছে ধরা প'ড়ে, চরণ সরিয়ে নিয়ে বন্ধু মধুর ভঙ্গীতে উত্তর দেন, 'ও চাঁদ নয়, প্যাঁদ!'

১৩০০ বঙ্গাব্দে নবদ্বীপে গৌরহরির আর্বিভাব উৎসব কালে প্রভুবন্ধুকে নবগৌরাঙ্গ বলে ভক্তগণ প্রচার করতে থাকলে, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ভয়ে আত্মগোপনেচ্ছু প্রভুবন্ধু টেলিগ্রামে কলিকাতা হতে রমেশবাবুকে আনিয়ে, রাত্রে গোপনে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হয়ে ভীতত্রস্তভাবে দ্রুতবেগে হাসখালি পর্যন্ত হেঁটে যান। তাতে রমেশচন্দ্রকে মুত্রবেগ রোধ করে প্রভুর পিছনে দৌড়ে চলতে হয়। ওখান থেকে অশ্বশকটে বগুলা পৌঁছে, ট্রেনযোগে প্রভু ফরিদপুর যান। ফরিদপুরে কেউ যদি ধরতে আসে, এই ধরা পড়ার ভয়ে প্রভু আবার ফরিদপুর হতে পাবনা ও পাবনা হতে তাড়াসে গিয়ে আত্মগোপন করেন। প্রভু সেবার রমেশবাবুকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

'রমেশ, তুই শিশির ও ভারতীকে বলিস, তারা যেন এভাবে আমাকে প্রচার না করে। বাতির আলোতে সূর্য প্রকাশ করতে হয় না। আমি সূর্যের মত স্বপ্রকাশ। যখন সময় হবে, তখন প্রকাশ হব।'

প্রভু কর্তৃক প্রচারে এইরূপ বাধা প্রাপ্ত হয়েও দিব্যদ্রষ্টা নিজ-জন প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় আচার্যের নিদেশের মর্মানুভূতি ও

বেদনাভরা আর্তি পত্রযোগে স্বয়ং প্রভুকে ও ভক্ত, জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেন। সেই পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল।

"প্রাণ কানাইয়া সে ত তুই রে,
তবে মিলন বঞ্চিত কাঁহে মুই রে!'
'তুই গোলক অবতার, নীচ নরক মুই ছার,
তবু কেন প্রেমে তোরে আলিঙ্গিতে চাই রে!
ব্রজের সে কালাচাঁদ, নদীয়ার গোরাচাঁদ,
সংশয় ত নাই ইথে সংশয় ত নাই রে!'
'ছিনু আমি তোর সাথে, সংশয় নাহিত ইথে,
তোর প্রিয়, কোন-রূপে, স্মরণ ত নাইরে!'
'পতিত উদ্ধার কর, তোরই দোহাই রে,
বুকে আয় প্রাণ কানাই রে।'

প্রাচীনদের মধ্যে চম্পটী ঠাকুর, শ্রীরামদাসজী, ছোট জয়নিতাই আদি ভক্তগণ 'ভজ জগদ্বন্ধু, কহ জগদ্বন্ধু' ইত্যাদি প্রাণ ভরে গেয়ে মহানামের টহল দিয়েছেন। শ্রীপাদ জয়নিতাইকে মহানাম কীর্ত্তনের মধ্যে মালসাট মেরে বন্ধুর জয়ধ্বনি দিয়ে বাহু আস্ফোটন করে তুঙ্গ উল্লম্ফনে নৃত্য করতে দেখেছি। মহানাম-প্রচারণে মহেন্দ্রজীর নেতৃত্ব ও সিংহবিক্রম প্রত্যক্ষ করেছি। ব্রহ্মচারী শ্রীরমেশচন্দ্রকে করতাল বাজিয়ে 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ' গাইতে গাইতে অঝোরে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। ফরিদপুরের, পাবনার, বৃন্দাবনের নবদ্বীপের ঢাকার ডাহাপাড়ার বাকচরের রাজবাগানের, [illegible], ও অন্যান্য বহুস্থানের [illegible] বর্ষণ করেছি।

প্রভুবন্ধুর অন্তরঙ্গ নিজজন এই সমস্ত মহামহিম ভক্তগণের জয় হোক!

উপসংহার

প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা প্রাচীনেরা প্রায় সকলেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। প্রভুর মহামৌনাবস্থায় যারা তাঁর আশ্রয় নেন, তন্মধ্যে অল্প কয়েক জন আমাদের সঙ্গে এখনও আছেন।

১৩২৮ সনে পৌষমাসে পাটনা নগরীতে নিখিলভারত কীর্ত্তন সম্মিলনী হয়। কুঞ্জদাসজীর নেতৃত্বে মহানাম সম্প্রদায় সেখানে উপস্থিত হয়ে মহানাম-রোলে দিগন্ত মুখরিত করেন। আমারও যোগদানের ভাগ্য ঘটে।

হরিদ্বার, প্রয়াগ ও নাসিক কুম্ভমেলায় পরপর তিনবার মহানাম-সম্প্রদায়ের প্রেমদাস প্রমুখ বান্ধবগণ ঐ ঐ স্থানে মাস-ব্যাপী মহানাম কীর্ত্তন ও নগর সংকীর্তনাদির দ্বারা মহাবতারীর জয় ঘোষণা করেন। হরিদ্বার ও প্রয়াগ কুম্ভে আমার মহানাম প্রচারণের ভাগ্য ঘটে।

আমার সহপাঠী, প্রেমদাস বন্ধুকথা প্রচারণে ও মহানাম যজ্ঞের আনুকূল্যার্থে অর্থাদি সংগ্রহে মহেন্দ্রজী কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে বার্মা, বোম্বে প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে গমনে ঐ সব কার্য সুসম্পন্ন করতে অনেক ক্লেশ ও কঠোরতা সহ্য করেছেন।

আমেরিকা চিকাগো-শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মিলনে (১৯৩৩

Fellowship of Faithsএ) মহেন্দ্রজী প্রেরিত শ্রীমান্ মহানামব্রত যোগদান করেন (ইং ১৯৩৩এ) এবং তথায় নব অবতারীর বার্তা (A ne / World Saviour's Message) ঘোষণা করেন। তিনি উক্ত ধর্মসম্মিলনের আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদ লাভ করে আমেরিকার বিশিষ্ট ৬৩টি সহরে সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলের সম্মুখে ৩৫৪টি ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বহু স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও রোটারী সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করেন। ভারতের সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য, মহাপ্রভুর দান এবং প্রভুবন্ধুর দান, ইহাই তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল। তাঁর প্রচারে বহু নরনারী বন্ধুসুন্দরকে আরাধ্য দেবতা জেনে মহানাম অবলম্বনে শরণাগতি গ্রহণ করেন।

শ্রীমান্ মহানামব্রত আমেরিকায় পাঁচ বৎসর আট মাস কাল (ইং ১৯৩৩ থেকে ইং ১৯৩৯)পর্য্যন্ত ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি একবার (১৯৩৭এ) লণ্ডন এসে বিশ্বধর্ম সম্মিলনে (World Congress of Faith এ] যোগ দিয়ে প্রভুর বার্তা ঘোষণা করেন।

আমেরিকায় থাকাকালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত মহানামব্রত শ্রীজীবগোস্বামীর দর্শন সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট অভিনব নিবন্ধ রচনা করে বৈষ্ণব বেদান্তের নিগূঢ় মর্ম পাশ্চাত্ত্য দেশের দার্শনিক সমাজে জানিয়ে দিয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ্. ডি. (Ph. D.) উপাধি লাভ করেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু সংকীর্তনে লিখেছেন, "শ্রীজীব বন্ধুসহায়' বস্তুতঃ শ্রীজীবগোস্বামী পাদের দার্শনিকতার উপরই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের

ভিত্তি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রসতত্ত্বের নির্য্যাসই বন্ধুসুন্দরের লীলায় মূর্তিমন্ত। শ্রীজীবদর্শনের গবেষণা ক'রে মহানামব্রত নিশ্চয়ই 'বন্ধুলীলার সহায়ক' হয়েছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে বহু নরনারী উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর মুখে জীবকল্যাণপ্রদ ভাগবত কথা ও বন্ধুবার্তা শুনে ধন্য হচ্ছেন।

পরমবন্ধু ভজনশীল শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী পরবর্তী সময়ে ক্রমে প্রভুর আবির্ভাব-ভূমি ডাহাপাড়া গিয়ে শ্রীমন্দির স্থাপন ও তথায় প্রভুর নিত্যসেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি জয়বন্ধু, কল্যাণ বন্ধু, হরিদাস, বন্ধুদাস (২নং), প্রাণবন্ধু, নয়নবন্ধু, বামাচুলাল, ব্রজবাসী বাবাজী মহারাজ, হরিবন্ধু, বন্ধুকমল (২নং), বন্ধুমঙ্গল, বন্ধু বিনোদ, জগৎমঙ্গল, ভুবনমঙ্গল, বন্ধুকৃপানন্দ, প্রমুখ তাঁর অনুরক্ত অনুগত জন সঙ্গে নিয়ে শ্রীধামে নিত্য কীর্ত্তন, বার্ষিক জন্মোৎসবাদি সুনির্ব্বাহ করে ও বন্ধু-গ্রন্থাদি প্রচার পূর্ব্বক রাঢ়দেশে তথা বঙ্গদেশে বন্ধু-মহানামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন।

ডাহাপাড়ায় বন্ধুগোপাল আর একটি পৃথক্ বন্ধুমঠ স্থাপন করে জীবদ্দশায় অনেক বৎসর দুই সন্ধ্যা বন্ধু-মহানামের টহল দিয়ে জীবকল্যাণ কার্যে ব্রতী থাকেন; ডাহাপাড়ায় বন্ধু-মস্তকমুণ্ডন মন্দির গঙ্গাতীরে পরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কুঞ্জদাদার শিষ্য বামাচুলালের তত্ত্বাবধানে থাকে ও সেখানে নিত্যসেবাকার্য, পাঠ ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমৎ ধলাশ্যামদাসজী প্রভুর আদরের লীলাস্থলী বাকচর শ্রীঅঙ্গনে নিত্য সেবাপূজা, উৎসব আদির অনুষ্ঠান, কীর্ত্তন ও শ্রীঅঙ্গন

রক্ষা বিধান নিয়ে জীবদ্দশা পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর সহায়ক ভাবে কালোশ্যামদাসজী অনেক বৎসর বাকচর অঙ্গনে থেকে, পরে কলিকাতা অঞ্চলে গিয়ে বন্ধুবার্ত্তা প্রচারে ব্রতী হন। বন্ধুস্মরণ অনেক বৎসর ধলাশ্যামদার সহকারী থেকে তথায় সেবাকার্য নির্বাহ করেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর বাল্যকৈশোর লীলাস্থলী ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসজী বন্ধু মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে তথায় নিত্যসেবাপূজা, পাঠ, কীর্তন ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান নিয়ে জীবিত কাল পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকেন।

১৩৪৭ সনে ১লা অগ্রহায়ণ শ্রীঅঙ্গন মহানাম যজ্ঞক্ষেত্র হতে মহেন্দ্রজীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় 'সহস্র মাদল' ফরিদপুর সহরময় বিরাট নগর কীর্তনে বিপুল আনন্দের প্রকাশ হয় এবং পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ও অন্যত্র হরিনামের অপূর্ব্ব সাড়া পড়ে যায়।

বন্ধুপ্রিয় শ্রীনবদ্বীপ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত প্রভু সম্বন্ধে 'দশামাধুরী' আদিগ্রন্থ প্রণয়ন, বক্তৃতা ও কীর্তনদ্বারা বন্ধু অভিপ্রেত কার্য করেছেন। যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় প্রভুর মৌনাবস্থার শেষভাগ থেকেই প্রভুর সেবা, প্রভু সম্বন্ধে 'প্রেমযোগ' 'নবযুগের সাধনা' 'মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু' আদি গ্রন্থ-প্রণয়ন, প্রচারণ এবং মহানাম সম্প্রদায়ের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা প্রভুর মহাউদ্ধারণ কার্যের সহায়ক হন।

প্রভুর মৌনের শেষভাগে রমেশবাবুর অনুগত বহু বন্ধুভক্ত ও রাজনাথ দাদা প্রমুখ ভক্তগণ ঢাকা, মুড়াপাড়া অঞ্চলে, চৌধুরী

সুরেশদা, মহাধর্মজ্যোতি (শশীদাদা) আদি মৈমনসিং অঞ্চলে, রাজেন্দ্রদা, শ্রীঅনন্তবিজয় আদি ভক্তবৃন্দ বরিশাল অঞ্চলে এবং পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে আরও বহু ভক্ত বন্ধু মহানাম প্রচারণে বিশেষ উদ্যোগী হন। অধ্যাপক রসিক সেন আদি ভক্তগণ মৌনী প্রভু সম্বন্ধে ভারতবর্ষ আদি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক প্রফুল্ল সরকার এম্, এ, পি, এইচ্, ডি, অধ্যাপক কুঞ্জ দত্ত, অধ্যাপক নিরঞ্জন ভট্টাচার্য আদি বান্ধবগণ গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা বক্তৃতা আদি দ্বারা প্রভুবন্ধুর প্রচারণ করেন। রমেশ বাবুর অনুগত শ্রীমাখন ধর, শ্রীনরেন্দ্র বসু আদি বন্ধুপ্রিয়গণ মহাউদ্ধারণ জগদ্বন্ধু বার্ত্তা আদি মুদ্রণ ও প্রকাশন দ্বারা জীবকল্যাণ কার্যে ব্রত হন। ক্রমশঃ শ্রীমান্ প্রশান্ত উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'মধুমাধুরী' পত্রিকায় বন্ধুকথা প্রকাশ হতে থাকেন।

'তোমরা রাঢ়ি সুরে, রাঢ়ি তালে কীর্তন করো' প্রভুর এই আদেশ মত গোপীবন্ধুদাসজী ঐ সব সুর তাল অভ্যাস করে অঙ্গনে ও অন্যত্র বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজলীলা ও গৌরলীলা এবং বন্ধুলীলা কীর্তন দ্বারা' ভক্তবৃন্দকে বহুবৎসর অপার্থিব আনন্দ দান করেছেন। তিনি সময় সময় ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতের আলোচনা দ্বারাও ভক্তসমাজের সুখদায়ক হয়েছিলেন। ১৩২৫ সনে ইনি সম্প্রদায়ে যোগদানকালে তালে করতাল বাজাতে পারতেন না, তাই লজ্জায় রাত্রে আমাদের দোহার হতেন। প্রভুর অপূর্ব কৃপার দৃষ্টান্ত হয়ে পরে ইনি পরম অধিকারী পদকীর্ত্তনীয়া হন।

জীবাধম আমাকে প্রভু বন্ধু মহামৌনাবস্থায় মহানাম সম্প্রদায়

গঠনের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁর অভয় চরণ পাশে টেনে নেন।
মহানাম প্রচারণের উচ্চ অঙ্গনে বন্ধুকিঙ্করত্ব পাবার ভাগ্য পেয়ে প্রায়
বৎসর কুড়ি পর নিজ কর্মবৈগুণ্যে ভবকূপে পতিত হই, এখন প্রভু
রচিত পদের মধ্যে নিজের অবস্থা দেখি ও ভাবি,

"মুই জীবাধম, ভজন অক্ষম, রিপুসঙ্গে সদাগতি।
শকতি বিতরি, যা করহে হরি, মুই অতি দুষ্টমতি॥

করুণাবতার, কহে ত্রিসংসার, বারেক কটাক্ষ কর।
মুই হে পতিত, ত্রিতাপে তাপিত, ত্বরা এসে কেশে ধর॥"

অধমের দুরবস্থা দেখে পরম দয়াল বন্ধুহরি চিরদিন এই অধমকে কেশে ধরে, ভাগবতাদি পাঠে, তাঁর কীর্ত্তনে, বন্ধুবার্ত্তাদি লিখনে ও প্রচারণে রুচি ও শক্তি দিয়ে রক্ষা করে আসছেন, এইটুকুই পরম সান্ত্বনা। অঙ্গনে ১৩২৩, অগ্রহায়ণে শুক্লা দ্বিতীয়াতে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রথম কীর্ত্তনে আমার যোগদানের ভাগ্যও ঘটে ছিল।

মহানাম সম্প্রদায়ের পুরাতনদের মধ্যে শ্রীমান্ উদ্ধারণ কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে মহানাম কীর্ত্তন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, নগর কীর্ত্তন, বন্ধুমন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দ্বারা শেষভাগে বন্ধু অভিপ্রেত কার্য্যাদি পরিচালনা করেন ও শ্রীমান্ বৃন্দাবন মহাউদ্ধারণ মঠে থেকে কীর্ত্তন, কীর্ত্তনে ও মৃদঙ্গবাদনে শিক্ষাদান ইত্যাদি বন্ধু অভিপ্রেত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

লীলাপ্রকাশ অনেক কাল আঙ্গিনায় ওপরে জলপাইগুড়ি আদি স্থানে বন্ধুসেবা, কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ, বন্ধুকথা প্রচার আদি নিয়ে

প্রভু অভিপ্রেত কার্যে রত থাকেন। তিনি কতককাল মৌনব্রত ও কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা পালন ও করেছেন।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ শুক্লা দ্বিতীয়াতে অঙ্গনে মহানাম সম্প্রদায়, মহেন্দ্রজীর ও তাঁর প্রধান সহকারী কুঞ্জদাসজীর নেতৃত্বেগঠিত হয়ে, নানাস্থানে বন্ধু মহানাম প্রচার করেন এবং ১৩২৮, ২রা কার্ত্তিক হতে ফরিদপুর অঙ্গনে মহানাম যজ্ঞ পরিচালনা করতে থাকেন। এর মধ্যে অনেক নূতন ত্যাগী ভক্ত এসে যোগ দেন, কতকজন বিভিন্ন বন্ধু আশ্রমে ধামে ও মঠে থাকেন, কতক জন পরলোকগত হন বা স্বেচ্ছায় অন্যত্র গমন করেন। ১৩৭৮, ৭ই বৈশাখ হিংস্র পাক সৈন্য মহানামযজ্ঞ আক্রমণ করে আট জন ব্রহ্মচারী ভক্তকে হত্যা করলে অহোরাত্র পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী মহানাম যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটে; তবে ভারতে বঙ্গে, নানাস্থানে হরিনাম মহানামে অহোরাত্র কীর্ত্তনযজ্ঞ চলতে থাকায় হরিনাম মহাযজ্ঞাগ্নি অনির্বাপিতই ছিলেন এবং ১৩৭৮, ২রা কার্ত্তিক কলিকাতা মহাউদ্ধারণ মঠে অহোরাত্র অবিরাম মহানামযজ্ঞ আবার প্রকাশ হন। তাতে উপস্থিত থাকার ভাগ্য আমার ঘটে। কয়েক বৎসর পর, বাংলাদেশে ও শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর আসনস্থলে আবার অহোরাত্র অবিরাম মহানামযজ্ঞ চলতে থাকেন।

এখানে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচারক পুরাতন ও নূতন ভক্তদের মোটামুটি একটি নাম তালিকা প্রকাশ করা হল।

মহেন্দ্রজী, কুঞ্জদাসজী, রোহিণী (তেজোনারায়ণ), প্রেমদাস (আমার সহপাঠী, গোয়ালন্দ হাই স্কুলের ছাত্র যতীন্দ্র), ভবতারণ

(গোয়ালন্দ হাই স্কুলের ছাত্র বিশ্বম্ভর), কৃষ্ণলাল (রাজা সূর্যকুমার ইন্‌ষ্টিটিউটের বালকছাত্র), সতীশ কর, সতীশ মুখার্জী, নিত্যসেবক, (প্রথমবার বনবিহারী নামে পরিচিত) বৃন্দাবন, বন্ধুদাস, জগত্তারণ, শান্তি, রসময়, আনন্দ, বলভদ্র, সর্বানন্দ, সেবানন্দ, পারিষদ, তরুণবন্ধু (এম্. এ.), শুদ্ধানন্দ, কীর্ত্তনব্রত, বন্ধুবিলাস, ১ নং হরিদাস, বন্ধুকিঙ্কর ১নং ও ২নং, শিশুবন্ধুদাস, পুরীদাস, বন্ধুকিশোর ১নং ও ২নং, ধর্মব্রত, উদ্ধব, বন্ধুজীবন, বন্ধুগোপাল, চরণদাস, লীলাপ্রকাশ, কল্যাণবন্ধু, সত্যব্রত, ব্রজবন্ধু, সত্যসেবক, বিজয়বন্ধু, সত্যস্বরূপ, নিদানবন্ধু, বন্ধুশরণ, কানাই বন্ধু, উৎপলবন্ধু, দিব্য আঁখি, অনন্তবিজয়, বন্ধুগৌরব, মাখন, মহাদেব, কৃষ্ণ, সন্তোষ, গুরুপ্রসন্ন, হরিপ্রসন্ন, বিজনবন্ধু, জয়বন্ধু, বন্ধুগোবিন্দ, ব্রহ্মাণ্ডবন্ধু, গোপীবন্ধুদাস, মহানামব্রত (এম্. এ., পি. এইচ্ ডি), ওঙ্কারবন্ধু হরিবন্ধু, বন্ধুপদ, অমরবন্ধু, অরুণবন্ধু, ভাবপ্রকাশ, বন্ধুপ্রসাদ, ভাবলহর, পরিমল, বিজ্ঞানবন্ধু (এম্. এ.), দীনবন্ধু, অনুরাগ, অনুকূল, অঙ্গন-বন্ধু, অঙ্গনদুলাল, বন্ধুকমল ১নং, বিমলবন্ধু, নবনীবন্ধু, নন্দদাস, কৃষ্ণকুমার, শচীনন্দন, বিবেকবন্ধু ১নং (জয়প্রভু দাস), ক্ষিতিবন্ধু, গৌরবন্ধু, বিশ্ববন্ধু, রমেশ সাধু, ২নং হরিদাস, বন্ধুকরুণা, বন্ধুকিরণ, বাবাজী মহাশয়, হরিবোল, বোবাসাধু, বিধাতৃ, রবি, মোহন্তগণ, জীবনবন্ধু, বিবেকবন্ধু ২নং, ভগবতীচরণ, পুরুষোত্তম, বন্ধুদাস ৩নং, এবং আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আরও অগণিত ত্যাগী ও গৃহী ভক্ত ও ভক্তা ও শান্তিদেবী, পাগলী দিদি আদি মাতৃগণ, নানাভাবে নানাস্থানে প্রভুবন্ধুর মহানাম প্রচারণে ও সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করবার ভাগ্য

পেয়েছেন। তাঁরা সকলেই যথাযোগ্যভাবে আমার স্নেহপ্রীতির পাত্র ও পাত্রী এবং মাননীয় ও মাননীয়া। বার্ত্তায় আমার লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিস্মৃতির জন্য অনুক্তনামা ভক্ত সকলের নিকট যুক্ত-করে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।

উপক্রমণিকা

উপসংহার লিখেছি। ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে, প্রভুর লীলা বুঝি শেষ হয়ে গেল। প্রভু বলেছেন, 'আমার লীলা সহস্র বৎসর চলবে।' "আমার এতো অপ্রাকৃত দেহ; দেশ ও কালের অধীন নয়।"

"চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম্ম সংস্থাপন করবো, তবে জানবি জগদ্বন্ধুর লীলা হবে।"

'যখন সময় হবে, তখন প্রকাশ হব।" "আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।" "হরি শব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয়।" এই আবার উপক্রমণিকা লিখছি। প্রভুর অনেক কাজ বাকি আছে। এই ত কেবল আরম্ভ। প্রকৃতির অনুকূলে তাঁর লীলা চলছে। একটি গাছ যেমন প্রত্যহই কিছুটা বাড়ে, তখনই ধরা পড়ে না, ছ'মাস পর বৃদ্ধি বুঝা যায়, সেইরূপ লীলা হয়ে গেলে, পরে উহা ধরা পড়ে, জানা যায়। এই দশায় যোগমায়া-সমাবৃত হয়ে বন্ধু বাহ্যতঃ অদৃশ্য হয়ে থাকলেও, তাঁর এই গূঢ় বন্ধুলীলায় তিনি প্রকটই আছেন।

ভাগবতীয় শাস্ত্রে আছে, দশম দশায় শ্রীমতীর মৃত্যুদশা ঘটেছিল,

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

হরিকথায় প্রভু লিখেছেন,

'দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল, নবদ্বার বন্ধ হল,
শবপ্রায় পড়ে কলেবর।'

প্রভু নিজের ত্রয়োদশ দশা আস্বাদনের কথা বলেছেন। শ্রীমতীর দশম দশা, বন্ধুর ত্রয়োদশ দশা। শুদ্ধ মাধুর্য, বালকত্ব, তন্ময়ত্বের মধ্যে জীবউদ্ধারণ 'অন্যতম' ভজনরস। হরিকথায় 'অলসে' বন্ধু লিখেছেন—

"অলস ভজন-রস, জীব-উদ্ধারণ।
বন্ধু-গীতি, জনকৃতি, মহাপ্রচারণ॥"

"অবশ, দ্বাদশভাব" "প্রভু বলে, লো বিলাব" (কল্যাণকুণ্ড)

জীব উদ্ধারণে, মহাপ্রলয়গ্রহণে, ত্রয়োদশ দশা আস্বাদনে, প্রেমঘন-বিগ্রহ বন্ধুসুন্দরের এই রসবিহ্বল অচৈতন্যা মহামৃত্যুদশা ঘটেছে। কোনো কোনো মর্মী ভক্তের অনুভব, এটি প্রভুর 'মহালস' অবস্থা।

'জয় জয় মহানাম জীবভজন। বন্ধুবুদ্ধি ক্ষ্মা-ঋদ্ধি মহাউদ্ধারণ।'

শ্রীমতী সংকীর্তন মহানামই মহাউদ্ধারণ, ইহাই জীবের ভজন, পৃথিবীর পরম সম্পদ্ (ক্ষ্মা-ঋদ্ধি)। তাঁর এই মহানাম-রসবিহ্বলতা হতেই তাঁর "ঘাটে ঘাটে যমুনা হবে, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হবে, গুরুত্ব

প্রকাশ হবে", এই মহাবাণী সাফল্যমণ্ডিত হয়ে জগন্ময় ব্রজভাবের প্রতিষ্ঠা হবে।

প্রভুবন্ধু বাহ্যতঃ লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়ার পর হতেই "জগদ্বন্ধুর মৃত্যু, হরিনাম শক্তি" তাঁর এই বাণী সত্য হয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ২রা কার্তিক, ১৩২৮ সনে আরব্ধ অবিরাম অহো-রাত্র হরিনাম মহানাম যজ্ঞ ১৩৮৭ সনে অর্দ্ধ শতাব্দী পার হোয়ে প্রায় ষাট (৬০) বৎসরে স্থিতিলাভ করল। ক্রমশঃ আর চলতে থাকবে। তাছাড়া এই হরিনাম যজ্ঞের আরম্ভের বহু পরে কয়েক বৎসর যাবৎ নানাস্থানে 'হরেকৃষ্ণ', 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' ইত্যাদি হরিনামে দিবারাত্র কীর্তনযজ্ঞ চলছেন। প্রলয়শক্তি বিনাশে, এই ভাবে নানাস্থানে অষ্টপ্রহর, ছাপ্পান্ন প্রহর ইত্যাদি সংকল্পেও হরিনাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রায় সারা বৎসর ভরেই চলছে। কীর্তন-আনন্দরূপে বন্ধু আছেন, তিনি না থাকলে, কিছুই থাকত না। বন্ধু না থাকলে 'কি বা রয় রে ?'

প্রভুর বাণীতে আছে। 'বন্ধু নাই যায়', 'ইচ্ছাকৃতি দ্বারা অবতার' "ইচ্ছাধীন অবতার কি ভয় রে! বন্ধু নাই, না-না-না; কিবা রয় রে!" 'হরিনামে দেহ হয়' 'হরি শব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয়' 'হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু' 'আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।' 'দেখবি, পৃথিবীর সমস্ত লোক একই সময়ে আমাকে দেখবে।'

তাঁর শ্রীমুখের বাণীর একটি অক্ষরও কোনোদিন মিথ্যা হয় নাই, হবেও না। প্রভুবন্ধুর মহাপ্রকাশ হবেই।

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ-দিদৃক্ষাকুসুমস্তবকঃ

হরি-হরি-রব-সক্তং নৃত্যগীতানুরক্তং
প্রণত-সুজন-পালং কক্ষবক্ষোবিশালম্।
কমলবদনধারি-স্বর্ণকান্তিং শুভেন্দুং
হরিপুরুষ! কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম্?

'রঘু-বটু-দিদি-রানী-তাত-কাহাদি'শব্দৈ
র্বিবিধরুচিরবাক্যৈঃ প্রীতিদানাহ্বয়ন্তম্।
মধুর-রসবিদগ্ধং মোহনানন্দসিন্ধুং
হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম॥ ২

মদন-মহিম-বন্ধু-প্রাণ-গোপালকান্তং
ভজননটনতালৈঃ কৃষ্ণগানৈঃ প্রশান্তম্।
রসিক-মুকুটরত্নং যোগিনাং মানসেন্দুং
হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম্॥ ৩

হৃতকলিবলদীপ্তিং ধ্বস্তকালাম্বুভাতিং
শুভহরিমখভূপং শ্রীমহানাম-রূপম্।
স্মরজয়ি-রসকায়ং দিব্যলাবণ্যসিন্ধুং
হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম্॥ ৪

সরসিজপদযুক্তং কৃষ্ণপাদোপভুক্তং
ধৃতশুভহরিচিহ্নং ধ্যেয়রাধাস্মরত্নম্।
মিলিতললিতকান্তং পুষ্পবন্তং হরীন্দুং
হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম্॥ ৫

নবনটবরবেশং দীর্ঘবাহুং সুকেশং
হলি-বিধি-শিব-সেব্যং বেদবেদান্তভাষ্যম্ ।
ব্রজরতিরসকন্দং প্রেমকারুণ্যসিন্ধুং
হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম্ ॥ ৬
মৃদুল-পুরটগাত্রং পুণ্ডরীকাভনেত্রং
মধুরকরুণহাসং সুন্দরং মূর্ত্তরাগম্ ।
শুচিরুচি-বিধুভালং পঞ্চতত্ত্বাত্মকেন্দুং
হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম্ ॥ ৭
পরিকর-মিলিতাঙ্গং গৌরমূর্ত্তিঞ্চ সাঙ্গং
সুরভিকুসুমগন্ধদ্রোহি-দিব্যাঙ্গগন্ধম্ ।
সুমধুরশিশুরূপং বিশ্বমাধুর্যসিন্ধুং
হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু সেবেয় বন্ধুম্ ॥ ৮*
সেবকোক্তং স্তবঞ্চেমমধীতে যো মহাশয়ঃ ।
নিত্যং ভক্তঃ স আপ্নোতি বন্ধুং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

* ন-ন-ম-য-য-যুতেয়ং 'মালিনী' ভোগিলোকৈঃ (১৫)

দ্বিতীয় খণ্ড

উত্তরার্দ্ধ

গুরুবন্ধুবাণী

সত্যধর্ম্ম। মহাধর্ম্ম। হরিনাম-মাহাত্ম্য।

"চৈতন্য লাভ কর। নৈষ্টিক হও। মাঙ্গল্যে রও। ধর্ম্মে জয়যুক্ত হও। নিত্য ধর্ম্ম-চর্চ্চা। নিত্য সংকীর্ত্তন। নিত্য টহল। নিত্য সন্ধ্যাটহল। নিত্য পাঠ। নিত্য উপদেশ। নিত্য ধর্ম্ম-চর্চ্চা। নিত্য নিষ্ঠাদান।" "ধর্ম, উদ্ধারণ। সংকীর্ত্তন, উদ্ধারণ। মালা, উদ্ধারণ।" "ধর্ম ভিন্ন সব মিথ্যা।" "তোমাদের এই ফকিরের কথা, উপদেশ, কার্য, ব্যবহার, সবই ধর্মময় জানিও।"

"উদ্ধারণ—চৌদ্দমাদল, টহল, নগর জলকীর্ত্তন, নিশাকীর্ত্তন, হরিনাম, লীলাকীর্ত্তন।" 'দশমী গান ভিন্ন ধর্ম নাই।'

"হরিনামের আগে তুচ্ছ ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম।"

"এই মর্ম এক ধর্ম জীব ভজন।"

"ধর্ম—প্রচার, কারুণ্য, ক্ষমা, নিষ্ঠা, গুরু।"

"নিত্য নগরকীর্ত্তন, টহল, নিষ্ঠা, কারুণ্য, অক্রোধ। টহলই শেষ ধর্ম।"

"নগরকীর্ত্তন—লোকালয়ে, গৃহীর গৃহে, জনতার পথে, সর্ব-সমক্ষে, হাটে, বাজারে, নদীতে, পথে।"

"টহল—গৃহ-সন্নিকট, লোকপথে, উষায়, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, প্রেমরোলে, রসাবেশে, নিরালম্বে, চিরদিন।"

"অষ্টমে জয়, সপ্তমে সংকীর্ত্তন, পঞ্চমে কীর্ত্তন, উনপঞ্চাশে মৃদঙ্গন, একান্নতে করতাল। ইতি মহাভাগ।"

"রাত্রিকাল পাপীতাপীর কলুষ-শ্রাদ্ধের সময়। শেষরাত্রে যেন তেন প্রকারে সকলে হরিনাম শুনতে পায়, তাহা করিও।"

"সকলের কৃষ্ণস্মরণ। চৈতন্যনিষ্ঠা।"

"ক্ষমা ও দয়া দান॥ কারুণ্য ভিক্ষা॥"

"শরীর, মন ও প্রাণদ্বারা যথাসাধ্য ধর্মকে রক্ষা করা উচিত। ধর্ম করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু বা যে কোনপ্রকার বিপদ্ হয়, সেও ভাল; কারণ ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মরক্ষা করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়।"

"বহু জন্ম পার হয়ে মানবজন্ম হয়। মানবজন্ম পাপ করিবার জন্য নহে। কৃষ্ণসেবার জন্য।" "সর্ব্বকার্যে দায়ী নর।"

"মহাধর্ম, মহাউদ্ধারণ"

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।" "উদ্ধারণকে নাম কহে, মহাউদ্ধারণকে মহানাম কহে। ত্রিকালের মঙ্গল কৃষ্ণনাম, রক্ষা হরিনাম, উর্দ্ধরতা মহানাম। অনন্তানন্ত নামকে মহানাম কহে। মহানামের প্রথম নাম জগদ্বন্ধু নাম, শেষ নাম অর্থাৎ মহানামের

শেষনাম হরিনাম, মহানামের মধ্যনাম পুরুষ।” “জগদ্বন্ধু পুরুষ হরি” “মহাউচ্চারণ মহানাম” “মহাউচ্চারণের অশুদ্ধি অসাধুতার কারণ।”

“পাপীরা মহানাম না করিয়া লোভী হয়। মহানাম উচ্চারণে জ্ঞান হয়। নাম উচ্চারণে ভক্তি হয়। একান্ন রাগে মহাউদ্ধারণ গান করিতে হয়। অনন্তানন্ত মহানাম মৃদঙ্গে উচ্চারণ করিলে মহামাঙ্গল্য হয়। অর্দ্ধ মহানাম মর্দ্দলন ও গীয়ন হইলে তথায় চতুর্দ্দশ মর্দ্দলন হয়। এক উচ্চারণকে সংকীর্ত্তন কহে।” “উচ্চারণে অপূর্ণ, পূর্ণ হয়।”

“নাম গ্রহণে সবার সমান অধিকার।
ইহাতে নাই জাতিকুল বিচার॥

একথা সর্বতোভাবে সত্য ও সকলের গ্রহণীয় এবং অবলম্বনীয়।”

“তোমরা হরিনাম করলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। আমি হরিনামের, এ’ ভিন্ন আর কারো নই।”

“রাত্রিকাল পাপীতাপীর কলুষশ্রাদ্ধের সময়। শেষ রাত্রে তাহারা শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণনাম শুনিতে পায়, তাহা সহরময় নিত্য করাইবে।”

“ধরে বেঁধে হরিভক্তি—ইহা ভিন্ন কাহারও দ্বারা কিছুই করাতে পারবে না।”

“নাম বিতরণ কর, নাম অনুশীলন কর। আমার কথা সর্ব্বত্র প্রচার কর। ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করাও। সংকীর্ত্তন,

প্রভাতি টহলের উৎসাহ দেও। সর্ব্বত্র কীর্ত্তনসম্প্রদায় গঠন কর।" "নির্ভয়ে আমার কথা যথাতথা ব'লিও। ছোটবড় বাছিও না।"

"হরিনাম শব্দ হরিঠাকুরের নাম নহে। যেমন পুষ্পবৎ বা পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্রসূর্য্য বুঝায়, সেই রকম গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম, সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল বললে সবই বলা হয়। হরিনাম এত উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করবে, যেন সহস্র হস্ত দূর হ'তেও শ্রবণ করা যায়। হরিনাম মহাউদ্ধারণমন্ত্র যাহাতে সমস্ত জীবজন্তু-স্থাবর-জঙ্গম শুনতে পায়, তা ক'রো। সবাকেই হরিনাম শুনাইও, ছোট বড় বাছিও না।"

"হরিনামে, কীর্ত্তনে উদ্দীপনা দিও।"

"বৈদ্যবটিকারূপ হরিনামের সহিত প্রেম, ভক্তি, আগ্রহ, একাগ্রতা ও নিষ্ঠারূপ অনুপান থাকিলে, ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধি পরাভূত হয়। মহাপ্রভুর সহজ পন্থা—করতাল, মর্দ্দল ও নাম হতে ভক্তিপ্রেম উথলে উঠে। সংকীর্তন হ'তেই কৃষ্ণের উৎপত্তি।" "প্রেমভক্তি ভিন্ন জীব শবতুলা, অসার।"

"খোল করতালে ভাই কর সংকীর্তন।"

"অষ্টপাশ কারাবাস হ'বে রে মোচন। (পরিণাম রবে গো)।
বন্ধু বলে অবহেলে এড়াবি শমন ॥ (আর ভয় নাই রে)॥"

"করতাল-রঙ্গে, মধুর মৃদঙ্গে, মত্ত কর চরাচর।"

"সেতারি সেতার খেলে যেন শ্রীমৃদঙ্গ করতাল ধরে।"

"সবে তালে তালে, খোল করতালে, কর হরিগুণ গান।"

"আয় সবে ভাই, খোল করতালে, আনন্দে হরিগুণ গাইরে॥"

"কেহ যেন কবির স্বরে তালে কীর্ত্তন না করে।"

"নিত্য চিরদিন, হরিনাম, নিতাই-গৌর নামের উদ্দীপনা দিয়ে সবাইকে জাগিয়ে রাখবে।"

"মৃদঙ্গ, করতাল ও অন্যান্য ইষ্টদ্রব্যাদিও বস্ত্রাবরণে, চিরনিত্য যত্নে রাখিও।"

"মৃদঙ্গ-করতাল-কীর্তনে, নিতাইগৌর-চন্দ্রমসীর আবির্ভাব হয়, সত্য জেনো। শ্রীনামকীর্তন ব্যাধিবিনাশন।"

"করতাল ও মৃদঙ্গ সহোদর। জ্যেষ্ঠ করতাল, কনিষ্ঠ মৃদঙ্গ।" "মহামর্দ্দলনে মৃত্তিকাবর্দ্ধন, করতালনে শস্যবর্দ্ধন, মৃদঙ্গনে মেদবর্দ্ধন, চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে ফলবর্দ্ধন, নগর কীর্ত্তনে ধান্যবর্দ্ধন, প্রভাতি সংকীর্ত্তনে জলবর্দ্ধন। ইতি কৃত্তিগণ।"

"আত্ম হইতে অধিক ভোজন, ভোজন হইতে অধিক বসন, বসন হইতে অধিক ধন, ধন হইতে অধিক জন, জন হইতে অধিক ধর্ম্মণ, ধর্ম্মণ হইতে অধিক সংকীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন হইতে অধিক কীর্ত্তন, কীর্ত্তন হইতে অধিক আর কিছুই নাই।"

"একটি মহানাম সংকীর্ত্তন। চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে।" "মর্দ্দলন ব্যাধিবিনাশন। মহামর্দ্দলন অঘবিনাশন। সংকীর্ত্তন তমোবিনাশন। কীর্ত্তন দুঃখবিনাশন। ইতি ধর্ম্মণ।"

"শ্রবণে দশা হয়। উচ্চারণে ভাব হয়। কীর্ত্তনে আবেশ হয়। সংকীর্ত্তনে রাগ হয়। মর্দ্দলনে পুলক হয়। মহামর্দ্দলনে আনন্দ হয়। চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে অশ্রু হয়। লুণ্ঠনে প্রেম হয়।"

"নতি, প্রণতি, অবনতি, অর্দ্ধনতি, পূর্ণনতি॥"

"কৃতি—লুণ্ঠন, অবলুণ্ঠন, অর্দ্ধাবলুণ্ঠন, অষ্টাঙ্গাবলুণ্ঠন, সর্ব্বাঙ্গাবলুণ্ঠন।"

"কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন, তুঙ্গ তুমুল নর্ত্তন,
প্রদক্ষিণাবলুণ্ঠনে মজ।
(সদা নতি রাখ রে) (শ্রীগুরুবিগ্রহ আগে)
(রহ পড়ে একভাগে)।"

"বন্ধু ভণে সংকীর্ত্তনে জীবন বিকাই রে।"

"উচ্চ তাণ্ডব॥ উচ্চ নৃত্য॥ উচ্চ রোল॥ উচ্চ ধ্বনি॥ বৃহৎকীর্ত্তন॥ প্রেমকীর্ত্তন॥"

"অষ্টাঙ্গে নতি, লুণ্ঠন এবং উর্ধ্ববাহুদ্বয়ে উচ্চনৃত্যসহ মহাপ্রভুর স্বরূপ কীর্ত্তন, স্মরণ ও সন্নিধান করিলে উচ্ছ্বাস, আনন্দ, ভাব, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি হইয়া থাকে।" "মনঃপ্রাণে হরিনাম নিষ্ঠা করিও।"

"হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।
(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই) (হরিনাম প্রচার কর)।"

"বন্ধুভয়, ঐ প্রলয়, কালাম্বুগর্জ্জন॥
(হরি-হরি-বল ভাই) (হরিবল হরিবল)॥"

"হরি-হরি-হরি-হরি, হরিনাম-ক্ষেম-প্রেম।"
"হরি বলে অবহেলে নিয়তি এড়াই রে॥"
"স্মরণ বন্দন নতি বিগ্রহ দর্শন।
নিষ্ঠা পাঠ ইষ্টগোষ্ঠী গোবিন্দ স্তবন॥
এই নিবেদন রে, শ্রীরাধা গোবিন্দ পদে,
ভুলনা বিষয় মদে॥"

"ইষ্টগোষ্ঠী॥ গুরু ভাই, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভক্ত, নৈষ্ঠিক, ধার্মিক, সাধু, জ্ঞানী।"

'ত্যাজি সত্য ধর্ম জ্ঞান কর্ম কুসঙ্গেতে মজে রলে।'
"মায়া মোহ ভুলে, বাহু তুলে, নাচ সদা হরি বলে।"

"রক্ষা হরিনাম। হরিনাম—প্রভু জগবন্ধু।"

"হায়! মানুষ হরিনাম করে না।" "ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন! এই আছে, এই নাই!" "গাধা সংসারী অপেক্ষা কিছু সুখী, কারণ দিনমান ঘাস খাইতে অবসর পায়। সংসারী দিবারাত্রি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণের ভার পৃষ্ঠে বহন করিতেছে; হরিনাম করার অবসর পায় না।" "বরাহ এত দ্রব্য থাকিতেও পুরীষের প্রতি দৃষ্টি করে। সেইরূপ পাষণ্ডেরাও কেবল কুবিষয়ে দৃষ্টি ক'রে থাকে। বরাহের গু,—পাষণ্ডের কু।"

"মনুষ্য নাই। পশুরা মনুষ্য অভিমান করে, ইহাই কৈতব।

হরিনামে ছাপ, সাদা হইলে-মনুষ্য পদবাচ্য হয়, নৈলে নরদেহেও পশু।”

“কাল, কলি, পাপ, প্রপঞ্চ ও প্রাক্তন—এই পঞ্চের অধীন হইয়া এত দুর্গতি। অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজন্ম পাওয়া যায়। একখানি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণের ন্যায় আত্মা পুনঃ পুনঃ দেহত্যাগ ও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। এজন্মে যাহারা তোমার পিতা, পুত্র, ভর্ত্তা ইত্যাদি হইয়াছে, তুমিও হয়ত পূর্ব্বজন্মে তাহাদের পিতা, পুত্র, ভর্ত্তা ইত্যাদি হইয়াছিলে।

সুতরাং কেহই কাহারও নয়। কেবল প্রপঞ্চ বা মায়ার ছলনামাত্র। এই মায়া হইতেই কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হইতে হয়। কিঞ্চিন্মাত্র মায়া থাকিতে স্বরূপ দর্শন হয় না। সুতরাং সাবধান।” “মুক্তি, প্রাক্তন, পরকাল ও পরিণামাদি স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী জানিও।”

“উষ্ট্রের কণ্টকবৃক্ষ খাইতে খাইতে মুখ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তস্রাব হইলেও তাহা ত্যাগ করে না। সেইরূপ সংসারী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সংসার-মায়ায় মোহিত হয়ে যাতায়াত করলেও তাহার সংসার-পিপাসা মিটে না;—হরিনাম করে না।”

“দরিদ্রতায় হরিনাম শক্তি দেয়।”

“সংসারী লোকেরই হরিনামে বেশী অধিকার।” “নিত্য গৃহে সংকীর্ত্তন করিবে।” “সময় থাকৃতে থাকৃতে হরিনাম কর। দেহরক্ষা কর; মঙ্গল হবে।”

"হরিনামের আগে তুচ্ছ ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম।"

"তোমরা সবাই হরিনাম কর, হরিনাম প্রচার কর।" "অহিংসায় সিংহবিক্রমে চল, হরিনামের বল বাঁধ। সংসার-ইন্দ্রজাল হরিনামে কেটে যাবে, মায়া-মনসিজ দূর হবে।"

"তোমরা হরিনাম করলেই আমার মহাউদ্ধারণ-ব্রত শেষ হয়।" "তোরা হরিনাম করে রক্ষা কর। আমার মহাউদ্ধারণ কার্যের সহায় হ।"

"মর্দ্দল-করতাল-কীর্ত্তন-তাণ্ডব।
বন্ধু-চর্চ্চা ; চারণ ; প্রচারণ ; সব।
(অনন্যগতি রে) (সংকীর্ত্তন উদ্ধারণ)।"

"হরিনাম সংকীর্ত্তন স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধার-সাধন। সংকীর্ত্তন ও প্রভাতি করলে মনের ময়লা দূর হয়ে যায়! মানুষ ছাপ, সাদা বরফের মত হয়। সংকীর্ত্তন করতে করতে মানুষ সব ভুলে যায়। নিজেকেও খুঁজে পায় না। সংকীর্ত্তন করলে আনন্দ উথলে উঠে। প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বুকে বল বাঁধে।"

"সমগ্র প্রয়াগ ও সাধনের ফললাভ এবং স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধারসাধন ; অপিচ চতুর্দ্দশ ভুবনের সর্বথা মাঙ্গল্যবিধান হয়। —ইহা নাম-মাহাত্ম্য। নাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্রাতীত, গুরুমুখ-শ্রোতব্য, লেখনীর অসাধ্য।"

"ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, সর্ব্বসার হরিনাম রে।"

গুরু, দীক্ষা, গুরু-গণ-নির্দেশ

"বন্ধুর্গুরু রহং সখে।" ভাঃ ১১।১৯।৪৩

"গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু জগদ্বন্ধু।"

"যাঁর বপুতে বিষ্ণুচিহ্ন অথবা মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে, তিনিই গুরু। জীব উদ্ধারে বা ভবসমুদ্র পার করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই গুরু।" "নিত্য চিরস্মরণীয়—১। প্রাণবন্ধু-জগদ্বন্ধু। ২। গুরু-জগদ্বন্ধু। ৩। প্রভু-জগদ্বন্ধু। ৪। হরি-জগদ্বন্ধু। ৫। পুরুষ-জগদ্বন্ধু। ৬। জগদ্বন্ধু-জগদ্বন্ধু। ৭। প্রভু-বন্ধু। ৮। গুরু-বন্ধু। ইতি স্মরণ-মঙ্গল।" "জগদ্বন্ধু পরমহংস।"

"ভজন-সাধন, সুখ-সৌভাগ্য, আয়ুর কারণ ও ফলই গুরু।"

"গুরু-অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরুদীক্ষা বা গুরু-প্রণালী বলা যায়।" "আমার প্রিয়ের প্রিয় কার্য করাই প্রধান ও প্রকৃষ্ট সেবা। সেইটি গুরুদীক্ষা, সেইটি শিষ্যত্ব।"

'হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র। উহা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ হইলে দীক্ষা হয়।" "সাধুগুরু বৈষ্ণবের বন্দিও চরণ।' "একাগ্রতা আনুগত্য, সাধু গুরু সেবা সত্য রে।" "বৈষ্ণবই সাধু। ধরায় আর সাধু সম্ভবে না।" "যাঁকে দেখামাত্র হরিনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।"

"মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কাণে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।"

জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু কাহাকেও লৌকিকভাবে দীক্ষা না দিলেও

তাঁর মৌনাবলম্বনের প্রায় পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে রমেশ, সুরেশ, কালী (কালিন্দী), তারক (গোপীকৃষ্ণ), দেবেন (নেপোলিয়ন), উপেন, অক্ষয়, বিধু (বিধানী), বিনোদ, নকুলেশ্বর, (ছোট বাবুজী) সুরেন, প্রবোধ, ললিত, লোকনাথ, এই কিশোর ও তরুণবয়স্ক ভক্তগণকে ফরিদপুরে লিখিতভাবে শিষ্য ও বাবুগণ আখ্যা দেন। তাঁর স্বীকৃত শিষ্যদের দীক্ষার বাকি থাকে কি? এই শিষ্যবাবুগণের পরিচালক ছিলেন, প্রভুবন্ধুর ছাত্রাবস্থার সহপাঠী রমেশবাবু। প্রভু এই অনুবর্ত্তী ভক্তগণকে আশ্বস্ত ক'রে বলেন ও লেখেন, "চিন্তা কোরো না, চিরগুরু রইলাম। চিরদিন কৃপা করব।" চিরগুরু বন্ধুর আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রমেশবাবুকে অভিভাবকগণ অন্যত্র তান্ত্রিক যোগী গুরুর নিকট রমেশবাবুর দীক্ষা দেবার ষড়্‌যন্ত্র করিলে, প্রভুবন্ধু রমেশবাবুদের সতর্ক করিয়া লিখেন,

"শ্রীশ্রীবাবুগণ, তোমরা হরিনাম ভিন্ন কোনও ব্রত বা নিয়ম করিও না।" "কেহও, দীক্ষা লইও না। দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র, মহাকৈতব।" "একবার বই দীক্ষা হয় না। একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় না।"

"প্রভুর স্বীকৃত শিষ্যগণের আবার অন্যত্র দীক্ষাটাই তান্ত্রিকতা ও মহাকৈতব।" আপাতবিরোধী বন্ধু বাণী সমূহের আলোচনা ও সমাধানের প্রয়াস বন্ধুবার্ত্তা 'কথানুশীলন'-এ দ্রষ্টব্য। গুরু ও দীক্ষাদি সম্পর্কে প্রভুর হরিকথা, সংকীর্ত্তন, ও শ্রীহস্তলিখিত খাতাপত্রাদি হইতে এখানে আরও কিছু গুরুবন্ধু বাণী উদ্ধৃত করা হইল ;

"লহ শ্রীগুরু শরণ, ভজ বৈষ্ণব চরণ।"

"যাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য গতি নাই, বা যিনি গোস্বামী শাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রহণ করেন না, তিনিই বৈষ্ণব।"

"বৈষ্ণবে রুচি, শ্রদ্ধা ভক্তি, কৃষ্ণরস, গোপীভাব, যুগলপ্রেম, ইহার উপরে আর কিছুই নাই।"

"ভজরে আমার মন চৈতন্য গোঁসাই।"
"এস রূপ রঘুনাথ আদি সকল গোঁসাই।"
'কোথা রূপ সনাতন শ্রীজীব গোপাল।
লোকনাথ রঘুনাথ ভূগর্ভ দয়াল॥'
"কত ভ্রমিতে ভ্রমিতে জনম পাইলে।
মহামায়ায় পড়ে জ্ঞান হারাইলে॥
গুরু না ভজিলে, কুসঙ্গে মজিলে,
জেনেছি তোমার কপাল মন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ।"
"নাম নৌকা নিতাই কাণ্ডারী।
ভারে ভারে যায় পারে পুরুষ নারী॥"
"স্বরূপ দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও।"
"রামানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস ভক্তবর।"
"হা গৌরাঙ্গ গদাধর বন্ধুর ঈশ্বর।"
"জয় অষ্ট ব্রহ্মচারী প্রভু গুণধর।"
"বন্ধুধন, ভক্তগণ ভব-যাতনা-হর॥"
"জয় জয় জয় রে নিত্যানন্দ জয় ভবতারণ।"

"গুরুগৌরাঙ্গ বলে, উঠরে কুতূহলে", "গুরু গতি"
"নিত্যানন্দ বন্ধুগতি" "অগতির গতি, জয় সীতাপতি"
"এস এস প্রভু মম, রামচন্দ্র নরোত্তম হে।"

"...কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা গুরু"

"ত্রিলোক তারণ ত্রিতাপ হরণ,
কোথা গৌর ভক্তবৃন্দ॥"

"এস ত্রাণকারী, অষ্ট ব্রহ্মচারী,
ষড়্-গোস্বামী শ্রীবাস।"

"ত্রাতা শ্রীবাস দয়াল।"

"জয় হরিনাম-দাতা, জয় নিতাই রে।
জয় প্রেমদাতা নাম, বন্ধু বড়াই রে॥"

"জয় ছয় গোস্বামী হে গুণের সাগর।"
"গোস্বামী দীক্ষা, গোস্বামী ধর্ম পালন॥"

"অগোস্বামি-গুরু, চিরত্যাগ।"

"মন্ত্রদাতা গুরুকে গোস্বামিগণ শ্যামের প্রকাশ রূপ উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সহ শ্যাম-সম্বন্ধ।"

"গুরু গতি" "রাধাগতি" "শ্রীমতীর দশম দশা," "দশমী কারণ, চন্দ্রা-উদ্ধার", "সব মনে আছে রে, দশমীর গুরুকরণ!"

"রাই, তুমি উদ্ধারণ"

"ঐ দশমী, চন্দ্রা; লো; লছমী, ভদ্রা, শিষ্য হবি তুই॥"

"কৃষ্ণনাম-মন্ত্র আজি, লও সখীগণ।
চরমে তোদের গুরু, হ'লাম এখন॥
(এই দক্ষিণা দাও) (সংকীর্ত্তন প্রচারণ)"

"গোপীচন্দন কোথায়, কৃষ্ণনাম লেখ তায়,
গুরু হেন, জেন ললিতায়।
(মোর এই বন্ধু মা) (শ্রীললিতা শ্রীললিতা)"

"শ্রীগোপাল মন্ত্রদীক্ষা, হরেকৃষ্ণ নাম শিক্ষা,
তিলক তুলসী-মালা ভেক্।
প্রভু গুরু হ'ল মা, শিক্ষা-দীক্ষা ভেক্ দানে"

"গুরু জগদ্বন্ধু। শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।"

"চিন্তা করো না, চিরগুরু রইলাম।"

"আমার কাছে এলে, কারো গুরুত্যাগ করা হয় না। যে যেখানে যত গুরুপূজা করে, সব আমাকেই গ্রহণ করতে হয়।"

"দরশন পরশন শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বন্দিও চরণ॥
সদা মতি যে রেখ গো, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবপদে।"

"মোরে দয়া কর হে, গুরু-গৌর-বৈষ্ণবগণ।"

"অন্য ভাবিও না, গুরুগোবিন্দ বই।"

"(আমায় দয়া কর) (সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ)"

"গুরুগীতি, গোপীগতি হও।
গোপীভাব লও রে, গুরু গতি, কৃষ্ণ পতি,
রুচি-রতি-মতি-সতি।"

"শ্রীগুরু বিগ্রহ-আগে রহ প'ড়ে একভাগে।"

"গুরুরূপা সখী বামে নেহারি নয়নে।
নিরবধি রহিব চরণ-সেবনে॥"

"মোরে সেবা যে দাও হে, কোথা শ্রীরূপমঞ্জরী,
কোথা ললিতাসুন্দরী।"

"শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি, সেবা বিশুদ্ধ ভকতি,
প্রভু বন্ধু বলে বাহু তুলে' চল ব্রজধাম গো।"

"বন্ধু বলে কেঁদে, গুরুপদে রাখ রতি অনুক্ষণ।"

"দীক্ষামন্ত্র দ্বারা যে অর্চ্চনা, তাহা আমিই গ্রহণ করি।"

"প্রভাতি কীর্ত্তন, টহল, পদস্মৃতি, নিত্যকীর্ত্তন, ধৈর্য্য, দীক্ষা॥ ইতি শিক্ষা॥"

"একান্তে যে, যে পূজা, জপ চিন্তা, প্রার্থনা করে আমিই তাহা গ্রহণ ক'রে থাকি।"

বীজমন্ত্র, জপাদি

"পঞ্চবীজ ; শ্রিঁ—রাধাবীজ। ক্লীং—কৃষ্ণবীজ।
ক্লীং—সখীবীজ। শ্রীং—গোপীবীজ। ঐং—বটুবীজ।"

"কৃষ্ণমন্ত্র।—ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়
গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

"কৃষ্ণগায়ত্রী ।—ক্লীং কৃষ্ণচন্দ্রায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নঃ
কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ।

কৃষ্ণের প্রণাম ।—নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥"

"কামগায়ত্রী ।—ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।"

"রাধামন্ত্র ।—শ্রিঁ রাধায়ৈ স্বাহা।

রাধাগায়ত্রী ।—শ্রিঁ রাধিকায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি
তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ"

"গৌরমন্ত্র ।—ক্লীং গৌরায় স্বাহা।

গৌরগায়ত্রী ।—ক্লীং গৌরচন্দ্রায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি
তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ।"

"নিতাইমন্ত্র ।—ঐং নিত্যানন্দায় স্বাহা।

নিতাইগায়ত্রী ।—ঐং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে সঙ্কর্ষণায় ধীমহি
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।"

"গুরুগায়ত্রী ।—ক্লীং গুরুদেবায় বিদ্মহে গৌররূপায় ধীমহি
তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীগুরুর প্রণাম ।—যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
স এব সর্ব্বসম্পন্নস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

ভজন, জপন, চিন্তন

"মস্তকে, রক্তপদ্মে, পঞ্চমবর্ষীয়, অস্ফুট, পরম সুন্দর, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত শ্রীগুরুদেবকে চিন্তা করিও।"

গুরুমন্ত্র। "এই মন্ত্র, প্রাতঃকালে ও মধ্যরাত্রে জপ করিবেক।"

"ললাটে, নীলবর্ণপদ্মে শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করিবেক। বয়ঃ ও অন্যান্য সমগ্র, শ্রীগুরুদেবের ন্যায়।"

গৌরমন্ত্র। "অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবেক।"

"রক্তবর্ণ, সুন্দর শিশু নিতাইকে কূটস্থে চিন্তা করিও। নিতাই গৌর অপেক্ষা পাঁচ মাসের বড়। অন্যান্য সমগ্র গৌরচন্দ্রের ন্যায়। পীতবর্ণপদ্মে নিতাইকে চিন্তা করিবে।"

"কৃষ্ণচন্দ্র, গুরু অপেক্ষা, পাঁচদিনের বড়।"

"শিরে চূড়া, ত্রিভঙ্গ মুরলীবদন, এই সুন্দর শিশুকে চিন্তা করিবে।"

"হৃদয়ে হেমবর্ণপদ্মে কুসুমভূষণে এই শিশুকে চিন্তা করিবে। এই সুন্দর শিশু নিয়ত মুরলী বাদ্য করিতেছেন।"

"কৃষ্ণচন্দ্র, বঙ্কিম নয়নে, রাই ধ্যান করিতেছেন।" "আজানু-লম্বিত বনমালা, গলে দুলিতেছে।" "সর্ব্বাভরণাদিই কুসুম-নির্ম্মিত।"

কামদেব। "বৃন্দাবনের নিবিড় অরণ্যে অষ্টমবর্ষীয় এই কাম বিগ্রহ রহেন। এই বিগ্রহ অপ্রাকৃত। ইনি বৃন্দাবন ভিন্ন, ক্ষণার্দ্ধ-কালও কোথাও যান না।"

"সাধন—১। সংকীর্ত্তন॥ ২। নর্ত্তন॥ ৩। পঠন॥ ৪। উদ্ধারণ॥ ৫। জপন॥" "জপ—রাস।" 'উচ্চারণ, ভজন। কৃষ্ণ, পতি। গুরু, গতি। রাধা, গতি।' "ভজন, মালাজপ। মালা, উদ্ধারণ।"

"১০০ মালা—১০০ গোপী। ৮ মালা, অষ্টসখী। সূত্র—রাধা। সুমেরু—কৃষ্ণ।"

*"জপাদি যথেচ্ছ সময়ে হইতে পারে। প্রবাসে, অশুচি অবস্থায়, জপাদি মানসেই হইবে। অশুচি, শৌচ, ক্ষালন, স্নান ইত্যাদি সর্ব্বাবস্থাতে মন্ত্রাদি মানসে জপ করিবে।"

যে যে বিগ্রহ, সেই সেই বিগ্রহের মন্ত্র, সেই সেই বিগ্রহের বেষ্টনে গোলাকার, স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল, তেজোময়, সুদর্শন, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, মধুর চিন্তা করিবে।

"জপ ও চিন্তা এক সময়েই হইবে। মন্ত্রাদিকে অভেদ বিগ্রহ জ্ঞান করিবে।"

"মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই বিগ্রহাদি স্ফূর্ত্তি পাইবেন। বহু জপে মন্ত্রাদি সদা স্ফুরিত হইবে। মন্ত্রাদির প্রয়োগে ভব-বন্ধন দূর হয়।"

* ভক্তবর কিশোরী চক্রবর্ত্তীকে লিখিত প্রভুবন্ধুর বাণী। এই প্রকার উপদেশ আরও অন্যান্য ভক্তকে লিখিয়াছেন।"

"জপন + জগদ্বন্ধু। চিন্তন + গুরুবন্ধু।" "বহু বহু জপে মন্ত্রাদি ও সদায় স্ফুরিত হইবেন।"

"মন্ত্রহীন দেহ শবতুল্য"

"নিত্যকার্য্যে মন্ত্রাদি অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। নিত্যকার্য্যে ভিন্ন অহোরাত্র মানসে সর্ব্বতঃ, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বথা জপ হইবে। দেহ-মন-প্রাণে জপ হইবে।"

"জপই ভবের সম্বল"

"মন্ত্রকে জীবনাধিক জ্ঞান করিবে।
প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র গোপন রাখিবে।
সমগ্র মন্ত্র ও মন্ত্রকথা, সর্ব্বদা মুখস্থ রহিবে।"

"গোপীমন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই মন্ত্র নিত্য বত্রিশ হাজার জপ করিবে। অর্দ্ধসংখ্যা স্বাভাবিক ও অর্দ্ধসংখ্যা উচ্চরবে জপ করিবে। এই মন্ত্র গুপ্ত নহে, সর্ব্বতঃ প্রকাশ্য। ইহা কখনও এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিবে যে, সহস্র হস্ত দূর হইতেও শ্রবণ করা যায়। এই মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য অন্যকে শ্রবণ করান।"

"তারকব্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র।"

"হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু।" "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।"

"তারক জানিতে চান, প্রভুর বার নাম অনন্তানন্ত,"

"প্রভুর বার নাম জপ ও উচ্চারণ করিও।"

"প্রভুর বারটি নাম উচ্চারণ করিবেন।"

"হরি মহাউদ্ধারণ পুরুষ জগদ্বন্ধু
ঈ আ উা ি ই ঈী উু উু অ"

"জপন—জগদ্বন্ধু। চিন্তন—জগদ্বন্ধু।"

"নিত্য, গুরু গোবিন্দ-স্মৃতি, সদা থাকিবে।"

"আমার বয়ঃ পাঁচ বর্ষ। আমাকে শিশু কহে।"

"কৃষ্ণের বয়ঃ,—পঞ্চবর্ষ। শ্রীরাধার একপক্ষ কম; সখীদের রাই সম।" "সদা কৃষ্ণস্মৃতি।"

"শূন্য থেকো না, সদা স্মরণ বই। অন্য ভাবিও না, গুরু গোবিন্দ বই।"

"সঙ্গ:—মৃদঙ্গ, করতাল, জপমালা, মালা, গ্রন্থ।"

বিদ্যার্জ্জন ও বিদ্যাদান

"তোমার মূর্খ থাকিও না। অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না, মূর্খে আমার কথা বুঝতে পারবে না।"

"কর্ম—বিদ্যা দান, বৈরাগ্য, শুচি, স্নান। বিদ্যা-অর্জ্জন, বিদ্যাদান।" "নানা ভাষা হইতে উচিত শুদ্ধ শুদ্ধ পথ করা। শুদ্ধ শুদ্ধ পথ, কাল শুচি।"

"বাড়ী সব ঝাড়িয়া শুচি করিবা।" "গোবৃত্তি করিয়া শুচি ও ভদ্র হইবা। বাণিজ্যে উন্নতি।" "কৃষি ও বিদ্যা না করিয়া সবে দুষ্ট হয়।"

"অক্ষর উচ্চারণ করিয়া নানাধর্ম।"

"সব ছাত্রবাবুদেরই গ্রাজুয়েট হইতে বলিও। কেহই যেন গ্রাজুয়েট না হয়ে পড়া ছাড়ে না। সবাই যেন দিনরাত পড়ে। একবেলার বেশী, অন্ন না খায়, রাত্রে জলযোগ।

আলস্য ত্যাগ, নিদ্রা ত্যাগ, বিদ্যা, একাগ্রতা, স্থৈর্য্য, অধোদৃষ্টি, মনঃসংযম, মৌন, অক্রোধ, দয়া, পাবন, প্রচার।"

"অভিক্ষা—বিদ্যা উপার্জ্জন ভিন্ন ভিক্ষা পাপ।" "ভিক্ষায় বিদ্যা হয়, অন্যথায় নহে।"

"বিদ্যা—১ম ইংরাজী, শেষ বঙ্গ, ইতি সংস্কৃত। বঙ্গ, কলিঙ্গ, ইংলণ্ড শুচি।"

"তোমরা ব্রহ্মচর্য্য কর। বিষয় ত্যাগ কর।"

"বিদ্যোন্নতি বিদ্যা স্মৃতি, বিদ্যানুশীলন।"

"বিদ্যার শ্রম করিও। অতি লিখন। নীরবে পঠন। অত্যধ্যয়ন, জাগরণাধ্যয়ন, দিবাধ্যয়ন, নির্জনাধ্যয়ন, মুখস্থকৃতি। রাত বার ঘণ্টাই পড়িও। দিনে ঘুমাইও।"

"হরিনামে তাপ উপস্থিত হইলে তখন আর হরিনাম করিবে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাপমুক্ত মুহূর্ত্তকালও নাম করিবার পক্ষে যথেষ্ট।"

"আমি যাহা বলি, মন দিয়ে শুনো। আমি যাহা লিখি, মন দিয়ে পড়ো। চিঠির মত পড়ো না, মুখস্থ করে রেখো। নিত্য চিরকাল মনে রেখো। চিন্তা করে কাজ করো।"

"পাঠে ও আমার কথায় আদৌ অবহেলা করো না। কল্যাণ হবে।" "সব রাত্রি পড়িও। স্বস্তি, আনন্দে রহিও। স্বস্তি, আনন্দে রহিও। সব মুখস্থ করিও।" "পাঠ, তুলসী টব, জপ, স্নান, ধ্বনি। ইতি জ্ঞানদান।" "জ্ঞান বিনা মনুষ্যজন্ম বৃথা।"

"বিদ্যা উদ্ধারণ-গ্রন্থ। উদ্ধারণকে বিদ্যা কহে, মহাউদ্ধারণকে সিদ্ধি কহে।" "চন্দ্রপাত, হরিকথা, সংকীর্ত্তন, ত্রিকাল গ্রন্থ।" "প্রভুর গ্রন্থ উদ্ধারণ এবং মহাউদ্ধারণ। ত্রিকালের রচনা যাবনিকতা ও অধর্ম্ম।" "হরিকথা,—এ মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ। অবিরাম পড়লে রসও পাবে, বুঝতেও পারবে। হরিকথা পাঠে তোমরা নির্ম্মল, ছাপ সাদা বরফের মত হয়ে যাবে। কৈতব থাকবে না। ভাগবত গ্রন্থের মত, শুচিভাবে পৃথক্ রাখিয়া নিত্য পাঠ করিও।"

"পঞ্চক্ষেম—হরিকথা, হরিনাম, হরিগ্রন্থ, হরিভক্তি, হরিপ্রেম।"

"পঞ্চপঠন। পঞ্চগ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।"

"রাত ভরে গ্রন্থচর্চ্চা করিস্; কান্দর্পিক বিকার ভাল হবে।" "বিদ্যাকে ইচ্ছামৃত্যু কহে।" 'হরিনামে কাম দমন করিও।"

"দেহমন শুদ্ধ হ'লে জ্ঞানের উদয়।
বন্ধু কয় তবে হয় প্রেম উদয়॥

(প্রেম উদয় হয়)   (শ্রবণ কীর্তন দাস্যে) ।”

“ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত রে।

(হবে) অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি ভাব সুনির্ম্মল রে ॥”

“গ্রন্থাদি, ভিন্ন আধারে যত্নে রাখিয়া পাঠ করিবে। গ্রন্থমাত্রই বস্ত্রাচ্ছাদনে নিত্য রহিবে।”

“নিঃশব্দ, নির্জ্জনতা, অনিদ্রা, নিশ্চিন্তা, মনোবৈরাগ্য, সর্ব্বে প্রচার, কীর্তনে শিক্ষাদান, ধীরতা।”

“দূরকীর্তন, নাম প্রচার, গানস্মৃতি, মৃদঙ্গশিক্ষা, রাগিণীশিক্ষা ॥ ইতি চিরস্মৃতি ॥”

“শ্রীকীর্ত্তনাদি মুখস্থ করিবে। বাদ্য অভ্যাস রাখিবে। হস্ত চালনায় বাদ্যের উন্নতি হইবে।” “মৃদঙ্গশিক্ষা, নিত্যকীর্তন, নিত্য-টহল, নিত্যোপদেশ, বিদ্যোন্নতি, সারল্য, আমল্য, সর্বলক্ষ্যকৃতি।”

সদাচার-যম-নিয়ম

“নিঃশব্দ হও, নিষ্ঠায় থাক।” “নিয়ম নিষ্ঠা নাই, আমিও নাই।” “সবা দ্বারা নিষ্ঠা করাবে।” “অনিষ্ঠাই প্রভুর মৃত্যু জানিবা।” “কৃতিমাত্র হও, হরিহিতে রও, আত্মশুচি উদ্ধারণে।”

“আত্মশুচি উদ্ধারণ। জগৎশুচি মহাউদ্ধারণ। পূর্ণ প্রেম।”

“আত্মশুচিতে বপুরক্ষা, বপুরক্ষায় গৃহশুচি, গৃহশুচিতে গ্রামশুচি, গ্রামশুচিতে দেশশুচি, দেশশুচিতে জগৎশুচি, জগৎশুচিতে চতুর্দ্দশ ভুবন শুচি। ইতি উদ্ধারণ তথাহি মহাউদ্ধারণ।”

"দেহ মন শুদ্ধ হ'লে জ্ঞানের উদয়।" 'নির্মল ছাপ সাদা বরফের মত হও।"

"ত্যাগ—১। লোকাচার, অভিমান। ২। জাতি, কুল, মান। ৩। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়। ৪। মায়া, মোহ, দ্বন্দ্ব। ৫। যোষিৎ, বালক-সঙ্গ। ৬। মনসিজ, কৈতব, কুভজ্য।" *

"কৃতি, অস্তিত্ব।" "কৃতি, শুচি।" "কৃতি—উদ্ধারণ, প্রচারণ, ভক্তিদান, অকিঞ্চন, নিষ্কিঞ্চন।"

"অনিষ্ঠা, অনাচারে প্রভুপাত জানিবা।"

"জ্ঞান—১। ক্ষমা ॥ ২। দয়া ॥ ৩। অক্রোধ ॥ ৪। মৌন ॥ ৫। স্মরণ ॥ ইতি পঞ্চনিষ্ঠা ॥" "শ্মশ্রুহীনতা, নিষ্ঠা, শিখা, সংকীর্ত্তন, ভক্তি ॥ ইতি উপদেশ ॥" "কণ্ঠিমালা, নিরামিষ, মুণ্ডন, হবিষ্য, জাগরণ ॥ ইতি স্তুতি ॥"

"প্রতিমাসে দুইবার মুণ্ডন ও প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া ক্ষৌরাদি নির্ব্বাহ করিবেক। ক্ষৌরকালীন উভয় নাসারন্ধ্রে তুলসীপত্র বা বিল্বপত্র সংযোজিত রাখিবেক।" *

"শ্বাপদের অনুকরণ করিয়া দাড়ি মোচ।" "চুল বড় হইলেই উহাকে পশু কহে। দাড়িমোচকে ভল্লুক কহে।" "মাথায় কেশ ছোট ক'রে রেখো। ভোগবিলাস ত্যাগ করো। আসনাদি অভ্যাস করো। স্বস্তিকাসনে মেরুদণ্ড সোজা করে বসো। দুই হাঁটুর উপর হস্তদ্বয় উত্তানভাবে রাখিবে।"

"ভোগ-স্পৃহা বর্জ্জনের নাম বৈরাগ্য ॥"

"ব্রহ্মচর্য্য করিও, করাইও।"*

"সকলেই রক্তজল করা অভ্যাস চিরদিনের মত ছাড়। উহাতে আয়ুঃ ও বংশ যায়। যোষিৎসঙ্গ মহাপাপ। হস্তমৈথুন করিয়া আয়ুঃক্ষয়॥"

"মৃত্যু—যোষিৎ, বিবাহ, আমিষ, ক্ষার, মিষ্ট।" "একত্র শয়ন, উপবেশন, গমন, ভোজন ও সম্ভাষণ করলে এক শরীরের পাপ আর এক শরীরে প্রবেশ করে।"

"যোষিৎ ও বালকাদি পরিহার করিও। অনশন, উপবাস, অমুকল্প, নিষ্ঠাবৃদ্ধি, বিদ্যাস্মৃতি, বিদ্যানুশীলন, সংসারে বাম, চির-কৌমার্য্য।" "ভবব্যাধি—মায়া, মনসিজ।" "ভববন্ধন—নারী।" "ভবসমুদ্র—মন্মথাচার, ভবব্যাধি—কন্দর্প।"

'সতী রক্ষণা' 'শিষ্যা বিবাহিতা স্ত্রী' 'লক্ষ্মী কন্যা' 'গোপী গতি' 'গুরুরূপা সখী'

"আমার সঙ্গ ও সেবার দ্বারা রিপু ও দশেন্দ্রিয়বিকার থাকে না।"

"শিশ্ন উর্দ্ধ করে কৌপীন পরো। কৌপীন পরলে নিদ্রাবিকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যথাযথ কৌপীন ধারণ করলে, কন্দর্পের কোনও উৎপাত হয় না।"

[শ্রীরামদাসজীকে কথিত একটি বন্ধুবাণী]

"জপ করতে করতে স্নায়ুগুলি নিস্তেজ হয়ে থাকে, একটু ফাঁক পেলেই তাদের (কামাদির) প্রকোপ বাড়ে। তখন সেখান থেকে

---

* "বিদ্যার্থং ব্রহ্মচারী স্যাৎ।" "উর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানবঃ।"

সরে গিয়ে স্নান করবি। যদি না পারিস, দৌড়বি। ক্লান্ত হলেই তারাও ক্লান্ত হবে। যার শরীরে দৌড়ান সয় না, সে বেড়াবে। আয়নায় মুখ দেখবি, তা হলেই ক্রোধ সরে যাবে। লোভ এলে খুব তেতো রস খাবি। মোহ এলে ঠাঁই-নাড়া হবি। অহংকার এলে উপোস করবি। পরের উপর কটাক্ষ বুদ্ধি (মাৎসর্য) এলে নিজের দোষ ভাববি।"

"স্ত্রীজাতির প্রতি কদাপি লক্ষ্য না করা, তাহাদের গাত্রগন্ধাদি সাধ্যানুসারে গ্রহণ না করা, গোজাতি ভিন্ন কোন জীবের অবয়বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করা কর্তব্য। কাহারও চরণ ভিন্ন মুখ বা অন্য অবয়ব লক্ষ্য করিতে নাই। দৃষ্টিপূত পথ, মনঃপূত বৈরাগ্য, মনে রাখিও।" "মাটির দিকে চেয়ে পথে চলো।"

"বস্ত্রপূত জল, দৃষ্টিপূত পথ-গমন, মনঃপূত সংকল্প।"

"মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহাকে কদাপি প্রশ্রয় দিওনা। দেহ, মন ও জীবন পণ করিয়া হরিসাধন করিতে হয় : এমতস্থলে সম্পূর্ণ কঠোর করিতে বৈমুখ হওয়া উচিত নহে।"

"যাহা বাস্তবিক দুঃখ, তাহাকেই আমরা সুখ বলিয়া মনে করি। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ, পরন্তু তাহাকে আমরা পরম সুখ মনে করি এবং তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহা বাস্তবিক অসুন্দর, তাহাকে আমরা সুন্দর বিবেচনা করি। স্ত্রীকায়া নিতান্ত অসুন্দর, তাহাকে আমরা সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া জ্ঞান করি। যাহা আত্মা নহে, আমার নহে, তাহাকেই আমরা 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হই। শরীর আমি

নহি, আমারও নহে, তাহাতে আমি ও আমার জ্ঞান ধারণ করি।” এতদ্বিধ যে কিছু বিপরীত বুদ্ধি সমস্তই অবিদ্যাচ্ছন্নতা হেতু ভ্রমবিশ্বাস।” (হঃ)

“আত্মবিবেকে চলিও। নিজ বিবেকবুদ্ধি ধর্ম।’

“অবিদ্যা ভ্রান্তি, অসাধারণ ভ্রান্তি”

‘Private conscience (প্রাইভেট কন্‌সেনছ)-ই ধর্ম।’

“নিত্য, শুচি, সুন্দর ও সুখকর যে ব্রজরসতত্ব তাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সেবাধিকারী হইবার চেষ্টা করিতে হয়।”

“আত্মার স্মৃতিকে, মনঃ কহে। আত্মার কৃতিকে শরীর কহে। স্মৃতিকে কাম কহে। আত্মসংযমই আত্মরক্ষা। সদা পবিত্রতা, সদা নিষ্ঠা। আত্মশুচিতে বপুরক্ষা হয়। নিষ্ঠাই আরোগ্য, অনিষ্ঠাই ব্যাধি ও মৃত্যু। কার ও বাতাস গায় লাগতে দিবে না। স্পর্শ করা মহাপাপ। ব্যাধি স্পর্শ। ধরায় দুই মহাপাতক আছে, এই,—স্পর্শদোষ ও পঙ্‌ক্তিভোজন॥”

“স্পর্শদোষাদি ত্যাগ কর॥ চিরদিন নিত্য টহল ও কীর্ত্তন কর। গুরুস্মরণ রাখিও।”

“পরের বস্ত্র, পরের গামছা ব্যবহার করিবে না। এক উপাধানে, এমন কি, এক বিছানায় পরের সহিত শুইবে না।”

“কখনও কোনো প্রকৃতির মুখের দিকে চাইবে না।* পদে

*প্রভু বামাজাতিকে সাধারণতঃ প্রকৃতি বা যোষিৎ বলিতেন।

পদে সাবধান হয়ো। মাটীর দিকে চেয়ে পথে চলো। প্রকৃতি দর্শন ও স্পর্শনই পতন।” “অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে নাই। মোহ সব ভুলায়ে দেয়।”

“প্রপঞ্চরূপ শৃগাল, ভ্রান্তিরূপ লাঙ্গুল দ্বারা, মনরূপ কাঁকড়াকে আকর্ষণ ক'রে ভ্রান্তিতে ফেলে।” “লোভ, কাম, চক্ষুদোষ, শয়ন, অভিমান, আলস্য চিরত্যাগ করিবে।”

“যারা হরিভক্তি শূন্য তারা কদাকার-কুশ্রী এবং যারা হরিভক্তিপরায়ণ, তারা সুশ্রী, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিস্।”*

“অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম-নিষ্ঠা জীবনের ভূষণ কর।” হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট।” “বলিদান তথা জীবহিংসা মহাপাপ”

“অহিংসা—অক্রোধ।” “সত্যই—সাধন।” “সত্যাশ্রয়, তপোনিষ্ঠা।” “সত্যই হরিনাম।'

“সাত্ত্বিকভাবে গমন করিয়া পদ, সাত্ত্বিক কার্য্যানুষ্ঠানে হস্ত, সাত্ত্বিকভাাবে গোবিন্দের কার্য্যনিমিত্ত বাক্যপ্রয়োগে মুখ, সাত্ত্বিক-ভাবে মলমূত্র ত্যাগ কবিয়া মল ও মূত্রদ্বার, সাত্ত্বিকগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অস্থি-মাংস-মজ্জাযুক্ত দেহ ও নাসিকা, সাত্ত্বিক রস আস্বাদন করিয়া দেহস্থিত বল অর্থাৎ রক্ত ও জিহ্বা, সাত্ত্বিক রূপ দেখিয়া

*অসহায় আর্ত্ত রোগীর পরিচর্য্যায় গুরুবন্ধু উৎসাহ দিয়াছেন। কামজিৎ হরিভক্ত সম্পর্কে প্রার্থনাচ্ছলে প্রভু লিখিয়াছেন—
“ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করিবেন আলিঙ্গন, জড় হেন পড়িব চরণে।”

দেহাশ্রিত বর্ণ ও চক্ষু, সাত্ত্বিক স্পর্শ করিয়া দেহযুক্ত ত্বক্, সাত্ত্বিক শব্দ শুনিয়া দেহাশ্রিত ছিদ্রাদি ও কর্ণ প্রভৃতিকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতত্ত্বের নিকট প্রেরণ করিয়া, সাত্ত্বিক কার্য্য ও সাত্ত্বিকরূপ চিন্তায় সমস্তই গোবিন্দের, আমি গোবিন্দের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি, এবংবিধজ্ঞানে অহংকারতত্ত্বকে পুনর্ম্মার্জ্জিত করিতে হয়।" (হ) *

"সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ পবিত্র ও রক্ষা করিতে হয়। তাহা হইলেই গোবিন্দের প্রদত্ত দেহ, প্রাণ, অহংকার, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্তই পবিত্র হয় এবং তবেই তাঁহার খেলা খেলিতে উপযুক্ত হওয়া যায়। গোবিন্দের ক্রীড়া নিমিত্ত তাঁহার দত্ত দ্রব্যাদি তাঁহার কার্য্যেই ব্যবহার করা উচিত। তাহা নিজের বলিয়া ভ্রমজ্ঞানে বৃথা কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। তা' করিলে গোবিন্দের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়। তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইলে মহাপাপ আশ্রয় করে, মহাপাপ আশ্রয় করিলে রোগ, শোক ও ভোগের অধীন হইতে হয়।" (হঃ)

"দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিবেচনা ক'রে চলো।"

"আত্মরক্ষা করিও। কোনও সঙ্গ ভাল নয়। অন্য চাহিও না, মৃত্তিকা বই। অন্য ভাবিও না, গুরুগোবিন্দ বই। শূন্য থেকো না, সদা স্মরণ বই। উদর ভরিও না, ক্ষুধা বই।" (রঃ)

"লক্ষণে মানুষ চিনে নিও; তদ্রূপ ব্যবহার করিও, করাইও। স্বাধীন থাকিও। দুষ্ট দমন করিও। নিজেকে বড় জ্ঞান

করিও,* তা' নৈলে কদাও কিছু করিতে পারিবে না। স্বপদে ও প্রতিষ্ঠায় থাকিও।" "নিরভিমান হইও।" (রঃ)

"সবাই বিনয়ী হও। মাটির মত নীচ হও। মৃত্তিকা আর তোমরা এক। মার খাইও, মারিও না।। জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস। জীবদেহে আঘাত করলে নিত্যানন্দে আঘাত করা হয়। সব জীবেই নিতাইয়ের স্বরূপ দেখো।" "মহাপাপ হরিহিংসা।"

"কেহই বৃথা সময় নষ্ট করো না। আলস্যে কলির আক্রমণ হয়। ভ্রমে ফেলে দেয়।" "অমূল্য সময় মন যায় আহা অবহেলায়।" "না শুয়ে যত বসে থাকা যায়, ততই ভাল। একাসনে। পা যত লাগে লাগুক। সহ্য করতে হয়।"

"মহাভোগালস্যে আয়ুঃশেষ॥ হরিসাধনে রক্ষা পাও॥" "ঠেস্ দিয়া সমস্ত দিন বসা নিষেধ।"

"নিরবলম্বন উপবেশন; কদাপি অসরল না করা। আসনবদ্ধ হইয়া উপবেশন, বসিয়া ভিন্ন ঘুমাইবে না। শুইয়া নিদ্রা যাইলে শরীর অপবিত্র হয়। কারণ নিদ্রাবস্থায়

---

* শ্রীহরির সুদীন দাস্য বা সেবকত্ব জীবের স্বপদ এবং উহাতেই প্রতিষ্ঠা, তাঁর কিঙ্কর আমি, তাঁর শক্তিতে পরিচালিত আমি, কর্ত্তব্য সাধনে ছোট কিসে, অক্ষম কিসে, এই বোধে নিজেকে বড় জ্ঞান করিলে কর্ত্তৃত্ব শ্রীহরিতেই অর্পিত থাকে এবং ইহাতে অহংকার থাকে না।

হঃ—হরিরায়ের প্রতি উপদেশ, রঃ—রমেশচন্দ্রকে উপদেশ।

শরীর অতিশয় অপবিত্র হয়। ধর্ম্মনাশ ও সর্ব্বনাশ নিদ্রাবস্থাতেই হইয়া থাকে। অকৃতি—নিদ্রা, ভোজন, আলস্য, শয়ন, হাস্য। নিদ্রাই নরক। শয়নকে মৃত্যু কহে। শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ক্রমে অতি দুর্ব্বলতাহেতু বসিয়া থাকিবার অক্ষমতা হইলে, যদি কখনও শুইতে হয়, তবে চিৎ হইয়া শুইবে। ডান বা বাম পার্শ্বে ফিরিয়া বা উপুড় হইয়া শোওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিদ্রাই মৃত্যু। অনিদ্রাই জীবন।"

"রাত্রিকালই উপাসনার সময়। সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে অল্প নিদ্রা গেলে হয়। দিবাভাগে কদাপি নিদ্রা যাইবে না। শয়নকালে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ ব্যতীত অন্য দিকে মস্তক রক্ষা করিবে না।

"ছেলেদের খেলা খেলিও না, ধর্ম নষ্ট হয়। তোমরা মন দিয়া দিনরাত পড়ো। একান্ত ইচ্ছার সহিত কীর্ত্তন করো। ভাল করে কীর্ত্তন না করলে পাপ হয়। উচ্চ কীর্ত্তনে পাপ নষ্ট করে। কীর্ত্তন না করাও পাপ। টহলকীর্ত্তন, পদকীর্ত্তন ইচ্ছায় করিবা। তোমরা রাঁঢ়ি আখর ও রাঁঢ়ি তালে আনন্দে কীর্তন করো।" 'হরিনাম না করাও পাপ।'

"রচনাকারীর রচনা ভাঙ্গতে নেই, তাতে ভাব নষ্ট ও অপরাধ হয়। আমি যখন যা বলে দেই, তা বদল করো না। আমার কথা, আমার ভাব, আমার ভাষা ঠিক রেখে চল্‌লে তোমাদের কদাচ

বিপদ্ হবে না। শব্দে সংকর্ষণশক্তি। নিতাইশক্তি বদলালে মহা-অপরাধ।"

"আমি যাহা বলি তাহা মন দিয়া শুনো, আমি যাহা লিখি তাহা মন দিয়া পড়ো, চিঠির মত পড়ো না, মুখস্ত ক'রে রেখো। সদাকাল আমার কথা অনুশীলন করো। আমি যাহা বলি তাহা নিত্যচিরকাল মনে রেখো। আমি যাহা বলি তাহা চিন্তা ক'রো। আমি যাহা বলি তাহা বিচার ক'রো, আমি যাহা বলি তাহা নিত্যচিরকাল প্রচার ক'রো। আমায় সদাকাল দেখে চলো। হরিনাম-নিষ্ঠা-পবিত্রতায় বুকে বল বাঁধ। তবেই তোমাদের মঙ্গল হবে। আমার কথায় কাজ করলে তোমাদের প্রতিষ্ঠা; আমার কাজ বহুকালব্যাপী ধরাধামে থাকবে। হরিনামে নিত্য-নিষ্ঠায় থেকো: কাল কলিতে ছুঁতে পারবে না।"

"জাহ্নবী সলিলে স্নান তুলসী সেবন।
দিবানিশি কর হরিনাম উচ্চারণ॥"

"পঞ্চবিগ্রহ :—গো, তুলসী, শালগ্রাম, গ্রন্থমালা।"

রক্ষা :—তুলসীবন, বেদী, ফুলগাছ, নৌকাকীর্তন, নিশাভ্রমণ।"
"তুলসীকে ধর্ম কহে।"

"আচরণ, ব্রহ্মচর্য্য। প্রচারণ—পাঠ, কীর্তন। দান, হরিনাম অনুকরণ—গুরুবন্ধু।"

"কর্তব্য :—১। অঙ্গন॥ ২। সংকীর্তন॥ ৩। ব্রহ্মচর্য্য॥ ৪। দৈন্য॥ ৫। নগরকীর্তন॥"

"উষায় স্নান, ত্রিস্নান, ব্রহ্মচর্য্য, ভাবগাম্ভীর্য পরমানন্দে করিও। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ।"

"গুরু গৌরাঙ্গ বলে, উঠরে কুতূহলে,
শীতল হবে মন প্রাণ রে।"

"হরে কৃষ্ণ হা রবে, হর রে রে কৈতবে,
যোষিৎ শয্যা ত্যজ পণ রে॥

"গোপী-গোপাল-গীতি, প্রাতঃ পূজন কৃতি,
গোষ্ঠ-গোবৎস পালন রে।"

"পঞ্চস্নান,—ক্ষালন, ধৌতি, শুদ্ধি, মার্জ্জন, নিষ্ঠা।" * "অথ শৌচনিয়ম যথা,—

* গৃহ, রাজপথ, দেবালয়, পবিত্র দেববৃক্ষ, জল ইত্যাদি হইতে দূরে ও লোকের অদৃশ্য ও অনির্দ্দিষ্ট স্থানে মৃত্তিকার উপর গুল্ম, তৃণপত্রাদি বিস্তৃত করিয়া তদুপরি পুরীষ ত্যাগ করিতে হইবেক। উপবীতকে দক্ষিণ কর্ণাবলম্বনে রাখিয়া অথবা পৃষ্ঠদেশে লম্ববান্ রাখিয়া নাসা, কর্ণরন্ধ্র, চক্ষু, মুখ ও মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদন রাখিয়া ওষ্ঠ ও নাসারন্ধ্রের সন্ধিস্থলে তুলসী কিম্বা বিল্বপত্র সংযোজিত করিয়া পুরীষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত সময়ে থুথু নিক্ষেপ ও ফুৎকার দেওয়া নিষিদ্ধ!"

"মলমূত্র ত্যাগের সময় মলমূত্র ও লিঙ্গের দিকে বা অন্যদিকে তাকান উচিত নয়। অতি নম্রভাবে উহা ত্যাগ করিতে হয়।"

"অথ প্রক্ষালন নিয়ম যথা—

বাম হস্তে দ্বাদশবার, দক্ষিণ হস্তে সাতবার, প্রতি পদতলে দুইবার, শিশ্নতে একবার, গুহ্যে তিনবার, পুনরায় বামহস্তে আটবার, দক্ষিণহস্তে পাঁচবার মৃত্তিকা লেপন কর্ত্তব্য। পদতল ভিন্ন অবশিষ্ট স্থানগুলিকে গোময় লেপন দ্বারা পবিত্র করা কর্তব্য।"* "গোময়-যমুনা।" "পঞ্চসার—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জল ও ধূলি।"

"মূত্র ত্যাগ অন্তে উভয় হাত ও মূত্রদ্বার ধুইতে হয়।"

"অথ দন্তধাবন নিয়ম যথা ;—

উপযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্বক্ষণে মুখগহ্বর, দন্তাদির মূলদেশ ও জিহ্বার নিম্ন ও উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা কর্তব্য"

"ব্রাহ্মমুহূর্ত ভিন্ন দন্তধাবন নিষিদ্ধ। তোমরা রাত পাঁচ দণ্ড থাকৃতে শয্যাত্যাগ করবে। শৌচাদি ও দন্তধাবন ক'রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতঃস্নান করো। প্রভাতি টহল-কার্ত্তনও করো" "অন্ধকার থাকিতে থাকিতে প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য।" "উষাস্নানে যবনের যবনত্ব বা ম্লেচ্ছের ম্লেচ্ছত্ব ঘুচিয়া যায়।" "সর্ব্বাঙ্গে গোময় লেপন করিয়া স্নান করিবে।" "জীবিতকাল পর্য্যন্ত তৈলমর্দন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" "আমলকী জলে পেষণ করিয়া মাথায় দিতে হয়, তৈলের সঙ্গে নহে।" *

* বিশিষ্ট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রতি প্রভুবন্ধুর উপদেশ।
তৎপরে উপযুক্ত দাঁতন আহরণ করিয়া বিধিমতে দন্তধাবন ও রসনা পরিষ্কার করা বিধেয়।

ত্যাগ।—ঝারী, ক্ষড়ম, ইচ্‌টকিন, কম্‌ফরটার, দস্তানা, তাম্বূল, ধূম্রপান, তৈল, বেশ, লোকাচার॥"

"ছত্র, বদ্ধবস্ত্র, পাদুকা, তৈল, অগ্নি,। ইতি ত্যাগ॥" (১)

"মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন ধাত্রী ও হরীতকী-মিশ্রিত জলে অবগাহন করা বিধেয় এবং গোময়, গোমূত্র, বিল্বপত্র, তুলসী, ধাত্রী ইত্যাদি গোদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নাত হইবেক; নাভি পরিমিত জলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিবেক। ইহাতে বহু তীর্থাবগাহনের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোময়—যমুনা; গোমূত্র—নর্মদা; গোদুগ্ধ—সাক্ষাৎ গঙ্গাতুল্য। গোদুগ্ধ অগ্নিতে পাক করিলে তন্মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যায়।" "পঞ্চস্নান। পঞ্চ পাঠ। পঞ্চ কীর্ত্তন। পঞ্চ লুণ্ঠন। পঞ্চ বন্দন।"

"ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কীর্তন। অবগাহন। ভৈরবরাগে কীর্ত্তন। করতাল-কীর্ত্তনে ভ্রমণ। ইতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকৃতি।" (১)

"নিত্য তিলকধারণ করিবে।" "দ্বাদশাঙ্গ তিলক"

"গদাধর পরিবারের তিলক করিও।'

"নিত্য, অল্প গোবর দুইবার ভোজন।" (২)

---

(১) সূর্য্যোদয়ের পূর্ববর্তী ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট; চারিদণ্ড—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত।

(২) বাবুগণের প্রতি প্রভুর 'জলতিলক করিও' উপদেশ ছিল। প্রভু ভক্তগণকে একটি মটর দাইলের পরিমাণ গোময় খাইতে বলিতেন, প্রয়োজন হইলে নিজে খাইয়া দেখাইয়া দিতেন।

"নিম, তুলসী ও বিল্বপত্র ভক্ষণ করিও, স্বাস্থ্য রহিবে।"

"ভোজন, পান, ব্যাধি, ক্রীড়া, শত্রু ॥ ইতি বিচার।"

"উচ্ছিষ্ট, অনিষ্ঠা, মহাপাপ, মহাকৈতব। কারো উচ্ছিষ্টই খাবে না, কেহকে উচ্ছিষ্ট দিবে না।" (৩) "নিদ্রাবিকারে ঔষধ। বিল্বপত্র, নিত্য অষ্টবার, দিনে ও রাত্রিতে ভোজন হইবেক। নিত্য চিরকাল, ঐ বিল্বপত্র, চর্ব্বণ পূর্ব্বক গলাধঃকরণ। ঐ নিদ্রাবিকারে, আমলকী বৃক্ষের মূল, রস করিয়া প্রভাতে পানবিধি।" "ঔষধ, পিত্তের। নিম্বপত্র, প্রভাতে ভোজন। নিত্য। মেধা বৃদ্ধির ঔষধ, শেওড়ার মূলের রস, শনি ও মঙ্গলবার, প্রভাতে পান। জ্বরবন্ধ কৃতি—নিত্য পাটপাতা, জলসিক্ত করিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক গলাধঃকরণ বা ভোজন।"

"গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন তিক্তদ্রব্যাদি ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। শরীর দুর্ব্বল বা কাতর অবস্থায় নালিতার জল খাওয়া উচিত।

"গন্ধকর্পূর। তিক্ত হিং।" "খাদ্যবিচার সদা করো!" "ভোজনই ব্যাধি।" "কেহ আমিষ খাইও না।" "অগব্য আমিষ। মহাব্যাধি আমিষ।" "মাংসভক্ষণ করিরা গুল্মরোগ। মৎস্যভক্ষণ করিয়া কৃমিরোগ।" "গোজাতির ঈশ্বরত্ব, উহাকে খাইয়া মহাপ্রলয়।" (৪)

---

(৩) অন্যত্র বন্ধুবাণী আছে, 'বৈষ্ণব কণিকা কর করপুটে পান।'

(৪) গোজাতি রাজ-ঐশ্বর্য্য, মানব সম্পদ্। উহার বৃথা হননে মানবের অকল্যাণ, হানি।

"খাদ্য তণ্ডুল।" "ফলকে ভোজ্য কহে।" "রস—থানকুনি।"

"প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন ক্রিয়ান্তে অল্পসংখ্যক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্যের সহিত জলপান করা কর্ত্তব্য। ইহার পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ উভয় ক্রিয়ান্তে বিষ্ণুচরণামৃত, গুরু বা বিপ্রপাদোদক, গোময় অথবা গোমূত্র, তুলসা-মূলস্থিত মৃত্তিকা, কোন দেবদেবী বা বিগ্রহের প্রসাদ ইত্যাদি বা ইহার কোন একটি গ্রহণীয়।"

"ছানা, মাখন, ক্ষীর অল্প পরিমাণে খাওয়া যায়। "দুগ্ধাদির মধ্যে অল্পমাত্র মিষ্টি মিশাইয়া খাওয়া যায়, তাহা ভিন্ন অধিক মিশ্রিত মিষ্টদ্রব্যাদি খাইতে নাই" "গোধুম বা যবচূর্ণ রুটি বা লুচি খাওয়া যায়।"

"ভোগ না ছাড়লে অধিক দিন বাঁচা যায় না। নাড়ী মোটা হ'লে অপকার বই উপকার হয় না। অধিক খেলে অশান্তি ও ভার ভার বোধ হয়। যা খেতে মিষ্টি, তা ফেলে রাখতে হয়। উঠলে আনন্দ।"

"নারায়ণপ্রসাদ ভিন্ন অন্য দেবতার প্রসাদ আমিষযুক্ত হইলে বা তৎসংস্পর্শ হইলে কোন নিরামিষ প্রসাদও খাইতে নাই।

"খাইতে অল্পমাত্র শব্দ হওয়া উচিত নয়।"

"কোনও দ্রব্য ভক্ষণ অর্থাৎ উদরস্থ করিতে হইলে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা উর্দ্ধে উত্তোলন

করিয়া রসনার উপর পরিত্যাগ করা উচিত। দিবা চতুর্থ প্রহরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ কর্ত্তব্য।

আহারকালীন জলপান নিষিদ্ধ। আহারের দুইঘণ্টা পরে জল পান করিবেক; অভ্যস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। ইহাতে মলমূত্রের অল্পতা হয় ও ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হয়।"*

"জল অতিপান নিষিদ্ধ। "নদীজল পানীয়।" "সুধা জল পান" "নিতান্ত পিপাসা হইলে হরিচরণামৃত অথবা অল্প তুলসী-মিশ্রিত জল বা কাঁচাদুগ্ধ খাওয়া যায়।"

"বাম নাসারন্ধ্রে শ্বাসবহাকালীন আহার বা কোন দ্রব্য উদরস্থ করা অকর্ত্তব্য; অর্থাৎ বাম নাসারন্ধ্রে শ্বাসবহাকালীন কুলকুণ্ডলিনী অচৈতন্যাবস্থায় থাকে; সুতরাং নিদ্রার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে উক্ত সময়েই নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাসবহাকালীন কুণ্ডলিনী-শক্তি চৈতন্যাবস্থায় থাকে। সুতরাং আহার বা কোন দ্রব্য উদরস্থ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উক্ত সময়েই গ্রহণ কর্ত্তব্য"

"আহারান্তে স্নান বা অবগাহন করা উচিত নয়। উহাতে যাহা খাওয়া যায়, তাহা অজীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা।" (হঃ)

নিম্নলিখিত তিথ্যাদিতে নির্জ্জলা উপবাস পালন করা কর্ত্তব্য। সীতানবমী, একাদশী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, দুর্গাষ্টমী, মাঘীপূর্ণিমা, বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়া, ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয়া ত্রয়োদশী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ভাদ্রের

পূর্ণিমা, রামনবমী, শিবচতুর্দ্দশী ইত্যাদি। উপবাসে সংযম, পারণ ও জাগরণাদি পালন কর্ত্তব্য। *

অথ সংযম নিয়ম যথা :—উপবাসের পূর্ব্ব দিবস নির্জ্জলা উপবাসে দিবাভাগ যাপন করিয়া সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেক। অথ পারণ নিয়ম যথা :— উপবাসের পর দিবস পঞ্জিকা-লিখিত সময়ের মধ্যে হবিষ্যান্ন গ্রহণ কর্ত্তব্য। পারণের সময় অতীত হইলে তদ্দিবস অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ।

অথ জাগরণ নিয়ম যথা :—উপবাস দিবসে সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে নিদ্রা, তন্দ্রা, ও আলস্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম-গান, তথা পঠন, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, কথন, কীর্ত্তন ইত্যাদি আচরণপূর্ব্বক রাত্রিজাগরণ করা কর্ত্তব্য। প্রতি সোমবার দিবসে উপর্যুল্লিখিত নিয়মানুসারে আচরণ করিবেক।"

"খাদ্যবিচার সদা করো।" "আহারকালীন কথনাদি নিষিদ্ধ। অন্যের অলক্ষ্যে ভোজন করিবে। মিষ্টদ্রব্য ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রায়ই বর্জ্জনীয়। কোন দ্রব্যই পরমেশ্বর বা কোন উপাস্যদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া উদরস্থ করা অবিধেয়। স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ কর্ত্তব্য; অসাধ্য হইলে শ্রদ্ধাবান্ ধর্ম্মনিষ্ঠের হস্তের পাকান্ন গ্রহণ করিবে অথচ উক্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় বা বর্ণশ্রেষ্ঠ হইবেক। *

*উপবাসে অসমর্থ-জনকে, প্রভু ফল, জল, রুটি, ছাতু, অন্ন ইত্যাদি গ্রহণের অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ইন্ধনস্থিত পাকপাত্রের তণ্ডুলগুলি অল্প বিকসিত হইবার পূর্ব্বক্ষণ হইতেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বস্ত্রাচ্ছাদনে রাখা বিধেয়।

ঐ প্রকার কোন অনিবেদিত বস্তুর ঘ্রাণ লইবে না, অর্থাৎ ঘ্রাণ গ্রহণে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি অর্দ্ধোচ্ছিষ্ট হয়; সুতরাং দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত বিষয়ের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।"*

"তুলসী না দিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না।"

"আহারান্তে ধাত্রী এবং হরীতকী ফল ভক্ষণ করিবে।" "পান, সুপারী, খয়ের, চুন, ধনে, গুয়ামউরী ইত্যাদি খাইতে নাই।" "ধূম্রপান, তাম্বূল, সঙ্গ, চঞ্চলতা, নিরানন্দ। ইতি ত্যাগ।" (১)

"সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ চিত্তে থাকিও।"

"নিম্নলিখিত তিথ্যাদিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ভোজন নিষেধ। প্রতিপদ—কুমড়া, দ্বিতীয়া—তিৎফল, তৃতীয়া—পটোল, চতুর্থী—মূলা, পঞ্চমী—বেল, ষষ্ঠী—নিম, সপ্তমী—তাল, অষ্টমী—নারিকেল, নবমী—লাউ, দশমী—কলমী, একাদশী—সিম, দ্বাদশী—পুঁইশাক, ত্রয়োদশী—বেগুন, চতুর্দ্দশী—মাষকলাই, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা—মৎস্য ও মাংস।"

---

* ভক্তিরাজ্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। প্রভু ডোম বা বাগ্দী কুলোদ্ভব নিষ্ঠাবান্ ভক্তের নিকট হইতে ব্রাহ্মণজাতীয় ভক্তকেও আহার্য্যগ্রহণে আদেশ দিয়াছেন।

"বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর অংশ হইতে অশ্বত্থ, মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার অংশ হইতে পলাশ, বীণাপাণি দেবী সরস্বতীর অংশ হইতে ধাত্রী, শৈলেন্দ্রদুহিতা দেবী উমার অংশ হইতে তুলসীর উৎপত্তি হইয়াছে। তুলসীদলে সর্ব্বদেবদেবীর অবস্থিতি হইয়া থাকে; সুতরাং যে কোন উপযুক্ত দ্রব্য বা অর্ঘ্যাদি যে কোন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে তুলসীদলে অর্পণ করা যায়, তিনি তা প্রাপ্ত হয়েন।

তুলসীদলে সলক্ষ্মী বৈকুণ্ঠনাথ অবস্থিতি করেন। অশ্বত্থ-মূলেও ঐ প্রকার অবস্থিত আছেন। তুলসী ও ধাত্রীবৃক্ষের ছায়াতে পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধ, কোন দেবদেবীর পূজা, পুণ্যাহ ও অন্যান্য প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বহুগুণ ফললাভ হইয়া থাকে।"*

"তুলসীর নিকট তিনসন্ধ্যা মাথা কুটীও, সেবাশুদ্ধি যাচ্ঞা করিও।"

"দ্বাদশী ও রাত্রিকালে তুলসী চয়ন করিবে না। ধাত্রী ও তুলসী বৃক্ষের শাখা ও শাখার অগ্রভাগ ছিন্ন বা ভগ্ন করিলে মহা-পাতক হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীফল ভক্ষণ ও তচ্ছায়ায় ভোজন, পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধ ও কোন সৎকার্যের অনুষ্ঠান অবিধেয়।"*

---

* চিহ্নিত বন্ধুবাণী সাধু নিবারণ মিত্র লিখিয়া রাখেন, ঐ সকল বাণী ১৩৩২ সনে বন্ধুবার্ত্তায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বসুখ সান্যাল মহাশয়ের নিকটও ঐরূপ বাণী দেখিয়াছি।

"ঋণ ক'রে স্বস্ত্যয়নাদি করা বিশেষ মঙ্গলজনক নহে। ঋণ, ব্যাধি ও বৈরী, ইহার শেষ রাখতে নাই। বাড়ীতে ও বাড়ীর চতুষ্পার্শে হরিনাম সংকীর্ত্তন, বাড়ীতে তুলসীবন ও পঞ্চবটী স্থাপন করিলে বিশেষ মঙ্গল হয়। পঞ্চবটী—(ধাত্রী) আমলকী, হরীতকী, বিল্ব, নিম্ব, তমাল।"

"কুভক্ষ্য ভক্ষণ, কুস্থানে গমন, কুদৃশ্য দর্শন, কুস্পৃশ্য স্পর্শন, কুবাক্য কথন, কুপুস্তক পঠন, কুভাবে ভ্রমণ, কুনিয়ম পালন, কুবিষয় শ্রবণ, কুদান গ্রহণ, কুসংসর্গকরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ।"

"মৎস্য-মাংস ভক্ষণ; তৈল মর্দ্দন, গুরুপাক দ্রব্য উদরস্থকরণ, অধিক ও বৃথা কথন, বৃথা তর্ক শ্রবণ, ধর্ম্মহীন ও পতিতের দান ও অন্ন গ্রহণ, মিথ্যাবাক্য কথন, অপরিষ্কার জলসেবন, বৃথা মৃত্তিকা খনন, দ্রুত গমন, লম্ফপ্রদান, অতিরিক্ত ভোজন, বৃথা পরিশ্রম, অধিক ও বৃথা ভ্রমণ, বৃথা বৃক্ষারোহণ ও জলসন্তরণ, অসত্য শ্রবণ ও কথন, জীবহত্যাকরণ, পরনারী ও বামাজাতি দর্শন, বৃথা স্ত্রীসংসর্গকরণ, পুরীষ অর্থাৎ বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ও পূতিগন্ধময় দ্রব্যাদি দর্শন ও তৎতৎ ঘ্রাণ লওন, সুরা-পান ও মাদকদ্রব্য সেবন, চিত্রলিপি ও দ্যূতক্রীড়াকরণ, স্নেহময় বা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, উপাধানাদি গ্রহণ, অন্যকে পীড়ন ও ভৎ'সন, অন্যের ব্যবহার্য্য শয্যা বস্ত্র, আসন ও পাদুকাদি গ্রহণ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবেক।" (হঃ)

"নিদ্রা, তন্দ্রা, অলসতা, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, অসন্তুষ্টতা, ক্রোধ, শঙ্কা, পাদুকা, ছত্র, উষ্ণীষ, উচ্ছিষ্ট, অবিবেকতা, কলহ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

"সর্ব্বাবস্থাতেই তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করিতে হয়।"

"তোমরা পদে পদে সাবধান থেকো।"

"চৌরভয়, অগ্নিভয়, প্রহার ভয়, রাজভয়, দারিদ্র্যভয়। ইতি সতর্কতা॥" "ভয় অগ্নি।" "পঞ্চপ্রলয়—চুরি, ডাকাতি, কলহ, ঝড়, নৌকাযাত্রা" "পঞ্চমহাপ্রলয়—মৃত্তিকা খনন, গ্রহভয়, সর্পভয়, দুষ্টভয়, অহিন্দু।"

"কীর্ত্তন মঙ্গলের সদা চেষ্টা পাইও।"

"ক্রোধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবে।" "পাপ—ক্রোধ, দ্বন্দ্ব, জয়, ঐশ্বর্য্য, অনিষ্ঠা।" "ক্রোধ, মান, অভিমান, ঘৃণা. লজ্জা, ভয়, অনিষ্ঠা ইত্যাদি জনমের মত ছাড়িও।" (রঃ)

"যখন বিষয়ানুরাগের সংস্কারগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তখন জানিবে অতি উৎকৃষ্ট বশীকার জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং বৈরাগ্যও তখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বশীকার জ্ঞান উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মলোকের স্পৃহাও থাকিবে না। এই বশীকার জ্ঞান যখন দৃঢ় হয় তখনই অনুসন্ধান দ্বারা গোবিন্দকে আদিপুরুষ জ্ঞাত হইয়া চিত্ত ঐকান্তিকভাবে তাঁহাতেই আসক্ত হয় এবং পরিপক্কদশায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।"(হঃ)

পরচর্চা নিষেধ, সত্যাশ্রয়, অহিংসা

"যেখানে সেখানে যাস্‌নে। ও'তে চিত্ত মলিন হয়। কেউ ভাব, অবস্থা বুঝে কথা বলে না। তাই শান্তি হয় না, লক্ষ্য ছেড়ে ঘুরে মরে।" "তোরা আর কদাও কোথাও যাস্‌নে; একালে, ওকালে, ত্রিকালে, এই ফকীরের কাছেই থাকিস্‌; পরিণাম রবে।"

"পঞ্চ রহস্য—অবতার, সাধু, মোহন্ত, চৌর, পতিত।" "ইন্দ্রজাল—চৌর, খোট্টা, সাধু, ভেক, বাউল।" "বিপদ্‌—যোষিৎ, বালক, বাউল, ফকির, ব্রাহ্মণ, গালিদান, উপদেশ, খবর, চৌর।

"সর্ব্বদা সরল ও শুদ্ধচিত্তে থাকা উচিত। কাহারো প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য করা উচিত নহে।"

"কাহারও দোষ দর্শন না করিয়া নিজেকে সর্বাপেক্ষা দোষী মনে করিও।"

"পরচর্চ্চা কদাপি অন্তরে বা কর্ণে স্থান দিও না।" "নিদ্রায় ধর্ম্ম হয় না, লভ্য শুধু পাপ। পরচর্চ্চা ও বাহ্যলক্ষ্য জনমের মত ত্যাগ ক'রো। অন্যের বিষয় ভাবলে নিজের চিত্ত মলিন হয়। মালিন্য দূর কর। ঘরের দেওয়ালে লিখে রে'খো—পরচর্চা নিষেধ, বাহ্যলক্ষ্য ত্যাগ।"

"খলের সহিত অধিক কথা কইতে নাই। ব্যবহারও। সর্ব-প্রকার প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করাই ভাল।"

"নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষোভ, আলস্য, অভিমান, অহংকার, হিংসা, পরনিন্দা—এ'সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হয়" "জীবহিংসায় মানুষের উন্নতি কোনদিনই হয় না। হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট।" "অহিংসা অক্রোধ।"

"কাহারও প্রশংসায় উত্তেজিত, আহ্লাদিত ও অহংকৃত এবং নিন্দায় নিরুৎসাহিত ও দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। কাহাকেও নিন্দা, স্তুতি বা প্রশংসা করিতে নাই।"

"সর্বদার জন্য মনে হর্ষ রাখা উচিত, কিছুতেই ক্ষুন্ন বা দুঃখিত হওয়া উচিত নহে।" "সর্বদা স্মরণানন্দে থাকিও।"

"বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত নিষিদ্ধ। কদাচ মিথ্যা বলা উচিত নয়। কাহারও প্রতি কটূ কুৎসা ও ঘৃণিত বাক্য বলিতে নাই।"

"কর্ত্তব্য ঠিক রাখিয়া কায়মনোবাক্যে কাহাকেও দুঃখিত ও লজ্জিত করা বা মর্ম্মে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। কাহারও নিকট কখনও কোন বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে নাই।" "জীবমাত্রেরই প্রাণে উদ্বেগ দিবে না।"

"তোমরা কাহাকেও আঘাত ক'রো না।"

"পৃথিবীর সকলেই আমার, তোমরা সবকে আপনার ক'রে লও।"

"তোমরা সমাজে, চার্চ্চে যেয়ে অমন ক'রে নিন্দা-বিদ্বেষ করো না। মহাপাপ। নিন্দায় জীবকে ভ্রান্তিতে ফেলে।" "নিত্যানন্দের স্বরূপ দেখে সবকে সম্মান দিবে।" "সমাজে,

চার্চ্চে, মস্‌জিদে প্রণাম করিও। সর্ব্বস্থানে নিত্যানন্দের বাস।” “সমাজে, চার্চ্চে, মস্‌জিদে যেও, কিন্তু একলক্ষ্য, সতীর পতির মত।”

“একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় না। সংসারে ভজনীয় একজন মাত্র।” “এই মর্ম্ম এক ধর্ম জীবভজন।” “তবু বিশ্বাস হ’ল না এক ব্রহ্ম এই বিশ্বাস, এক ব্রহ্ম এই বিশ্বাস।” “লক্ষ্য—জগদ্বন্ধু।” *

“প্রাইভেট কন্‌সেনছ—(Private conscience)ই ধর্ম।”

“বাক্‌সংযত—মৌনী হও।” “কথোপকথনকে কলহ কহে।” “বৃথা কথা বলো না। বৃথা বাক্যব্যয়ই দুর্ভাগ্য।” “সদা হরিকথা কও, নাম সংকীর্তনে রও, তাপ সাবধান হও।

“হরিনামের আবশ্যক ভিন্ন কাহারো সহিত কথা কহা নিষেধ।”

“তোমরা সদাকাল সত্যকথা বলবে। কদাচ মিথ্যা বলবে না। প্রাণপণ ক’রে, সত্যরক্ষা করবে।” “সবাই সত্যের দিক্ চল্‌বে। তোমাদের প্রাণে সংকর্ষণ শক্তি দিবেন। যে সত্য পথে চলে, কেউ তার কেশও ছু’তে পারে না ” “যা’ বল, তা’ করার একান্ত ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই তা’ সিংহবিক্রমে করতে পারবে।” “তেজ অচল অটল থাকলে, একান্ত ইচ্ছায়, মানুষ সবই পারে।” “সত্যই হরিনাম।” “সত্যত্বকে ধর্ম কহে।” “প্রভু সত্য নিত্য বস্তু।” ‘সত্যাশ্রয়, তপোনিষ্ঠা।’

"গোপন মাধুর্য্য"

"বৃন্দা দূতী শ্রীমতি রাইকে এই উপদেশ করেন।" (১)

'যাইতে উত্তরে, বলিবি দক্ষিণে, দাঁড়ায়ে পূরব মুখে।
গোপনের প্রেম, গোপনে রাখিবি, থাকিবি পরম সুখে॥
হেঁসেলি হইবি, রন্ধন করিবি, না ছুঁবি ভাতের লেশ।
সাগরে নামিবি, সিনান করিবি, না ভিজিবে মাথার কেশ॥'

"...তোমরা এইরূপ কার্য্য করিয়া, আত্মগোপন করিও॥ ইষ্ট ও পরিণাম রক্ষা হবে। চিরজীবন ইহা পালন করিও॥

জগদ্বন্ধু॥" (২)

"যাদের মনঃপ্রাণ প্রভুতে সমর্পিত, তাদের অনেক সইতে হয়। আমার জন্য কত সইতে হ'বে।"

(১) অবস্থাবিশেষে উৎপীড়ক অভিভাবকের নিকট শ্রীহরিদর্শন-কথা বা ভগবদ্‌ভক্তি-ভাব-উচ্ছাস গোপন রাখিতে প্রভুর উপদেশ আছে। গোপীগণ আত্মগোপন করিতেন, বহির্মুখীদের কাছে কারাগৃহে আবদ্ধ সনাতন গোস্বামিপাদ, মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য কারারক্ষকের নিকট ছল-চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ চাতুরীতে মাধুরী আছে। ইহা স্মরণীয় যে, ধর্মগোপন মাধুর্য্যময়, অন্যপক্ষে পাপগোপন কদর্য্যতাময়।

(২) বন্ধুপ্রিয় বালক অক্ষয়, সুরেন, সুরেশ ও কালীকে প্রভু বাকচর হ'তে ১৩০৪, ২৩শে শ্রাবণ এই পত্র দেন।

"আত্মগোপনেই প্রেম-মাধুর্য্যের বিকাশ পায়। গোপনই মাধুর্য্য। যারা প্রভুকে ভালোবাসে, তাদের কিছুতেই ছুঁতে পারে না; কাল, কলি, প্রাক্তন দূরে সরে থাকে। মানুষের সাধ্য কি তোদের কেশাগ্র স্পর্শ করে? তোমরা সদা আত্মগোপন ক'রে প্রভুর দিকে চলো; পাপপুণ্যে স্পর্শ করবে না।"

"শব্দ চৌর্য্য। গোপন মাধুর্য্য।"

"সর্ব্বদা স্মরণানন্দে থাকিও।"

গার্হস্থ ধর্ম-সম্বন্ধে

"অমন ক'রে ভ্রষ্টবুদ্ধি হ'তে নাই ও পিতামাতার অন্তরে কষ্ট দিতে নাই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করেও শান্তি পায় না।" *

*প্রভুবন্ধু তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ব্রহ্মচারী ভক্তগণের অধিকাংশকেই সংসারাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। প্রয়োজন ও অধিকার বুঝিয়া কাহাকেও কাহাওে চিরকুমার থাকিতেও আদেশ করিয়াছেন, আবার কোন কোন বিবাহিতকে অবিবাহিতের ন্যায় থাকিতে বলিয়াছেন। বন্ধুহরি হরি-নামের সহিত সদাচার-নিয়মনিষ্ঠা পালন করিতে গৃহীদিগকেও বলিতেন। পুত্রকামনাবিষয়ে সংযত থাকিতে প্রভুর উপদেশ আছে। কেবল কন্যা বা কুপুত্র অথবা অল্পায়ু পুত্র বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পুত্রের জন্য ইষ্ট শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে। ভার্য্যার সহিত হরিগণ-গান, ইষ্ট-চিন্তা ও তিথি-নক্ষত্রাদি বিচার করিয়া পুত্রবর কামনা করা গুরুবন্ধুর উপদেশ। গৃহে সপরিবারে হরিনাম করাও বন্ধুর উপদেশ।

"আমি সংসার ছাড়া নই। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জড়িত।"

"তোমরা গৃহে যাও, হতাশ হ'য়ো না। আমি আছি। চিন্তা কি?" "গৃহী হইও, বিষয়ী হইও, নিষ্ঠায় থাকিও।"

"জননী ও ভ্রাতৃগণকে চিরদিন সর্ব্বতঃ পালন করিও।"

"বাড়ীতেই কীর্ত্তন করিও।"

"দেশে দেশে কীর্ত্তন, ভক্তিবিচার, ইষ্টগোষ্ঠী, চিরদিন করিও।" "শিষ্যা বিবাহিতা স্ত্রী। লক্ষ্মী কন্যা। মঙ্গল গৃহ। অবলম্বন সর্ব্বাস্তিত্ব পুত্র।" "...দেশে দেশে কীর্ত্তন কর, কীর্ত্তন সর্ব্বত্র করাও। স্কুল কলেজে হরিনাম ছড়াও।"

"অসতী ভার্য্যার মুখাবলোকন করিবে না ও উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে।" "সতী রক্ষণা"। 'কুসঙ্গবর্জ্জন।'*

"দশমস্কন্ধ ভাগবত মুখস্থ করিও॥ চরিতামৃত মুখস্থ করিও॥ সগোষ্ঠীতে, নৈষ্ঠিক রহিও॥ অকৈতবে বিষয়বৃত্তি করিও॥ চিরদিন, গৃহস্থ বৈষ্ণব রহিও॥ নিত্য, কীর্ত্তন করিও॥ প্রভাতি গাইও॥ তুলসী-বন করিও॥ ইষ্টগোষ্ঠী করিও॥" (শ্রীকিশোরী চক্রবর্ত্তীর প্রতি)।

"কেহ শরীরের রক্ত জল করে আয়ু ও বংশ নষ্ট ক'রো না, আমার শপথ।"

"কেহই, যেন চিরদিন মায়া-মনসিজ অভ্যাস না করেন।"

---

* অন্যপক্ষে গৌরহরির প্রতি কটাক্ষ করায় গৌরপ্রিয় সার্ব্বভৌম, কন্যাকে গৌর-বিমুখ পতি-ত্যাগে উপদেশ দেন।

"কোন বিষয় সাধ্যাতীত হইলে দেববৃন্দ, ঋষিবৃন্দ ও পিতৃ-পুরুষদিগের নিকট ঋণী হইতে হয় না"*

"সংসারে পবিত্র জীবন বহন কর। আমি তোদের পাছে আছি। দিনান্তে একবার মনে ক'রো।" "তোমরা দিনান্তে একবার আমায় স্মরণ করো। তুলারাশিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত পাপতাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। স্মরণ কর, আর না-ই কর, আমি নিত্যকাল তোমাদিগকে স্মরণ করব, স্মরণ করে রক্ষা করব।" "তোদের গতি অহং, কহিলাম সত্যকথা, এ' কথা নহে অন্যথা।"

"ভাই বন্ধু প্রতিবাসী কুটুম্ব স্বজনে,
সত্যস্নেহ সদাচারে তুষিও সতত ;
বিরোধ-বিদ্বেষ-ভাব রাখিও না মনে,
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে খাদ্য দিও সাধ্যমত ॥

ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখি কর্ম করিও পালন,
যাইও সে স্থানে, যথা সাধু আগমন ;

সাধুর চরণে পড়ি, সুখে দিও গড়াগড়ি,
বসিও অদূরে, রহে ইতর যেমন,
চঞ্চলতা ব্যাকুলতা করিও বর্জ্জন ॥

কুস্থানে গমন আর কুদৃশ্য দর্শন,
কুস্পৃশ্য স্পর্শন কভু কুভক্ষ্য ভক্ষণ,

* ভক্তবর সর্বসুখের প্রতি প্রভুর এই লিপি

কুসঙ্গ কুরুচি ক্রোধ, কুজনের অনুরোধ,
কুদান গ্রহণ, কভু কুগ্রন্থ পঠন,
—এ' সকল কায়মনে করিও বর্জ্জন।

সমগ্রীব হ'য়ে বসি স্বস্তিক আসনে,
নাসাগ্রেতে দৃষ্টি সদা রাখিও যতনে,

ব্রজ সৃষ্টি, রূপ, লীলা, যৈছে হরি আচরিলা,
বিচারিও এ' সকল আপনার মনে,
সমগ্রীব হ'য়ে বসি স্বস্তিক আসনে ।।*

অবিবেকতা ও চৌর্য্য-হিংসা-মোহ-মায়া,
নিদ্রা, তন্দ্রা, লোভ, ক্ষোভ, আলস্য, অসত্য ;

ত্যজিলে এ'সব তবে শুদ্ধ হয় কায়া ;
নতুবা কি মন'পরে শোভে অধিপত্য ?

---

* বাম জঙ্ঘা ও বাম উরুর সন্ধির অভ্যন্তরে দক্ষিণ পদতলে এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধির অভ্যন্তরভাগে বামচরণতল রাখিয়া পবিত্র সমতল স্থানে কম্বল কুশাসন আদিতে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া সমগ্রীব হইয়া বসিয়া নাসাগ্রে স্থিরদৃষ্টি ও পাণিতলদ্বয় উভয় উরুর উপর উত্তান ভাবে রাখিতে হয়। ইহাই স্বস্তিকাসন।

পদ্মাসনে বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম পদ রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে স্থির ভাবে বসিয়া ইষ্টকে ধ্যান করিতে হয়। আসনে চিত্ত স্থির ও নানা ব্যাধি নাশ হয়।

শাস্ত্রপাঠ জীবে দয়া সত্যের সেবন,
অল্পাহার গম্ভীরতা অভ্যাস করিবে :
বেদবিধিমতে সব করিও পালন ;
সর্ব্বজন সহ মম আশিস্ জানিবে ॥
গোবিন্দে অর্পিও সব ওহে মতিমান্ ;
পার্থিব সুখেতে কভু তৃপ্তি নাহি হবে ;
পুরাণ-বেদান্ত-বেদ-সাঙ্খ্যের প্রমাণ,
বিনা মনোবৃত্তি-রোধ শান্তি কি সম্ভবে ?”

কোনও কোনও মাতার প্রতি

ভক্তকে মাধ্যমে রাখিয়া মন্দির হইতে উপদেশ

“সর্বদা সকলের কাছে সাবধান ও সতর্ক থাকিতে হয়। তাহাতেও যদি কেহ কুটিল কটাক্ষ করে, তবে সে পাষণ্ডকে এক সময় নির্জ্জনে ডাকিয়া পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় ও মুক্ত কণ্ঠে তাহাকে পুনঃ পুনঃ পুত্র ডাকিতে হয়।” “মাছ, মাংস, তৈল, লবণ, ডাল, তরকারী, পান, সুপারী, চূণ, আলোপাতা ও বেশী জল, ইহা কদাপি খাইতে নাই।”

“কথা বলা প্রায় ছাড়িয়া দিলেই ভাল হয়। সর্বদা কৌপীন পরিয়া থাকা উচিত।” “সকলের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলা উচিত।” “কীর্ত্তনে নৃত্যটি সর্ব্বদাই বজায় রাখিতে হয়.

কারণ শরীরের দ্বারা যত পাপ হইতে পারে, উপযুক্তরূপে নৃত্য করিলে সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়া যায়।"

"মাটি গুলিয়া অথবা সিন্দূর গুলিয়া সর্বদা শরীরে রাধাকৃষ্ণ নাম লেখা উচিত।" "অনেক রাত্রি হইলে বাহিরে আসিয়া বেলগাছতলা, তুলসীগাছতলা, ও নারায়ণ-মণ্ডপের আঙ্গিনায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি দিতে হয়, তুলসীমূলের মাটি সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে হয়। সুযোগ হইলে দিনেও গড়াগড়ি দেওয়া যায়।"

"নিকটে বা দূরে সংকীর্ত্তন হইলে সেই তালে তালে ঘরে দরজা দিয়া নাচিতে হয়।" "রাত্রে সামান্য একটু জলও খাইতে নাই।" "এই সকল নিয়ম পালন করিলে যদি কেহ মারে, ভৎসনা ও বিড়ম্বনা করে, লাঞ্ছনা দেয়, তবুও এ'সমস্তই সহ্য করিতে হয়। খুব সাহস চাই।"

"ত্রিস্নান করিও। নিত্য লক্ষ নাম করিও। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিও।। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মুখস্থ করিও।। নিদ্রালস্য ত্যাগ করিও।। স্ত্রী-পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যাদি ত্যাগ করিও।। চক্ষু, কর্ণে, মনুষ্যংবিষয়, গ্রহণ করিও না।। হবিষ্য করিও। লবণ-সৈন্ধবাদি ত্যাগ করিও। হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। স্বরূপ-দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও॥ গৌর-গদাধর ধ্যান করিও।। মিলনাদি-স্মরণে, আবিষ্ট হইও।।" (পত্রযোগে উপদেশ)

"সকলের দ্বারা কীর্ত্তন করাইও।। আমি, যেন, আসিয়া, সবের, ভক্তি পাই। নগরকীর্ত্তন ও টহলও দেওয়াইও।" (পত্রযোগে)।

"গুরু জগদ্বন্ধু।"

ভজন-সাধন, তত্ত্বকথাদি

"ভজন-সাধন সুখ, সৌভাগ্য আয়ুর কারণ ও ফলই গুরু।"
"বহুজন্ম পার হয়ে মানবজন্ম হয়। মানবজন্ম পাপ করিবার জন্য নহে, কৃষ্ণসেবার জন্য।

"সর্ব্বকার্য্যে দায়ী নর।"

"আত্মহত্যা মহাপাপ। দেহ, রূপ, যৌবন, বৃথা ধন, সব কৃষ্ণপাদে সমর্পণ।" 'ধ্যেয় রাধামাধব।' 'গৌরগদাধর ধ্যান করিও।' 'গৌরনিত্যানন্দ ধ্যান কর।' 'চিন্তন জগদ্বন্ধু।'

"ভজন—দর্শন, জপন, স্মরণ, নিবেদন, আত্মনিবেদন।"

"সাধন—সংকীর্তন, নর্তন, লুণ্ঠন, পঠন, প্রদক্ষিণ।"

"কীর্তন-মঙ্গলের সদা চেষ্টা পাইও।"

"(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধা মাধব রাধিকা নাম॥"

"সদা কৃষ্ণস্মৃতি। সদা বিগ্রহ চিন্তা।"

"হরি হরি বল মন, জনম বিফলে যায়।
দারুণ অরুণসুত শিয়রে আগত প্রায়॥"
"কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য।
পাপ তাপ অপরাধ কৈতব কুভজ্য।
(তোর এই গতি রে) (কৃষ্ণ বিমুখ হয়ে)
(শত্রুগণ সঙ্গে লয়ে।)"

"পুনঃ পুনঃ উপাসনা দ্বারা ষড়্‌রিপু, দশ ইন্দ্রিয়, নবদ্বার, অবিদ্যা, মন ও অহংকারাদির বৈপরীত্য-সাধন কর্তব্য।"

"পবিত্রতার মধ্যে যাও। তোমাদের সরল ভজন দেখলেই, আমার উদ্ধারণব্রত শেষ হয়।"

ব্রজের তিন প্রকারের ভজন

১। "সখী ল'লতা। ইনি রাধামন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি প্রেমের কার্য্য করেন। ইনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন; কেন না, পাছে শ্রীমতী কাঁদিয়া উঠেন, এইজন্য। ইনি প্রেমের পথের। ইঁহার ডাক "মাধব"। ইনি শ্রীমতীকে 'রাই' বলিয়া ডাকেন। ইনি শ্যামকে রাধামন্ত্রে দীক্ষা দেন। অর্থাৎ শ্যামের গুরু আর দাসীও। আর সকলের শ্রেষ্ঠ আদিরসপ্রেমে আত্ম-সুখ-বিস্মৃতি। ইঁহার চেষ্টা, কিসে রাইয়ের রাত্রে আনন্দ হয়। কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে। ইঁহার হইল রাই-জীবন।

বৃন্দা সখী। ইনি যুগলমন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি ভক্তির কার্য্য করেন। ইনি কুঞ্জেতে মিলনের কাজ সমাধা করিয়া যুগল শয়ন দিয়া শয়ন করেন। ইনি ভক্তিপথের। ইঁহার ডাক 'গোবিন্দ'। শ্রীরাধাকে ইনি "শ্রীমতী" বলিয়া ডাকেন। ইঁহার চেষ্টা কিসে যুগলমিলন হবে। ইঁহার হইল যুগল-জীবন।

সখী বিশাখা। ইনি গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি জ্ঞানেব কার্য্য করেন। কুঞ্জেতে ইনি সকলের আগে শয়ন করেন। ইনি অনুরাগিণী। ইঁহার ডাক 'হরি'। শ্রীমতীকে ইনি রাধা বলিয়া ডাকেন। ইঁহার চেষ্টা, কিসে রাই শ্যামকে সাধিতে আসিবে। ইঁহার কৃষ্ণ-জীবন।

এই মোটামুটি তিন প্রকারের ভজন। যাহার যে প্রকার ইচ্ছা। ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।"

॥ শ্রীমতী ॥

১। পাঁচদণ্ড রাত্রি থাকিতে, গাত্রোত্থান। দন্তধাবন, শৌচ, ক্ষালন। গোময়লেপন, অবগাহন। ঐ সবই পাঁচ দণ্ড রাত্রি থাকিতে। (১)

২। হরেকৃষ্ণ নামের মালাজপ, পদব্রজে মৃদুভ্রমণ, ক্রমে উষা, ঊষা হইতেই আহ্নিক ও তিলক ধারণ। উষার পূর্বে প্রভাতি টহল।

৩। নিত্য লক্ষনাম জপ।

১। সায়েস্তাপুরের যোগেন্দ্রমোহন গোস্বামী (ছোটকাকে) এই নিত্য নিয়মাবলী প্রভু লিখিয়া দিয়াছিলেন। বন্ধুবার্ত্তায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪। বৈদিক···ইত্যাদি···নিষিদ্ধ। (১)

৫। লীলাকুঞ্জে, "গোপীঘেরা যুগল-স্মরণ", বন্দন, অর্চ্চন, লুণ্ঠন, সেবন (মানসে)।

৬। অহোরাত্রই স্মরণাবেশে স্থিতি।

৭। চক্ষু দ্বারা প্রাকৃতি কিছুতেই না দেখা।

৮। কীর্ত্তন মুখস্থ করিবেক।

৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, মুখস্থ রহিবে।

১০। শ্রীমদ্ভাগবত, পাঠ করিবেক।

১১। নিত্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিবেক।

১২। পাঁচশ হাজার, হরেকৃষ্ণ জপ, উচ্চস্বরে করিবেক॥

১৩। সংকীর্ত্তন, লুণ্ঠন, নিত্য, তুমুল নৃত্য, বাহুবিস্তার ইত্যাদি নিত্য হইবে॥

১৪। নিত্য, তুলসী সেবা হইবেক॥

১৫। স্থির, নিশ্চিন্ত, স্থৈর্য্যশীল, ধৈর্য্যশীল, বিনয়ী, গম্ভীর, ধীর, নতশির, মৌনী হইবেক॥

১৬। নিঃশব্দে গমন ও অন্যান্য ব্যবহারাদি করিবে॥

১৭। প্রসন্ন, প্রফুল্ল, আবিষ্ট, স্বস্তিশাল, কারুণ্যপরায়ণ, নির্লোভ হইবে॥

১৮। দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে॥

১। গোস্বামী ও অধিকারী পাত্রভেদে প্রভুর বিভিন্ন আদেশ। অন্যত্র প্রভুর আদেশ আছে—"বেদবিধিমতে সব করিও পালন।" 'পুরাণ-বেদান্ত-বেদ-সাঙ্খ্যের প্রমাণ।'

১৯। বদ্ধাসনে বসিয়া থাকিবে ॥

২০। চিরদিন, শয়ন করিবে না ॥

২১। আলস্য ত্যাগ করিবে ॥

২২। শয়নে নিদ্রা যাইবে না ॥ বসিয়া, বদ্ধাসনে, নিদ্রা যাইবে।

২৩। মৃদঙ্গবাদ্য শিক্ষা করিবে ॥

২৪। উচ্চ কীর্তনাদি, শিক্ষা করিবে ॥

২৫। নিত্য পাঠে, মানসচৈতন্য হবে ॥

২৬। নিত্য পাঁচবার গোময় ভক্ষণ করিবে ॥

২৭। প্রতি সপ্তাহে, দুই দিন, তিক্ত গ্রহণ করিবে ॥

২৮। কৃষ্ণচৈতন্যে, অর্পণ ভিন্ন, পান-ভোজন নহে ॥

২৯। নিত্য তুলসীপত্র, মঞ্জরী, জলসিক্ত গ্রহণ করিবে ॥

৩০। জলসিক্ত ভিন্ন, "এই দুই" অশুদ্ধ ॥

৩১। নিত্য, সর্বত্র, সর্ব্বথা, সর্ব্বদা, সর্বতোভাবে, "এই দুই" সঙ্গে থাকিবে ॥ উহাতে, বিষ্ণু-সান্নিধ্য ও সর্ব্বশুচি থাকিবে ॥

৩২। নিজেকে, পাঁচ বৎসরের বালিকা জ্ঞান করিবে; রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা পাঁচ মাসের ছোট, কারণ কৃষ্ণ পাঁচ বৎসরের ॥ তাঁহার গোপীরাও সব পাঁচ মাসের ছোট ॥

৩৩। কৃষ্ণের সহিত গোপীদের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই জ্ঞান করিবে ॥

৩৪। গোপীদের যে যে কার্য্য, "মানসে" কৃষ্ণের প্রতিও, সেই সেই "ব্যবহার" করিবে ॥ মানসে, সদা, যুগল-সঙ্গ ॥

৩৫। পদকল্পতরু-অনুযায়ী, লীলা-পদাদি, মুখস্থ করিবে॥

৩৬। পদকল্পতরু, সঙ্গে রহিবে॥

৩৭। শ্রীপদাদি-অনুসারেই ভজন হইবে॥

৩৮। যুগলের প্রতি, মানসে যে যে কার্য্য ও আচরণ, তাহাকে "ভজন" কহে।

৩৯। নিতাই-নিষ্ঠাকেই, সাধন কহে॥

৪০। কৃষ্ণগতি ও কৃষ্ণপতি, এই সার করিবে॥

৪১। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, জীবন-ব্রত করিবে॥

৪২। কৃষ্ণ ভিন্ন, অন্য জানিবে না॥

৪৩। কৃষ্ণ কান্তি, নয়নে ও মানসে, সদা ভাসিবে॥

৪৪। কৃষ্ণই জীবন-সর্ব্বস্ব॥

৪৫। নিজেকে কৃষ্ণদাসী জ্ঞান॥

৪৬। কৃষ্ণই, প্রাণপতি জানিবে॥

৪৭। কদাচও নিজেকে পুরুষজ্ঞান করিবে না॥

৪৮। নিজেকে অমুকদাসী জ্ঞান করিবে॥ *

৪৯। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এই লিখিবে, ভাবিবে, জানিবে, জপিবে, কাঁদিবে॥" (১)

"ওরে শ্রীকৃষ্ণ সব জান্‌লেও, তাঁকে নিজমুখে সব বল্‌তে হয়। নির্জনে ব'সে স্থির হৃদয়ে জানাতে হয়; প্রার্থনা, নিবেদন করতে হয়। তাঁকে না জানালে, তাঁর কাছে না গেলে, তিনি কিছুই করতে পারেন না; অচলের মত প'ড়ে থাকেন, আর দেখেন।"

* রাধাদাসী। প্রভু শ্রীমতী রাধাকে 'অমুক' বলিতেন

"তোমরা সরল হও। মালিন্য দূর কর। যখন যা হয়, তখনই আমার ব'লে ছাপ্ হ'য়ে যেও।"

"রাত্রিকাল উপাসনার সময় ভাল। স্বস্তিকাসনে, উর্ধ্বনেত্রে, স্থির হৃদয়ে বসে, কৃষ্ণকে স্বীয় মানসপটে যত্নে রাখিয়া জপ করিও।" "জপই সর্বাবলম্বন হইবে।" "তোমরা যে হরেকৃষ্ণমন্ত্র জপ কর, তাতে আমারই নাম করা হয়। ভজনের বস্তু আমি একক।" "আমার ভজনায় গব্যঘৃতের বল পাইবা।" 'ভজন—জগদ্বন্ধু। চিন্তন জগদ্বন্ধু। লক্ষ্য জগদ্বন্ধু।' 'জগদ্বন্ধু নাম জপ করিও।'

"প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র গোপন রাখিবে।"

"হৃদয়ে, হেমবর্ণ-পদ্মে, কুসুমভূষণে, ইষ্টদেবতাকে বসাইয়া চিন্তা করিবে। জপ ও চিন্তা এক সময়েই হইবে।"

"জপাদি যথেচ্ছ সময় হইতে পারে; প্রবাসে, অশুচি অবস্থায়, সর্ব্বত্র, সর্বাবস্থায় তারকব্রহ্ম হরিনাম মহাউদ্ধারণমন্ত্র মানসে বা সর্বতঃ প্রকাশ্যে জপকৃত হইবে।" "নিত্য, গুরুগোবিন্দ স্মৃতি, সদা থাকিবে।"

"সাধন—কীর্ত্তন॥ ভজন—মালাজপ॥ স্মরণ—যুগলমিলন॥ দর্শন—গৌর॥ পঠন—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা॥"

"কর্তব্য—দাস্য। আনুগত্য। সঙ্গ। সেবা। অনুকরণ।"

"ভজন—দাস্যভক্তি। ললিতার যূথ। বৃন্দার অনুগত। রাইসেবা। সখী। ইতি পঞ্চরহস্য।

সাধন—সংকীর্ত্তন। নর্ত্তন। পঠন। উদ্ধারণ। জপন। ইতি পঞ্চধর্ম।"

"হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। স্বরূপদামোদরে আত্মসমর্পণ করিও। গৌরগদাধর ধ্যান করিও। মিলনাদি স্মরণে, আবিষ্ট হইও।"

'ধ্যেয় রাধামাধব।'

"অবস্থা—প্রেম। রাগ। ভাব। দশা। রস। "বৃহৎকীর্ত্তন।" "প্রেমকীর্ত্তন।" অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠন। ঊর্ধ্ববাহুতে নৃত্য। মণ্ডলাকারে নৃত্য। জয়ধ্বনি। সর্বহিতস্তুতি।"

"ধৃতি—রতি। মতি। পতি। সতী। গতি।

কৃতি—ক্ষেম। প্রেম। রাগ। রস। দশা।

কৃতি—হাস্য। করতালী। গীয়ন। নর্ত্তন। প্রদক্ষিণ।

ক্লৃতি—নৌকাবিলাস। হিন্দোলন। তাণ্ডব। মাল্য গ্রন্থন। পুষ্পবৃষ্টি।"

"স্মৃতি—পিতা + বৃষভানুরাজা ॥ মাতা + কৃত্তিকা ॥ শ্বশুর + নন্দরাজা ॥ শ্বাশুড়ী + যশোদা ॥ পতি + কৃষ্ণ।"

"অরুণোদয়ে কুঞ্জভঙ্গ, উষায় রসোদ্‌গার, সূর্যোদয়ে গোপীগোষ্ঠ, প্রথম প্রহরে নৌকাবিলাস, গোধূলিতে মিলন।" "সকলের কৃষ্ণস্মরণ।"

"গুরু—বন্ধু। পতি—কৃষ্ণ। গতি—গৌর। সেবা—রাই। দশা—ললিত।" "সঙ্গ—যূথ। দৌত্য, অনীকিনী। সখী, রাই।"

"শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মধুর—এই পঞ্চদশাতে উদ্ধারণ পূর্ণ।" "শান্ত সারস পক্ষী, বাৎসল্য গো, দাস্য শুক, সখ্য উলূক, মধুর খঞ্জন।"

"কৃষ্ণের মধুর ভাব, বলরামের সখ্য ; বরূথপ, উজ্জ্বল এইমাত্র সখ্য ; কিঙ্কিণীসখার শান্তভাব। আর সব সখার দাস্যভক্তি। পৌর্ণমাসীর শান্তভাব। প্রেমমঞ্জরী, যমুনা ইহাদের শান্তভাব। ললিতাসুন্দরীর পঞ্চভাব অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। আর সব সখীদের সখ্যদশা। নন্দ মহারাজের পিতৃ-শান্তভাব। ধনিষ্ঠা ও যশোদার মাতৃ-বাৎসল্য ভাব। আর সমস্ত বিগ্রহেরই শান্ত ভাব। এক কৃষ্ণ নামে শুচি। ইতি উদ্ধারণ।"

"মানস বৈরাগ্য কর"

"তোমরা ব্রহ্মচর্য্য কর ; বিষয়-বিষ ত্যাগ কর। মানস বৈরাগ্য কর। হৃদয় পবিত্র কর। সদা হরিনাম জপ কর। আত্মবধ কর। গোপী স্বভাবে 'রাধাকৃষ্ণ-মিলন দিবানিশি চিন্তা কর।" "গোপী অনুকরণ। বস্ত্রাবৃত দেহ। আবৃত দেহে অবগাহন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। বামপদ অগ্রে ক্ষেপণ। গোপী চিন্তন। আত্মদৃষ্টি। ইতি সপ্ত করণীয়। গুরুবন্ধুপ্রভু।"

"পঞ্চ স্মরণ—মিলন। রাস। মিলিতাঙ্গ। রাধাকুণ্ড-বিহার। বৃন্দাবন বিলাস।"

"দশা—ললিতার যূথ॥ বৃন্দার দৌত্য। বনদেবীর সঙ্গ। ব্রজঃরাণীর + ভাব॥ মনসিজের + পরাভব॥" (১)

"লীলা—অনুরাগ ॥ অভিসার ॥ অলস ॥ প্রেমবৈচিত্ত্য। কুঞ্জভঙ্গ ॥" (১)

"উদ্ধারণের দশাকেই লীলা কহে।" "ধর্মকে উদ্ধারণ কহে।"

"স্থান—বৃন্দাবন। রাধাকুণ্ড। পাবনসরোবর। বৃষভানুপুর। গোবর্দ্ধন।"

"স্থিতি—রাসমণ্ডল। পুলিন ॥ নিধুবন ॥ নিকুঞ্জ ॥ কুণ্ড"

"বৃন্দাবনের নিত্যসিদ্ধা অষ্টসখীর নাম—ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী।" "রূপমঞ্জরী। রতিমঞ্জরী। লবঙ্গমঞ্জরী। গুণমঞ্জরী। রাগমঞ্জরী। রসমঞ্জরী। ইতি ছয় মঞ্জরী।"

"বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণরস, গোপীভাব, যুগলপ্রেম—ইহার উপরে আর কিছু নাই।"

"অনুগত রও রে, ভাব ভকতি বাস, সদা হরিকথা ভাষ ॥"

"নিতাইনিষ্ঠা আবশ্যকীয়। সাধনে বর্ণবিচার ও কায়িক-মানসিক নিষ্ঠাকেই নিতাইনিষ্ঠা বলে।"

"শ্যামকে সাধনাঙ্গ বলা হয়। ভজন পৃথক্। গৌরগদাধর বা গোপীকৃষ্ণের স্মরণ-সান্নিধ্যকে ভজন বলা যায়।" "যুগলের প্রতি মানসে যে কার্য্য ও আচরণ, তাহাকে "ভজন" কহে।

"রাধামাধব স্মরণ কর। অঙ্গনটি পালন কর। সংকীর্ত্তন, প্রচার কর। ভক্তি-শিক্ষা দাও; নিত্য, কৃষ্ণনাম, জপ-ধ্যান কর। নগরকীর্ত্তন কর।"

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে"
"শ্রেষ্ঠাচার পরচার হরেকৃষ্ণ মালা।
বন্ধুবলে হেন হলে যাবে সব জ্বালা॥
(সব জুড়াইবে ভাই)   (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ)
(মানস-আত্মিক তপ)"

"লীলা—উদ্ধারণ।   উদ্দেশ্য—সংকীর্ত্তন।   ধর্ম্ম—প্রচার। মর্ম্ম—নাম।"

"লীলা—পূর্ব্বরাগ, মিলন, রাস, অলস, প্রেমবৈচিত্ত্য।"
"ভজন—জপন॥ স্মরণ॥॥ বন্দন॥ নিবেদন॥ দর্শন॥"
"সাধন—সংকীর্ত্তন॥ পঠন॥ উচ্চারণ॥ কথন॥ লুণ্ঠন॥"

"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চ্চিও,—ডাকিও, কঁদিও, গাইও, জপিও, সেবিও, বাসিও, আপন করিও॥" (রঃ)

"কৃষ্ণের উপাধি কি? নিরুপাধি মাধুর্য্যপূর্ণ, অপ্রাকৃত। তাঁহাকে অন্যে দেখাইতে পারে না ব্যাকুল হয়ে যে ডাকে সে-ই দেখতে পায়।" "সংকীর্ত্তন হইতেই কৃষ্ণের উৎপত্তি"

"সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বামী এবং পরম দেবতা ও পরমধন। তিনি ও ব্রজগোপীগণ ভিন্ন আর সব মিথ্যা; সুতরাং নিজের বলিতে আর কি-ই বা আছে।"

"শিবপূজা করিয়া শিবদুর্গার নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামনা করিতে হয়। সকল দেবতাকেই ডাকিয়া তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিতে হয়।"

"ওরে একান্ত আগ্রহে হয়; মানুষ সব পারে, একান্ত আগ্রহ হইলেই ভগবানের দর্শন পায়।" "ভগবান্ ভক্তাধীন।

"একান্ত ইচ্ছার সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন করলে ও কাঁদলে মহাপ্রভু কৃপা করেন। তখন সে নিজেই কৃষ্ণকে দেখতে পায়।"

"ভক্তি বুদ্ধি মুক্তি ঋদ্ধি, যূথ-স্মৃতি, সেবা-সিদ্ধি
দৌত্য-দাস্য দশাবেশে মজ।
(ভাবাবেশে মজ রে), (আবিষ্ট একনিষ্ঠ)
(ভাবহ, আপন ইষ্ট) ॥"

ভগবৎ-তত্ত্ব *

ব্রজলীলায় গোপীকৃষ্ণ

"ইহলোকে বা পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ বই অন্য কেহই পুরুষ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সর্বদেবগণ ও সর্বমুনিঋষিগণ বা যাহাদিগকে পুরুষের আকারে দেখা যায়, তাহারা সকলেই প্রকৃতি বা স্ত্রীজাতি। ইহা দিব্যজ্ঞান হইলেই জানিতে পারা যায়।"

* প্রভু শ্রীহরিকথাদি গ্রন্থ ও রমেশচন্দ্র, চম্পটিঠাকুর, নবদ্বীপদাস, হরিরায়-প্রমুখ প্রিয়গণের মাধ্যমে জগতে অতুল, অমূল্য ও অভিনব ভগবৎ-তত্ত্বোপদেশ দান করিয়াছেন।

"ব্রজ, ব্রজরাখালগণ, ব্রজসখীগণ, অর্থাৎ ব্রজের যে কিছু সম্ভবে, তাহা ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। সমস্তই প্রলয়কালে লয় হইবে। দেবতারাও অনিত্য, তাহাদেরও প্রলয়কালে আর সমস্ত লয়ের মতই লয় হইতে হইবে। অতএব নিত্য যে ব্রজসম্বন্ধীয় বস্তু, তাহাতেই স্নেহ, মমতা, আসক্তি, আশা ও ভরসা করিতে হয়।"

"সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর নিরাকার ছিলেন। তিনি স্বীয় তেজঃ ও শক্তি আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া প্রথম প্রকাশ হন। তেজঃ—সংকর্ষণ। ভগবান্—চিন্ময় (মহাবিষ্ণু)। শক্তি—চিন্ময়ী (যোগমায়া)।

নিরাকার পরমেশ্বর এই প্রথম তিনরূপে সাকার বা প্রকাশ হন। ভগবান্ (চিন্ময়) হইতে বিষ্ণু (চতুর্ভুজ), রাম (দ্বিভুজ-ধনুকধারী), সদাশিব, ধর্ম (ইনিও চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী)—ইঁহাদের উৎপত্তি। শক্তি (চিন্ময়ী) হইতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, পার্ব্বতী, ব্রহ্মাণী—ইঁহাদের উৎপত্তি। তেজঃ (সংকর্ষণ) হইতে গরুড় ইত্যাদির উৎপত্তি।" "শক্তি চতুর্বিধা— হ্লাদিনীশক্তি : চিচ্ছক্তি—যোগমায়া। মায়াশক্তি—কালিকা। জীবশক্তি—কুলকুণ্ডলিনী।"

"কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু"

"কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সমস্তই প্রকৃতি। কৃষ্ণ ভিন্ন পুরুষ নাই। ধনুকধারী রাম, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ (চিন্ময়), শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু, ত্রিশূলধারী শিব, ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণের দাসীত্ব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে বিষ্ণু বিশ্বকর্তা, এই শ্যামই সেই বিষ্ণুর উপাস্য।"

"কৃষ্ণ নিত্যপুরুষ, গোলোকধাম তাঁহার ধাম। পরমেশ্বর সাকার হইবার পূর্ব্বেও ঐ ধাম ছিল। উহার উৎপত্তি ও লয় নাই। পরমেশ্বর বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণ নহেন।" "প্রথমে নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, ভগবান্। তাঁহা হইতে অর্থাৎ স্বীয় শক্তি হইতে শক্তি উৎপন্ন হন। এই শক্তি যোগমায়া।"

"ভগবান্ ও যোগমায়া অপ্রকাশ থাকেন। প্রথম প্রকাশ হন ক্ষীরোদসাগরে। ক্ষীরোদসাগরে তখন জল হয় নাই। ভগবান্ শয়নে আছেন, লক্ষ্মী পদসেবা করিতেছেন। ভগবানের স্বীয় তেজঃ হইতে সংকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবানের অংশ প্রথমে বিষ্ণু, আবার মুহূর্ত্ত পরেই মহাদেবের উৎপত্তি হয়। এইজন্য ইঁহারা যমজের মতন। এইজন্যই হরিহর মিলন বলে। তাহার পর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়।

আবার স্বীয় অংশ হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হন; ইনি চতুর্ভুজ, কিন্তু গরুড় বাহন নাই।

"যোগমায়ার অংশ হইতে লক্ষ্মী-সরস্বতী উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর দুইদিকে বিরাজ করিতেছেন এবং উক্ত যোগমায়া হইতে পার্ব্বতী উৎপন্ন হইয়া মহাদেবের বামে বিরাজ করিতেছেন ও সাবিত্রী উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার বামে বিরাজ করিতেছেন।

তাহার পর মহাদেবের অংশ হইতে ভৈরব ও ব্রহ্মার অংশ হইতে সপ্তঋষি উৎপন্ন হইলে পৃথিবীতে নানাপ্রকার সৃষ্টি আরম্ভ হইল। আর পার্ব্বতীর অংশ হইতে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইল।

যোগমায়ার এক অংশ হইতে ধেনু, আর ধর্ম্মের এক অংশ হইতে বৃষ। ধেনুকে বেশী মান্যভক্তি করিতে হয়।

এই সচ্চিদানন্দ ভগবানই বিশ্বরূপ ধারণ করেন।

তিনিই আকাশচারী দেবতা তপন।
অন্তরীক্ষচারী তিনি দেব সমীরণ॥

ইঁহার মস্তক গোলাকার এবং পদ পাতাল ও চক্ষুর্দ্বয় চন্দ্রসূর্য্য।"

"এই সচিদানন্দ ভগবান্ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের দাসী। কারণ এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি। ইঁহারাও প্রকৃতি। কিন্তু এ' মানব-প্রকৃতি নয়। ব্রজে ইঁহারা কে? সচ্চিদানন্দ ভগবান্ পূর্ণ প্রেমমঞ্জরী। যোগমায়া, পূর্ণমাসী। সংকর্ষণ, অনঙ্গ-মঞ্জরী।" "পূর্ণ প্রেমমঞ্জরী একজন সখী। তাঁহা হইতে এবং কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি ও ক্লান্তি হইতে ভগবান্ চিন্ময়ের উৎপত্তি।"

---

* "বসুদেববসুতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবোঽখিলাত্মনি।
লীনো নন্দসুতে রাজন্ বনে সৌদামিনী যথা॥"—যামলে

"সেই চিন্ময় বিষ্ণুই শান্তিপুরের সীতানাথ-অদ্বৈতচন্দ্র। এই নিমিত্ত সীতানাথের পরিবারের মঞ্জরী শ্রীশ্রীপ্রেমমঞ্জরী।"

"মঞ্জু মীন অবতার হয়। মঞ্জুর ধ্যেয় বস্তু কম্বু, কূর্মাবতার। কম্বুর ধ্যেয় বস্তু বিষ্ণু, শ্রীরামচন্দ্র অবতার। বিষ্ণুর ধ্যেয়বস্তু জিষ্ণু, বাসুদেব সুত, ইনি শ্রীকৃষ্ণ নহেন।* জিষ্ণুর ধ্যেয় বস্তু বিধু, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। বিধুর ধ্যেয়বস্তু বিরাট, পালনকর্ত্তা, যাঁহার শীর্ষদেশ উচ্চ নভস্তলে; পাদদেশ সপ্তপাতালের নিম্নদেশে এবং নাভিদেশ এই মর্ত্ত্যলোকে, সৃষ্টির এই বিরাট মূর্ত্তি। বিরাটের ধ্যেয়বস্তু তুরীয়, অস্ত্ররূপী সংহার কর্ত্তা। তুরীয়ের ধ্যেয়বস্তু ব্রহ্ম, মন্ত্ররূপী, ওঁ, ক্লীং, হ্রীং প্রভৃতি প্রণবযুক্ত শব্দ।

ব্রহ্মের ধ্যেয়বস্তু পরমাত্মার, স্রষ্টা। পরমাত্মার অপর নাম পরব্রহ্ম।"

"এই পরমাত্মাই প্রাকৃত রাজ্যের শেষ সীমা। কারণ পরমাত্মা স্বয়ং স্রষ্টা হইলেও, সৃষ্টমাত্র,—মহাপ্রলয়ে লয় হন। পরমাত্মা এক নহেন, বহু: অর্থাৎ যেমন এই একটি সৃষ্টি-সংসার, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসার আছেন। যেমন এই সৃষ্টি-সংসারে একটি বিরাট, একটি তুরীয়, একটি ব্রহ্ম ও একটি পরমাত্মা আছে, তেমনি সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারে অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যায় বিরাট, তুরীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা আছেন। ইহাদের প্রত্যেকের পর্বতভেদ, সমুদ্রশোষণ, প্রলয় বা সৃষ্টিরচনাদিবৎ ইন্দ্রজাল ও ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তি আছে বটে, কিন্তু পাপ গ্রহণ করিবার শক্তি ইহাদের

আদৌ নাই। পাপগ্রহণ অর্থাৎ ভূভারহরণের জন্য,—শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধারণ অবতার। শ্রীমতি, (প্রকৃতি নহেন) উদ্ধারণ অবতার।

শ্রীকৃষ্ণ = গৌর = অযোনিসম্ভব।

সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারের অধীশ্বর ও সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট, তুরীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু,—কৃষ্ণ, নিরুপাধি মাধুর্য্য বিগ্রহ।"

"যশোদানন্দন বা ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই এই কৃষ্ণ। ইনিই গোপীনাথ এবং ভক্তের একমাত্র হৃদয়নিধি। ইঁহার ইচ্ছাশক্তি ও চিন্ময় হইতে মথুরনাথ বা দ্বারকানাথের উৎপত্তি। যদি বল কৃষ্ণ যদি দ্বারকানাথ নহেন, তবে কৃষ্ণ মথুরায় গেলে ব্রজগোপীদের বিরহ হইয়াছিল কেন?

তাহার উত্তর এই যে, কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি মথুরায় গিয়াছিল। সেই ইচ্ছাশক্তির সহিত চিন্ময়ের যোগে মথুরা ও দ্বারকালীলা হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি মথুরায় গেলে, তিনি অদৃশ্যাবস্থায় বৃন্দাবনে ছিলেন।* সেইজন্য তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া গোপীদের বিরহ হইয়াছিল। পুনরায় চিন্ময় ক্ষীরোদসাগরে গেলে এবং কৃষ্ণের ইচ্ছা-শক্তি বৃন্দাবনে আসিলে কৃষ্ণ গোপীদের নিকট দৃশ্যমান হন এবং যুগলমিলন ও লীলাদি হয়।"

---

* শ্রীযামলগ্রন্থে—'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

গৌরহরি—'ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে।' চৈঃ চঃ

"কৃষ্ণের উপাধি কি? নিরুপাধি মাধুর্য্য-বিগ্রহ ;—মাধুর্য্য-পূর্ণ, অপ্রাকৃত।" "মায়িক সৃষ্টির সহিত কৃষ্ণের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। কৃষ্ণ একলেশ্বর, স্বতন্ত্র ইশ্বর। মায়িক সৃষ্টিতে কৃষ্ণ কেবল নামরূপে আছেন এবং নাম সংকীর্ত্তনেই কৃষ্ণের উৎপত্তি।" "কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু। জীবের হিতের জন্য বিশেষ চিহ্ন নিয়ে মানুষের ভিতরও মানুষ হয়ে আসেন। লক্ষণে চিনে নিতে হয়।"

"কৃষ্ণের রাসলীলা কলুষিত (sensual) নহে ; কামগন্ধ-হীন প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণের ব্রজবধূবিহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন মনুষ্যের হৃদ্‌রোগ কাম নষ্ট করিবার প্রধান, প্রকৃষ্ট উপায়।

"ছয় বৎসর বয়সে শ্যাম রাস করেন। ভাগবতে দেখিও। অবশ্য তিনি অস্ফুট ; তাঁহার সখীগণ তাঁর অপেক্ষা ছোট ; সুতরাং অস্ফুট ও অক্ষত। তবে কন্দর্প কোথা? সব প্রাকৃত জীবের কল্পনামাত্র। গোপীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত। পয়োধর, উপস্থ, কটাক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃত জীবেরই কল্পনামাত্র। শ্যাম বা ব্রজগোপীর প্রতি সাধারণের অপ্রাকৃত ও অকৈতব স্মরণ, স্ফুরণ, দর্শন, সীমন্তন, আস্বাদন আবশ্যক। দম্পতির ভাব নয়। দম্পতির ভাব প্রাকৃত মাত্র।"

"রাধাকৃষ্ণ সহোদর সহোদরা ; জ্যেষ্ঠা রাধা, কনিষ্ঠ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, চালিতাগছের পাতার রং ; রাধিকা স্বর্ণবর্ণ, গিনি ও পাউণ্ডের রং।"

"কৃষ্ণের স্বীয় শক্তির নাম হ্লাদিনীশক্তি। ঐ হ্লাদিনী-

শক্তিই শ্রীমতী (রাধা)। তাঁহার প্রথম দুই প্রকাশ। যথা, (১) ললিতা, (২) বৃন্দা।

বৃন্দাবন তিন প্রকার—(১) নিত্যবৃন্দাবন, (২) লীলাবৃন্দাবন, (৩) ধামবৃন্দাবন।

১। নিত্যবৃন্দাবনে একমাত্র নিত্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। সেখানে সখা-সখী কেহই নাই।

২। লীলাবৃন্দাবনেই যুগলকিশোরের নিত্যলীলা হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি বা লয় নাই। এই লীলাবৃন্দাবনই তোমাদের ভজনীয় জানিবা।

৩। ধামবৃন্দাবন, যেস্থানে লোক বাস করে এবং যেস্থান লোকে দর্শন করে। শ্রীশ্রীমানসসরোবর হইতে কাম্যবন পর্যন্ত ধামবৃন্দাবন বলা হয়। এই স্থানের মধ্যেই নিত্য ও লীলাবৃন্দাবন আছে। কিন্তু সকলের নিকট উহা দৃশ্যমান নহে। শ্রীকৃষ্ণদাসী ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারে না।"

গৌরলীলা। পঞ্চতত্ত্ব

"সব রল, প্রভু গেল, অন্য উদ্ধারণে।
রাই-কানু এক তনু, ইহারি কারণে॥
(জয় জয় জয় রে) (হরিনাম হরিনাম)"

"পীতবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কলিউদ্ধারণ। আর সমগ্র পরিকর মানসরূপক। পঞ্চ মিলনে এক এক বিগ্রহ শরীর।"

"রাধা-শ্যাম-বীরা-কুন্দ-ললিতাসুন্দরী।
পঞ্চ ;-এক ;-"মহাপ্রভু" দশমী-শিহরি॥
(বড় দুঃখে এক রে) (দশমী কি মনে নাই)॥
শৈব্যা-চন্দ্রাবলী-লক্ষ্মী-মঞ্জু-সরস্বতী।
"প্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র"; দশমী-ভকতি॥
(নামে, মত্ত হল রে) (প্যারীর দশমী লয়ে)॥
রঙ্গঃরাণী-বনদেবী-প্রেমমঞ্জরী।
পৌর্ণমাসী-বিশাখা ; "অদ্বৈত" সম্বরি॥
(সব মনে আছে রে) (দশমীর গুরুকরণ)॥
যমুনা-মুরলী-ধরা মাধবী-মালতী।
"শ্রীপ্রভু শ্রীবাসচন্দ্র" দাস্যের শকতি।
(বড় ভয় ছিল রে) (উদ্ধারণে ভয় নাই)॥
শ্যামাসখী-তুঙ্গবিদ্যা-শ্রীরূপমঞ্জরী।
শারি-কেকী ; গদাধর ; সখ্যদান করি।
(সখ্যে বামে দাঁড়ায়) (উদ্ধারণ উদ্দীপন)॥
আর সব পারিষদ মানসরূপক।
পঞ্চতত্ত্ব সংকীর্ত্তন প্রেম-প্রচারক॥
(সব সাথের সাথী গো) (সংকীর্ত্তন প্রচারণ)"

"গৌরগোপাল বাল্যে, গৌরকিশোর কৈশোরে, কৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু যৌবনে।"

"নিত্যানন্দে বলরামের আবেশ ছিল বলিয়া তাঁহাকে বলরাম বলা হয়।" "একান্তে, সগোষ্ঠী, নিতাই পদকমলে, শরণ লও।"

"সংকর্ষণ = লক্ষ্মণ = বলরাম = নিত্যানন্দ।"

"একদিন কৃষ্ণচন্দ্র পণ রাখিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতীর জয় হইল দেখিয়া শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর জয়ে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া আনন্দে রাধাময় হওত প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িতেই শ্রীমতী বাহু পসারিয়া প্রাণকান্তকে বুকে আবরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীমতী রাধাময়, শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ করিলেন। গৌরাঙ্গ অবতারের ইহাই সূচনা। ললিতা দাঁড়াইয়াছিলেন, যেই দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরভাবে একেবারে মিলিয়া যাইতেছেন, তখন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা শ্রীমতীকে স্পর্শ করিলেন। যে অংশটুকু মিলিতে বাকী রহিল, তাহাই গদাধরে রহিয়াছে। এইজন্য গদাধরকে শ্রীরাধা বলা হয়।"

"কোনও এক রাত্রে শ্রীমতীর সহিত পণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করছিলেন; শ্রীমতী ও সঙ্গিনীগণ দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেখছেন, ও হাসছেন নৃত্যভঙ্গী দেখে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর আবেশে ভরপুর, একেবারে আত্মহারা, পড়ে যাচ্ছেন, এমনি হয়েছিল। শ্রীমতীও অনিমেষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে গেছেন। উভয়েই তন্ময়। এমন সময় শ্রীমতীর ভাব ও আবেশে শ্রীকৃষ্ণ পড়ে যান যান। তখনই

শ্রীমতী ছুটে গিয়ে দুই বাহু বেষ্টন ক'রে আলু-থালু বেশে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন। দুই দেহ এক হয়ে মিশে যায় যায়। এমন সময় ললিতার চমক ভাঙ্গল। ললিতা ছুটে গি'য়ে 'কি কর, কি কর' ব'লে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা শ্রীমতীকে স্পর্শ করলেন।

তখন উভয়েরই ভাব ভঙ্গ হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ হলেন। উভয়ের অঙ্গ এমনিভাবে মিশেছিল যে, চন্দ্রকলার মত এক কলামাত্র মিশতে বাকি ছিল। ঐ এক কলা শক্তি ললিতা পেয়েছিল। তাই গৌরাঙ্গলালায় গদাধরে ঐ শক্তির বিকাশ থাকায়, গদাধর কাছে এ'লে তিনি স্থির হ'তেন। ইহাই হ'ল গৌরাঙ্গ লীলার পূর্ব্ব আভাস।

শ্রীমতীর ভাব এতই গাঢ়তম যে, নিজদেহ দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের দেহ সম্পূর্ণরূপে আবরণ ক'রে রেখেছিলেন, যা'তে গৌরাঙ্গলীলায় শ্রীকৃষ্ণের দেহে আঘাত না লাগে।

আছাড়ি বিছাড়িতেও শ্রীকৃষ্ণের দেহে আঘাত লাগে নাই, যা কিছু সবই শ্রীমতীর দেহে লাগে; কেন না শ্রীমতী নিজ দেহ দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের দেহ একেবারে মুড়ে রেখেছিলেন।

দেখলি! এখন বুঝলি ত, কৃষ্ণতত্ত্ব বোঝার চেয়ে কতদূর কঠিন শ্রীমতীর তত্ত্ব বোঝা!"

"গৌর—কৃষ্ণ। নিত্যানন্দ—বলরাম। শ্রীবাস—রজঃরাণী। গদাধর—রাধা" "গৌর—রাধা। নিত্যানন্দ—অনঙ্গমঞ্জরী। প্রেমমঞ্জরী—শ্রীঅদ্বৈত রায়।"

"সংকীর্ত্তনরূপী মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে পঞ্চ প্রকাশ। নিতাই —করতাল। গৌর—নাম। সীতানাথ—মর্দ্দল। শ্রীবাস—ভক্তি। গদাধর—প্রেম।"

"সুরধুনী—যমুনা। বৃন্দাবন—নবদ্বীপ। সখীসখা—পরিকর। লীলা—উদ্ধারণ। রাস—সংকীর্ত্তন।"

"সুরধুনী তটে স্থিতি, সদা সংকীর্ত্তন-প্রীতি,
ত্রয়োদশ-দশা-আস্বাদনে।
(প্রভু এই করে গো) (জাহ্নবীর তীরে তীরে)"
"অবশ ; দ্বাদশ-ভাব, "প্রভু" বলে, লো! বিলাব!"
"হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মহাউদ্ধারণ।
পতিত, নিস্তার কর ; জীব অকিঞ্চন।
(কোন দোষ নাই হে) (কীট-কুহক-জাত)
(কীট-গুরু-তাপ-তাত) (কীট,-স্বনাম-বিখ্যাত)
(জেনে'ও, কি, জাননা ত ?)"

মহাপ্রলয়-দমনে, ত্রয়োদশ-দশাস্বাদনে মহাউদ্ধারণ বন্ধু

"প্রলয়কালে মহাউদ্ধারণ, সত্যযুগের সূচনা জান্‌বি।"

"জয় রাধা-বিনোদ বিশ্ব-উদ্ধার হে।
বন্ধুগীতি প্রণতি, তাপ-নিস্তার হে।

(জয় জয় জয় হে) (তাপ-জীবে দয়া-ধর)"

"এবে রাখ হে, প্রলয়ে অতলে যায়।"

"আঁখি মেলে চাও রাই, মহাপ্রলয় এল,

কীর্ত্তন ছেড়ে গেল।"

"আর রক্ষা নাই হে, প্রাণগৌর বিশ্বম্ভর,

কাতরে কটাক্ষ কর, নিজ উদ্ধারণ ধর,

জীবগণে ক্ষমা কর।"

"গৌর রাখ প্রভুরে, মহাপ্রলয় আসে,

কাঁপে ভব তরাসে, প্রলয়াম্বু ভয় বাসে,

রাখ এই অবকাশে।"

"গরজে প্রলয়-সিন্ধু শারদ নির্ঘোষ ;

বন্ধুনতি শ্রীগৌরাঙ্গ, "ক্ষম কীট দোষ।"

(উহার দোষ কি) (প্রভু তোমার দয়া দেখি)"

"গরজে বরজ-রজঃ রজঃরাণী নাই।

ভূমিকম্প ভবশঙ্কা, বন্ধু কি বালাই॥

(আর্থকুইক্, হয় কেন, মা ?) (মহাপ্রলয় নিকটে মা)

(কালজল নাশ রটে) (যদি মা কীর্ত্তন রটে)

(তবে সৃষ্টি রক্ষা ঘটে) (আবেশে বাঁচায় বটে)

(কলিসংখ্যা পূর্ণ বটে) (পঞ্চসহস্র মাহে বটে)

(ঐ মাত্র সংখ্যা বটে)"

"ঐ ঐ প্রলয় হয়, ভ, ভ, ভয় কয়।"

("আর রক্ষা নাই) (সবে হরিনাম লও)
(সদা হরি কথা কও) (নাম সংকীর্তনে রও)
(তাপ সাবধান হও)"

"সম্মুখে মহাপ্রলয়। প্রলয়ই সত্যযুগের আগমনী জানিয়ে দিচ্ছে।" "রক্ষা হরিনাম। হরিনাম করবি, আর ব্রহ্মাণ্ড ভ'রে হরিনাম ছড়ায়ে দিবি।"

"দেখ, এই পাপের সংসারে হরিনাম প্রচার করা বড় কঠিন। মানুষ কেবল হুজুগ চায়, হৈ চৈ ভালবাসে। তোমরা হুজুগ করো না, ধীরে, মহাপ্রেমে, নিষ্ঠায় চলিয়া যাও। আমিই ত আছি, ভয় কি? হরিনামে, প্রাণ, মন, শীতল রেখে চলতে থাক। মানুষ তোমাদিগকে জটিল পথে নিতে চাইবে, কষ্ট দিতে চাইবে, তাতে ভীত হয়ো না; কর্তব্য ছেড়ো না; পদে পদে আমায় দে'খে বিচার ক'রে, চলো। পতিত সংসারে কাম, প্রেম, ব'লে বিকাচ্ছে; এইত মহাহুজুগ; কাল কলির খেলা, পাপ-প্রপঞ্চে ঘেরা।"

"আমার সঙ্গ ও সেবার দ্বারা রিপু ও দশেন্দ্রিয়বিকার থাকে না।"

"এটি প্রলয় কাল। আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত ভিন্ন, এ সৃষ্টিতে রক্ষা পাওয়া দায়।"

"আমার সান্নিধ্যে এ'লে, আমার সান্নিধ্যে বাস করলে, আমার কথায় কাজ করলে, আমায় অনুসরণ করলে, পাপ, ত্রিতাপ, মোহ

মায়া থাকতে পারে না।” ‘আমার অগ্রে চিন্তার বিষয় থাকে না। কিন্তু আমার সান্নিধ্য ও বাক্য পালন আবশ্যক।’

“আমার সান্নিধ্যে আসায় ও আমার সংস্পর্শে থাকায় তোদের প্রারব্ধ. সব এক জন্মেই কাটিয়া গেল। এই এক জন্মেই, সকল ভোগ কাটিয়া যাইবে।”

“তোমাদের ভবিতব্য, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সবই আমার হাতে।” “তোমাদের গতি অহম্। আমি তোম্যদের একালে, দ্বিকালে, ত্রিকালে নিত্য চিরগুরু।” “চিন্তা করো না—চিরগুরু রইলাম,—দিনান্তে একবার আমায় স্মরণ করো।”

“আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।”

“তোদের যদি মনে হয়, কোনও বিপদ্ আসছে, তা’হলে আমার নাম স্মরণ ক’রে একটা তুলসীপত্র জলে ফেলে দিস্। তা’হলেই জানতে পারবো।”

‘আমি সদাকাল সর্ব্বত্র মঙ্গলেই থাকি।’

“প্রলয় দমন, ধর্ম্মরক্ষণ, আমার কার্য্য জান্‌বি।” ‘অনন্ত-বিগ্রহে আমার স্থিতি। তাই অনন্তানন্তময় + গুরু + প্রভু + বন্ধু + জগৎ-বন্ধু” “জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু জীব উদ্ধারণ বন্ধু। প্রেমময় জগদ্বন্ধু! আনন্দময় জগদ্বন্ধু। মাধুর্যময় বন্ধু। পরাণ নিধিয়া বন্ধু।”

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু

"আমার কথা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে যথাতথা ব'লে বেড়াবি।"

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পুরুষ আমি, আর আর সব প্রকৃতি। দ্বিতীয় পুরুষ নাই। আমি পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম।" "জগতে আমিই একমাত্র পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ নাইও হ'তেও পারে না।"

"শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, বেগে কীটানুসরণ।
বামপদাঙ্গুষ্ঠে, দুষ্টে করিতে নিধন॥

(.হরিনাম দিয়ে গো।) (পতিতপাবন অবতার)" (হরিকথা)

"কলি, কীট, কুহক, নিধন, মোক্ষণ লীলা। মহাউদ্ধারণ॥

১। গৌরাঙ্গ অবতারে কলি, কীট, কুহক, নিধন হয় নাই।

২। সবে হরিনাম লয় নাই, তাই :—

৩। এবার আমি বামপদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা কীট, কুহক, নিধন, মোক্ষণ করেছি।

৪। অদূরে মহাপ্রলয় আগমন।

৫। প্রলয়কালে, মহাউদ্ধারণ, সত্যযুগের সূচনা জান্‌বি।

৬। আমি সব ধ্বংস হ'তে দিব না।

৭। আমি ধ্বংসকারী নহি, রক্ষাকারী বটি। প্রলয়ে নানা ভয় জানবি।

৮। প্রলয়, মহাপ্রলয় দমন, মহাউদ্ধারণ, সবে হরিনাম-প্রেমদান, আমার কার্য্য জান্‌বি।

৯। তোরা সবে, টুক্‌টাক্ করে ব্রহ্মচর্য্য, হরিনাম করবি ও করাবি, চারিদিকে ছড়ায়ে দিবি।

১০। আমি প্রলয়ের এক এক ঘাতে এক একটা Continent (কন্টিনেণ্ট) চূরমার্ ক'রে দিব। একেবারে ধ্বংস করব না।" "আমার আচরণ, আমার প্রচারণ, আমার কথা, আমার কার্য্য সদাকাল সর্ব্বাবস্থায় লক্ষ্য করে চললে, কেউ তোমাদের কেশাগ্রও ছুঁতে পারবে না।"

"১৮৯৯ সনের এপ্রিল থেকে কলির প্রভাব খর্ব্ব হয়েছে, সত্য তিলে তিলে বেড়ে যাচ্ছে।"

"দেশ পশ্চিম। তৈলহীন দেশ। উষ্ণ ধান্যক্ষেত্র। দরকার· বাঙ্গালী।" "বাঙ্গালী অষ্টম জাতি।" "অষ্টম জাতি ভিন্নেরা কীট।" "বাঙ্গালী জাতিকে বিগ্রহ কহে।" "হিরো (Hero) বাঙ্গালী।"

"বিষ্ণুপূজা। কালীপূজা। শারদীয়াপূজা। বাসন্তীপূজা। জগদ্ধাত্রীপূজা। স্কুল কলেজ কোতোয়ালী। জেল, ক্ষেম, ক্ষমা। সৃষ্টিরক্ষা। ব্রহ্মপূজা। লক্ষ্মীপূজা। অন্নপূর্ণাপূজা॥"

"বিষ্ণু ও শক্তি আমার আশ্রিত।"

"প্রকৃতির অনুকূলে আমার কাজ হয়ে যাবে।" "আমি এক এক ঘায়ে, এক একটি Continent (কনটিনেণ্ট, মহাদেশ) ঠিক করে দেব।" "গোহত্যা নিবারণ হবে। মদ্যপান উঠে যাবে।" "চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম্ম সংস্থাপন করব। তবে জান্‌বি, জগদ্বন্ধুর লীলা শেষ হবে।"

"আমার লীলা সহস্র বৎসর চলবে।"*

"ইউরোপবাসীরা চার্চ্চে আমার কথা বলে। আমার অনন্ত শক্তি। Amoeba (অ্যামিবা, চিৎকণ), দেহে সর্ব্বভূতি। আকাশে, বাতাসে, ইথারের উপরেও আমার প্রকাশ ও শক্তি। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের Ambrosia (অ্যামব্রোসিয়া, অমৃত), সুতরাং Universal (ইউনিভার্সাল) Sweeper (সুইপার, ঝাড়ুদার) এর মত ঝাড়ু দিয়ে Purify (পিওরিফাই, পবিত্র) করতে এসেছি।"

"আমি, হরি, পুরুষ একই। ইথারের উপরে, আমার শক্তি। বিষ্ণুচিহ্ন আমাতে আছে।"

"জীবমাত্র কৃষ্ণভক্ত। সকলেই আমার। একদিন সকলেই আমার হবে, এপারে বা ওপারে। তোরা কিন্তু সবকেই ভাল-বাসবি। কেন না সবই তো আমার। আমার শত্রুমিত্র কেউ নাই। সকলে আমাকেই চায়। যখনই চায়, তখনই বার বার আমি তাদের কাছে যাই।"*

* মৌনী হওয়ার পূর্বে প্রভু যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। যেমন,—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। বঙ্গদেশে তিনজন গভর্ণর হবে। হাইকোর্ট বাঙ্গালীর হবে। দিল্লীতে রাজধানী উঠে যাবে। টুপীওয়ালারা টুপী খুলে সেলাম দিয়ে চলে যাবে। ভারত স্বাধীন হবে।" ইত্যাদি।

"বন্ধুর শক্তিতে মানুষ সত্যাগ্রহ করতে থাকবে, শান্তির সূচনা হবে।"

"দেখ্‌বি পৃথিবীর সমস্ত লোক একই সময়ে আমাকে দেখ্‌বে।"

"ইচ্ছাধীন আমার আগমন। মুনলাইটের সুধা লয়ে আমার দেহ। তাই চন্দ্রপুত্র। দেহের হ্রাসবৃদ্ধি আমারই হাতে।"

"আমি শক্তিরও শক্তি।" "আমাকে তোরা কি প্রকাশ করবি! বাতির আলোতে সূর্য্য দেখতে হয় না। আমি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। যখন সময় হবে, তখনই প্রকাশ হব।"

"আমি দণ্ডদাতা নহি, উদ্ধারণ বটি।" "একলেশ্বর, স্বপ্রকাশ। হরি, পুরুষ, জগদ্বন্ধু। Globe (গ্লোব) এর দায়ে মহাবতারণ।"

"অনাদির আদি গোবিন্দ, স্বয়ং ভগবান্, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা, এই দুই লীলার সর্ব্বসমষ্টিশক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু। আমি সেই রে সেই, জান্‌লি ?"

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পরিকর ও শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবন এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের লীলা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম, এই সর্বসমষ্টি শ্রীশ্রীহরিপুরুষতত্ত্ব। আমিই,

দি লীলা কমবিনেশন্ অব অল থিংস্

THE LILA COMBINATION OF ALL THINGS."

"আমাকে শুধু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কিংবা শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বললে চলবে না। তবে কি আমি তাই নই ? তাই বটে। তবে তত্ত্ব অতি নিগূঢ়।

যুগাবতার ছাড়াও শ্রীভগবান্ ধরাধামে আসতে পারেন। যুগাবতারের ভগবান্ আর স্বয়ং ভগবানে কিছু পার্থক্য আছে। যুগাবতারে সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশ পায় না। একই শ্রীভগবান্ যুগাবতারে যে শক্তি নিয়ে আসেন, তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তি নিয়ে এসে মহাউদ্ধারণ কার্য্য করেন।"

"শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া, শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জানবি কি? তাঁহার নিজের ইচ্ছা। যখন আসবার প্রয়োজন হয়, তখনই আসেন। লক্ষণে চিনবি। শক্তি প্রকাশ করলে এবং জগত্‌কে জানালে জগৎ জানতে পারে। আমার আগমনে জগতে সকল সাধু মহাপুরুষের আগমন। আমি সকলের কেন্দ্র।

অনেক ভক্ত অভিমানে অবতার সেজে বসবে। সাবধান! সকলকে নিষেধ ক'রে দিস্, কেহ যেন আমার জন্য নিতাই অদ্বৈত প্রভৃতি না সাজে। এবার আমার একাধারেই সব।" (নঃ)*

"শ্রীমতীর দশম দশা হয়েছিল। মহাপ্রভুর দ্বাদশ দশা হয়েছিল। এবার ত্রয়োদশ দশা দেখ্‌তে পাবি। এবার আমাতে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য্য, বালকত্ব ও তন্ময়ত্ব এই তিনটি বেশী দেখতে পাবি।" (নঃ) **

* শ্রীনবদ্বীপদাসজীকে কথিত।

** শ্রীবৃন্দাবনে রাজর্ষি বনমালী, প্রভুর সুদীর্ঘ শবাকার-দশা, গোস্বামী রঘুনন্দন গৌরহরির ন্যায় প্রভুতে সুদীর্ঘাকৃতি, কূর্ম্মাকৃতি ও অস্থি-সন্ধিহীন সুদীর্ঘ শবাকৃতি-দশা দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-কিশোর সাহাদি ভক্তগণও প্রভুর দেহে কূর্মদশা দর্শন করেন।

"সমস্ত লীলার সমষ্টি, সর্ব একত্রে, একমাত্র আমি। আমি ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু।" "আমি একক সর্ব্বসমষ্টি।"

"দেখ্, এমন সময় আসবে, তখন আমি জড়ের মত হ'ব। কোন জ্ঞান থাকবে না। পঞ্চবর্ষীয় শিশুর ন্যায়।..."

"ত্রিকাল ফক্কিকার। ত্রিকাল হইতে তিন হস্ত দূরে উদ্ধারণ। উদ্ধারণ হইতে একবিংশ হস্ত দূরে হরিপুরুষ।"

"আমার বয়ঃ পাঁচ বর্ষ। আমি ফক্কীকার হইতে অতি ছোট। আমাকে শিশু কহে।" (১)

"আমি, গাভী, ষণ্ড ও উদ্ধারণ; এই সবই নির্দোষী। ইহাদের আইন হয় না। রাজামাত্রকেই জানাইও। ১ম আমি, ২য় গাভী, ৩য় ষণ্ড, ৪র্থ উদ্ধারণ, এই সব নির্দোষী।"

"আমি হরিনাম মহানাম নাম মাত্র, তোমরা ফক্কীকার॥ এই দুই ভিন্ন আর কিছু নাই।"

১। "আমার পরিচয় মাত্র আমিই। ২। ইচ্ছাধীন আগমন। ৩। আমি একেলেশ্বর। ৪। আমি একক সর্ব্বসমষ্টি। ৫। আমি বিশ্বের কেন্দ্র। ৬। আমি একমাত্র আইন। ৭। লক্ষণে কার্য্যে আমার পরিচয়। ৮। বিষ্ণুচিহ্ন, চিহ্নসমষ্টি আমার দেহে আছে। সর্ব্বলক্ষণযুক্ত আমি।"

"সাধু সন্ন্যাসী স্বার্থপর, আমার জন্য কেহই কষ্ট স্বীকার করিতে চায় না। একান্ত ভক্ত কিম্বা ত্রিকালজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভিন্ন আমার কার্য্যের কেহই সহায়তা করিতে পারিবে না।"

"আমি হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। একমাত্র পুরুষ ও ব্রহ্ম। এই যে ঘরে থেকে যিনি কথা বলছেন, আমিই সেই হরিপুরুষ।"

"পৃথিবীময় আমার অষ্টকালীন ভোগ হয়ে থাকে তোরা না দিলেও আমার ভোগ হয়। তোরা যে দিস্, এটাত তোদেরই ভাগ্য।"

"যার যে ভাব সে তাই চায়। আমি সবকেই সব দিয়েছি। দেখ, এত সব চায়; কিন্তু হরিনাম দেও, উদ্ধারণ চাই, তা কেউ বলে না। কেবল পরীক্ষা! ওরে, আমি সবই পারি। ও'সব তুচ্ছ কথা। শুধু ইন্দ্রজাল! কেবল ফাঁকি! ইন্দ্রজালে পৃথিবী ঘিরে ফেলেছে! হায়! হায়!"

"ওরে আমি দর্পণ, আমার কাছে এলেই স্বরূপ প্রকাশ পায়। কারো কিছু গোপন থাকে না।" "ভেবেছ, আমি কিছু টের পাই না। আমি সবার সব জানি, ত্রিকালের কথা বলতে পারি।"

"আমার কোন কিছুতে ইন্দ্রজাল বা কুহক নাই। স্ব-ভাব, প্রয়োজনে বিকাশ, এই মাত্র।" "কহিলাম সত্য কথা, এ'কথা নহে অন্যথা।"

"আমি ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া একাই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব।"

"আমি সর্ব্বলক্ষণ, চিহ্নধারী পুরুষ। সব, দেব দেবী নিদ্রিত। কেবল জেগে আছি আমি, আমি চিরকাল জেগে থাকি। আমি ঘুমালে পলকে প্রলয় হয়ে যায়।"*

"হরিনাম হাজার হাজার ছড়িয়েছি; আরও কত কোটি পদ্মাধিক ছড়িয়ে বেড়াব।"

"দেখ্, সময়ে এমন সব লোক আমার কাছে আসবে, তোরা দেখে অবাক্ হয়ে যাবি। তাদের হরিনামে ভক্তি-বিশ্বাস অটল থাক্‌বে। তাদের হরিনামে বাধা দেয়, এমন লোক নাই। তারা ভুবনমঙ্গল হরিনামের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে, দিনরাত হরিনামে মেতে থাকবে।"

"বালক, পাগল, মাতালমাত্রই আমাকে চিনতে পারে। তাদের মধ্যে অসত্য কপটভাব নেই।"

"এখন আমি ঘরে ঘরে সেধে বেড়াচ্ছি, কেউ হরিনাম করলে না। তোরাও আমার কথা শুনলি না। এই ত্রিশ বছর দেখ্‌লি, বিশ্বাস করলি না। দেখবি, এমন দিন আসবে, সে সময় একটি কথা শুন্‌বার জন্য কাঁদবি; তখন খুঁজেও পাবি না। লক্ষ লক্ষ লোক আমায় ঘিরে থাকবে, হরিনাম প্রেমে ধরা টলমল কর্‌বে। মনে রাখিস্ আমার হাত কেউ এড়াতে পারবি না।"

"তোমরা সকলে মিলে আমার কাজ কর।" "তোমরা হরিনাম ক'রে আমায় পালন কর। এই আমার শপথ।"

"১। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সবকে। ২। ভারতের সবকে ৩। বাংলার সবকে। ৪। দেশ-বিদেশের সবকে। ৫। গ্রামের, বাড়ী ঘরের সবকে। ৬। আমার মনে ক'রে, নিত্য

চির আপন ক'রে লও। সবা দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করাবে। ৭। সবা দ্বারা কীর্ত্তনমণ্ডলী গঠন করাবে। ৮। ব্রহ্মচর্য্য করিবে, করাবে। ৯। হরিনাম, কৃষ্ণনাম, নিতাই গৌরনাম, নিষ্ঠা সর্ব্বদা গ্রহণ ও প্রচারণ।"*

"আমি সেই পদ্মপলাশলোচন হরি।" "আমি গৌরাঙ্গ।" "আমি পৃথিবীর কেন্দ্র, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে নাই।"

"অনন্ত সৃষ্টি সংসারের অধীশ্বর, পাপতাপহরণকারী প্রেমদাতা, জীবত্রাতা, প্রভু জগদ্বন্ধু জানবি।"

"দীক্ষামন্ত্র দ্বারা যে অর্চ্চনা, তাহা আমিই গ্রহণ করি।" "বিগ্রহে থাকিয়া আমিই পূজা গ্রহণ করি।" "আমার অষ্টকালই ক্ষুধা লাগে।"

"প্রভু সত্য নিত্য বস্তু।" "একালে, ওকালে, ত্রিকালে, নিত্য চিরদিন নির্ভয়ে, যেখানে সেখানে আমার কথা বলে বেড়াবি। আমি ত ঝুটা মাল নই যে বল্‌তে ভয় করবি? মেটে হাঁড়িও লোকে বাজায়ে কিনে। আমায় বাজাতে ছাড়বে কেন? পৃথিবীর সকলকে বল, মহা-মহা-জ্যোতিষী দ্বারা আমার বিষয় গণনা করায়ে দেখে, সত্য হ'লে যেন গ্রহণ করে, নৈলে দূরে পরিহার করে।"

"Ethereal power (ইথিরিয়াল পাওয়ার) আমাতে আছে। তাই ইথারের উপর (পরব্যোমে) আমার শক্তি ও স্থিতি।"

"আমি কেহ নহি, একটি চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে সব লক্ষণ ছিল, সে সব আমাতে আছে।

অমুকের (শ্রীমতীর) যা সব লক্ষণ ছিল, সে সবও আমাতে আছে। তোরা দেখবি কি? তোরা কি চিন্‌তে পারিস? আমার রাজটীকা আছে। উনিশটি লক্ষণ আছে।" "আমি স্বপ্রকাশ।" "প্রভুপদে, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখায়।"

"আমার ললাটে রাকাশশী। উহাকে চন্দ্রভাল কহে। দেহে চন্দ্রসুধা। তাই কোমলাঙ্গ, চিন্ময়।" "নীলজ্যোতিঃ বিকাশ। স্ব-রূপ। লক্ষণে জানবি। অশোকপুষ্পের কুঁড়ির অগ্রভাগের আভা সর্ব্বাঙ্গে। উহার স্থিতি একমাত্র চিন্ময় পুরুষে।"

"আমি অযোনিসম্ভব।" Moonlight (মুন লাইট) এ, আমার দেহ। আমার ইচ্ছায় দীর্ঘ ও খর্ব্ব হ'তে থাকে।"*

"গ্রহে পাঁচ তুঙ্গ, ক্ষণে জন্ম, যোনির সংস্রব নাই। চন্দ্রের সুধায়, এটা কারণ দেহ। আমি কৃষ্ণ বিষ্ণু সব। নিত্য জেন।"

'আমার কথা, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে যথাযথা বলে বেড়াবি।'

"বিশ্বাস না হয়, বাজারে যাচাইয়া লেও।"

'ইচ্ছাধীন-আমার আগমন।'

"ইচ্ছাধীন-অবতার কি-ভয় রে।

বন্ধু-নাই ; না-না-না ; কি-বা রয় রে॥"

"হরিনামে দেহ হয়।" "ইচ্ছাকৃতি দ্বারা অবতার।"

"হরি শব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয়।"

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।

চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন॥

(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)"

"১। আমি ভিন্ন কিছুই নাই।

২। হরি।

৩। মহাউদ্ধারণ।

৪। পুরুষ।

৫। জগদ্বন্ধু।

৬। পরব্রহ্ম।

৭। সৃষ্টি।"

"......এই নেও আমার পরিচয়। আজ হ'তে আমি মুক্ত হ'লাম। সবকে আমার কথা বলবে। চিরজীবন ভরে, নিত্য চিরদিন আমার কথা বলবে। চিরজীবন ভরে, নিত্য চিরদিন আমার কথা লিখ্‌বে সদা প্রচার করবে। আমি কি তোদের কেউ নই? আমি কি ভেসেই যাব? আমায় হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষা করবে না? হায়! হায়! কেউত আমার কথা শুনে না, হরিনামও করে না। আমি তোমাদের দেহ হস্ত, পদ, প্রাণ, মন, সব। তোমরা আমার কথা রাখ, হরিনাম কর। আমি তাই শুনতে শুনতে ধূলিতে পৃথিবীর সমস্তে, আকাশে মিশে যাই। আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক, তোমাদেরও মঙ্গল হউক। তা' হ'লেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে নেও। আমি হরিনামের, এ'ভিন্ন আর কারো নই।"

"ব্রজলীলায় রস আস্বাদন করিয়াছিলেন অষ্টসখী, গৌরাঙ্গ-লীলায় সাড়ে তিন জন রসপাত্র ছিলেন। এ সব লীলায় বিশেষ কিছুই হয় নাই।"

"এবার সকলকেই হরিনাম আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।" "এবার মানুষ ত মানুষ, পশু-পক্ষী-কীটপতঙ্গ-বৃক্ষলতা তৃণ এমন কি অণুপরমাণুদিগকে পর্য্যন্ত আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

"আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।"

"হরিপুরুষের প্রকাশ নাম, প্রভু জগদ্বন্ধু।"

"হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু।"

প্রভুর প্রধান সেবাইত ও সহকারী সেবকগণ

শ্রীশ্রীপ্রভুর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি অনুসারে অনেক ভক্ত তাঁহাকে সেবা করিবার ভাগ্য পাইয়াছেন। যাঁহাদের নাম বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়, যথাসম্ভব পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। দেবীমা, শ্রীযুক্তা দিগম্বরী—বন্ধুগোপাল বাল্যাবধি দীর্ঘকাল গোবিন্দপুর ও ব্রাহ্মণকান্দা অবস্থানকালে ইঁহার সেবা ও আদর যত্ন গ্রহণ করিয়াছেন। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৩ সনে শ্রীঅঙ্গনেই দেহরক্ষা করেন ও শ্রীঅঙ্গনেই ইঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

২। শ্রীগোপাল মিত্র, শ্রীমহিম দাস, শ্রীনবকুমার দত্ত—বাকচর অবস্থানকালে ইঁহারাই বিশেষভাবে সেবা-সৌভাগ্য পাইয়াছেন।

৩। প্রফেসর শ্রীরমেশচন্দ্র (ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী)—ইনি প্রভুর মৌনী হওয়ার পূর্ব্বে ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বহুদিন সেবাকার্য্য করিয়াছেন।

৪। শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক (গোকুলানন্দ)—বাকচর শ্রীঅঙ্গন ও কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে সঙ্গে থাকিয়া সেবাভাগ্য পাইয়াছেন।

৫। শ্রীনবদ্বীপ দাস—১৩০০ সনের উল্‌টা রথযাত্রার দিবস হইতে প্রায় আট নয় বৎসর নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পাবনা, বাকচর, কলিকাতা, ফরিদপুর আদি নানাস্থানে প্রভুর শ্রীচরণ পাশে থাকিয়া সেবাভাগ্যে ভাগ্যবান্ হইয়াছেন।

৬। ছোট জয়নিতাই ও শ্রীহরিরায়—১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রায় এক বৎসর কাল ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে সেবাকার্য করেছেন। ধনীর সন্তান হররায় কঠোর ত্যাগীর মত জীবন নিয়ে বাকচরে ও কিছুকাল সেবাকার্য করেন।

৭। ছোট জয়নিতাই এর ১৩০৬ সনের শেষভাগ হ'তে শ্রীগোপীকৃষ্ণ দাস (তারকেশ্বর বণিক বি. এ.) প্রভুর মৌনী হওয়ার পূর্বভাগে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রায় দেড় বৎসর কাল সেবাকার্যে ছিলেন। এর মধ্যে প্রভুর মহাভাবোন্মাদ দশা ঘটে। অতঃপর প্রভু ঢাকা ও কলিকাতাতেও গতায়াত করেন। ভক্ত অন্যান্যরাও প্রভুর সেবাকার্য করেন।

৮। এই সময় মাঝে মাঝে শ্রীসুরেশচন্দ্র প্রমুখ প্রভুর প্রিয় পদাতিক বালকভক্তগণ ফরিদপুরে কিছুদিন প্রভুর সেবাভাগ্য লাভে ধন্য হইয়াছেন।

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রভুবন্ধু ১৩০৯ সনের আষাঢ়ের প্রায় মধ্যভাগ হতে ১৩২৫ সনের ১লা মাঘ বৈকাল পর্যন্ত মহাগম্ভীরায় ও ১৩২৫ সনের ১লা মাঘ বৈকাল হ'তে ঐ সনের ১৬ই ফাল্গুন পর্যন্ত পূর্ব্বদিকের পাকা দেওয়াল দেওয়া মন্দিরে মহামৌনাবস্থায়, ১৩১০ সনের কিছু পূর্ব্ব হ'তে ১৩১৭ সন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণদাস একক কঠোর ভাবে থাকিয়া অতি নিষ্ঠায় প্রভুর প্রেমের সেবা করেন।

১০। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চম্পটি (তিন বিষয়ে অনার্স গ্রাজুয়েট) ও তৎসহধর্মিণী দেবী ক্ষীরোদা বঙ্গাব্দ ১৩১৭ হইতে ১৩১৯ সনের ২রা অগ্রহায়ণ পর্যন্ত মহাগম্ভীরায় প্রভুর পরম সেবাব্রতে ব্রতী থাকেন। অতঃপর দ্বাদশ দিবস প্রভুর অনশন ঘটে।

১১। শ্রীবাদল বিশ্বাস – ১৩১৯ সনের ১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২৪ সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত, নিজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত প্রভুর প্রেমসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন এবং শ্রীঅঙ্গনেই দেহ রক্ষা করেন। কৃষ্ণদাসজী এর মধ্যে মাঝে মাঝে এসে সেবাকার্য করেছেন।

শ্রীমহেন্দ্র, শ্রীঘনশ্যাম, শ্রীপ্রসন্ন সাহা, শ্রীকালোশ্যাম, শ্রীযজ্ঞেশ্বর, শ্রীনিত্যগোপাল সরকার, শ্রীজিতেন্দ্র গুহ এবং আরও কেহ কেহ, কেহ দীর্ঘকাল, কেহ অল্পকাল, বাদল বিশ্বাসজীর অনুগত সহকারিভাবে প্রভুর সেবাভাগ্য প্রাপ্ত হন।

১২। শ্রীকৃষ্ণদাস—পুনরায় ১৩২৫ সনের বৈশাখ হইতে ১৩২৮ সনের আশ্বিন পর্যন্ত প্রভুর সেবাভার গ্রহণ করেন। ১৩৩৪

সনে ২৮শে আষাঢ় বন্ধুসেবক প্রসন্ন সাহাজীর কলিকাতাস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী বন্ধুর সেবামন্দিরে প্রভুর নাম-কার্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণ-দাসজী দেহরক্ষা করে দিব্য দেহে প্রভুর নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হন।

ধলাশ্যাম, কালোশ্যাম, যজ্ঞেশ্বর, রাখাল, সীতানাথ, নিত্যসেবক, সত্যব্রত, প্রাচীন শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক ও আরও কাহারো কাহারো কৃষ্ণদাসজীর আনুগত্যে প্রভুর সেবাভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে।

এতদ্ব্যতীত, হরমোহন (কল্যাণ বন্ধু), ব্রজবন্ধু (কালী) ভদ্র, ক্ষিতীশ, বসন্ত ভট্টাচার্য্য, রাজেন্দ্র দত্ত, পাগলা কুঞ্জ, দোলগোবিন্দ, রাজুয়া, উদ্ধারণের পিতা শ্রীদুঃখীরায় (প্রাচীন ভক্ত), শচীন ঘোষ, জ্ঞান, বিজয়, মনোমোহন, ভোলা, বৃদ্ধমোহন্ত, দীনেশ, অতুল, মনোহর, বলরাম, নিতাই প্রমুখ বন্ধুভক্তগণ বিভিন্ন সময়ে, দীর্ঘ বা অল্পকাল প্রভুর দোলা বা শকট বহন ও অন্য সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকার ভাগ্য পান।

১৩। শ্রীমহেন্দ্রজী, মহানাম সম্প্রদায় সহ শ্রীশ্রীপ্রভুর মহা-দশাশ্রয়ের পর ১৩২৮ সনের ২রা কার্ত্তিক হইতে শ্রীঅঙ্গনে নিরবচ্ছিন্ন মহানামের সেবা ও কয়েক মাস পর হতে নিয়মিত নিত্য সেবার ভার গ্রহণ করেন। ১৩৫০, ২৩শে মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীঅঙ্গনে মহেন্দ্রজী দেহ রক্ষা করেন এবং অঙ্গন পার্শ্বেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

ইহাই উল্লেখ্য যে, মহেন্দ্রজী বর্ত্তমান থাকাকালেই ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে মহানাম সম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মহানামব্রত, প্রেমদাস, লীলা-

প্রকাশ, গোপীদাস, বন্ধুজীবন, অমরবন্ধু, আদি ভক্তগণ সমন্বয়ে 'মহাউদ্ধারণ সংঘ' গঠিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে অঙ্গনে ভক্ত ডাঃ হরিহরবাবুর মস্তকে কুঠারঘাতের ঘটনায় কতককাল সম্প্রদায়ে অশান্তির অবস্থা চলতে থাকে এবং ঘটনাপরম্পরায় ঐ সময় মহেন্দ্রজীকে কিছুকাল সহরে ভক্ত শশধর মণ্ডলের গৃহে বাস করতে হয়েছিল। পরে মহেনদা প্রাচীন বন্ধুভক্ত নবদ্বীপদাসজীর সঙ্গে অঙ্গনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দ্বন্দ্বের সময় 'মহাউদ্ধারণ সঙ্ঘ'ই শ্রীঅঙ্গনে পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন।

বাংলা ১৩৫৫ সনে দ্বিধা বিভক্ত সম্প্রদায় আবার মিলিত হয়ে 'মহানাম-সম্প্রদায়' নামেই পরিচিত হন। মহেন্দ্রজীর নিত্যধাম প্রাপ্তির প্রায় পাঁচ বৎসর পর এই মিলন ঘটে এবং মহানামব্রতজী তখন হতে মহানাম সম্প্রদায়ের নেতা বা প্রেসিডেণ্ট রূপে পরিগণিত হন।

মাতৃদেবীগণের মধ্যে পূর্ব্বকালে স্বয়ং মাতা বামাদেবী, ন'মা (ক্ষমাময়ীদেবী), দেবী রাসমণি, কৈলাসকামিনী, দাসী ঊর্মিলা, দেবী মা, দেবী গোলোকমণি, শ্রীনিস্তারিণী, বিন্দুমাতা, রাইমাতা, বাদলগৃহিণী, লাহিড়ী শ্রীশগৃহিণী, মথুরগৃহিণী আদি যার যার যথাপ্রাপ্যভাবে, অল্পবিস্তর, প্রভুকে সেবা করব'র ভাগ্য পেয়েছেন।

উত্তরকালে দক্ষিণাবাবুর গৃহিণী, উদ্ধবজননী, রাজ্যচরণ ভগিনী, রামমাতা, কবিরাজগৃহিণী, পেস্‌কার গৃহিণী, দক্ষদিদি, রাজেন্দ্রভগিনী, (বিনোদিনী), দুই রাধেদাসী আদি যার যার সময় ও ভাগ্য মত অঙ্গনে প্রভুর সেবা কার্য করেছেন এবং শিশুপ্রভুকে দর্শনাদি করবার ভাগ্য পেয়েছেন।

শ্রীমথুর কর্ম্মকারের প্রতি

প্রভুর নাম
বারে বারে উচ্চারণ করিবেন
হরি, উদ্ধারণ
মহাপুরুষ জগদ্বন্ধু
অন্তরীক্ষে উদ্ধৃত

Hare Krsna dash.

কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম
রাধামাধব রাধিকা নাম॥

পিতা — বৃষভানু রাজা
মাতা — কীর্ত্তিদা।
পতি — কৃষ্ণ।
সখী — ললিতা।
শ্বশুর — নন্দরাজা।
শাশুড়ি — যশোমতী।
স্থান — বৃন্দাবন।
মর্ম্ম — মিলন।

।ভজন।

জপন।

দর্শন।

স্মরণ।

বন্দন।

।নিবেদন।

সাধনা।

পতন।

কীর্ত্তনা।

মূর্চ্ছনা।

উন্মাদনা।

প্রদক্ষিণা।

শ্রীশ্রীবন্ধুকথানুশীলন

বন্ধুবাণী-চর্চ্চা

সদাকাল আমার কথা অনুশীলন করো।"
"বন্ধু-চর্চ্চা, চারণ, প্রচারণ সব"—বন্ধুবাণী

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের জগন্মঙ্গল মহাবাণীসমূহের মধ্যে কতিপয় আপাত-বিরোধী কথা পরিদৃষ্ট হয়। তাহা নিয়ে অনেক সময় অনেক ভক্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। সকল বিষয় সুষ্ঠু সমাধান করবার সামর্থ্য মাদৃশ অল্পজ্ঞ জীবের নিশ্চয়ই নাই। তথাপি বন্ধুবাণীর চর্চ্চা ও অনুশীলন করা তাঁহার শ্রীলেখনী-প্রসূত আদেশ, ইহা স্মরণ করে কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিতে প্রয়াসী হচ্ছি।

"নিত্য সত্য অভিভাবক"

প্রভুবন্ধু তাঁহার সেবক বালক-ভক্তগণকে এক সময় "তোমরাই আমার নিত্য সত্য অভিভাবক" বলে অত্যাদর করেছিলেন, আবার অভিমানযুক্ত হলে তাহাদিগকেই, "তোরা দুনিয়ার মহাপাপী, ভেসে যাচ্ছিলি, ধরেছি বসে আছিস্" বলে তদ্বিরোধী সাবধান বাক্য সচৈতন্য করেছিলেন।

"রমেশ, তুই অমর"

ঢাকা সহরে অবস্থান কালে একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে বলেছিলেন, "রমেশ, তুই অমর," ইহার কিছুক্ষণ পরেই আবার বললেন,—"রমেশ, তোর আয়ু নাই।" রমেশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ঐরূপ বিপরীত কথা বলবার কারণ জানতে আগ্রহ করলে, প্রভুবন্ধু বুঝিয়ে বললেন যে, যখন তাঁহার প্রিয়ভক্ত প্রভুর সেবা সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁহাকে অমর বলেছেন, আর যখন প্রভুকে ভুলে বিষয়চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁহার আয়ু নাই বলেছেন। ভক্ত রমেশ ভেবে দেখলেন, সর্বান্তর্য্যামী প্রভু অতি সত্য কথাই বলেছেন। কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধহীন মানব বাহ্যতঃ বেঁচে থাকলেও মৃত।

"সকলেই বৈরাগী হ'য়ো না"

ভক্তবর পূর্ণদত্ত তাঁহার যৌবনকালে একদিন নগ্ন পায়ে, এক-বস্ত্রে বস্ত্রের অঞ্চলে কাঁধ ঘুরিয়ে একটি গিট্ দিয়ে বৈরাগীর বেশে শ্রীঅঙ্গনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালে, প্রভু শ্রীমন্দির হতে তাঁকে বলেছিলেন,—

"জামা পরো, জুতো পরো। বাবু হয়ে হরিনাম করো। হরিনাম গ্রহণে সবারই সমান অধিকার। তোমরা সকলেই

বৈরাগী হ'য়ো না। সকলে বৈরাগী হ'লে লোকে ভাববে, বৈরাগী ছাড়া আর কারো হরিনাম করতে নাই।"

"অকৈতবে বিষয়-বৃত্তি করিও"

"গৃহী হইও, বিষয়ী হইও," 'বিষয়ী হইও না,' 'বিবাহ কর,' 'চিরকুমার রহিও,'—এই সকল বন্ধুবাণী আপাত-বিরোধী, বুঝতে হবে। ঐ সকল কথা ব্যক্তিগত ; বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে বলেছেন। কোন্ কথা কখন, কাহাকে, কোন্ হেতু বলেছেন, তাহা অনুশীলন করলে বিরোধিতা দূর হবে ; তখন বুঝা যাবে যে, সকলে চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করুক, ইহা প্রভুর হার্দ্দ নহে। যোগ্যব্যক্তি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করুক, অপর সকলে অকৈতবে বিষয়-বৃত্তি করুক, ইহাই প্রভুর অভি-প্রায়। শ্রীসর্ব্বসুখ সান্যালের প্রতি প্রভুর আদেশ "বেদ বিধিমতে সব করিও পালন," পক্ষান্তরে শ্রীযোগেন্দ্র গোস্বামীর প্রতি প্রভুর আদেশ, "বৈদিক সন্ধ্যা···ইত্যাদি সমগ্রই নিষিদ্ধ।"

প্রভুর আপাত-বিরোধী-বাক্যাবলীর মধ্যে জন্ম-রহস্য ও গুরুবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনাই সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই ঐ ঐ সম্বন্ধে যথামতি কিঞ্চিৎ অনুশীলন করছি।

জন্মরহস্য প্রসঙ্গ

কোন কোন ভক্তমুখে শুনা যায় যে, গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা-অবলম্বনে প্রভু ধরাধামে এসেছেন বলে প্রভুর বাণী আছে।

এক নির্দ্দয় চাষী একটি গাভী দ্বারা জমি চাষ করছিল। প্রপীড়িতা গাভীরূপা ধরণী অশ্রু বিসর্জ্জন করছিলেন, তদবলম্বনে বন্ধুহরির ধরায় আবির্ভাব।

শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপক্রমণিকায় বর্ণিত আছে, অসুর-প্রকৃতি রাজন্যবর্গ দ্বারা ধরিত্রী উৎপীড়িতা ও পাপভারাক্রান্তা হয়ে গোমাতার রূপ ধারণ করে অশ্রুবর্ষণ করতে করতে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন; ব্রহ্মা তাঁহাকে নিয়ে ক্ষীরোদসাগরের তীরে গমন করেন। দেবগণসহ ব্রহ্মা ও ধরণীর আকুল প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হন। এই গাভীরূপিণী ধরণীর অশ্রু বন্ধুহরির ধরাধামে আবির্ভূত হবার একটি হেতু।

বন্ধুবার্তা গ্রন্থে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চম্পটী মহাশয়ের মুখে শ্রুত প্রভুর অপূর্ব্ব এক আবির্ভাব রহস্য।

আর একটি বার্ত্তা শুনা যায়—ব্রাহ্মণ-দম্পতি ব্রাহ্মমুহূর্তে বন্ধুচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ডাহাপাড়া গঙ্গায় গমন করেন এবং পদ্মের উপরে ভাসমান অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময় শিশুবন্ধুকে প্রাপ্ত হন। যোগমায়ার আবরণে, ঐ দিব্যশিশুই ডাহাপাড়াধামে তাঁহাদের আত্মজ-রূপে প্রকাশ পান।

শ্রীহরির কৃপায় স্বভবনে বসিয়াও গঙ্গায় পদ্মস্থিত শিশুবন্ধুর দর্শন এবং প্রাপ্তিও অসম্ভব নহে। এই সমস্তই দিব্য দর্শন ও দিব্যানুভূতি। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে একমাত্র অর্জ্জুনই ভগবৎ-কৃপায় বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, অন্যেরা দেখে নাই। রথস্থ হয়েই তিনি স-নদীসাগর-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও যুদ্ধের ভাবী ঘটনা দর্শন করেছিলেন। মাতা যশোদাও এক সময়ে গোপালের মুখে স-গোকুল-বৃন্দাবন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখেছিলেন। বসুদেব-দেবকী, জগন্নাথমিশ্র-শচীদেবীও, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ঐ প্রকাশ, দিব্য মূর্ত্তি ও জ্যোতি দর্শন করেছিলেন। এই সকল রহস্যময় কথার মূল সত্য হল এই যে, প্রভুবন্ধু অযোনিসম্ভব ও অপ্রাকৃত। "প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।" জগতের মহা-উদ্ধারণ-বিধানার্থে তিনি যোগমায়া-সমাবৃত হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই নিগূঢ় সংবাদ নানাবিধ রহস্যময়-বাক্যে ব্যক্ত করেছেন।

গুরুবাদ, দীক্ষা ও অদীক্ষা

"সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—শ্রুতি।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" —গীতা

"গুরু পদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"প্রভাতি টহল, নিত্যকীর্ত্তন, পদস্মৃতি, ধৈর্য্য, দীক্ষা—ইতি শিক্ষা"—বন্ধুবাণী।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু প্রয়োজন বুঝিয়া কখনও বা কোন ভক্তকে গুরুগিরি করতে নিষেধ করেছেন, আবার কাহাকেও বা গুরুগিরির অভিমান ত্যাগ করে শিষ্য করতে, নামমালা মন্ত্র দিতে আদেশ করেছেন।

বাকচরের প্রাচীন ভক্ত শ্রীগোপাল মিত্র মহাশয়কে একদিন বন্ধুসুন্দর আদেশ করেন, "এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, গোপাল, যাও, স্নান করে এস ; ওকেও (রজনী সর্দ্দারকেও) স্নান করতে বল।" প্রভুর আদেশ পাওয়ামাত্র দুইজনে (গোপালও রজনী) নিকটস্থ স্রোতস্বিনী পূতসলিলা কাবেরীতে অবগাহন-পুরঃসর আর্দ্রবস্ত্রে হরিবোল, হরিবোল, বলতে বলতে প্রভুর নিকট ফিরে এলেন।

আসামাত্র প্রভু মিত্র মহাশয়কে আদেশ করেন "ওকে মালা দেও।" অতঃপর প্রভু স্বীয় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে থলিয়াসহ দুইটি মালা নিয়ে ফিরে এসে মিত্র মহাশয়ের হাতে দিলেন এবং পুনরায় বললেন—"তুমি উহাকে মালা দেও,—তোমাকে যে মালার মন্ত্র দেওয়া হয়েছে, সেই মন্ত্র উহাকে দেও।"

মিত্র মহাশয় অস্বীকার করে বলেন, "প্রভো, মালার মন্ত্র আমি দিতে পারবো না। আপনি দিন।" প্রভু বললেন,—"আমিই ত দেই, উপলক্ষ্য তুমি। তোমার এক হাজার শিষ্য করতে হবে।" তখন মিত্র মহাশয় বাধ্য হয়ে প্রভুর আদেশ-অনুসারে রজনীকে সম্মুখে

বসালেন ও মালামন্ত্র প্রদান করলেন। নামমন্ত্র প্রচার করে মিত্র মহাশয় করজোড়ে বললেন—"প্রভো! আমার এ-ই এক হাজার।" প্রভু বললেন—"এখন থেকে ইহাকে হরিদাস ব'লে ডেক।" ইনি মোহান্ত সম্প্রদায়ের নেতা সুবিখ্যাত হরিদাস মোহান্ত। ঘটনাটি মিত্র মহাশয়ের মুখে মহেন্দ্রজীর সহিত নিত্যসেবক আমিও শুনেছি। (ইহা মহেন্দ্রজী লিখিত "জগদ্‌গুরু" গ্রন্থ, ২১৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে)।

"আমি যাহা বলি, তাহা বিচার করো"

অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে সত্য স্থাপন করা যায়।

প্রভুর আদেশ, "নিত্যকীর্ত্তন করিও" কীর্ত্তন-সম্পর্কে এই বাণী 'অন্বয়-মুখে' তিনি বলেছেন "কীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন ব্রত বা নিয়ম করিও না।" কীর্ত্তনের প্রাধান্য দিয়া প্রভু এই আদেশ ব্যতিরেক মুখে বলেছেন।

"কীর্ত্তন করিও না," এমন কথা প্রভুবন্ধু কাহাকেও বলেছেন বা লিখে দিয়েছেন শুনলে, তাহা নিশ্চয়ই সার্ব্বজনীন নহে, কোন বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বলেছেন, এইরূপ বুঝতে হবে। যেমন কোন ছাত্র-ভক্তকে প্রভু লিখেছিলেন—"একজামিন শেষ না হওয়া অবধি, নিঃসঙ্গ হইও, কীর্ত্তন করিও না।"

পূর্ব্ব কথিত কীর্ত্তন-নিষেধক বাক্যটির "একজামিন শেষ না হওয়া অবধি" অংশটুকু যদি ঘটনাচক্রে হারিয়ে যেত, তাহা হলে "কীর্ত্তন করিও না"। এই অংশটুকু নিয়ে আমরা বিব্রত বোধ করতাম। এখন হেতু স্থির হওয়ায়, ঐরূপ বিব্রত আমরা হব না। অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা স্থাপিত বাক্যের বিরোধী বাক্য পাওয়া গেলে আমরা তাহা বিশেষ কোন-স্থান-কাল-পাত্র-উদ্দেশ্যে বলা, সার্ব্বজনীন নহে, – ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করব।

প্রভুর বাণী ঃ "আমি কিছু অশাস্ত্রীয় বলি না, লিখি না।"
শ্রীশ্রীপ্রভু বাকচরবাসীদের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মলিপিতে লিখেছেন—
"গোস্বামী দীক্ষা" "গোস্বামী ধর্ম্মপালন।"

এই দুইটি বাণী দ্বারা গোস্বামী দীক্ষা ও ধর্ম যে প্রভুর অভিপ্রেত, তাহা অন্বয়মুখে সার্ব্বজনীনভাবেই বলা হল। প্রভুর এইসব শ্রীহস্তলিপি নিজে দেখেছি।

পুনরায় এই ধর্ম্মলিপিতেই, (জগদ্‌গুরু, ১৩৭ পৃষ্ঠায়) চিরত্যাগ পর্য্যায়ে অগোস্বামী গুরুর কথা আছে।

"চিরত্যাগ—অগোস্বামী গুরু" বাক্যে অগোস্বামি গুরুকে চিরত্যাগ করতে বলেছেন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী-দীক্ষা ও ধর্ম্মপালন বিষয়টিকেই ব্যতিরেক মুখে বলা হল। এই অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা প্রভুর যাহা একান্ত অভিপ্রেত, তাহা অখণ্ডনীয় ভাবে স্থাপিত হয়ে গেল। প্রভুর এই সমস্ত মূললিপি নিজে দেখেছি।

অতঃপর বাকচরবাসীদের ধর্মলিপিতে শিক্ষাপর্য্যায়ে লিখেছেন—"প্রভাতি টহল, নিত্যকীর্ত্তন, পদস্মৃতি, ধৈর্য্য, দীক্ষা—ইতি শিক্ষা।" এই পরম উক্তিতে দীক্ষা যে সর্ব্বতোভাবেই প্রভুর অভিপ্রেত, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, সর্ব্বসাধারণের ঐ ধর্মলিপিতে নিষেধাত্মক কোন বাক্যই নাই।

প্রভুর কতক বাণী সার্ব্বজনীন, আবার কতক বাণী ব্যক্তিগত। প্রভুর সার্ব্বজনীন বাণী ব্যক্তিগত বাণী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রয়োজনে গ্রহণ করবেন। আবার ভক্তমুখে শ্রুত বাণী অপেক্ষা তাঁর লিখিত বাণীর গুরুত্ব অধিক। প্রভুর স্বহস্ত লিখিতবাণী তাঁর প্রতিলিপির বাণী অপেক্ষা শক্তিশালিনী বলে গ্রহণ করব।

চিঠিপত্রে লিখিত প্রভুর বাণী অপেক্ষা প্রভুর শ্রীহরিকথাদি গ্রন্থোক্ত বাণী অধিকতর সামর্থ্য-শালিনী।

প্রভুর লিখিত উপদেশ, "উচ্ছিষ্ট অনিষ্ঠা মহাপাপ," লিখিত বাণী প্রভুর গ্রন্থে, "বৈষ্ণবকণিকা আর করপুটে পান,"—এখানে আমরা বুঝব, বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ প্রভুর হার্দ্দ। অবৈষ্ণবের অনিবেদিত উচ্ছিষ্ট ত্যাজ্য। অবশ্য, বৈষ্ণব লক্ষণে চিনিতে হইবে। "স্পর্শ দোষ, মহাপাতক"—লিখিত বাণী। "ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করিবেন আলিঙ্গন" গ্রন্থোক্ত বাণী। যাঁহার দর্শনে হরিনাম উচ্চারিত হয়, এইরূপ আদর্শ বৈষ্ণবের স্পর্শ বাঞ্ছনীয় বুঝতে হবে। স্পর্শ দোষ, অবৈষ্ণবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তাছাড়া উচ্ছিষ্ট ও 'স্পর্শ দোষ' হতে ব্যাধি সংক্রামিত হয়, অনৈষ্ঠিক সংসর্গে।

দুইটি গ্রন্থোক্ত বাণী আপাতবিরোধী ও সমবল মনে হলে "সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য" দেখতে হবে প্রভুর আচরণ ও শাস্ত্রের সমর্থন কোন্ দিকে। যেমন, "পুস্তক বেশ্যা" (ত্রিকালগ্রন্থ), "ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে" (সংকীর্ত্তন), দুই-ই গ্রন্থোক্ত বাণী। প্রভুর আচরণ ও শাস্ত্র দৃষ্টে বুঝতে হবে, সকল পুস্তকই বেশ্যা নয়; ভক্তিকথাবিহীন পুস্তকই নিন্দনীয়।

প্রভুর ত্রিকালগ্রন্থের অনেক বাণী দুরধিগম্য,—উহা নিন্দাত্মক কিংবা প্রশংসাত্মক, বুঝা যায় না। যেমন "মিথুনকে মালাজপ কহে," "উদরের পীড়াকে তিলক ফোঁটা কহে।" এই বাণীতে হার্দ্দ কি বলা শক্ত, আপাত নিন্দাই মনে জাগে। তথাপি সকলেই তিলক করেন ও মালা জপ করেন। তিলক ধারণ করতে ও মালা জপ করতে প্রভুর স্পষ্ট আদেশও আছে।

প্রভুর আপাতবিরোধী বাক্যগুলি বিচার পূর্বক গ্রহণ করতে হবে। ত্রিকালগ্রন্থে অষ্টবন্ধু পর্য্যায়ে, 'নিদ্রা হিত' উল্লেখ আছে। অন্যত্র 'নিদ্রা মৃত্যু' বলে বিশেষ বাণী আছে ও নানা স্থানে নিদ্রা জয়ের উপদেশ আছে। কাজেই বন্ধু বা হিত পর্য্যায়ে থাকলেও সারাদিন নিদ্রাভিভূত থাকা নিশ্চয়ই হার্দ্দ বলিয়া গ্রহণ করা চলবে না। অকৃতি পর্য্যায়ে 'বাদ্য' শব্দ আছে। আবার অন্যত্র মৃদঙ্গবাদ্য শিক্ষায় "বাদ্য অভ্যাস রাখবে," প্রভুর উপদেশ আছে, "খোল করতালে ভাই কর সংকীর্ত্তন" প্রভুর বিধান আছে। এখন স্পষ্ট দেখা গেল, একস্থানে যাহা অকৃতি, অন্যত্র তাহা 'কৃতি' হয়েছে।

প্রভুর কোনও বাক্যার্থবোধ ও উহা পালন অসম্ভব হয়ে পড়লে তাঁহার কার্য্য ও দেশকালপাত্র ও সদাচার দৃষ্টে কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। যেমন ত্রিকালগ্রন্থে প্রভু শবদাহ ও শবপ্রোথন, উভয়কেই মহামারী ও মহাপ্রলয় বলে নিন্দা করে সমুদ্র অথবা প্রান্তরে ফেলে দিবার বিধি দিয়াছেন। এই বাক্য পালন নানা কারণেই অসম্ভব হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় প্রভুর আচরণ ও সদাচার দৃষ্টে কার্য্য করতে হবে। প্রভু নিজে ভক্তের সমাধিও দেওয়াইয়াছেন, দাহ করবার ব্যবস্থাও দিয়াছেন। নিন্দাত্মক বাণী থাকলেই উহা সর্বথা পালনীয় বা অপালনীয়, এমন বিধান চলে না।

প্রভুর বাণী, শাস্ত্রের বাণী, প্রভুর আচরণ, পূর্ব মহাজনদের আচরণ, প্রভুর বিশিষ্ট ভক্তের আচরণও যখন মিলে যাবে, তখন আমাদের আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।

এখন আমরা আলোচনা করব, প্রভু জগদ্বন্ধু গুরুতত্ত্ব, মন্ত্র, দীক্ষা ও জপ মানেন কি না। গুরু, দীক্ষা, মালা ও মন্ত্র এই চারিটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কেন না, গুরু মানলেই মন্ত্র, দীক্ষা ও জপ মানা হল। দীক্ষা মানলেই—গুরু, মালা ও জপ মানা হল। মন্ত্র মানলেই—গুরু, দীক্ষা ও জপ মানা হল। জপ মানলেই গুরুর নিকট প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্রের জপ বুঝা যায়। এই বিষয়টিকে গুরুবাদ শব্দ দ্বারা বুঝাব। গুরুবাদ প্রভুর হার্দ্দ কি না, তাঁহাই অনুশীলন করছি।

"গুরু, দীক্ষা, গুরুগণ-নির্দ্দেশ" শীর্ষক গুরুবন্ধু-বাণীতে পঞ্চাশটিরও অধিক গুরুবাদ সমর্থক প্রভুর বাণী আছে। ইহা

ছাড়া গুরুবাদ সমর্থক প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গোস্বামী গ্রন্থ সমূহ প্রভু স্বয়ং সমাদর করে "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ রহিবে" "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মুখস্থ করিও" ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন।

গুরুবন্ধুবাণীতে উদ্ধৃত "গুরুগতি, কৃষ্ণ পতি" "লহ শ্রীগুরুশরণ" "চরমে তোদের গুরু হ'লাম এখন" ইত্যাদি পঁচিশ (২৫) টিরও অধিক বাণী প্রভুর শ্রীহরিকথা আদি গ্রন্থে লিখিত আছে। অতএব এইগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। ইহা ছাড়া প্রভুবন্ধুর শ্রীহস্তলিখিত গুরুবাদ সমর্থক মহামূল্যবান্ বহু বাক্য ও মন্ত্র এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে ও ঐ সমস্তের কিছু কিছু ব্লকও মুদ্রিত হয়েছে।

বন্ধুকথা, জগদ্গুরু জগদ্বন্ধু ও ১৩৩২ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত বন্ধুবার্ত্তায় প্রকাশিত "চিরগুরু রইলাম", 'গুরু স্মরণ রাখিও', "প্রভাতি হৈল··· ধৈর্য, দীক্ষা ইতি শিক্ষা", 'গোস্বামী দীক্ষা', 'দীক্ষা মন্ত্রদ্বারা যে অর্চনা, তাহা আমিই গ্রহণ করি'; 'তোদের শ্রীমতি আমাকে স্বপ্নে মন্ত্র দিয়াছেন', ইত্যাদি বন্ধুবাণী, সমস্তই গুরুবাদ ও দীক্ষার স্পষ্ট সমর্থক।

গুরু-শিষ্য সম্পর্কে প্রভুর লিখিত, নিম্নে উদ্ধৃত

"রমেশ যুগলকিশোর ও তার গুরু ছাড়া আর কিছু জানে না", "আমি গুরু, হরেকৃষ্ণ দাস শিষ্য", "মন্ত্রদাতা গুরুকে গোস্বামিগণ শ্যামের প্রকাশরূপ উল্লেখ করিয়াছেন", ইত্যাদি বাণীগুলি, গুরু, শিষ্য ও গোস্বামী শাস্ত্রের দৃঢ় সমর্থক।

সাক্ষাৎ প্রভুকে যাঁরা গুরু বলে স্বীকার করেছেন, সাক্ষাৎ প্রভু-সেবা করেছেন ও প্রভুও যাঁদের শিষ্য আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরা ত মহাভাগ্যবান্। তাঁদের আবার দ্বিতীয় বার লৌকিক দীক্ষার প্রয়োজন আছে কি? দ্বিতীয় বার অন্য কোথাও দীক্ষা নিয়ে প্রিয় ভক্ত মহাকৈতবে পতিত না হয়, এই জন্য প্রভু নিজ প্রিয়গণকে অন্যত্র দীক্ষা নিতে নিষেধ করেন।

বাকচরবাসী সর্বসাধারণের খাতায় প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত মূল লিপিতে দেখেছি,

"গোস্বামী দীক্ষা, "গোস্বামী ধর্মপালন" "অগোস্বামী গুরু, চির-ত্যাগ" "প্রভাতি টহল, নিত্যকীর্ত্তন, পদস্মৃতি, ধৈর্য, দীক্ষা ইতি শিক্ষা।" ইত্যাদি। এই সমস্ত গুরুবন্ধুবাণী সার্বজনীন ও সর্বজন গ্রাহ্য। তবে 'গোস্বামী' অর্থে, গো (ইন্দ্রিয়গণের) + স্বামী (শাসক, নিয়ন্তা) অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, কামজয়ী, কৃষ্ণগৌরবন্ধু তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবকে বুঝতে হবে। বংশপরম্পরায় গোস্বামী বা বৈষ্ণব মন্ত্র দানে অধিকারী নহেন, গুণ-কর্ম-লক্ষণে অধিকারী গোস্বামী ভক্ত-বৈষ্ণব গুরুপদ বাচ্য।

প্রভুবন্ধু লিখিতভাবে ফরিদপুরে শ্রীরমেশ, সুরেশ, কালী, তারক, দেবেন, উপেন, অক্ষয়, বিধু, বিনোদ, নকুল, সুরেন, প্রবোধ, ললিত ও লোকনাথ—এই ভক্তগণকে শিষ্য ও বাবুগণ আখ্যা দেন। এই বাবু শিষ্যগণের পরিচালক ছিলেন রমেশবাবু। ঐ সময়ে একবার রমেশবাবুর অভিভাবকগণ রমেশবাবুকে তাঁর চির ইষ্ট গুরুবন্ধু হতে বিচ্ছিন্ন করে কোনো তান্ত্রিক যোগীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেন। প্রভু তখন নিজ প্রিয় বাবুগণকে সতর্ক করে আদেশ দিয়ে লিখেন,

"শ্রীশ্রীবাবুগণ! তোমরা হরিনাম ভিন্ন কোনও ব্রত বা নিয়ম করিও না। তোমরা কেহও দীক্ষা লইও না, দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র। মহাকৈতব।"

জগদ্গুরু প্রভুবন্ধুর স্বীকৃত শিষ্যগণকে দ্বিতীয়বার দীক্ষাদানের চেষ্টাটাই মহাকৈতব, দীক্ষা নেওয়াটাও মহাকৈতব। প্রভুর বাণী, 'একবার বই দীক্ষা হয় না।' 'একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় না।' প্রভুর এই ভাগ্যবান্ প্রিয়গণের 'লক্ষ জগদ্বন্ধু।' 'এক লক্ষ সতীর পতির মত।'

আর একটি বন্ধুবাণী আছে চম্পটী ঠাকুরের প্রতি। উহা ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বন্ধুবার্ত্তা প্রথম সংস্করণে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। জীবধর্ম আমি ঐ বাণী সংগ্রহ করে প্রকাশ করি। সংগ্রহকালে ঘটনা শুনেছিলাম যে, একসময় দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি চম্পটী মহাশয়ের শিষ্য হ'তে ইচ্ছা করেছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তখন শিষ্য করতে নিষেধ করে চম্পটী ঠাকুরকে বলেন,

"গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি পৃথিবীতে যত পাপ আছে, সব চেয়ে বেশী পাপ গুরুগিরিতে।"

প্রভুর সন্নিধানে থেকে, প্রভু মৌনী হওয়ার পূর্বে, প্রভুর আদেশ ছাড়া কাহাকেও দীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। তাই চম্পটী ঠাকুরের মত যোগ্য ব্যক্তিকেও প্রভু দীক্ষা দিতে নিষেধ করেন। প্রভু মৌনী হওয়ার পর এবং প্রভুর ত্রয়োদশ দশায় স্থিতিকালে, যে সকল আদর্শ চরিত্র বন্ধু হরিতত্ত্বজ্ঞ বন্ধুভক্ত জনসাধারণকে বন্ধুভজনে উন্মুখী

করিয়াছেন, বন্ধু মহানাম মন্ত্র দান করিয়াছেন, তাঁহারা গুরুর গুরু-দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। প্রভুবন্ধুকে দেখাইয়া দেওয়া, তৎপদং দর্শিতং যেন, গুরুর কার্য। চম্পটী মহাশয়কেও পরবর্ত্তী কালে অনেকে গুরু বলে গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি গুরুগিরি ব্যবসায় করেন নাই। তিনি সদ্‌গুরুর লক্ষণ যুক্ত ভক্তরাজ বলিয়াই গুরুর মর্যাদা পাইয়াছেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে একদিন পরমদয়াল মহামৌনী প্রভুবন্ধুর কৃপা-আকর্ষণে তাঁহার অপ্রাকৃত দিব্য স্পর্শন প্রাপ্তিতে আমার অন্তরে ও মুখে জগবন্ধু-মহানামমন্ত্র স্বতঃস্ফুরিত হয়। আমি অন্যত্র দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন মনে করি নাই। বন্ধুহরি অযাচিত কৃপায় ক্রমে সাক্ষাদ্‌ভাবে আমাকে তাঁহার দর্শন-স্পর্শন ও সেবার অধিকার দিয়া নিত্যকিঙ্কর রূপে গ্রহণ করেন। প্রভুর মৌনভঙ্গের পর একদিন শিশু প্রভুর কাছে, আমাকে তাঁহার নিত্যদাস করে তাঁহার চরণে চির আশ্রয় দিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রথমে মস্তক নাড়িয়া সম্মতি দেন, পরে শ্রীমুখে 'তা বলেছি' বলে আমাকে তাঁহার 'নিত্যদাস' বলে স্বীকার করেন। তাই বন্ধু হরিই একাধারে আমার গুরু, ইষ্ট, উপাস্য ও সর্বস্ব। সুতরাং আমি গুরু ও দীক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করি। 'গুরু-অভিপ্রেত কার্যকেই গুরুদীক্ষা বা গুরু প্রণালী বলা যায়।'

রমেশ শর্মাজী, মহেন্দ্রজী, কৃষ্ণদাসজী, জয় নিতাই দেব, অতুল ঠাকুরজী, বাদল বিশ্বাসজী, নবদ্বীপ দাসজী, রঘুগোঁসাইজী, যোগেন্দ্র কবিরাজজী, প্রমুখ প্রভুর প্রিয়সেবক বান্ধবগণ বন্ধুভজন নিষ্ঠাদানে

বন্ধুমহানাম নিষ্ঠাদানে ও বন্ধুসেবা নিষ্ঠাদানে আমার পথ প্রদর্শক গুরু-স্থানীয় আদর্শ শিক্ষাগুরু ও চিরপ্রণম্য।

এখানে দীক্ষা, শিষ্য আদি সম্পর্কে বন্ধুবাণীর 'কৃতি, অকৃতি' বিষয়ে আরও আলোচনা করিতেছি।

"অকৃতি—দীক্ষা, বাক্য, বাদ্য, শিষ্য, উপদেশ, তর্ক, আমোদ, যোষিৎ, লাম্পট্য।"

"কৃতি—ভ্রমণ, স্নান, দয়া, মৌন, কারুণ্য, জাগরণ, অদীক্ষা, ব্রজেবাস, সত্য।" (এই বাণীদ্বয় ভক্তবিশেষকে লিখিত)।

"ত্রিকালের অষ্টবৌদ্ধ—চোর, ডাকাত, লম্পট, মিথ্যাবাদী, বেশ্যা, যাজক, গুরু, বৈরাগী।

"ত্রিকালের অষ্ট দণ্ডার্হ—গোঁসাই, ব্রাহ্মণ, চামার, ইন্দুর, মশা, মাছি, কীট, সর্প।" (ত্রিকালগ্রন্থ)

আপাতবিরোধী এই বন্ধুবাণীগুলি বিচারপূর্ব্বক গ্রহণীয়।

কৃতি-অকৃতি মধ্যে অদীক্ষা-দীক্ষা শব্দ এবং বৌদ্ধ ও দণ্ডার্হ পর্য্যায়ে গুরু, গোঁসাই শব্দ কোন বিশেষ সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। সংকীর্ত্তনাদিতে "বন্ধু বলে কেঁদে, গুরুপদে রাখ রতি অনুক্ষণ" ইত্যাদি বন্ধুবাণীতে গুরুবাদ ও গুরুকরণ স্বীকৃত হইয়াছে। গুরু স্বীকার করিলে, দীক্ষা ও শিষ্য মানিতে হয়। বন্ধু বলিয়াছেন, "গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরুদীক্ষা বা গুরুপ্রণালী বলা যায়।" শিষ্যকে গুরুঅভিপ্রেত কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং দীক্ষা স্বতঃসিদ্ধ।

গোঁসাই মাত্র দণ্ডার্হ হইলে, প্রভুর সংকীর্ত্তনে উল্লিখিত "চৈতন্য গোঁসাই" "সীতাপতি অদ্বৈত গোঁসাই" ও দণ্ডার্হ হন। শিষ্য অকৃতি, নিন্দার্হ হইলে, প্রভুর লিখিত "হরেকৃষ্ণ দাস, শিষ্য" এই বাণী অকৃতি হন।

দেশ, কাল, পাত্র, অধিকার ও প্রয়োজন বুঝিয়া, প্রভু কোনও ভক্তকে "অকৃতি. উপদেশ" লিখিয়াছেন, আবার রমেশ-চন্দ্রের ন্যায় ভক্তকে "নিত্য সবকে উপদেশ দিও," এই 'কৃতি' আদেশ দিয়া তাহাকে উপদেষ্টার অধিকার দিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন প্রভু ছয় গোস্বামীর প্রতি লক্ষ্য করে গোস্বামী শব্দ এবং সাধারণ গুরুগিরি-ব্যবসায়ী গোস্বামী সন্তানদের উদ্দেশ্যে গোঁসাই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। একথা ঠিক নহে। শ্রীশ্রীপ্রভু কামজিৎ জিতেন্দ্রিয় রূপ রঘুনাথকেও গোঁসাই বলিয়াছেন, "এস রূপ রঘুনাথ আদি সকল গোঁসাই" এইপদ প্রভুর সংকীর্ত্তনে আছে।

সুতরাং বুঝিতে হইবে সকল গোঁসাই দণ্ডার্হ নয়, সকল গুরুই নাস্তিক নয়, সকল দীক্ষাই অকৃতি নয়, সকল অদীক্ষাই কৃতি নয়। দীক্ষামাত্র অকৃতি হইলে গদাধর পণ্ডিতের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মহাপ্রভুর আদেশে দীক্ষাগ্রহণকার্য্যও অকৃতি হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অদীক্ষামাত্র কৃতি হইলে, সংসারে অদীক্ষিত অসংস্কৃত সৎ বা অসৎ যে কোটী কোটী জীব আছে, তাহারা সকলেই কৃতিমান্ হইয়া উঠে। অকৃতি পর্য্যায়ে বাদ্য ও উপদেশ আছে। সকল বাদ্য ও উপদেশ অকৃতি হইলে

খোল-করতাল বাদ্য অচল হয় এবং "জ্ঞানদান" "বাদ্য অভ্যাস রাখিও" এই সকল প্রভুর উপদেশ প্রচার করাও অকৃতি হইয়া পড়ে। উপদেশ দিও না, এ উপদেশ দেওয়াও সম্ভব হয় না। "অকৃতি উপদেশ" একথা লিখিয়া দেওয়াও "অকৃতি" হয়। অতএব ঐ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এখন দেখা গেল, প্রভু একজনের পক্ষে যাহা "কৃতি" বলিয়াছেন, অন্যের পক্ষে তাহা অকৃতি হইয়াছে। ত্রিকাল গ্রন্থের "হাফফেরোয়ারীকে শিষ্য কহে," "দীপান্তরদিগকে গুরু কহে" এই বাণী দুর্ব্বোধ্য, নিন্দাত্মক কিংবা প্রশংসাত্মক, বুঝা যায় না।

সাধ্যসাধন তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়া যাহারা গুরুতাকে জীবিকার্জ্জনের উপায়-স্বরূপমাত্র করিয়া ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন, সেই সকল তথাকথিত গুরুগোঁসাইকে প্রভু ত্রিকালগ্রন্থে দণ্ডার্হ লিখিয়াছেন। ঐ সকল অযোগ্য, অক্ষম অসৎ-পথগামী গুরুদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ অকৃতি ও দীক্ষা না লওয়াই কৃতি লিখিয়াছেন। যাহারা না বুঝিয়া ঐ সব গুরুর দিকে অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদিগকে ঐরূপ, কৃতি-অকৃতি, লিখিয়া দিয়া নিষেধ করিতেন। কটু ঘৃত বিষতুল্য, এইরূপ উক্তিতে যেমন 'ঘৃত আয়ুবর্দ্ধনশীল' এই সত্যের বিরোধিতা হয় না, তদ্রূপ উক্ত বাণীসকল দ্বারা দীক্ষার নিষেধ প্রতিপন্ন হয় না।

গুরুবন্ধুর সমাদরপ্রাপ্ত যে সকল শাস্ত্র ও আচার্য্য দীক্ষা-সম্বন্ধে শতশত আদেশ বাক্য দিয়াছেন, তাহারাও অবৈষ্ণব গুরু

ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-গুরু হইতে মন্ত্রগ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥

(নারদ পঞ্চরাত্র)

অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রগ্রহণে নিরয়গামী হতে হয়। ঐরূপ কেহ করলে তাকে পুনরায় বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হইবে।

ভক্তিসন্দর্ভে বন্ধুর সহায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উৎপথগামী গুরু-ত্যাগেরও বিধি দিয়াছেন—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

কুকর্ম্মলিপ্ত, কার্য্যাকার্য্য-সম্বন্ধে অজ্ঞ, উৎপথগামী গুরু পরিত্যাগ করিবে। প্রভুবন্ধুও "অগোস্বামী গুরু"কে চিরত্যাগ করিতে লিখিয়াছেন।

বামন-হরিকে ভূমিদানে শুক্রাচার্য্য বাধা দিলেন। বলি মহারাজ গুরুর সেই আজ্ঞা শুনেন নাই। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল এইরূপ গুরু, পিতা, মাতা, অগ্রজ ভ্রাতা, পণ্ডিতাদি-গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, প্রহ্লাদ, ভরত, বিভীষণ, নাগপত্নী আদির কথা শাস্ত্রে বিরল নহে। উপর্য্যুক্ত স্থলে যে সকল তাৎপর্যে শাস্ত্রকারগণ দীক্ষা ত্যাগ ও গুরুত্যাগের কথা বলিয়াছেন, ঠিক সেই অর্থেই বন্ধুসুন্দর দীক্ষার অকৃতিত্ব, গুরুর নিন্দনীয়ত্ব বলিয়াছেন।

কারণ শ্রীশ্রীপ্রভু বলেছেন—"আমি কিছু অশাস্ত্রীয় বলি না, বা লিখি না।" নানাস্থানে প্রভু লিখিয়াছেন—

"বেদ-বিধিমতে সব করিও পালন।"

"পুরাণ-বেদান্ত-বেদ-সাংখ্যের প্রমাণ।"

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে।"

"দশমস্কন্ধ ভাগবত মুখস্থ করিও।"

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মুখস্থ করিও।"

"প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মুখস্থ কৃত্তি।"

"নিত্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিবে।"

সুতরাং নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, প্রভুর সকল শিক্ষা ও আচরণ শাস্ত্রানুমোদিত।

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ॥"—গীতা

'গুরু, দীক্ষা, গুরুগণ-নির্দ্দেশে' পঞ্চাশটির অধিক বন্ধুবাণী দেওয়া হইয়াছে, গুরুবাদের সমর্থক। নিম্নে এই মর্ম্মে বন্ধুহরির নিত্যহার্দ্দি শাস্ত্রবাণী দেওয়া যাইতেছে। শাস্ত্রবাণী এই মর্ম্মে অগণিত। দু'একটি দিগ্‌দর্শনমাত্র করিতেছি।

গুরুবাদ সমর্থক শাস্ত্রবাক্য

১। শ্রীশ্রীপ্রভুর অনুমোদিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থপঞ্চকের অন্যতম, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রথম পংক্তিতেই আছে—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

গ্রন্থ প্রারম্ভেই গুরুবর্গের বন্দনা।

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে গুরুবাদ ও দীক্ষা সম্বন্ধে অগণিত আদেশবাক্য ও নির্দ্দেশবাক্য আছে। নিম্নে কয়েকটি দেওয়া গেল,—

"সর্ব্বাবরণে লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ।" মধ্য।২৪

"গুরু পদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন" মধ্য।২২

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।"

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে
"গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" আদি।১ম

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ অন্ত্য।৪র্থ

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" মধ্য।৮

"গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ" মধ্য। ১৯

"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তা সভার চরণে আগে করিয়ে বন্দন॥" আদি।১ম

৩। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-গ্রন্থখানিকে মুখস্থ করতে শ্রীশ্রীপ্রভু পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। সেই শ্রীগ্রন্থের প্রথম পঙ্ক্তি—

"শ্রীগুরু-চরণ পদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দ মুই সাবধান মনে।"

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থের বহু শ্লোক গুরু শ্রীলোকনাথের বন্দনা ও গুণকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ।

কায়স্থকুলোদ্ভব হইয়াও স্বীয় গুণে নরোত্তম, ভুবনপাবন সদ্‌গুরু ও বিপ্রগণেরও ঠাকুর হইয়াছেন। প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে প্রভু সম্বোধনে লিখিয়াছেন,—"এস এস প্রভু মম, রামচন্দ্র নরোত্তম।" ঐ প্রকার দাস রঘুনাথও গোঁসাই, গুরু হইয়াছেন।

৪। শ্রীমদ্ভাগবতে গুরুতত্ত্বের পোষাক বহু মহাবাক্য আছে। কয়েকটি মাত্র লিখিত হইল।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"

"সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"

"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্"

৫। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" গীতা ২।৭

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" ৪।৩৫

বন্ধুবাণী—"গুরু গতি, কৃষ্ণ পতি" "ধর্ম্ম···গুরু"।

প্রভুর বাণী ও শাস্ত্রের বাণী দেখান হইল। এখন পূর্ব পূর্বলীলার আচরণ দেখান যাইতেছে,—

পূর্ব্বলীলায় আচরণ

১। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠকে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সান্দীপনি মুনিকে, শ্রীগৌরচন্দ্র ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীকে গুরু স্বীকার করিয়াছেন।

"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" "স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দাক্ষিণাত্যের শ্রীলক্ষ্মীপতি গোঁসাইজীর নিকট মতান্তরে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষিত। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীগদাধর, গৃহাশ্রমী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মহাপ্রভুর অনুমোদনে দীক্ষিত।

২। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দীক্ষা দিয়াছেন। প্রমাণ, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে দ্বিতীয় মালায় লিখিত আছে :—

"ভট্ট গোসাঞি মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র।
প্রীত হইয়া দিলা হরিনাম মহামন্ত্র॥
প্রভু তারে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিল।
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিল॥"

শ্রীশ্রীপ্রভুর লিখিত শ্রীহরিকথায় আছে,

"শ্রীগোপাল মন্ত্রদীক্ষা, হরেকৃষ্ণ-নাম শিক্ষা,
তিলক তুলসী মালা ভেক্।
(প্রভু গুরু হ'ল মা) (শিক্ষা-দীক্ষা-ভেক্-দানে)"

৩। পরম কৃষ্ণপ্রিয়া চন্দ্রাবলী নিজে কৃষ্ণের সেবা ও কৃষ্ণনাম করিতেন; তথাপি শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী স্বয়ং শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণকে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র দীক্ষা দিয়াছেন অকৈতব

কৃষ্ণসেবাদানের জন্য। প্রমাণ শ্রীহরিকথায়—

"কৃষ্ণনাম মন্ত্র আজি লও সখীগণ।
চরমে তোদের গুরু হ'লাম এখন॥

৪। শ্রীরাধা অন্যান্য সখীগণকে, 'গুরু কৃষ্ণ' বর্ত্তমান থাকিতেও ললিতাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন—

"গুরু হেন যেন ললিতায়।"

৫। দশম দশায় কেবল চন্দ্রাবলীর নহে, অন্যান্য সখীদেরও গুরুকরণ হইয়াছিল। প্রমাণ হরিকথায়—

"সব মনে আছে রে, দশমীর গুরুকরণ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি বাণী, দীক্ষাদির অপ্রয়োজনীয়তার জ্ঞাপক বলে মূলপ্রসঙ্গে অনভিজ্ঞের নিকট মনে হয়। বাণীটি এই—

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥ মধ্য ১৫শ

ইহা নামের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে সত্যরাজ খানের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি। হরিনামের এত শক্তি যে, দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা ছাড়াও নাম আচণ্ডালকে উদ্ধার করিতে পারে, ইহাই বুঝান হইয়াছে। এইবাক্য দ্বারা,—অতএব কেহ দীক্ষা লইও না, এই অর্থ প্রতিপন্ন হয় না।

বাকচরের কোন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুবন্ধু একদিন বলিয়াছিলেন, "শূয়োর খেলেও কোলে তুলে নেবো, কিন্তু হরিনাম ভুলিস্ না " এইবাক্যে শূয়োর খাইবার উপদেশ বুঝায় না। কেন না ইহা বিধি-বাক্য নহে। হরিনামের প্রতি প্রভুর ভালবাসা, ইহাই বুঝাইবার জন্য ঐ কথা। শূয়োর খাইলেও কোলে লইবেন, এইজন্য যেমন শূয়োর খাইতে হইবে না, ঠিক তদ্রূপ নাম, দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা করে না বলিয়াই যে দীক্ষা লইতে হইবে না, এমন নহে। কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী স্বয়ং দীক্ষিত এবং গুরুকরণ বা দীক্ষার অগ্রগণ্য নিত্য প্রয়োজন, "গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন" ইত্যাদি বাণীতে, নিজগ্রন্থে বহুস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

"একমাত্র কৃষ্ণনাম সর্বপাপ হরে," কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, "সাধুকৃপা না হইলে প্রেম না জন্মায়" (চৈঃ চঃ)। আর বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে,

> "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
> তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ, আদি, ৮ম)
> তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
> কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর।" আদি। ৮ম

প্রভুবন্ধুও জীবশিক্ষার্থে সদৈন্যে লিখিয়াছেন—"ভাগ্যে হ'ল না, হ'ল না, গুরু-অপরাধী আমি, বৈষ্ণব-অপরাধী আমি।"

যেহেতু প্রভুর আদেশ, "নাম মাহাত্ম্য শাস্ত্রাতীত ও গুরুমুখ-শ্রোতব্য, লেখনীর অসাধ্য" তখন সাধুগুরুর নিকট শ্রুত নাম

মাহাত্ম্য দীক্ষিত ভক্তিমান্ জনের হৃদয়ে যথাযথ উপলব্ধি হইবে এবং তাহার সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া অধিকন্তু কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। কিন্তু সাধুগুরুর কৃপাশূন্য, গুরুহীন অদীক্ষিত-জন ঐ প্রেম-সম্পদে বঞ্চিত। লক্ষণযুক্ত সাধুগুরুর কৃপাপ্রাপ্তি বা আনুগত্যও একপ্রকার দীক্ষা।

"কীর্ত্তন ভিন্ন, অন্য কোন ব্রত বা নিয়ম করিও না"—প্রভুর এই বাক্য দ্বারাও দীক্ষার নিষেধ বুঝায় না। কেন না, উক্ত ব্রত-নিয়ম শব্দে সকল প্রকার ব্রত নিয়ম বুঝাইবে না। তাহা বুঝাইলে একাদশীর ব্রত-ত্যাগের প্রসঙ্গ হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যপালনও একটি নিয়ম। ঐ সকল নিয়ম সম্বন্ধে প্রভুবন্ধু অন্যত্র বলিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্য কর, করাও," 'নিয়ম নিষ্ঠা নাই, আমিও নাই।" অতএব ঐ বাণীতে হরিভজন-বর্জ্জিত শুষ্কব্রত-নিয়মাদির নিষেধই বুঝাইবে। হরিভজনানুকূল নিয়ম বা দীক্ষার নিষেধ বুঝাইবে না।

শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণী, শাস্ত্রের বাণী ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলার আচরণের কথা বলা হইয়াছে। তখন শ্রীশ্রীপ্রভুর আচরণের কথা বলা হইতেছে,—

দীক্ষা ও শ্রীশ্রীপ্রভুর আচরণ

১। শ্রীশ্রীপ্রভুলীলায় ব্রাহ্মণকুমার। যথারীতি যজ্ঞোপবীত ও সাবিত্রী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়নের পর তিনি নিয়মিত সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন।

গোস্বামিশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াই প্রভুর হরিকথা আদি লিখিত হইয়াছে।

২। "প্রভু, আপনার গুরু কে?" রঘুনন্দন গোস্বামী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু বলিয়াছিলেন—"তোদের শ্রীমতী আমাকে স্বপ্নে মন্ত্র দিয়াছেন।"

৩। প্রভুর কৃপা পাইবার পূর্ব্বে মহিমদাসজী কুলগুরুর নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী বন্ধু জানিতেন, ঐ মন্ত্রে ভুল আছে। তিনি উহা মহিমকে গুরুর নিকট হইতে শুদ্ধ করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহিম অমনোযোগী হওয়ায় ও তাঁহার গুরুদেব অতঃপর দেহরক্ষা করায়, প্রভু প্রথমে স্বপ্নযোগে শুদ্ধমন্ত্র বলিয়া দিয়া পরে কাগজে মন্ত্রটি শুদ্ধ করিয়া লিখিয়া দেন। দীক্ষামন্ত্রের প্রয়োজন না থাকিলে, শুদ্ধমন্ত্র লিখিয়া দিতে প্রভু এত ব্যগ্র হইলেন কেন এবং দীক্ষামন্ত্র জপ করিতে আদেশ দিলেন কেন? মহিমদাসজীর মুখেই ইহা শুনিয়াছি।

৪। শ্রীশ্রীপ্রভু কাহাকেও কর্ণে মন্ত্র দিয়া দীক্ষা না দিলেও অনেককে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র, গোপাল মন্ত্র, কামগায়ত্রী, রাধাগায়ত্রী, গৌরমন্ত্র, গৌরগায়ত্রী, গুরুগায়ত্রী, হরেকৃষ্ণ নাম, গুরুপ্রণাম মন্ত্র, ভজন-প্রণালী ইত্যাদি নিজ শ্রীহস্তে খাতায় লিখিয়া শুনাইয়াছেন। খাতার উপর শ্রীহস্তে "গুরু জগদ্বন্ধু, শিষ্য কৃষ্ণ-চৈতন্যদাস" ইত্যাদি রূপ লিখিয়াছেন, এইরূপ বহু খাতা দেখিয়াছি।

শিতিকণ্ঠ গোস্বামী, রামদাস বাবাজী, নবদ্বীপ দাসজী, মহিম দাসজী প্রভৃতি ভক্তকেও লিখে দিয়াছেন।

৫। ঐ সকল মন্ত্রের খাতা যখন যাকে দিয়াছেন, তখনই তৎপূর্ব্বে কোন লীলার ঘটনা আছে। প্রায় প্রত্যেক স্থলেই কতগুলি ঘটনা-পরম্পরার পর ঐরূপ লিখিয়াছেন। নবদ্বীপ দাস মহাশয়কে যে মন্ত্রের খাতা দেন, তৎসংক্রান্ত লীলাকাহিনী লিখিত হইল।

৬। বাকচরে প্রভুর সেবায় থাকাকালীন এক সময় নবদ্বীপ দাস মহাশয়ের প্রাণে মন্ত্র গ্রহণ করবার সাধ জাগে। প্রভুকে অন্তরের কথা জানাইলে তিনি মালায় হরিনাম করবার উপদেশ দেন। ভক্ত আদেশ শিরোধারণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইল না। এই ব্যাপার নিয়ে প্রভু ও ভক্তের মধ্যে মান-অভিমানের খেলা আরম্ভ হয়। শেষ পর্য্যন্ত নবদ্বীপ সেবা ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। প্রভু ভক্তের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। নবদ্বীপ কুমারখালি গিয়াছেন শুনিয়া প্রভু সেখানে পর পর তিনখানি পত্র দেন। ঐ পত্র যথাকালে ভক্তের হস্তগত হয় না। নবদ্বীপ কুমারখালি হইয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন এবং প্রাণের বেদনা-আর্ত্তি জানাইয়া প্রভুবন্ধুর পাদপদ্মে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের উত্তরে প্রভু লিখিলেন,—

"শ্রীমতী ভরসা।"

শ্রীহরেকৃষ্ণ !!

রাত্রে কারুণ্যলিপি পাইলাম। জগদ্বন্ধু। কুমারখালী তিন পত্র দিয়াছি। পাও নাই। বাকচরের সব ঘটনা "দীক্ষার অভিমান" করিয়াছিলাম। পাশরিলাম। নিশ্চিন্ত হও; ধরায় সবই মোর চির গ্রহণীয় বটে।..." পত্র পাইয়া নবদ্বীপ দাসজীর মনে আনন্দ হইল। প্রভুর, অভিমান গিয়াছে ও নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন, ইহাতে ভক্তের প্রাণে পরম উল্লাস। অতঃপর শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতা আসেন। কলিকাতা আসিয়া কুমারটুলী বনমালী সরকারের ষ্ট্রীটে গঙ্গার ধারে ফটিক মজুমদারের বাসায় অবস্থান করেন। নবদ্বীপ সঙ্গে আছেন। প্রভু তেতালায় গঙ্গার দিকের কোঠায় থাকেন, জানালা দিয়া গঙ্গাদর্শন করেন। জানালা দিয়া গঙ্গার হাওয়া আসে, তাহাতে প্রভু পরম আনন্দ লাভ করেন। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গায় স্নান করেন। নবদ্বীপ ছায়ার মত পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্র নিয়ে অনুগমন করেন। স্নানান্তে ভিজা কাপড় কেচে, নিজে স্নান করে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসেন। বাকচরে থাকাকালীন অন্তরে যে বাসনা জাগিয়াছিল, তাহা মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠে। আবার প্রভু নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন, মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

একদিন নবদ্বীপ স্নান করিয়া অসিয়া মালা নিয়া বসিতে যাইতেছেন, এমন সময় প্রভু, "বরেগী, এদিক আয়" বলে কাছে ডাকিলেন; মধুর ডাকে মুগ্ধ হয়ে ভক্তবর প্রভুর ঘরের দরজার নিকটে গেলেন। প্রভু একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন। নবদ্বীপকে দরজার নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভক্ত বসা

মাত্র তাহার কাছে একখানি সুন্দর খাতা রাখিয়া প্রভু বলিলেন, "এই নে, সব মন্ত্র দিলাম।"

নবদ্বীপ খাতাখানি মস্তকে স্পর্শ করিয়া খুলিয়া দেখিলেন, স্পষ্ট বড় অক্ষরে বহু মন্ত্র লিখিত আছে ও সাধন-ভজনের পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ইহাতে নবদ্বীপের মন সন্তুষ্ট হইল না। আবদারের সুরে বলিলেন, 'ছাপান বইয়ে কত মন্ত্র আছে, কানে না দিলে কি হয়?' একথা শুনিয়া করুণাময় প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও! কানে দিতে হবে বুঝি! আয়, তবে কাছে।" নবদ্বীপ সভয়ে একটুখানি আগাইয়া তক্তপোষে গা ঠেকাইয়া নীচুতে বসিলেন। প্রভু খাটের উপর হইতেই শ্রীহস্ত-লিখিত খাতা খুলিয়া দুইটি মন্ত্র ধীরে ধীরে অতি সুন্দর শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিলেন। একটু পরে "বলিলেন, "হ'ল তো?" আর কিছুক্ষণ পরে তন্মধ্যে একটি মন্ত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এই মন্ত্র মহাপ্রভু গৌরসুন্দর গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই কথা বলিবার সময় প্রভুর বদনমণ্ডল উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

৭। মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বে প্রভু তাঁহার ভক্ত গৌরকিশোর সাহা মহাশয়কে নিজ হাস্তে একদিন কণ্ঠীমালা দিয়াছিলেন। ভাগ্যবান্ গৌরকিশোর, সাহা-লোককে ব্যবসায়াদি কার্য্যে মিথ্যা কথা বলিতে হয় বলিয়া প্রথমে কণ্ঠীমালা পরিতেই আপত্তি করেন। তখন ব্যবসায়ের বিশেষ প্রয়োজনে দু'চারটি মিথ্যা কথা বলার যে পাপ, তাহার দায়ভার প্রভু গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন।

ইহার পর গৌরকিশোর তুলসী কণ্ঠীমালা লইতে আর একটি আপত্তি তুলেন,—বউ ছেলে পেলে নিয়ে সংসার করতে হয়, আমিষ না খেয়ে থাকতে পারা যায় না।

প্রভু তখন তাহাকে আমিষ খাইতে অনুমতি দেন। কিন্তু রবিবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী, জন্মাষ্টমী, সীতানবমী, শিবচতুর্দ্দশী, গৌরপূর্ণিমা ইত্যাদি তিথি ও বিশেষ পর্ব্বে মৎস্য খাইতে নিষেধ করেন। আর তাহাকে মৎস্য শিকার করিতে ও জীবন্ত অবস্থায় মাছ কিনিয়া খাইতে নিষেধ করেন। খাইতে হইলে টাটকা মরা মাছ কিনিয়া খাইতে বলেন।

সরল ভক্ত তখন প্রভুকে বলেন,—প্রভু, মালা দিলেন, আপনি আমার গুরু হলেন; এখন কি নাম জপ করব? প্রভু তখন নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া বলেন, "জয় জগদ্বন্ধু নাম জপ করিস্।" কোন্ মূর্ত্তি ধ্যান করিব, ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু মধুর ভঙ্গীতে অঙ্গুলি দ্বারা নিজেকে দেখাইয়া "এই রূপ চিন্তা করিও" বলিয়া তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল দিব্য গৌরবন্ধু-রূপের ধ্যান-চিন্তা করিতে অনুমতি দান করেন। সাহাজীর মুখে শুনিয়া এই ঘটনা লিখিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করিতেছি যে, প্রভুবন্ধু সময়ে নিজের শ্রীমূর্ত্তির পূজা নিজেই করিয়াছেন। বন্ধুপ্রিয় রামদাসজী উহা লক্ষ্য ও বর্ণনা করিয়াছেন।

৮। প্রাচীন বন্ধুভক্ত লোকনাথ সরকার মহাশয় আমাকে

বলিয়াছেন—প্রভু দীক্ষাদি পাত্রভেদে কাহাকেও বা লইতে নিষেধ করিয়াছেন, কাহাকেও বা করেন নাই। তিনি জগতের বন্ধু; যাহার যাহার ভাব অবস্থা বুঝিয়া উপদেশ দিতেন।

লোকনাথ প্রভুর মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বে রমেশচন্দ্রের বিশেষ প্রীতি-স্নেহ এবং সাক্ষাৎ প্রভুর দর্শন ও আদেশ-উপদেশাদি প্রাপ্ত হন। তৎকালে যোগ-শিক্ষায় আগ্রহ হওয়ায়, তিনি সাধু হরানন্দজীর কাছে দীক্ষা লন, কিন্তু প্রভুর আদেশ-উপদেশাদি-পালন, প্রভুস্মরণ, আনুগত্য, হরিনাম ইত্যাদি কিছুই ত্যাগ করেন নাই। অশীতি, নবতি বৎসর বয়সেও তিনি প্রভুর পূজা করিতেন ও প্রভুর নাম করিতেন। তাঁহাকে প্রভু দীক্ষা লইতে নিষেধ করেন নাই। এক সময় লোকনাথ রমেশচন্দ্রের সহিত ঢাকায় এক মেসে থাকিতেন, ভক্ত কলেজে গেলে ছাত্রদের অনুপস্থিতিতে প্রেমময় প্রভু অবসর মত তথায় যাইয়া প্রিয় ভক্তের কক্ষ, পবিত্র শয্যাদি দেখিয়া রমেশ-চন্দ্রের কাছে ভক্তের প্রশংসা ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন—

লোকনাথ, ভূষণ্ডী, ত্রিকালের কথা সব জানে। Accountant (অ্যাকাউন্‌ট্যান্ট) পূর্ণবাবু ও হরানন্দ স্বামী তাহার কাজের সহায় হ'বে। তাহাদের সহায়তায় আমাকে পাইবে। আমাকে পাইতে অন্য সহায়ের দরকার নাই।" এই বাণী রমেশচন্দ্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভক্তের দীক্ষাগুরু হরানন্দজীকে প্রভু উপদেশসূচক কয়েক-খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। একবার ঢাকাতে লোকনাথ কঠিন রোগে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলে লোকের অদৃশ্য দিব্যরূপে প্রভু আসিয়া

তাহাকে কোলে তুলিয়া নিয়া বলেন,—"ভয় নাই, আমি আছি।" ইহার পর লোকনাথ বিস্ময়জনকভাবে রোগমুক্ত হন।

কিছুদিন পর হরানন্দজী এই ঘটনা শুনিয়া লোকনাথকে আনন্দাতিশয্যে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলেন,—প্রভুর কৃপা পাইয়াছ। যোগাদির আর কোন প্রয়োজন নাই। প্রভুর কৃপা পাওয়াই দীক্ষা-যোগাদির মূল লক্ষ্য। আরও কয়েকবার কঠিন ব্যাধিতে, প্রভু লোকের অদৃশ্য দিব্যদেহে লোকনাথকে দর্শন ও ব্যবস্থা দিয়া নিরাময় করেন।

৯। দেখা গিয়াছে, অন্যত্র দীক্ষিত মহিমদাস, শ্যামানন্দজী, পূর্ণদত্ত, পাগল হরনাথের শিষ্য অটলবিহারী নন্দী, স্বামী ভাস্করানন্দের শিষ্য সর্ব্বসুখ, শ্রীরাধারমণ চরণদাসজীর শিষ্য শ্যামদাসজী, জটিয়াবাবার শিষ্য বালকৃষ্ণ ব্রজবালা প্রভৃতি অনেক ভক্ত তাঁহাদের গুরুভক্তি-নিষ্ঠা যথাযথ বজায় রাখিয়া বিশ্বগুরু প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ প্রভুকে শ্রীগৌরাঙ্গ-জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রভুবন্ধুর উপদেশাদিও পাইয়াছেন।

১০। জটিয়া বাবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিজীর শিষ্য সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইয়া প্রভুবন্ধুর নিকট যখন যাতায়াত করিতেন তখন একদিন প্রভুর কাছে যাওয়াকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন—আমার গুরু সাক্ষাৎ শিবতুল্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রভু বন্ধুসুন্দরের কাছে যাইয়া অপরাধ করিতেছি না তো? তিনি অন্তর্য্যামী প্রভুর সন্নিধানে যাওয়ামাত্র প্রভু বলিলেন,—"বালকৃষ্ণ, আমার কাছে এলে

গুরু ত্যাগ করা হয় না। যে যেখানে যত গুরুপূজা করে, সে সমস্তই আমাকে গ্রহণ করিতে হয়।"

উক্ত বাণীসমূহ ও আচরণ হইতে গুরুবাদ, মন্ত্র ও দীক্ষা যে প্রভুর অভিপ্রেত, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। জগতে গুরুতত্ত্ব স্থাপন করিতেই প্রভুর আগমন।

তাহা না হইলে সেই ব্রজলীলাতেও যে চন্দ্রাবলীসখীর শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণনাম মন্ত্র দীক্ষা লইতে হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই গৌর-প্রেমের পরমগুরু নিতাইচাঁদের আবির্ভাব, এই অপ্রকাশিত রহস্য পাঁচ হাজার বৎসর পর প্রকাশ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? অন্য প্রয়োজন যাহাই থাকুক, একটি প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য যে, গুরু-আনুগত্য ও কৃষ্ণনাম-মন্ত্র দীক্ষা ছাড়া চন্দ্রাবলীর মত প্রিয় সখীরও "উদ্ধার" হইতে বাধা হইতেছিল, ইহা জগজ্জীবকে জানাইয়া দেওয়া। প্রভুর লিপি, "দশমীকারণ, চন্দ্রা উদ্ধার," দশম দশার গুরুকরণে শ্রীরাধাপদে আত্মদানেই চন্দ্রাবলীর "উদ্ধার" হয়। গুরু রাধার প্রেমের ঋণ শোধ দিতে যেমন শ্যামসুন্দর গৌর হন, তদ্রূপ গুরু শ্রীরাধার দক্ষিণা বা প্রেমের ঋণ শোধ করিতেই চন্দ্রাবলী নিতাইচাঁদ হন।

শ্রীশ্রীহরিকথায় "প্রকট রহস্য" শীর্ষক পদে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু জানাইলেন যে, মূল গুরুতত্ত্ব শ্রীহ্লাদিনী শক্তি। "রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট" (চরিতামৃত)। শ্রীশ্রীরাধাভাবময় বলিয়াই শ্রীশ্রীগৌরহরি জগদ্‌গুরু, ব্রজলীলা-গৌরলীলা-মিলিততনু বলিয়া এবং চন্দ্‌ ধাতু হ্লাদনার্থক গ্রহণে

চন্দ্রপুত্র পদের ব্যঞ্জনাতে বন্ধুসুন্দর হ্লাদিনীর ঘনীভূত মূর্ত্তি বলিয়া তিনি জগদ্‌গুরু। এই রহস্যই প্রভুবন্ধুকে শ্রীমতীর স্বপ্নে মন্ত্র দিবার কথার মধ্যে লুক্কায়িত। গুরুতত্ত্বের ইহাই নিগূঢ় রহস্য। এবার এই রহস্য জগজ্জীব অনুভব করিবে।

এই গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ সম্পর্কেই কোন প্রিয় ভক্তকে গুরুবন্ধু বলিয়াছিলেন—

"এবার গুরুতত্ত্ব প্রকাশ হ'বে,
ঘাটে ঘাটে যমুনা ব'বে,
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হ'বে।"

শ্রীগুরুর মাধ্যমেই শ্রীরাধার অনুগ্রহ-শক্তি অনুগত ভক্তের নিকট প্রবাহিত হয়। অতএব গুরুতত্ত্ব অপরিহার্য্য। এই অপরিহার্য্যত্ব কোন কোন পদে প্রভু জানাইয়া দিয়াছেন, ব্রজভজনের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাপন করিয়া। যেমন,

"বন্ধু অভিমত, হব অনুগত,
যুগল সেবার লাগি।"
"গুরুরূপা সখী বামে নেহারি নয়নে।
নিরবধি রহিব চরণ সেবনে॥"

শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাদিতেও ঐ ভজন-রহস্যের সন্ধান আছে। এই গুরুরূপা সখা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ নহেন। এই বৈষ্ণব আনুগত্যেই কৃষ্ণপতি ও তাঁহার সেবাপ্রাপ্তি ঘটে। প্রভু প্রিয় সেবক রমেশবাবুকে লিখেন, 'মন্ত্রদাতা

গুরুকে গোস্বামিগণ শ্যামের প্রকাশরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহ শ্যাম সম্বন্ধ।"

প্রভুবন্ধু স্বয়ং এখানে মন্ত্রদাতা গুরুকে গুরুকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন সদ্‌গুরু বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি গুরুরূপা সখী"।

হরিকথায় প্রভু লিখিয়াছেন—"গুরু গতি, কৃষ্ণ পতি," "শ্রীগুরুবিগ্রহ আগে, রহ পড়ে একভাগে।" আরও বন্ধুবাণী আছে, "দীক্ষামন্ত্র দ্বারা যে অর্চ্চনা, তাহা আমিই গ্রহণ করি।"

গুরুবাদের নিষেধাত্মকবাণী কয়েকটির স্থান, কারণ ও উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও একটি উত্তর এই যে, গুরুবাদের যে বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে, এমন পবিত্রতম বস্তুর যে অপপ্রয়োগ হইতেছে, তাহার উপর কটাক্ষ করিয়া, এমন কি আঘাত দিয়া প্রভুবন্ধু ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করিতেই হইবে, আবার তাহার গায়ে "বিপজ্জনক" কথাটিও লিখিয়া রাখিতে হইবে। শিষ্য গুরুকে চৈতন্যের "প্রকাশ"ই জানিবেন। গুরু নিজেকে "চৈতন্যের দাস-দাসানুদাস" জানিবেন, তাহা হইলেই বিপদের কবল হইতে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে।

যে সকল বন্ধুভক্ত নিজেদের প্রভুবন্ধুর দাস মনে করিয়া গুরুগিরির অভিমান শূন্য হইয়া বন্ধুহরি নামমন্ত্র দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আদর্শ কতিপয় বন্ধুভক্তের নাম ও দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিলাম :

প্রভুর অনুবর্ত্তিগণের দৃষ্টান্ত

১। প্রভুপাদ শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীজীকে প্রভু বন্ধুহরি সুলক্ষণ-যুক্ত দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া অল্পসংখ্যক শিষ্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনিও তাহা করিয়া গিয়াছেন। শশাঙ্ক বণিক্, ভগবতী দত্ত, জিতেন গুহ প্রমুখ তাঁহার অনুগত জনেরা শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুতে পরম ইষ্টবুদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহা সদ্গুরুর কৃপার ফল। রঘুনন্দন গোস্বামীজী এক সময় স্নেহবশতঃ এই জীবাধম লেখককে বন্ধু-লিখিত মন্ত্রের খাতা দেখাইয়া, ঐ মন্ত্র দ্বারা দীক্ষা দিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। 'সাক্ষাৎ মহামৌনী প্রভুর স্পর্শনে ও দর্শনে মহানাম—মহামন্ত্র পাইয়াছি'; আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আর পৃথক মন্ত্র দেন নাই। অনেকের গুরু হইয়াও গোস্বামীজীর গুরুগিরি ছিল না। এই গোস্বামী মহাশয়কে প্রভু "বৈষ্ণব" বলিয়াছেন। 'ভজ বৈষ্ণব চরণ', প্রভুর আদেশ।

২। শ্রীপাদ জয়নিতাইদেবকে প্রভু "সাধু" বলিয়াছেন। জয়নিতাই কতিপয় শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত ভক্তিসাগর কালীহর বসু মহাশয় গুরু-কৃপাতে প্রভুবন্ধুকে ইষ্টবুদ্ধি করিয়া তাঁহার গ্রন্থাদিতে প্রভুকে সাক্ষাৎ গৌর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহুদিন জয়নিতাইদেবের দুর্লভ স্নেহময় সঙ্গলাভের ও তাঁর মুখে বন্ধুবার্ত্তা শ্রবণের সৌভাগ্য এই জীবাধম লেখক পাইয়াছে।

৩। শ্রীযুত চম্পটী ঠাকুর ও শ্রীযুত নবদ্বীপ দাসজী, এই দুই জনের প্রতি শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী গুরুবুদ্ধিতে ভক্তিমান্ ছিলেন। চম্পটী ঠাকুরকে মহেন্দ্রজী গুরুবুদ্ধি ও তৎসহধর্ম্মিণী ক্ষীরদাদেবীকে মাতৃবুদ্ধি করিতেন, ক্ষীরদাদেবীর মাতা, দেবী দিগম্বরীকে দিদিমা ডাকিতেন। মহেন্দ্রজীর অনুগত সকলেই দেবীমাকে দিদিমা বলিয়া থাকেন। ঐ দিদিমা ডাকের মধ্যেও গুরুবাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। প্রভুবন্ধুতে গুরুবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তগণ দেবীমাকে পিসিমা বলিয়া থাকেন।

৪। শ্রীমহেন্দ্রজীকে অনেক ত্যাগী ভক্ত ও গৃহস্থভক্ত গুরুবুদ্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীযুত নবদ্বীপ ঘোষ এম্. এ. বি. এল্, গোপীবন্ধু দাস, মহানামব্রত প্রভৃতি অনেকের লিখিত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে মহেন্দ্রজী যে তাঁহাদের গুরু, তাহার স্পষ্ট স্বীকৃতি দৃষ্ট হয়। মহেন্দ্রজী নিজেও তাঁহার বহু অনুগতজনকে তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

৫। শ্রীচম্পটী মহাশয়কে গুরুবুদ্ধি করিয়া ডাঃ শ্রীযুত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. বি, শ্রীযুত তিনকড়ি ঘোষ এম. বি. প্রভৃতি অনেকে বন্ধু-ভজন করেন। এই অধম লেখকও চম্পটী মহাশয়ের দুর্লভ সঙ্গ ও স্নেহকৃপা-উপদেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

৬। নবদ্বীপ হরিসভার প্রভুগতপ্রাণ শিতিকণ্ঠ গোস্বামী মহাশয় কতিপয় ভক্তকে মহানাম-ভজন দীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অনুগতগণ প্রভুবন্ধুকে আরাধ্য বস্তু মনে করেন।

৭। মোহান্ত শ্রীহরিদাসজী অনেককে শিষ্য করিয়া প্রভুর দিকে উন্মুখ করিয়াছেন।

৮। মেহেরপুরের শ্রীযুত কালী অধিকারী মহাশয় কতিপয় ভক্তকে বন্ধু-ভজন দীক্ষাদান করিয়াছেন।

৯। পূজনীয় শ্রীকুঞ্জদাসজী বহুসংখ্যক ভক্তকে মহানাম-মন্ত্রদানে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রতি উন্মুখ করিয়াছেন। বহুজনের অন্তরে গুরুরূপে স্থিত থাকিয়াও কুঞ্জদাসজী গুরুগিরি—ভাব-বর্জ্জিত, প্রতিষ্ঠাহীন, শুদ্ধ-নির্ম্মল।

১০। নিরভিমান বন্ধুসেবক পূজনীয় নবদ্বীপ দাসজী অনুগত কতিপয় ভক্তকে নামমন্ত্র দীক্ষা ও বন্ধু-ভজন দান করিয়াছেন।

১১। শ্রীমান্ মহানামব্রত অনেক ভক্তকে মহানাম-ভজন দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর প্রতি উন্মুখী করিয়াছেন। সুদূর আমেরিকায় কতিপয় শিক্ষিত সাহেব-মেম তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিয়া বন্ধুসুন্দরকে আরাধ্য-জ্ঞানে ভজন করিয়া থাকেন।

১২। বন্ধুর চিহ্নিত ভক্ত শ্রীরমেশচন্দ্রকে রাজনাথ দাদা, শ্রীমাখনধর আদি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ গুরুবুদ্ধি করিতেন। ব্রহ্ম-চারী শ্রীধীরেন্দ্র গুপ্ত শ্রীরমেশচন্দ্রের নিকট মহানাম-মন্ত্র পান এবং তিনি নিজেও কতকজনকে বন্ধু-মহানাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন।

১৩। শ্রীযোগেন্দ্র কবিরাজজীর কতিপয় অনুগত বন্ধুভক্ত শিষ্য ছিলেন। শ্রীমদ্ গোপীদাস, শ্রীমদ্ লীলাপ্রকাশ আদি বান্ধবগণ কতকজনকে এইপ্রকার বন্ধু-ভজন দিয়াছেন।

আদর্শ চরিত্র বন্ধুভক্তের পক্ষে বন্ধুনামে দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকিবে, সকলেই প্রভুকে জানুক, ভজুক। কামজিৎ জিতেন্দ্রিয় ভক্তই গোস্বামী।

শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী আমাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীপ্রভু স্বহস্তে (সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মলিপিতে) লিখিয়াছেন, "গোস্বামী দীক্ষা"; অতএব দীক্ষা সম্বন্ধে নিষেধবাণী কোথায়? বরং আদেশ। "কেহ দীক্ষা লইও না, দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র," এই বাণীটি কয়েকজন ভাগ্যবান্ যুবকের প্রতি। কারণ প্রভুবন্ধু নিজে যাহাদের কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাদের অন্য কোনও স্থানে গুরুমন্ত্র লইবার প্রয়োজন নাই।

"প্রভাতি, টহল, নিত্যকীর্ত্তন, পদস্মৃতি, ধৈর্য্য, দীক্ষা। ইতি শিক্ষা।" দীক্ষা নেওয়া বা দেওয়া প্রভুর নির্দ্দেশ। নিষেধ নাই, আদেশ আছে।..."গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু বন্ধু"—ঐ বাণীর অর্থ প্রভু জগতের গুরু।..."

গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু বন্ধু, এই শ্রীবাণীর সমাধান শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামী-রূপে শিখান আপনে॥"

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করেন কি ভাবে? "ভক্ত দ্বারা কৃপা করেন দীক্ষা-শিক্ষা দিয়া।" শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ, "ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত। নিত্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিবে। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মুখস্থ করিও।”

দীক্ষা-গুরুকরণ না মানিলে ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করা যায় কি প্রকারে?···শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

“আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।”

“শ্রীগুরু চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥”

শ্রীবৃন্দাবনের ভক্তগণ প্রভুর ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা বে-সম্প্রদায়ী, আমাদের সহিত বসিতে পারিবে না। ভক্তগণ প্রভুকে ইহা জানাইলে, তখন প্রভুবন্ধু বলিলেন—“বলিস্, বে-সম্প্রদায়ী নহি, স্ব-সম্প্রদায়ী। তোদের শ্রীমতী স্বপ্নে আমাকে মন্ত্র দিয়াছেন। হরিনামই মহাউদ্ধারণ-মন্ত্র, উহা সাধু মুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ হইলে দীক্ষা হয়।”

সাধু-বৈষ্ণব মুখে হরিনাম শ্রবণও এক প্রকার দীক্ষা। অজিতেন্দ্রিয় ব্যবসায়ী গুরুর কাছে, লৌকিক দীক্ষা গ্রহণ ফল-দায়ক নহে, উহা ব্যর্থ।

শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহার বাক্য বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। প্রভুর আদেশ আছে, “দিবাভাগে কদাপি নিদ্রা যাইবে না,” আবার প্রয়োজন বোধে তিনি কাহাকেও বা আদেশ করিয়াছেন,—“রাত, বার ঘণ্টাই পড়িও, দিনে ঘুমাইও।”

প্রভু উপদেশ দিয়াছেন, “অভিক্ষা” “কাহাকেও কিছু দিও

বই, নিও না” কিন্তু ত্যাগীর পক্ষ হইয়া তিনি লিখিয়াছেন,

“কুঞ্জে মেগে খাব, গুণ গাব, বেড়াইব বনে বনে।”

“কুঞ্জে কুঞ্জে করপুটে, মুঞ্জ মাধুকরী লুটে রে,
ঢর ঢর পান কর যমুনার জল রে”।

প্রভু বিদ্যা-অর্জনে ও গুরুসেবাতেও ভিক্ষার অনুমতি দিয়াছেন।

“একাগ্রতা-আনুগত্য, সাধুগুরু সেবা সত্যরে”।

প্রভু কখনও কখনও নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ভক্তের উদ্দেশ্যেও “সকলেই” “কেহও” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, এক সময় কতিপয় ছাত্রের তৎকালীন স্বাস্থ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরীক্ষার পড়া প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া তিনি সাময়িক আদেশ করিয়াছিলেন, “সকলেই আমিষ খাইও”, “একজামিন শেষ না হওয়া অবধি, নিঃসঙ্গ হইও। কীর্ত্তন করিও না।” কয়েকজন ছাত্রকে প্রভু সাময়িক আদেশ করেন, ‘সকলেই আমিষ খাইও।’ প্রিয়ভক্ত শ্রীদুঃখীরামকে প্রভু আদেশ দিয়া লিখেন—“মাছ খাইও না, মাছ অখাদ্য। নিতাই গৌর ঘি চালাইবেন।”

এখন আমিষভোজনে পক্ষপাতিগণ ও কীর্ত্তনে অনিচ্ছুকগণ যদি প্রভুর কোনো সাময়িক ব্যক্তিগত বাক্যে উল্লসিত হইয়া আমিষ খাওয়া, কীর্ত্তন না করা প্রভুর সার্ব্বজনীন উপদেশ বলিয়া প্রচার করেন, তবে ভক্তগণ অনেকেই বিভ্রান্ত হইবেন। দীক্ষার বিরুদ্ধে যাহারা প্রচার করেন, তাঁহারাও সেইরূপ সুধী ও ভক্তবৃন্দকে বিভ্রান্ত করেন মাত্র। “আমিষ মৃত্যু” “আমিষ

সংস্পর্শ হইলে নিরামিষ প্রসাদও খাইতে নাই” “কীর্ত্তনমঙ্গলের সদা চেষ্টা পাইও” ইত্যাদি বন্ধুবাণী যেমন প্রভুর হার্দ্দ দেখাইয়া দিতেছে, ঠিক তদ্রূপ “গোস্বামিদীক্ষা” ইত্যাদি অন্যূন পঞ্চাশটি মহাবাণী ও “অগোস্বামী গুরু, চিরত্যাগ” ইত্যাদি ব্যতিরেকাত্মক গুরুবন্ধুবাণী একত্র হইয়া গুরুবন্ধুর প্রকৃত অভিপ্রায় অভ্রান্তভাবে সুপরিব্যক্ত করিয়াছে।

প্রভু বন্ধুসুন্দর যখন স্বীয় অপ্রাকৃত রূপ-লাবণ্যরাশি লইয়া জগজ্জীবের নয়নগোচর ছিলেন, তখন যাঁহারা তাঁহাকে স্বয়ং গুরুগোবিন্দবুদ্ধিতে দর্শন-স্পর্শন ও তাঁহার সেবাভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং তিনিই চরম সাধ্যতত্ত্ব, ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সব ভাগ্যবানদের আর অন্যত্র দীক্ষার প্রয়োজন নাই। তথাপি কাহারও প্রাণে প্রয়োজনবোধ জাগিলে তিনি কোন পরম অধিকারী জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ যোগ্য বন্ধুভক্তের নিকট জপ-ভজনাদি শিক্ষা করিয়া লইলেও কোন আপত্তির কারণ দেখি না। আসল কথা হইল প্রয়োজনের বোধ। প্রভুর দর্শন পাইয়া যাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, আর প্রয়োজনের বোধ নাই, তাঁহার নিশ্চয়ই আর কিছুর প্রয়োজন নাই। যাহার হৃদয়ে অভাবের বোধ আছে, সে পূর্ণতা খুঁজিবেই। নবদ্বীপদাসজীও রামদাসজী প্রভুর অনুমতি লইয়া পৃথক্ দীক্ষা নিতে, পরবর্ত্তী কালে ইচ্ছুক হন। একই প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সকলের একই ভাব হইবে, এমন কোন বিধি নাই। কাহাকে কি ভাব দিবেন, প্রভুই জানেন, আমরা বিচারক নহি।

কুরুক্ষেত্রে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে কেবল অর্জ্জুনই "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্," বলিলেন। ইহার বিচার কে করিবে ?

বন্ধু-মহানামদানে মানবকে বন্ধুর উন্মুখীকরণ-কার্য্য মহা-প্রচারণেরই বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া মনে করি। তবে প্রচারণ করিতে গেলে প্রভুর সাবধান সতর্ক-বাক্য সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। একটু অসতর্ক হইলেই, অগ্নি হাত পোড়াইতে পারে, ইহা জানিয়াই অগ্নি ব্যবহার করিতে হইবে। নিজেকে প্রভুর পাদপদ্মে বিলাইয়া দিয়াই প্রচারক ও অন্যের পথ-প্রদর্শক হইতে হইবে। মূলগুরু প্রভুবন্ধুই, কামজিৎ বান্ধব দীক্ষাগুরু পথপ্রদর্শকও উপদেষ্টা হইতে পারেন মাত্র, প্রভুবন্ধুর কৃপাশক্তি পাইয়াও অন্তরে বন্ধুহরির একনিষ্ঠ নিরভিমান সেবক থাকিয়া।

দীক্ষা, জপ ও কীর্ত্তন

গোস্বামিশাস্ত্রের মর্য্যাদা দিয়া জগদ্‌গুরু কৃষ্ণসহ বৈষ্ণব দীক্ষাগুরুর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া প্রভু লিখিয়াছেন,

"মন্ত্রদাতা গুরুকে গোস্বামিগণ শ্যামের প্রকাশরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার সহ শ্যামসম্বন্ধ।" কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা কামজয়ী এই মন্ত্রদাতা গুরু শ্যামের সেবক বৈষ্ণব। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইলেই দীক্ষা হয়। 'সাধুকৃপা না হইলে প্রেম না জন্মায়'। চৈঃ চঃ।

প্রভুবন্ধু নিজে শ্রীহস্তে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রাদি লিখিয়া দিয়া "ইতি দীক্ষামন্ত্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীলিপিরাজি নিজে দেখিয়াছি। প্রভুর বাণী,—'জপ রাস', 'রাস সংকীর্ত্তন'

"মন্ত্রকে জীবনাধিক জ্ঞান করিবে।" "জপই জীবন" "জপই ভবের সম্বল।" গীতায় বলিয়াছেন—

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।"

দীক্ষা অর্থই মন্ত্রগ্রহণ। মন্ত্রগ্রহণ অর্থ সংখ্যাপূর্ব্বক জপ। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রভুবন্ধু কোথাও মন্ত্রদাতা সদ্গুরুর মন্ত্রের বা দীক্ষার নিন্দা করেন নাই। যাঁহারা সদ্গুরুর অভিপ্রেত কার্য্য করেন, তাঁহারা ত নিত্য দীক্ষিত ও কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির একমাত্র অধিকারী। তাঁহাদেরই হরিনাম কীর্ত্তনের আনন্দরস আস্বাদনে সর্ব্বাধিক অধিকার।

জপও একপ্রকার কীর্ত্তন। হরিনামের সাধক ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মধ্যে জপকীর্ত্তন ও উচ্চকীর্ত্তন দুই-ই মূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণপ্রিয় মহাজপকর্ত্তা, পরম-রূপবিত্তশালিনী-রূপোপজীবিনীর হরিনাম-দীক্ষাদাতা ত্রাতা, ভক্তশিরোমণি শ্রীহরিদাসকে প্রভুবন্ধু, "ব্রহ্ম হরিদাস" "জয় হরিদাস" 'হরিদাস সীতানাথ প্রেমসুধা ঢালিছে', "হরিদাস শ্রীবাস পাষণ্ডী পাত", ইত্যাদি বাক্যে মহাস্তুতি করিয়া একসঙ্গেই দীক্ষা ও সংকীর্ত্তনের প্রশংসা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মহরিদাসের শ্রীদেহ কাঁধে লইয়া মহাপ্রভু হরিনামে নৃত্য করিয়াছেন, স্বহস্তে

সমাধি দিয়াছেন এবং স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া তাঁহার স্মরণানন্দে মহামহোৎসব করিয়াছেন।

জপকে মানসকীর্ত্তন বলা চলে। শ্রীশ্রীপ্রভু ভাগবত পাঠ, জপ ও কীর্ত্তনকে কোথাও পৃথগ্‌ধর্ম্মী করেন নাই। বন্ধুবাণী—
"সাধন—সংকীর্ত্তন, নর্ত্তন, পঠন, উচ্চারণ, জপন, ইতি পঞ্চধর্ম্ম।

শিক্ষা—প্রভাতি, টহল, নিত্যকীর্ত্তন, পদস্মৃতি, ধৈর্য্য, দীক্ষা।

সঙ্গ।—মৃদঙ্গ, করতাল, জপমালা, মালা, গ্রন্থ।"

"জপ রাস" "রাস সংকীর্ত্তন"

উপর্য্যুক্ত সাধন, শিক্ষা ও সঙ্গ-বিষয়ক বাণীসমূহ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পাঠ, জপ ও কীর্ত্তনকে, খোলকরতাল ও জপ-মালাকে, কীর্ত্তন ও দীক্ষাকে প্রভু সমমর্য্যাদা দিয়াছেন। জপ ও জপমালার মর্য্যাদার অর্থই হইল, মন্ত্রের মর্য্যাদা। মন্ত্রের মর্য্যাদাই দীক্ষার মর্য্যাদা। সুতরাং কেহ যদি বলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু দীক্ষার নিন্দা করিয়া কীর্ত্তনের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অমূলক ও সত্যের অপলাপ। 'নিত্যকীর্ত্তন ও দীক্ষা' উভয়কেই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশ্বগুরু বন্ধু ঐরূপ মিথ্যাভাবনার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।

প্রভুর রচনায় দীক্ষা ও সংকীর্ত্তনের অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া শ্রীমতী গুরুদক্ষিণা চাহিলেন, "এই দক্ষিণা দাও, সংকীর্ত্তন প্রচারণ।" দীক্ষিত হওয়ার পর দীক্ষিত দ্বারাই হরিকথায় 'চৈতন্য প্রচারণ' ও 'নিতাই প্রচারণ।'

কেহ যদি মনে করেন, নাম ও মন্ত্র ত আছেনই, উহা জপ করিলেই হইল, দীক্ষার আবার প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায় যে তারকব্রহ্মনাম, মহানাম সর্ব্বতঃ প্রকাশ্য হইলেও মন্ত্রাদি চির গুপ্তই, "প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র গোপন রাখিবে" এই মর্ম্মে প্রভুর বাণীও আছে। গুপ্ত মন্ত্রাদিও সাধু গুরুমুখ হইতেই লইতে হইবে, নতুবা পাইবার আর উপায় নাই। এমন কি যাহা প্রকাশ্য মন্ত্র, তাহাও গুরুমুখ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রভুর বাণী আছে—"হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র, উহা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ হইলে দীক্ষা হয়।"

এ সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রই একমত। গুরু হইলেন অনুগ্রহ-শক্তি বা মন্ত্রের আধার-শক্তি। ধান্য, উপরের আবরণ বা আধার-তুষটিসহ রোপণ করিলেই অঙ্কুরিত হয়, তুষ বাদ দিয়া চাউল রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে না। ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন। ইহা লইয়া বিচার-তর্ক বৃথা। সদ্‌গুরু মুখোচ্চারিত কৃপাশক্তি-সম্বলিত নাম অন্তরে গৃহীত হইলেই উহা কার্য্যকরী ও প্রেম-ফলোন্মুখী হয়। প্রভু সংকীর্ত্তনে আদেশ করিয়াছেন—

"একাগ্রতা আনুগত্য, সাধুগুরু সেবা সত্য রে"
"লহ শ্রীগুরু শরণ, ভজ বৈষ্ণব চরণ"

ভক্তিরাজ্য-প্রবেশে গোস্বামিশাস্ত্রের একটি অপরিহার্য্য মুখ্য উপদেশ গুরুকরণ বা দীক্ষাগ্রহণ। তাই প্রভুবন্ধু লিখিয়াছেন—"গোস্বামি-দীক্ষা। গোস্বামি-ধর্ম্ম পালন।" "যাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য গতি নাই, বা যিনি গোস্বামিশাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রহণ করেন না, তিনিই বৈষ্ণব।" "আমায় দয়া কর, সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ।" "বৈষ্ণবই সাধু। ধরায় আর সাধু সম্ভবে না।" "যাঁকে দেখামাত্র হরিনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।" "সাধুগুরুবৈষ্ণবের বন্দিও চরণ।" প্রভুর লিপিতে 'সাধু' জয় নিতাই, 'বৈষ্ণব' জয় গোঁসাই, দীক্ষাদানে অধিকারী ছিলেন।

মন্ত্রদান-প্রসঙ্গে মিত্র মহাশয়কে কথিত "আমিই ত দেই, উপলক্ষ্য তুমি", এই বন্ধুবাণীটি সকল অধিকারী ভক্ত সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সাধু গুরু দ্বারা দীক্ষা বা মন্ত্রদান করাইয়াও মন্ত্রদানের মূল-কর্ত্তা গুরুগৌরাঙ্গ বা তদভিন্ন গুরু বন্ধুই।

হরিনামের মাহাত্ম্য অনন্ত; কিন্তু বহু হরিনাম করিয়াও শুনিয়াও অনেকের কুমতির পরিবর্ত্তন দেখা যায় না কেন? কারণ, সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ের বা আনুগত্যের অভাব। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপালব্ধ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-নিষ্ঠারূপ অনুপান সহ বৈদ্যবটিকারূপ হরিনাম সেবন করিলেই নাম-মাহাত্ম্য বোধগম্য ও কুভাব বা দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধি প্রশমিত হইবে এবং প্রেমধনে ধনী হওয়া যাইবে। প্রভুর আদেশ, "নাম-মাহাত্ম্য গুরুমুখ-শ্রোতব্য।"

হরিনামের কৃপাশক্তি, কৃষ্ণভজনযোগ্যদেহ ও কৃষ্ণপতি লাভের একমাত্র গতি বা উপায় সাধু-গুরু-বৈষ্ণব। তাই জগজ্জীবের উদ্দেশ্যে এই নিত্য সত্যবার্ত্তা দিয়া জীবের পক্ষ হইয়া জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু লিখিয়াছেন,—"গুরুগতি, কৃষ্ণপতি।"

"একাগ্রতা আনুগত্য, সাধু গুরু সেবা সত্য রে"
"মোরে দয়া কর হে, গুরু গৌর বৈষ্ণবগণ,
এই বিনে গতি নাই, বন্ধুর অন্য গতি নাই,
পাদপদ্মে দেও ঠাঁই।"

"হরিনামই মহাউদ্ধারণমন্ত্র, উহা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ হইলে দীক্ষা হয়।"

ভক্ত শিবানন্দ সেনের সপ্তমবর্ষীয় বালক-পুত্র পুরীদাস নীলাচলে গৌরপ্রিয়গণের সমক্ষে মহাপ্রভুর মুখে প্রকাশ্যে কৃষ্ণনাম শুনিয়া উহা দীক্ষামন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, অন্ত্য, ষোড়শ পরিচ্ছেদে আছে,—

" 'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বলে বার বার ;
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥"
"প্রভু বলে, আমি নাম জগৎ লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম করাইল ॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম করাইতে।"
শুনিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি লাগিলা কহিতে।
তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কারো আগে না করে প্রকাশে ॥

মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥"

বালক পুরীদাস কৃষ্ণনাম তো তাঁহার পরমপূজ্য গৌরপ্রিয় পিতৃদেব ও ভক্তগণমুখে কতবার শুনিয়াছেন। তখন দীক্ষা হয় নাই। কৃষ্ণকৃপায় যথাসময় নাম বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ হইলে তাঁহার দীক্ষা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি মায়াদেবীর উক্তিতে উল্লেখ আছে—

"ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি কর মোরে ধন্যা।
আমায় ভাসায় যৈছে ঐছে প্রেমবন্যা ॥"

মায়াদেবী নিজমুখেই ত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন। আবার এই নাম সাধুমুখ হইতে দান চাইলেন কেন? কবিরাজ গোস্বামীই উত্তর দিয়াছেন,

"মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়।
সাধুকৃপা নাম বিনা প্রেম নাহি হয় ॥"

সাধুকৃপা-পুটিত নামই প্রেমদানে সমর্থ। ভক্তমাল-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহাত্মা কবীর রামানন্দ স্বামীজিকে গুরু করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সামাজিক বিচারে কবীর নীচ জাতি ছিলেন বলিয়া স্বামীজি সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত ছিলেন না। চতুর ভক্ত কবীর তখন একদিন কাশীর গঙ্গাঘাটে

শেষরাত্রে শয়ন করিয়া থাকেন। রামানন্দজী ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে স্নান করিতে যাইয়া তাহাকে না জানিয়া অকস্মাৎ চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়া ফেলেন এবং মৃত মনে করিয়া "রাম কহো" বলিয়া উঠেন। ভক্ত কবীর ইহাতেই নিজেকে দীক্ষিত মনে করিয়া রামানন্দজীকে হৃদয়ে গুরুর আসনে বসাইয়াছিলেন। স্বামীজী নিজমুখে বলিয়াছেন—

"আনুষঙ্গ মোর মুখে রামনাম শুনি।
দীক্ষা নিষ্ঠা কৈল মহামন্ত্র জানি॥"

কবীর কি 'রাম' এই নামটি জানিতেন না, বা উচ্চারণ করিতেন না? তবু আবার গুরুমুখে শুনিবার আগ্রহ কেন? স্বয়ং গৌরহরি শ্রীরূপের শিক্ষায় উত্তর দিয়াছেন,—

"গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।" চৈঃ চঃ মধ্য, ১৯

ভক্তিলতার বীজ যে নাম-মন্ত্র, তাহা গুরু এবং কৃষ্ণ প্রসাদেই লাভ করিতে হইবে। পদ্ম এবং ভ্রমর দুইয়ের মিলিত কৃপাতেই মধু লাভ করিতে হইবে। মধু পদ্মের, দিবে ভ্রমর আহরণ করিয়া; কৃপা কৃষ্ণের, দিবেন গুরুদেব আনিয়া; ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভক্ত-ভ্রমরের কৃপা ছাড়া কৃষ্ণকৃপা-মধু পাইবার আর কোন উপায় শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করেন নাই।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥" চৈঃ চঃ
'মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয়॥'+ চৈঃ চঃ

গুরুই মহৎ। গুরুই ভক্তশ্রেষ্ঠ। "অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।"

কেহ্ কেহ্ গুরু মানেন, দীক্ষা মানেন না। ইহ্া এক অদ্ভুত অবস্থা। নামমন্ত্রই যদি না দিলেন, তবে গুরু বলার সার্থকতা কি? যদি তাহা দিলেনই, তবে আর দীক্ষা না মানার অর্থ কি রহ্িল?

কেহ কেহ বলেন নাম দিতেই হইবে, তবে দীক্ষার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা দীক্ষা অর্থ বুঝেন, কাণে নাম দেওয়া। তাঁহাদের মতটা এইরূপ যে, নাম দিতে হবে, কিন্তু কাণে দিলে দোষ হবে। খেতে হবে, হাঁ করিলে দোষ। শব্দ গ্রহণের একটি ইন্দ্রিয়ই সৃষ্টিকর্ত্তা দিয়াছেন। সেটি হইল কর্ণ। নাম যখন শব্দময়, তখন তাহাকে কর্ণরন্ধ্র ছাড়া আর কোন অঙ্গ দ্বারাই গ্রহণ করা যাইবে না। জিহ্বা, নাম বলিবে, কর্ণ, নাম শুনিবে।

প্রভুর বাণী "গুরু অভিপ্রেত কার্যকেই গুরুদীক্ষা বা গুরুপ্রণালী বলা যায়"। সদ্‌গুরুর প্রধান অভিপ্রেত কার্য্যই হরিনাম। নাম ত লইতেই হইবে—অধিকন্তু গুরুর সমস্ত অভিপ্রায় যদি শিষ্য নিজ-জীবনে মূর্ত্তি দিতে পারে, তবেই তার দীক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়। কতিপয় দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়া প্রভুবন্ধু রমেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,—"এই কাজ হইলে বুঝব, আমি গুরু, হরেকৃষ্ণ দাস (রমেশ) শিষ্য। তোরও মুখ থাকবে। আমারও মুখ থাকবে।"

বিরহবিধুরা শ্রীরাধার "কর্ণমূলে গায় নাম বদন ভরি"

গুরুরূপা শ্রীললিতা "কৃষ্ণ" নাম দিয়াছেন—এইরূপ শ্রীশ্রীপ্রভুর ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদ আছে। জীবমাত্রই কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর, সদ্‌গুরুই ললিতাস্থানীয়। তিনি কর্ণমূলে নাম দিবেন, ইহাতো শাস্ত্র-বিধি ও প্রভু-সম্মত কথা।

"গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু বন্ধু"

উপরি লিখিত শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণী দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন, কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধুই গুরু। আর পৃথক্ ব্যক্তিকে গুরু স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর দিতে হইলে বাণীটির অনুশীলন আবশ্যক।

কৃষ্ণ, গৌর ও বন্ধুকে আমরা অভিন্ন বলিয়া জানি এবং পরতত্ত্ব বলিয়া মানি। সুতরাং কার্য্যের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধু, এই তিনটি কথা স্থলে 'পরতত্ত্ব' এই একটি কথা বসাইয়া তিনটি পদকে একটি পদ করিয়া লইলাম।

গুরু পরতত্ত্ব। কথাটির অর্থ কি? প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কে উদ্দেশ্য, কে বিধেয়। "এই বিপ্র পণ্ডিত', আর "এই পণ্ডিত বিপ্র," এই দুই বাক্যে অনেক পার্থক্য। প্রথম বাক্যে ব্যক্তিটি যে ব্রাহ্মণ তাহা জানা কথা, তিনি যে পণ্ডিত

তাহা জানান হইল। দ্বিতীয় বাক্যে ব্যক্তিটি যে পণ্ডিত তাহা জানা কথা, তিনি যে ব্রাহ্মণ ইহা জানান হইল।

আলোচ্য ক্ষেত্রে গুরু উদ্দেশ্য ও পরতত্ত্ব বিধেয়। ইহাতে অর্থ হইবে, কৃষ্ণ যে পরতত্ত্ব ইহা জানা ছিল না, জানাইয়া দেওয়া হইল। বাক্যে কে উদ্দেশ্য ও কে বিধেয় হইবে, তাহা নিয়ম করা আছে।

"আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাৎ বিধেয়" "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ', ইহা ব্যাকরণের ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম, কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন। সুতরাং গুরু শব্দই উদ্দেশ্য বা অনুবাদ (অনুবাদ ও উদ্দেশ্য একার্থকই)।

অতএব প্রভুর শ্রীহস্তে লিখিত গুরুবাদ সর্ব্বতোভাবে প্রভুর অভিপ্রেত। কারণ—'গুরুকৃষ্ণ' বলিলে গুরুবাদ স্বীকৃত হইয়া যায়। প্রভুর বাণী,—"গুরু গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম।" এখানে গৌরাঙ্গই যদি গুরু হন, তাহা হইলে গুরু ও গৌরাঙ্গ দ্বিরুক্তি ব্যর্থ হয়।

স্বীকৃত গুরু-তত্ত্বই যদি পরতত্ত্ব হন, তাহা হইলে আর পৃথক্ কৃষ্ণগৌর মানিবারই দরকার কি? গুরুর পূজার্চ্চনা করিলেই হয়—এরূপ আশঙ্কায় উত্তর দেওয়া যাইতেছে,—

গুরু দুই প্রকার, সমষ্টি-গুরু ও ব্যষ্টি-গুরু। গুরুকে যেখানে পরতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধু বলা হইয়াছে, সেখানে গুরু, জগদ্গুরু বা সমষ্টি-গুরু অর্থে গৃহীত। সমষ্টি-গুরু ও কৃষ্ণ অভিন্নই। সূক্ষ্ম বিচারে গুরু, কৃষ্ণের একটি বিলাসমূর্ত্তি। প্রমাণ—

"কৃষ্ণ গুরু ভক্ত শক্তি অবতার প্রকাশ।

এই ছয় রূপে নিত্য করেন বিলাস।”

ব্যষ্টি-গুরু ভক্তশ্রেষ্ঠ, গোবিন্দ প্রেষ্ঠ। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত। ব্যষ্টি-গুরুকে সমষ্টি-গুরুর প্রতীক মনে করা যাইতে পারে, যেমন লৌকিক মাতা বা মাতৃজাতি জগজ্জননীর প্রতীক।

যাঁহারা “গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌর, গুরু বন্ধু” এই বাণী তুলিয়া গুরুবাদের বিরোধিতা করেন, তাঁহারা দুইবার ভুল করেন; একবার ভুল করেন উদ্দেশ্য ও বিধেয়-বিচারে, আর একবার ভুল করেন, ব্যষ্টি-গুরু ও সমষ্টি-গুরুর বিচারে।

গুরু বলেছেন,—“যাঁহার বপুতে মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে, তিনিই গুরু।” ভাগবতাদি শাস্ত্রে বহু হরিভক্তের মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সাধ্যতত্ত্ব প্রভুবন্ধুকে মাত্র ঐ মহাপুরুষের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে, তাঁহাকে খর্ব্ব করা হয়। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ সল্লক্ষণযুক্ত হরিভক্তমাত্রই গুরু হওয়ায় যোগ্য।

“যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়।” চৈঃ চঃ

মহাপুরুষের বত্রিশ লক্ষণ ব্যতিরিক্ত আরও অনেক অপ্রাকৃত লক্ষণ ও দশা শ্রীহরিপুরুষে সতত বিদ্যমান থাকে। হরিপুরুষ সমগ্র মহাপুরুষমণ্ডলের কেন্দ্র ও নিত্য উপাস্য সমষ্টি-গুরু।

বস্তুতঃ বন্ধুহরি মূলগুরু জগদ্‌গুরু বা সমষ্টিগুরু। আর যাঁহার মুখ হইতে “নাম-মাহাত্ম্য গুরুমুখশ্রোতব্য” বলিয়াছেন, তিনি ব্যষ্টি-গুরু। গুরুব্যষ্টি হইলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ-ভক্তেরই নাম-মাহাত্ম্যের অনুভূতি আছে। সেইজন্য তাঁহার মুখে শুনিলেই

ঠিক শোনা হইবে। নাম-রস-মাধুর্য্য ভক্তেরই আস্বাদ্য, ভগবানের নহে। ভগবান্ উহা আস্বাদন করিতে ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন। আমরা যখন শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীবন্ধুসুন্দরকে নামের মহাশক্তি ও মহামাধুর্য্যের কথা বলিতে শুনি, তখন তাঁহারা উহা পরতত্ত্বের ভূমিকা হইতে বলেন না—ভক্তভূমিকা হইতেই বলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর অধিকাংশ পদই ভক্তভাবের। পূর্ণ ভগবদ্ভাবে গৌর বসেন বিষ্ণুখট্টায়, বন্ধুসুন্দর শ্রীহস্তে লিখেন "প্রভুবন্ধু" "হরিমহাবতারণ", তখন আর ভক্তের মত দৈন্যোক্তি থাকে না।

গুরুকরণ না মানিলে, "গুরুমুখ-শ্রোতব্য" কি ভাবে সম্ভব হইবে? সমষ্টি-গুরু বা জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধু সকলের পক্ষে সর্ব্বদা সহজলভ্য ও দৃশ্যবস্তু নহেন। এইজন্যই প্রভুবন্ধু হরিকথা ও সংকীর্ত্তনাদি গ্রন্থে জীবের জন্য গুরু-গুণসম্পন্ন "ত্রাণকারী, কাণ্ডারী, ভবতারণ, সাধু-ভক্ত-বৈষ্ণব-ঠাকুর-গোঁসাই"কে গুরু বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অর্থাৎ (তাঁহারা ছাড়া), উক্ত লক্ষণ বা গুণশূন্য, আচারভ্রষ্ট গুরুতাব্যবসায়ী গোস্বামিগণ বা অধিকারী ঠাকুর গুরুপদবাচ্য নহেন। গো (ইন্দ্রিয়) + স্বামী (ঈশ্বর), ইন্দ্রিয়জয়ী বা কামজিৎ ভক্তই গুরুপদবাচ্য। প্রভুবন্ধু স্থানে স্থানে পরমবৈষ্ণব গোস্বামী গৌরভক্তবৃন্দকে "ত্রিলোকতারণ, ত্রিতাপহরণ, ত্রাণকারী, কাণ্ডারী, প্রভু, সহায়, পাষণ্ডিপাত, পাবন, ভবতারণ" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভবসমুদ্র পার করিতে গুরু সমর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, একমাত্র জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ-গৌর-জগদ্বন্ধুতে গুরুলক্ষণ সীমাবদ্ধ করেন নাই। প্রভুবন্ধু

নিজেকে "গুরু জগদ্বন্ধু গোস্বামী" লিখিয়া "গোস্বামী" পদের গুরুত্ব আরও সুপরিস্ফুট করিয়াছেন।

একসময় কতিপয় বালকভক্ত প্রভুবন্ধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখাইয়া কোনও গুরুভাইয়ের সাহচর্য্যে অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিলে প্রভু তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, "শাস্ত্রে গুরুই আছে, গুরু-ভাই নাই, জনজল্পনা মাত্র।"

বস্তুতঃ গুরু না মানিলে গুরুভাইয়ের অস্তিত্ব থাকে না। মূল ঠিক রাখিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতে প্রভু আদেশ দিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। যদি প্রভু 'গুরুভাই' একান্তই অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আবার গুরুভাই-সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীর উপদেশ দিলেন কেন? বন্ধুবাণীতে আছে—

"গুরুভাই, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভক্ত, নৈষ্ঠিক, ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ইতি ইষ্টগোষ্ঠী।" "ইষ্টগোষ্ঠী করিও।"

গুরুশিষ্য সম্পর্ক পরস্পর-সাপেক্ষ। গুরু না থাকিলে এই সংসারে শিষ্য সৃষ্ট হয় না, শিষ্য না থাকিলে গুরুর অস্তিত্ব থাকে না। আবার গুরুর একাধিক শিষ্য না থাকিলে, গুরুভাই সহ ইষ্টগোষ্ঠী করা সম্ভব হয় না। উক্ত বাণীতে প্রভু গুরু মানিয়াছেন, ইষ্টগোষ্ঠী ও গুরুর একাধিক শিষ্য থাকাও মানিয়াছেন। তবে গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া গুরুভাইর সঙ্গে সম্প্রীতি, জনজল্পনা, মিথ্যা বলিয়াছেন। গুরু না মানিলে, গুরুভাই শব্দের অস্তিত্বই থাকে না।

কেহ কেহ গুরুবাদ মানেন, দীক্ষাও স্বীকার করেন। কিন্তু

গুরুলক্ষণসংক্রান্ত পুরুষ সুত্নর্লভ বলিয়া, গুরুকরণ না করাই ভাল মনে করেন। এইরূপ ভাবনাও ঠিক নহে। যাঁহার ভাগ্যে সুলক্ষণযুক্ত সদ্গুরু মিলে নাই, তিনি নিশ্চয়ই শোচ্য। গুরুলক্ষণ-বিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয় ভক্ত দুর্লভ বটে, কিন্তু সুত্নর্লভ নয়, এই জগতেই মিলে। "প্রবর্ত্তকের পর সাধক অবস্থায় সংকর্ষণ শক্তি দান করেন"—বন্ধুবাণী।

গুরু দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যত্ব লাভে প্রত্যাখ্যাত গুরুনিষ্ঠ একলব্য মৃন্ময় গুরুমূর্ত্তির কাছে এমন অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যাহা দ্রোণাচার্য্য নিজেও জানিতেন না। গুরুভক্তি যে কত শক্তিশালী, অগণিত ভক্তজীবন তাহার সাক্ষ্য বহন করে। পিতামাতা যেমনই হউক, সন্তানের পক্ষে মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি যে কল্যাণদ, ইহা সকলেই জানে। তবে গুরুকরণকালে সাধ্যমত বিচার করিয়াই করা উচিত। গুরু জিতেন্দ্রিয় ও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা।

সাবধানে গুরুবন্ধুবাণীর মর্ম্ম গ্রহণীয়

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে মানভরে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিংবা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জের দুয়ার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, চন্দ্রাবলীকে 'গণিকা' বলিয়াছেন এবং কৃষ্ণকে "যাও যাও যাও হে, যথা সে গণিকা রয়," এইরূপ কঠোর উক্তি করিয়াছেন,—

এই সকল নিগূঢ় রসলীলার মাধুর্য্য না বুঝিয়া আমরা যদি কেহ তাহার অনুকরণ বা অনুসরণ করি, তাহা যেরূপ নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক মূর্খোচিত গর্হিত কর্ম্ম হইবে—ঠিক সেইরূপ বন্ধু ও বন্ধুভক্তের আনন্দ-আস্বাদন, মান-অভিমান. মিলন-বিরহ, আদর-ত্যাগের ও ভক্তের প্রতি প্রভুর 'লম্পট' ইত্যাদি উক্তির গূঢ় মাধুর্য্য না বুঝিয়া প্রভুবন্ধুর কোনও আপাত-বিরোধী কথার অনুসরণ করি, ও ভক্তের নিন্দা করি, তাহাও তদ্রূপ গর্হিত, লজ্জাজনক ও অপরাধমূলক কার্য্য হইবে। এখানে ভক্তাপরাধ হইতে আত্মরক্ষার্থ, সত্যবাক্ প্রভুর আপাতবিরোধী, "রমেশ, তুই অমর' 'রমেশ, তোর আয়ু নাই", ইত্যাদি বাণীর মর্ম্মার্থ পুনরায় স্মরণ করিতে, সকলকে অনুরোধ করি।

সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে কতকজনকে তিনি নাম-মন্ত্রাদি লিখিয়া দিয়াছেন ও মুখে 'গোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ' নাম ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া শুনাইয়াছেন। প্রিয়ভক্ত কতকজন 'গতি গুরুবন্ধু' জানিয়া লোকদৃশ্য দীক্ষা লন নাই, কেহ কেহ অন্যত্র দীক্ষা লইয়াছেন ও দিয়াছেন, এ'সব কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যেমন সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রভুর কৃপাস্পর্শপ্রাপ্ত বন্ধু সেবক জিতেন্দ্র, তাঁহার প্রভুর আদেশপ্রাপ্ত ও দীক্ষিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গোস্বামী রঘুনন্দনজীর কাছে দীক্ষা লইয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা গুরু-শিষ্য কেহও প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছেন বা প্রভু তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, এমন

কথা কেহ বলেন না, মনেও করেন না এবং কার্য্যতঃও দেখা যায় না।

সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র সম্বন্ধ গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ। ক্বচিৎ কাহারও দুর্ভাগ্যবশে এই পবিত্রতম সম্বন্ধ মালিন্যযুক্ত হইয়া পড়িলে সে সম্বন্ধে সতত সতর্ক থাকা প্রয়োজন হইবে, কিন্তু মূলনীতির পরিবর্ত্তন চলিবে না। গুরু দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে অর্জ্জুনের সম্মুখ-সমর হইলেও তাঁহাদের সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয় নাই। কোথাও পতি-পত্নীর সম্বন্ধও দুঃখপূর্ণ হইতে পারে, তাই বলিয়া সমাজ হইতে বিবাহ তুলিয়া দেওয়া চলে না। বিবাহ-সম্বন্ধহীন মানব-সমাজ ও গুরুশিষ্য-সম্বন্ধহীন ধর্ম্ম-সমাজের অবস্থা একই প্রকার। ঐরূপ হইলে, উভয়ই ব্যভিচার-দোষদুষ্ট হইবে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুবন্ধুর লেখনী পর্য্যন্ত কোথাও গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয় নাই। ইহা চিরকাল ছিল, আছে ও থাকিবে, সর্ব্বদোষশূন্য হইয়া উজ্জ্বলভাবে থাকিবে। জয় জগদ্বন্ধু হরি॥

॥ ইতি ॥

সর্ব্বকালীন মহানাম কীর্ত্তন

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।'
বন্ধু একাধারে কৃষ্ণগৌর ত্রিলোকহরণ॥
সর্ব্বলীলাময় বন্ধু হরি মহাবতারণ।
বন্ধু মূর্ত্তিমান্, 'রসোবৈসঃ' দর্পিদর্পকদলনম্॥
মূর্ত্ত রাস-রস প্রভু মহামন্মথমথন।

প্রভু প্রেমদাতা জীবত্রাতা মহাপ্রলয়দমন ॥
'হরিনাম প্রভু-জগদ্বন্ধু' ব্রহ্মাণ্ডরক্ষণ।
বন্ধু পাপহারী ভয়বারী ত্রিতাপহরণ ॥
জগদ্বন্ধু জগন্নাথ অনাথকারণ।
'জগদ্বন্ধু কৃপাসিন্ধু অন্ধের নয়ন।'
জগদ্বন্ধু প্রেমসিন্ধু ভুবনপাবন।
কলিকীটকুহকমোক্ষণ বন্ধু ভূভার হরণ।
জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু বিশ্ব বিমোক্ষণ ॥
নিত্যানন্দ জগদ্বন্ধু মহাধর্ম্মসংস্থাপন ॥
প্রভু আর্ত্তবন্ধু প্রাণবন্ধু জগতেরজীবন।
'প্রভু সত্য নিত্য বস্তু' নিত্যসেবকরঞ্জন ॥

বন্ধুভজনগীতি

ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু লহ জগদ্বন্ধু নাম রে।
বন্ধু একাধারে নিতাই গৌর বন্ধু রাধাশ্যাম রে ॥
বন্ধু মহাবীরের ভজনীয়, প্রভু সীতারাম রে।
সর্ব্বলীলাময় বন্ধু ভক্ত প্রাণারাম রে ॥
প্রভু বিশ্বগুরু কল্পতরু প্রেম সত্যধাম রে।
জয় জগদ্বন্ধু বল রবে পরিণাম রে ॥
ভজ জগদ্বন্ধু হরি হবে পূর্ণ মনস্কাম রে
হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু গাও অবিরাম রে ॥
বিশ্বত্রাণ বিশ্বমঙ্গল জগদ্বন্ধু মহানাম রে।

মহাউদ্ধারণ কীর্ত্তনে পাবে চির বিরাম রে ॥
বন্ধু-কামহর বর্ণিবর চিরভোগস্পৃহা বাম রে। *
হেমতনুধর বন্ধুসুন্দর চির নয়নাভিরাম রে ॥
ভ্রমহারী বন্ধুহরি নিত্যসুখ শান্তি ধাম রে।
ভজ হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু নিতাই গৌর রাধাশ্যাম রে ॥
* ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু গাও জগদ্বন্ধু গান রে।
'হরি নাম প্রভু জগদ্বন্ধু' বন্ধুপালয়ে দান রে ॥
"বন্ধুবাণী, মনঃপ্রাণে জীবে করে কারুণ্য কল্যাণ।
ক্ষমা দয়া ধর্ম দান উদ্ধার বিধান ॥
উদ্ধারণ ধর রে, সবে হরি নাম দান।
সবে হরিনাম দান এই কল্যাণ বিধান রে ॥"
জগতের বন্ধু জগদ্বন্ধু জগজ্জীবের প্রাণ রে।
যে জন জগদ্বন্ধু ভজে সে জন আমার প্রাণ রে ॥
জগদ্বন্ধু কীর্ত্তনে করে চির শান্তি দান রে।
* জগদ্বন্ধু ভজনে হবে দিব্য জ্ঞান রে ॥

* বণিবর-ব্রহ্মচারাদের নিয়ন্তা প্রভু। বর্ণী-ব্রহ্মচারী।
* প্রলয়চক্রান্ত বিশ্বশান্তিরক্ষণে বন্ধু প্রচারণ ॥

প্রার্থনা

কবে রাধার দয়া হ'বে যাব বৃন্দাবন রে।
গোপীপদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে ॥
(আমি) সখীসনে অভিসারে করিব গমন রে ॥
কবে আমি হেরিব সে যুগল মিলন রে ॥
কবে দোঁহে কাঁচলিতে করিব ব্যজন রে ॥
(আমি) কবে দোঁহে নিরখিয়ে জুড়াব জীবন রে ॥
(কবে) দোঁহে প্রদক্ষিয়ে গাব নাম-সংকীর্ত্তন রে ॥
(কবে) জগদ্বন্ধু-শিরে রাই দিবেন শ্রীচরণ রে ॥
(কবে) রাধাকৃষ্ণে সমর্পিব দেহ-প্রাণ-মন রে ॥

বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে।
সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজঃ আভরণে ॥
নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে, সখী সনে অভিসারে,
এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে।
হাতে বাঁশী কালশশী, নিকুঞ্জ কাননে পশি,
সুখে রহিতেন বসি' মনোপরে প্যারীসনে।
ক্রীড়াশ্রমে রাধাশ্যাম, ঘামিতেন অবিরাম,
অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে।
বন্ধু বলিছে কাতরে, কবে রাধা দামোদরে,
সাজা'ব হৃদয় ভরে' হেরিব প্রেম নয়নে।

লেখক নিত্যসেবককে ভক্তদের স্নেহাশীষ, শুভেচ্ছা ও বন্ধুবার্ত্তা-আদি গ্রন্থের প্রশস্তি

বন্ধুবার্ত্তা প্রথম সংস্করণ পড়িয়া বন্ধুকথা-প্রণেতা পূজনীয় সুরেশচন্দ্র বন্ধুবার্ত্তা-লেখককে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক উৎসাহ দিয়া (২৮শে পৌষ, ১৩৩২ সনে) বলিয়াছিলেন—'তুমি একূল ওকূল দুকূল রক্ষা ক'রে বেশ politely লিখেছ। প'ড়ে খুব আনন্দ পেলাম।—"

প্রেমযোগ, নবযুগের সাধনা, মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু, বিশ্বধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা পরম বন্ধুনিষ্ঠ পূজ্যপাদ শ্রীল যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় লেখককে আশার্ব্বাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বন্ধুবার্ত্তা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুহরি-সম্বন্ধীয় যতগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বন্ধুবার্ত্তার মত প্রভুর অমৃতবার্ত্তা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত এরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। জগদ্বন্ধু সুন্দর, তাঁহার কথা সুন্দর, সুতরাং সমস্ত সুন্দরের সমাবেশে গ্রন্থখানাও সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। এ গ্রন্থে গ্রন্থনকারীর যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় রহিয়াছে। লেখক স্থানে স্থানে মর্ম্মগ্রাহী ভাবে প্রভুর কথায় সার্থকতা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকগণকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

ভুবনমঙ্গল হরিনাম মহাউদ্ধারণ-মন্ত্র। ইহাই জীবের একমাত্র পরিত্রাণের উপায়।—নামই জীবের খাইতে, শুইতে, জন্মিতে,

মরিতে, একমাত্র সম্বল।—প্রভুর এই পরম কল্যাণকর অভিনব হরিনামের ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইলে প্রতিগৃহে যে ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।—প্রভু এবার লীলায় আসিয়া উদ্ধারণের মূলে হাত দিয়াছেন। কেন না জন্মিবার পূর্ব্বেই হরিনামের ব্যবস্থা হইলে ভক্তশিশু জন্মগ্রহণ করাতে পৃথিবী ক্রমে নামে ও ভক্তিতে পূর্ণ হইবে এবং ভগবানের উদ্ধারণও সহজ হইবে। বন্ধুবার্ত্তায় প্রভুর এই অভিনব ব্যবস্থা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।——

লীলার সমস্ত ব্যাপারই মুখ্যভাবে মায়ামুগ্ধ জীবের উদ্ধারের ও আদর্শের জন্য, মুক্ত সাধু সন্ন্যাসীর জন্য নহে।—ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের প্রচার দেখিলে আনন্দিত হইব।" রাজবাড়ী, বৈশাখ, ১৩৩৩।

ডাহাপাড়া শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-ধাম হইতে মহানামনিষ্ঠ পরম বন্ধুপ্রিয় শ্রীল কুঞ্জদাদা ১৩৬১, ৪ঠা আষাঢ়, লেখককে স্নেহাশিস্ জানাইয়া লিখেন—

"প্রাণের ভাই নিত্য,

...শ্রীশ্রীবন্ধুবার্ত্তা প্রকাশ হইতেছেন জানিয়া আনন্দ হ'ল। প্রভুর দয়ার সীমা নাই——"

৬ই চৈত্র, ১৩৬১, ইং 20 march, 1955 রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, বন্ধুবার্ত্তার প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়া লিখেন—

বন্ধুবার্ত্তা—মহেন্দ্রকাব্যতীর্থ প্রণীত। ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত।

গ্রন্থকার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং নানাভাবে তিনি তাঁহার সঙ্গসুখে সৌভাগ্যবান্। তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও শ্রুত, পূর্ব্বে অপ্রকাশিত বন্ধুলীলামৃতের সংক্ষিপ্তসার আলোচ্য পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বন্ধুলীলা-কণা, গুরুবন্ধুবাণী, শ্রীশ্রীহস্তাক্ষর ও বন্ধুকথানুশীলন,—এই চারিভাগে বিভক্ত।

প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাকথা স্বভাবতঃই মধুর। প্রেমাবতার প্রভুর লীলা ভুবনপাবন পতিতোদ্ধারণ, সেই লীলার পরিবেশনে বিশেষ পারিপাট্য গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। গুরুবন্ধুবাণী ও শ্রীশ্রীবন্ধু-কথানুশীলন, এই দুইটি ভাগে গ্রন্থকারের অধ্যাত্মানুভূতি এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সমাহারে মনীষা পরিস্ফুট হইয়াছে। সর্ব্বাংশে সুসম্পাদিত শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভুর এমন লীলাকথা পাঠে বাংলার ভক্ত, রসিক ও চিন্তাশীল সমাজ বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই সুন্দর। কয়েকখানি মূল্যবান্ ফটোচিত্রে গ্রন্থখানি সুসজ্জিত।

কুঞ্জদাদা-স্নেহাশীস্ "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম। ডাহাপাড়া। ২৫ ভাদ্র। ১৩৭৫

'সাধু শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥'

ভাই নিত্য,

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। শ্রীশ্রীবন্ধুভাগবতামৃতবিন্দু

গ্রন্থ লেখা হয়েছে জানিয়া সুখী হইলাম। গ্রন্থের প্রয়োজন। দয়াল প্রভুর কৃপা না হইলে গ্রন্থ হয় না। পূর্ব্বলীলায় শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের অপ্রকটের ৪০ বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও ৮০ বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইলেন। এই দুই গ্রন্থের কৃপায় শ্রীগৌর কৃপা, জীবের ভাগ্য। আমাদের শ্রীশ্রীবন্ধুহরির কথামৃত প্রকট না হলে ত্রিতাপে তাপিত জীবের গতি কি হবে? শ্রীমহাউদ্ধাবণ লীলায় মহামঙ্গল বন্ধুর কথা হৃদয় ও কর্ণরসায়ন। "তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্।" "জয় জগদ্বন্ধু।" কুঞ্জ

প্রভুবন্ধুর প্রত্যক্ষ লীলাদ্রষ্টা ও পরমবন্ধুহরিপ্রিয়

শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ মহোদয়ের

বন্ধুবার্ত্তা-লেখককে আশীর্ব্বাণী

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলার 'দিগ্ দর্শন' নামে যে বাণী শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন তাহাতেই আমার কথা লিখিত হইয়াছে। তাহা বড় করিয়া লিখিলে যতবড় ইচ্ছা তাহাই করা যায়। মহানাম যাহা বিলাসদৃষ্টি নামে অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন অর্থাৎ 'হরিনাম আস্বাদন, হরিনাম বিরহ, মহাপ্রলয় ও মহাউদ্ধারণ' এই চারিটির উপরেই বন্ধুসুন্দরের সমস্ত লীলা। যে যতদূর পারে, সে ততদূর আস্বাদন করে। এই লীলার অন্ত নাই। এই সমস্ত তত্ত্ব শ্রীশ্রীবন্ধুবার্ত্তা গ্রন্থে খুব ভালভাবে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি এবং খুব ভাল লাগিয়াছে। আমি গ্রন্থকর্ত্তার সর্ব্বান্তঃকরণে

শান্তি প্রার্থনা করি। প্রভু তাঁহাকে আশ্রয় দেন ইহাই কামনা।”
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ কলিকাতা।

গ্রন্থকারকে প্রভুবন্ধুর পরম প্রিয়সেবক শ্রীল নিত্যগোপাল সরকার মহোদয়ের স্নেহাশিস্।

“প্রিয় (নিত্যসেবক) ভাইটি আমার,

সেদিন রাত্রে শ্রীঅঙ্গন হইতে আসিবার প্রাক্‌কালে কবিত্বপূর্ণ বিভিন্ন ছন্দে তোমার লিখিত শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের স্তবমালা-রূপ রসসুধা (শ্রীশ্রীবন্ধুস্তোত্র-রত্নাবলী) কিঞ্চিৎ পরিবেশন করিয়া যে আনন্দ দিয়াছ তাহা ভুলিতে পারিতেছি না। তোমার কলমে যে সুধাধারা ক্ষরিত হইয়াছে, উহাদ্বারা ত্রিতাপদগ্ধ জনগণ স্নপিত হউক। এরূপ সুন্দর রত্ন শীঘ্রই ছাপার অক্ষরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হউক, ইহাই প্রার্থনা। পুনঃ আস্বাদিতে লোভ বাড়ে চিতে——। জয় জগদ্বন্ধু হরি।
কলিকাতা, ১৩৬৪।৯ই চৈত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণাশ্রিত অমানী-মানদ ভক্তরত্ন কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার দাশগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় বন্ধুলীলামৃতকণা আস্বাদনানন্তর তাঁহার হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার নিত্যসেবক মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থকে লেখেন—

“—হৃদয়ের ভক্তি ও ভালবাসা গ্রহণ করুন। আপনার প্রেরিত “শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুলীলামৃতকণা ও বন্ধুপ্রীতি” গ্রন্থ পাইয়া আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিলাম। “শ্রীশ্রীপ্রভু” সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ

পড়িয়াছি, শ্রীঅঙ্গনের সাধুদের কৃপায়। কিন্তু এমন আনন্দ অন্য কোথাও পাই নাই। মাদৃশ হীন ও অজ্ঞজনের প্রশংসা বা নিন্দায় আপনার কিছুই আসে যায় না। বহু কৃতবিদ্য লোক ইহার সমাদর করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বড়ই ভাল লাগিল। কোথায়ও অতিরঞ্জিত করিবার লেশমাত্র প্রয়াস নাই। ইহাই আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করিয়াছে। আমার পরম শ্রদ্ধা রইলো আপনার প্রতি—ইতি—" ইং ৭।১।১৯৬৭ সিন্দিয়াঘাট, ফরিদপুর।

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরির অশেষ কৃপায় অনেকাংশ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বন্ধুবার্ত্তার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থমুদ্রণের কাগজের ব্যয় অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় উত্তমরূপে বাঁধান গ্রন্থের মূল্যও কিছু বর্ধিত করিয়া ধার্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতি

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীপ্রভুর অশেষ কৃপায় অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীশ্রীহস্তাক্ষর ও কয়েকখানি ফটোচিত্রসহ বন্ধুবার্ত্তার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ব্যয়াধিক্য বশতঃ মূল্য কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল, তজ্জন্য ভক্তবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি—

দীন প্রকাশক
শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর